শুকতারা-র

১০১ গোয়েন্দা ও রহস্য গল্প

ছোটদের কাছে গোয়েন্দা গল্প আর রহস্য গল্পের মতো আকর্ষণীয় জিনিস আর নেই। জমজমাট একখানা গোয়েন্দা গল্প কি গা-ছমছম রহস্য গল্প পেলে তারা নাওয়া-খাওয়া ভুলে যায়। শুধু কি ছোটরা! ছোটদের হাতে গল্পের বই দেখলে যাঁরা ধমক দেন, লুকিয়ে তাঁরাও সেই বই নিয়ে মশগুল হয়ে যান। এমনই নেশা এসব গল্পের।

এক-এক সময় এক-এক গোয়েন্দার কদর হয়। কখনও জয়ন্ত-মাণিক, কখনও ব্যোমকেশ বক্সী, কখনও ফেলুদা, কিন্তু এরা ছাড়াও আরও অনেক শখের গোয়েন্দা আছে, গোয়েন্দা গল্পের জাদুকর অনেক লেখকও আছেন। একই কথা বলা যায় রহস্য গল্প সম্বন্ধে। এক-এক ধরনের রহস্য গল্পের এক-এক রকম রোমাঞ্চ। এ জাতীয় গল্পের কয়েকজন দুর্ধর্ষ লেখকও ছিলেন। 'শুকতারা' পত্রিকায় দীর্ঘ চৌষট্টি বছর ধরে এরকম রুদ্ধশ্বাস গোয়েন্দা গল্প আর রোমাঞ্চকর রহস্য গল্প বেরিয়েছে প্রচুর, সেগুলো থেকেই অত্যন্ত যত্ন করে বেছে বেছে সেরা একশো একটি গল্প এখানে জড়ো করা হয়েছে। লেখকদের মধ্যে যেমন আছেন হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুধীন্দ্রনাথ রাহা, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণ সান্যাল, লীলা মজুমদার বা আশাপূর্ণা দেবীর মতো লেখক, তেমনি আছেন একালের মহাশ্বেতা দেবী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, অদ্রীশ বর্ধন, অজেয় রায়, শক্তিপদ রাজগুরু, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায় বা হিমানীশ গোস্বামীর মতো বাঘা বাঘা লেখক।

এক সময় যে সব গোয়েন্দা ও রহস্য গল্প পাঠকদের চমকে দিয়েছে, সেইরকম একশো এক গল্পকে হাজির করা হয়েছে তোমাদের জন্যে। সাবধানে পড়তে হবে, একবার ধরলে কিন্তু এ বই ছাড়া যাবে না!

ISBN: 978-93-5060-002-3

শুকতারার ১০১ গোয়েন্দা ও রহস্য গল্প

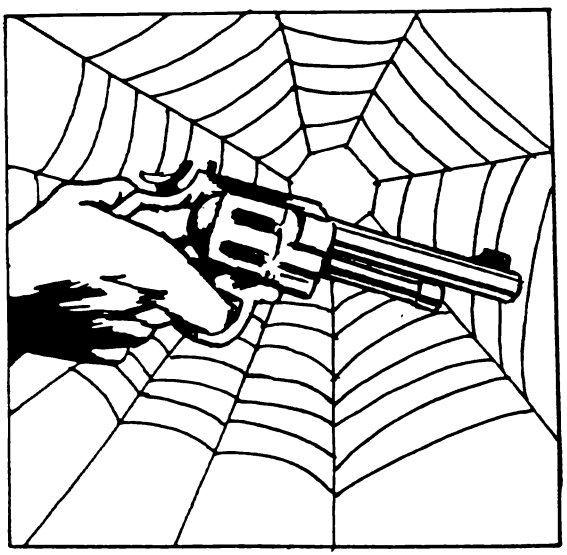

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড

SUKTARAR

101 GOENDA O RAHASHYA GALPA

(A collection of 101 crime and detective stories)
Code No. 87 S 28
ISBN 978-93-5060-002-3
Price : Rs. 250·00

Dev Sahitya Kutir Pvt. Ltd.
21 Jhamapukur Lane, Kolkata- 700 009

Tel : 2350-4294/4295/7887

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, জানুয়ারি ২০১২, মাঘ ১৪১৮
পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০১২, পৌষ ১৪১৯
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ২১ ঝামাপুকুর লেন,
কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে শ্রীঅরুণ চন্দ্র মজুমদার কর্তৃক
প্রকাশিত এবং বি. সি. মজুমদার কর্তৃক বি. পি. এম'স
প্রিন্টিং প্রেস, রঘুনাথপুর, দেশবন্ধুনগর, উত্তর ২৪
পরগনা থেকে মুদ্রিত। **বর্ণ সংস্থাপন :** বীণাপাণি
প্রেস, ১২/১এ বলাই সিংহ লেন,
কলকাতা-৭০০ ০০৯
প্রচ্ছদ : গৌতম দাশগুপ্ত

দাম : ২৫০·০০ টাকা

ভূমিকা

ছোটদের পত্রিকা হিসাবে 'শুকতারা'-র একটি বিশেষ স্থান আছে। একসময় 'শিশুসাথী' আর 'মৌচাক' পত্রিকার যখন ছিল জয়-জয়কার, সেই সময় এর সঙ্গে পাল্লা দিতে এসেছিল 'শুকতারা'। শুধু পাল্লাই যে দেয়নি, দীর্ঘকাল সুনামের সঙ্গে টিকে গেছে, তার প্রমাণ তার চৌষট্টি বছরের জয়যাত্রা। মধ্যে অনেক পত্রিকার জন্ম হয়েছে, সুনামও অর্জন করেছে, কিন্তু এরকম দীর্ঘ স্থায়িত্ব তারা লাভ করতে পারেনি। অনেক পত্রিকাই লুপ্ত বা লুপ্তপ্রায় হয়েছে, কিন্তু 'শুকতারা' দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করে চলেছে, আজও।

'শুকতারা' পত্রিকার হরেক আকর্ষণ, কিন্তু অন্যতম প্রধান আকর্ষণ এর গল্প। অত্যন্ত সন্তর্পণে সেই সব গল্প থেকে ভূতের গল্পগুলি বেছে নিয়ে আমরা গত বছর একটি সংকলন প্রকাশ করেছিলাম। সেই বইয়ের প্রভূত জনপ্রিয়তাই আমাদের উৎসাহিত করেছে এই ধরনের আর একটি বইয়ের সংকলন করতে। ভূতের গল্পের মতোই কিশোরদের কাড়াকাড়ি করে পড়ার মতো গল্প হল গোয়েন্দা গল্প। সেকালে হেমেন্দ্রকুমার রায় থেকে শুরু করে অনেকেই ছিলেন গোয়েন্দা গল্পের জাদুকর, একালেও দক্ষ গোয়েন্দা গল্পের লেখক নিতান্ত কম নেই। গোয়েন্দা গল্প ছাড়াও বিচিত্র ধরনের রোমাঞ্চকর রহস্য গল্প প্রকাশিত হয়েছে এই পত্রিকায়। একসময় সেই সব গল্প কেবল ছোটদের নয়, বড়োদেরও টানতো সমানভাবে। সেই কারণে আমরা এবার উৎসাহিত হয়েছি ১০১ গোয়েন্দা ও রহস্য গল্পের সংকলনে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে, এরকম একটি সংকলনগ্রন্থ প্রকাশ করা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। ঐতিহ্যশালী পত্রিকা 'শুকতারা'-য় একসময় লিখেছেন গোয়েন্দা ও রহস্য গল্পের দিকপাল সব লেখক। তাঁরা যখন প্রবীণ হয়েছেন তখন উদীয়মান কিছু লেখক এসে কিশোরদের মন জয় করে নিয়েছিলেন—আজ তাঁরাও অনেকেই প্রবীণ। বর্তমান নতুন প্রজন্মের কিছু লেখক এখন আসর জাঁকিয়ে বসেছেন, ছোটদের কাছে তাঁরাও এখন খুব জনপ্রিয়। আমাদের গল্প বাছাই করতে হয়েছে এই তিন প্রজন্মের লেখকদের রচনা থেকে। এর পরেও একটি কথা আছে, দীর্ঘ চৌষট্টি বছরের জনপ্রিয় পত্রিকায় যেসব লেখক গল্প লিখেছেন, তাঁরা অনেকেই নিয়মিতভাবে লিখেছেন। অর্থাৎ একদিকে যেমন তিন প্রজন্মের লেখকদের মধ্যে বেছে নিয়ে একটি সংকলনগ্রন্থ করা কঠিন ব্যাপার, তেমনি তাঁদের প্রচুর লেখার মধ্যে সেরা লেখাটি নির্বাচন করাও নিতান্ত সহজ ব্যাপার নয়। সেকালের ও একালের যেসব লেখদের আমরা এই সংকলনে রেখেছি তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু নাম—হেমেন্দ্রকুমার রায়, যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, ধীরেন্দ্রলাল ধর, সুধীন্দ্রনাথ রাহা, নীরদচন্দ্র মজুমদার, মুরারিমোহন বিট, শৈলেশ ভড়, মহাশ্বেতা দেবী, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, আশাপূর্ণা দেবী, স্বপনবুড়ো, লীলা মজুমদার, নারায়ণ সান্যাল, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, প্রফুল্ল রায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ও সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়।

এরকম একটি দুঃসাধ্য কাজ সম্পন্ন করা একার পক্ষে সম্ভব নয়, বিভিন্ন ব্যাপারেই আমরা বিভিন্ন মানুষের শরণাপন্ন হয়েছি। এঁদের সকলের কাছেই আমরা কৃতজ্ঞ। তবে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে সাহিত্যিক শ্রীরূপক চট্টারাজের কাছে। এই সংকলনের কাজে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। আমাদের অনেকেরই শ্রম এবং উদ্বেগ জড়িত আছে এই গ্রন্থের সঙ্গে, যাদের জন্য এত শ্রম এই বই তাদের মনের মতো হলেই আমাদের এই উদ্যোগ সার্থক হল মনে করব।

প্রকাশকের নিবেদন

বিগত বছরে 'শুকতারা' পত্রিকার নির্বাচিত ১০১ ভূতের গল্পের সংকলন যখন আমরা প্রকাশ করি তখনই আমাদের পরিকল্পনা ছিল, এই পত্রিকায় প্রকাশিত গোয়েন্দা ও রহস্যের সমসংখ্যক গল্প নিয়ে আর একটি সংকলন প্রকাশ করবার। কারণ ভূতের গল্প কিশোর পাঠকদের খুবই প্রিয় সন্দেহ নেই, কিন্তু গোয়েন্দা গল্পের জনপ্রিয়তাও নিতান্ত কম নয়—কিশোর পাঠক তো বটেই, তাদের অভিভাবকরাও এসব গল্প উপভোগ করেন বলে আমাদের প্রচুর চিঠিপত্র দিয়ে উৎসাহিত করেন। এছাড়া বিশেষত আগেকার দিনে হাড়-হিম-করা রোমাঞ্চ গল্পেরও কয়েকজন জাদুকর ছিলেন, তাঁদের বেশ কিছু গল্প আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এই সব গল্প আমরা একসঙ্গে সাজিয়ে দিয়েছি যাতে আজকের পড়ুয়ারা সেসব গল্পের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং বয়স্ক পাঠকের পুরনো স্মৃতি উজ্জীবিত হয়।

দীর্ঘদিন ধরে 'শুকতারা' পত্রিকায় যেসব গোয়েন্দা ও রহস্য গল্প পাঠকের মন রোমাঞ্চিত করেছে, এখনও কিশোরদের মনে যাঁরা এ জাতীয় গল্পের আকর্ষণ জাগিয়ে রেখেছেন প্রাচীন ও নবীন লেখকদের সেই সব গল্পের একটি আকর্ষণীয় সংকলন হয়ে উঠেছে এই গ্রন্থ। এইরকম একটি সংকলন করতে গেলে গল্প নির্বাচন, সংগ্রহ, তার আকর্ষণ অনুযায়ী বিন্যাস ইত্যাদি কাজ অত্যন্ত দুরূহ। অনেকেই এ কাজে আমাদের সাহায্য করেছেন কিন্তু এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা পেয়েছি কবি ও সাহিত্যিক শ্রীরূপক চট্টারাজের কাছ থেকে। তাঁর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

১০১ ভূতের গল্পের সংকলন কিশোর পাঠকদের মধ্যে যেভাবে আলোড়ন জাগিয়েছিল, এই গ্রন্থও যদি সেভাবেই তাদের আকর্ষণ করে তাহলেই আমাদের শ্রম সার্থক হয়ে উঠবে।

Get Bangla eBooks

আরো বাংলা বইয়ের জন্য
নিচের লিংকে
ক্লিক করুন

www.banglabooks.in

৫৯। সুভাষ ধর
৬০। স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়
৬১। মীরা বালসুব্রনিয়ন
৬২। ব্রজেশ তরফদার
৬৩। হীরেন চট্টোপাধ্যায়
৬৪। ঘনশ্যাম চৌধুরী
৬৫। বরুণ দত্ত
৬৬। শচীন দাশ
৬৭। মনোরঞ্জন ঘোষ
৬৮। মনোজ সেন
৬৯। আশিস সান্যাল
৭০। দীপঙ্কর বিশ্বাস
৭১। দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৭২। সুধীন্দ্র সরকার
৭৩। রমেশ দাস

পিলাকের গুপ্তধন ... ৪০৬
আকাশে মৃত্যুর ফাঁদ ... ৪২৫
জয়সলমীরের গাইড ... ৪৩৩
মাকড়সার জাল ... ৪৩৮
বাঘের ঘরে ... ৪৪৫
বন্ধ কারখানার অন্ধকারে ... ৪৫৩
শয়তানের শেষ অভিযান ... ৪৬১
অনুতোষের অন্তর্ধান ... ৪৬৫
এক টিপ নস্যি ... ৪৭০
রাধাগোবিন্দ রহস্য ... ৪৭৬
কারবাইনস কোভে আতঙ্ক ... ৪৮১
চুপিচুপি গুপ্ত এন্ড কোং ... ৪৯০
চৌধুরীবাড়ির গোলাপী মুক্তোর মালা ... ৪৯৭
কাকতাড়ুয়া ... ৫০৬
তপোবনে রহস্যভেদ ... ৫১১

লেখকের নাম	গল্পের নাম	পৃষ্ঠা
৭৪। শুভমানস ঘোষ ...	দস্যু এল দ্বীপে ...	৫১৭
৭৫। অপূর্ব দত্ত ...	ছেঁড়া পাতার রহস্য ...	৫২৫
৭৬। ধ্রুবজ্যোতি রায়চৌধুরী	নরসিংজীর কাতান ...	৫৩৩
৭৭। বাপ্পাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়	একের ভিতর তিন ...	৫৩৮
৭৮। সঞ্জীব সিংহ	রহস্যময় বন্ধু ...	৫৪৪
৭৯। অসিত মৈত্র	প্রেতপিশাচের অভিশাপ ...	৫৫২
৮০। দেবব্রত মুখোপাধ্যায়	শরীর ছেড়ে বেরিয়ে ...	৫৬৬
৮১। গৌরী দে	ইছামতীর তীরে ...	৫৭২
৮২। পঙ্কজ দাস	রহস্যময় হত্যাকাণ্ড ...	৫৭৬
৮৩। চণ্ডী ভট্টাচার্য	প্ল্যানচেট, ফেলুদা ও গোয়েন্দা আর্য সেন ...	৫৮১
৮৪। অজিত পুততুণ্ডু	নিখোঁজ নটরাজ ...	৫৮৪
৮৫। মনতোষ মিশ্র	তান্ত্রিকের তুকতাক ...	৫৯০
৮৬। চুনীলাল সরকার	রতনগড়ের রানীমা ...	৫৯৩
৮৭। সঞ্জয় কুমার ভুঁইয়া	জাহাঙ্গীরের ছুরি ...	৫৯৭
৮৮। জাহান আরা সিদ্দিকী	রহস্যময় বাড়ি ...	৬০১
৮৯। সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়	অজানা সংকেত ...	৬১০
৯০। অনিল কুমার ঘোষ	দেওয়াল লিখন ...	৬১৫
৯১। অমিতাভ পাল	কালীনাথের শব্দছক ...	৬১৯
৯২। গোপালচন্দ্র হালদার	ট্রেজার হান্ট ...	৬২৪
৯৩। সঞ্জয় ব্রহ্ম	বাবা সোমেশ্বরের অন্তর্ধান রহস্য ...	৬৩১
৯৪। নন্দলাল ভট্টাচার্য	কৃষ্ণের গোয়েন্দাগিরি ...	৬৩৫
৯৫। সুব্রত মাইতি	জঙ্গল-বাড়ির রহস্য ...	৬৪০
৯৬। সিদ্ধার্থ সেনগুপ্ত	সবুজ নটরাজ ...	৬৪৫
৯৭। উৎপল চক্রবর্তী	গণেশ উধাও! ...	৬৫১
৯৮। পার্থপ্রতিম মণ্ডল	দীপুদার গোয়েন্দাগিরি ...	৬৫৮
৯৯। কল্যাণ মৈত্র	হোয়াই ...	৬৬৭
১০০। ত্র্যম্বক গাঙ্গুলী	আইপড রহস্য ...	৬৭৩
১০১। রূপক চট্টরাজ	চন্দ্রদার দ্বিতীয় অভিযান ...	৬৮৪

পিলাকের গুপ্তধন

সুভাষ ধর

সিঙ্গারবিল এয়ারপোর্টে নেমে ঘোষ জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, 'আহা, এইখানকার বাতাসেও চমৎকার সুবাস। মনপ্রাণ তাজা হইয়া যায়।'

সুশান্ত বলল, 'একটু আগেই শূন্যে আমাদের উড়োজাহাজ যখন বাতাসে সাঁতার কাটছিল তখন তোমার মনপ্রাণ আর যাই হোক তাজা ছিল না।'

ঘোষ অপ্রস্তুত মুখে বলল, 'বহুদিন পর আকাশে উইঠা শূন্যে লাফঝাঁপ ঠিক বরদাস্ত হয় নাই। আমাদের প্লেইন মাঝে মাঝেই মেঘ কাটাইবার জন্য উপর-নীচ করছিল, আর মনে হইতেছিল যদি কোনোক্রমে গোঁত্তা খাইয়া একেবারে মাটির লগে ধাক্কা খাই, তখন কী হইব!'

সুশান্ত বলল, 'দেবীবাবু চাইছিলেন আমি যেন কোনো সাহসী সঙ্গী নিয়ে ত্রিপুরায় যাই। তখন তাঁকে বললাম, ঘোষ ভীষণ সাহসী, যাকে বলে সিংহহৃদয়। সিংহহৃদয় লোকটিকে তিনি যদি তখন দেখতেন!'

কথাবার্তায় ছেদ পড়ল। কারণ স্বস্তিক সামন্ত, অমূল্য দেববর্মণ ছাড়াও আরেকটি বিশেষ পরিচিত মুখ প্রণব বোস লাউঞ্জের ওপাশ থেকে প্রবলভাবে হাত নাড়ছে। প্রণব বোস আজ ধড়াচূড়ায় নেই, সাফারি স্যুটে ভারিক্কি ভাব।

মামুলি চেকিং পার করে অন্যপাশে আসতেই আলিঙ্গন, কুশল প্রশ্ন। স্বস্তিক বললেন, 'আমার জিপ বাইরে দাঁড়িয়ে। আগে চলো আমার বাড়িতে গিয়ে একটু ফ্রেশ হয়ে নেবে। তারপরে না হয় কাজের কথা।'

প্রণব বলল, 'উত্তম প্রস্তাব। তাড়াতাড়ি বাইর হইতে গিয়া ইয় প্রাতরাশ ঠিকঠাক হয় নাই। স্বস্তিকদার বাড়িতে বরাবর ঢালাও ব্যবস্থা থাকে। আগে পেট শান্ত কইরা পূর্ণ উদ্যমে কাজে ঝাঁপানো যাইব।'

এয়ারপোর্ট থেকে শহরের প্রান্তে উঁচু-নিচু টিলা পার করে স্বস্তিক সামন্তের বাংলো। বড় বড় লিচুবাগান, আনারসের ক্ষেত আর জলাশয়ের পাশ দিয়ে কয়েক মাইলের পথ। এখানে পাহাড় নেই, কিন্তু মাঝে মাঝেই বিস্তীর্ণ জায়গা নিয়ে উচ্চভূমি। স্থানীয় নাম টিলা।

সুশান্ত কাজের কথা রাস্তায়ই সেরে নিল। বলল, 'এটা কোনো বড়ো-সড়ো দলের একক দুষ্কর্ম কিনা ঠিকঠাক বলা যাচ্ছে না। কিছুদিন আগে একটি লোক বার্টরাম স্ট্রিটে কিছু প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা একজন বিদেশিকে বিক্রি করছিল এমন অবস্থায় হাতে-নাতে তাকে ধরা হয়। স্বর্ণমুদ্রাগুলোর সময়কাল সপ্তম শতক। সোনার দাম তার যাই থাক এদের প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য খুব বেশি। লোকটিকে জেরা করে ওর আরো দুই সঙ্গীকে আটক করা হয় সদর স্ট্রিটের একটি গেস্ট হাউস থেকে। ওদের কাছেও আরো কিছু প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা ছিল। এরা কেউ ভারতীয় নয়। দুজন বাংলাদেশী এবং একজন সুদূর আরাকানবাসী, মগজাতীয়। স্বভাবতই পণ্ডিতি পরামর্শ নেওয়া হল এবং এই তিনজনকেও কিছু উত্তম-মধ্যমসহ জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। যে সত্য বেরিয়ে এল তাও বেশ চমকপ্রদ। ত্রিপুরার বিলোনিয়া অঞ্চলের একটি স্থান পিলাক নামে প্রসিদ্ধ। প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক কারণে। ওখানে মগ এবং পুব বাংলার উদ্বাস্তুদের একটি বিশাল উপনিবেশ গড়ে উঠেছে। এরা মূলত কৃষিজীবী। পুব বাংলার উদ্বাস্তুরা প্রচুর পরিশ্রম

করে জলাভূমি এবং অনুর্বর পাহাড়ি টিলাগুলোর সংস্কার করে সোনার ফসল ফলাচ্ছে আর মাটি খুঁড়তে গিয়ে নিত্যনতুন মূর্তি আবিষ্কার করছে। বেলেপাথর এবং ব্রোঞ্জের তৈরি নানা দেব-দেবী ছাড়াও বুদ্ধমূর্তি, তান্ত্রিক সাধনভজনের মূর্তি, সাধারণ মনুষ্যমূর্তিও প্রচুর পাওয়া গেছে। মনে হয় কোনো এককালে এখানে বৌদ্ধধর্ম এবং হিন্দুধর্মের সহাবস্থান ছিল। যাহোক, এগুলো পুলিশি সমস্যা নয়, ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণার ব্যাপার। পুলিশি ব্যাপার হল এই তিনটি লোক আরো একটি জবরদস্ত খবর দিয়েছে যে পিলাকের কোনো গুপ্তস্থানে সাতরাজার ধন ছোট্ট সিন্দুকে পুরে লুকনো আছে। স্বর্ণমুদ্রা বা স্বর্ণালঙ্কার কিছুই না তার কাছে সম্পদের হিসেবে।'

স্বস্তিক সামন্ত বললেন, 'এ সম্পর্কে আমিও কিছু কিছু শুনেছি। স্যাইকিয়ং নামে একটি বহু প্রাচীন পুঁথিতে নাকি পিলাকের গুপ্তধনের কথা লিপিবদ্ধ করা আছে। ঐ পুঁথিতে নকশা এঁকে গুপ্তধনের পথনির্দেশও দেওয়া আছে। বার্মা অথবা আরাকান অঞ্চলের কোনো ভ্রমণকারী এই পুঁথিটি লিখে যান। আসল পুঁথিটি কেউ চোখে দেখেছে বলে মনে হয় না। তবে আরাকান অঞ্চল থেকে মাঝে মাঝেই দুঃসাহসী অভিযাত্রীরা এই অঞ্চলে গুপ্তধনের সন্ধানে আসে, এ খবরও আছে।'

অমূল্য বলল, 'বুড়োদের মুখে আমিও শুনেছি বিষধর সাপ ঐ গুপ্তধনের রক্ষক। রাতে নাকি সাপের মাথার মণি জ্বলে। কাঁপে বুদ্ধের মুখ আঁকা লাঠি আর মুখে ওঁচাই মন্ত্র জপ করলে সাপ রাস্তা আগলায় না। তবে ওঁচাই মন্ত্র উচ্চারণে ত্রুটি থাকলে আর রক্ষা নাই।'

প্রণব বোস বলল, 'ইয়, সুশান্ত ভাই, একখান দুঃসংবাদ দিমু দিমু কইরাও দিতে বুক ফাটছিল। তুমার গজমোতির হার আবিষ্কার আর ডাকাইত সর্দার মোনাগাজিরে প্রহারের কথা মনে আছে তো? সেও আমারে কইছিল, পিলাক নদীর আশেপাশে কোথাও অনেক ধনসম্পদ লুকানো আছে। সেই সম্পদের আসল মালিক হইল অর পূর্বপুরুষ সামসের গাজি। কোনোদিন ছাড়া পাইলে ঐ সম্পদ উদ্ধার করা অর প্রধান কর্তব্য। ভাইরে, মোনাগাজি আগরতলার সদরজেলে স্থানান্তরিতে হইবার সময় দুই প্রহরীরে জখম কইরা জঙ্গলে আত্মগোপন করছে। একসপ্তাহ আগের কথা। বিশালগড়ের জঙ্গলে চিরুনি তল্লাশি কইরাও অর খোঁজ পাওয়া গেল না!'

সুশান্ত বলল, 'প্রণব, শুধু ডাকাতসর্দার মোনাগাজি নয়, পূর্ব পাকিস্তানে যাদের বলত রাজাকার, বাঙলাদেশ স্বাধীন হবার পর এরা দুই দেশের সীমান্তের আশেপাশে ভোল পাল্টে নাম পাল্টে আত্মগোপন করে আছে। মিলিটারি ইন্টালিজেন্সের খবর, এদের একটা কুখ্যাত ছোট দল পিলাকের আশেপাশে ঘাঁটি গেড়ে আছে। চট্টগ্রামের ময়নামতীর মগ আর পিলাকের মগদের মধ্য যাতায়াত রয়েছে। তেমনি নোয়াখালি আর শ্রীহট্টের বাঙালিদের সঙ্গে পিলাকের উদ্বাস্তুদের আত্মীয়তা, বৈবাহিক সম্পর্ক থাকাতে অনবরত সীমান্তের এপার-ওপার চলছে। রাতের অন্ধকারে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে এরা পিলাকের ঋষ্যমুখে কী যেন খুঁজে বেড়ায়। মিলিটারির ধারণা, একাত্তরের যুদ্ধের আগে-পরে একটি স্মল আর্মের বিশাল পেটি এখানেই কোথাও লুকনো আছে। অসংখ্য আমেরিকায় প্রস্তুত পিস্তল বা রিভলবারের দামই বা কি কম?'

ঘোষ মুখ খুলল, 'পিলাক দেখি একখান গুপ্তধনের দেশ। সামসের গাজির ধনসম্পদ, চিনা না মগ সাহেব ভাইকিংয়ের রত্নালঙ্কার, সেইসঙ্গে রাজাকার বাহিনীর অস্ত্রভাণ্ডার। কেইসটা ভালোই জমছে মনে হয়!'

সুশান্ত বলল, 'ঘোষ, সাগরদস্যুদের আরেক নাম ভাইকিং। আমরা বলছি একটি প্রাচীন পুঁথির কথা, তার নাম সাইকিং। দেখো, পুঁথিটি উদ্ধার করতে পারো কিনা। তবে কোন ভাষায় লেখা সঠিক জানা যায়নি এখনো। চৈনিক, তিব্বতি না আরাকান অঞ্চলের ভাষায় লেখা, বইটি পেলেই বুঝা যাবে।'

প্রণব বলল, 'ইয়, আমি অল্প কিছুদিন যাবৎ বিলোনিয়া সদর থানার চার্জে আছি। পিলাক আগরতলার সদর হইতে একশো কিলোমিটারের রাস্তা। পথ দুর্গম। মাঝে-মধ্যে পার্শ্ববর্তী বিশাল

বনাঞ্চল হইতে জংলী বাইসন বাইর হইয়া আসে। অরা দূর হইতে ভালো। ক্ষেপলে ভয়ঙ্কর। শরীরে অসীম শক্তি। শিং দিয়া গুঁতা মাইরা জিপ উল্টাইয়া দিতে সক্ষম। জংলী হাতিও আছে, তবে এইদিকে কম আসে। আমরা শান্তিরবাজার অথবা জোলাইবাড়ির ডাকবাংলোয় থাকতে পারি। ভালো ব্যবস্থা, খাওয়া-দাওয়া উত্তম।'

কথাবার্তার ফাঁকে স্বস্তিক সামন্তের প্রাসাদোপম আলয়ে জিপ ঢুকে পড়ল। এখানকার বনেদি লোকদের মতো অনেকখানি খোলামেলা জায়গা নিয়ে বাড়ি, রাস্তা থেকে বেশ উঁচু টিলার উপরে তৈরি। লাল সুরকি ঢালা গাড়ি চলাচলের রাস্তা টিলা বেয়ে বাড়ির গেট পার হয়ে গাড়িবারান্দা পর্যন্ত চলে গেছে। নানান গাছপালায় বাড়িটি ছায়াময়।

সুশান্তরা পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই হর্ন দিতে দিতে আরেকটি ঢাউস কালো গাড়ি গেট পার হয়ে ভেতরে ঢুকল। স্বস্তিকের দারোয়ান পরদুমন পুলিশের গাড়ি দেখে পুছপাছ করল না।

গাড়ি থেকে একগাল হাসি নিয়ে একজন উর্দিধারী কনস্টেবল নামল। সুশান্ত চিনতে পারল, আগেও দেখেছে, নাম নবদ্বীপ। নবদ্বীপকে দেখে প্রণব তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল, বলল, 'নবদ্বীপ, তুমারে না কইছি আমার ধারে-কাছে আসবা না? তুমারে দেখলেই আমার ব্লাডপ্রেশার চড়চড় কইরা বাইরা যায়। ডাকাইতের সর্দার মোনাগাজি একবার তোমার জন্য হাতছাড়া হয় এই আপশোস জীবনেও যাইবো না। শঙ্কর নন্দী দারোগারে অর্ডার দিছিলাম এরপরে তুমার হাতে রাইফেল না দিতে। সে কি আমার নির্দেশ অমান্য করল নাকি?'

নবদ্বীপ বলল, 'সার, মানছি মোনাগাজির ব্যাপারে একটু দোষ হইয়া গেছিল, রাইফেল লোড করি নাই। তবে আপনেও সেই দোষে দোষী। আপনার রিভলবারেও গুলি ভরা ছিল না, সেইডা ভুইলা গেলেন?'

প্রণব অগ্নিশর্মা হয়ে বলল, 'ইয়, তুমার এতো বড়ো আস্পর্ধা আমার মুখে মুখে তর্ক! তুমারে থানায় ফিরাই সাসপেন্ড করুম। আগে এইখানে কী করণের জন্য আসছো কও?'

নবদ্বীপ করজোড়ে বলল—'সার আপনে মহানুভব, আমার উপরওয়ালা। মাপ কইরা দেন। শঙ্কর নন্দী সার একখান পত্র হাতে পাইয়াই আমারে কইলেন, নবদ্বীপ দৌড়াও, প্রণববাবুসার এতোক্ষণে স্বস্তিকবাবুর ঐখানে পেটপূজায় ব্যস্ত, তেনার হাতে এই পত্র তুইলা দিও। খুব জরুরি পত্র। দেরি করবা না।'

নবদ্বীপ তার উর্দির বুকপকেট থেকে একখানা লেফাফাসুদ্ধ চিঠি বার করে প্রণবের হাতে দিল। লেফাফার মুখ ছেঁড়া, ভেতর থেকে একটি ছোট্ট কাগজ বেরিয়ে এলো। সেটিকে চিঠি না বলে চিরকুট বলাই সঙ্গত।

চিরকুটটি এইরকম।

'ইনিসপেক্টর প্রণববাবু ছাহেব সালাম,

আমি মোনাগাজি, পিলাকের দিগে আমার সম্পদ সামসের গাজি আব্বাহুজুর কুথায় রাখিয়াছেন তাহা জানি। আমারে ধরিতে গেলে আপনার এন্তেকাল নিশ্চিত জানিবেন। ইতি মোনাগাজি সরদার। পুনঃ ঐ ধনরত্ন দখল নিতে গেলাম।'

সুশান্ত হেসে বলল—'তোমার মোনাগাজি বেশ রসিক লোক দেখছি। এর আগে তোমার বন্ধু বাহারকে এইরকম সাবধানবার্তা পাঠাত। তা তোমাকেই এমন চিঠি লিখল কেন?'

প্রণব বলল, 'ইয়, আমি দোষের মধ্যে কোর্টে অর দেখা পাইয়া কইলাম, মোনাগাজি, তুমার বয়স হইছে, দাড়ি পাকছে, উকিল ধইরা ডাকাতি কেইসগুলির ডেইট নেও ক্যান? দোষ স্বীকার কইরা একেবারে জেল খাইটা শুদ্ধ হইয়া বাইর হইয়া আসো। তখন না হয় বাহাররে কইয়া অর বাবার তৈরি মসজিদে একটা কাজকাম জোগাড় কইরা দিমু। তখন উপরওলার নাম নিয়া দিনগত পাপক্ষয় করবা। মোনাগাজি ক্ষ্যাপ্যা লাল, কয় অর পূর্বপুরুষ সামসের গাজি বাহাদুর লোক ছিলেন। তাঁর কত ধনরত্ন পিলাকে লুকানো আছে, সেই বংশের লোক খিদমতগার হইতে পারে!'

সুশান্ত বলল, 'আমার মনে হয় না সেটা আসল কারণ। তোমার বিলোনিয়ায় বদলি হবার কথা ও জেনেছে। পিলাক অঞ্চলটা তোমার এলাকায় পড়েছে, এজন্যেই হুমকি দিয়ে চিঠি। যাই হোক, তিনটে দল পিলাকের আশেপাশে ঘাপটি মেরে আছে, এ সম্পর্কে নিশ্চিত হলাম। এদের মধ্যে কেউ কেউ স্বভাব-দুর্বৃত্ত, অন্যরা অনুপ্রবেশকারী। স্বস্তিকদা, আপনিও কি যেতে চান পিলাকে? তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ি চলুন। জঙ্গলের আঁকাবাঁকা উঁচুনিচু একশো কিলোমিটার পথ, কম করেও অন্তত চার ঘণ্টার ধাক্কা। রাস্তায় বরং আরো কাজের কথাগুলো সেরে নেব।'

সুশান্ত ব্যস্তসময়ে হাল্কা খাবার নেয়। প্রণব এবং সত্যেন ঘোষের যুক্তি অন্যরকম। পেটপুরে রসদ ভরে রাখলে অধিক সময় পর্যন্ত খালি-পেটের চিন্তা মাথায় আসে না! স্বস্তিক সামন্তর খানদানি ব্যবস্থা। চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় কোনো কিছুর ত্রুটি ছিল না। যার যেমন নিয়ে নিল। তাও যাত্রা শুরুতে এক ঘণ্টা বিলম্ব। দল মোটামুটি ছোট নয়। সুশান্ত, ঘোষ, স্বস্তিক, প্রণব, অমূল্য ছাড়াও জিপের ড্রাইভার-কাম-গার্ড পালোয়ান পরদুমন, কনেস্টবল নবদ্বীপ নাছোড়বান্দা, সেও সঙ্গ ধরেছে। প্রণব মুখে যতই বকাঝকা করুক, নবদ্বীপের উপর মায়ার টান আছে। পুলিশ জিপের ব্যবস্থাও থাকল। কনস্টেবল ড্রাইভার, দুজন রাইফেলধারী সশস্ত্র পুলিশ। জিপে অয়ারলেস থাকাতে জরুরি কথাবার্তার আদান-প্রদান সহজ হবে। সুশান্ত, ঘোষ, প্রণব বোসের কাছে আটত্রিশ বোরের সরকারি রিভলবার, অমূল্য আর স্বস্তিকের নিজস্ব রাইফেল। সুশান্ত ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের, ঘোষও তাই, কাজেই দুজনের সাদা পোশাক। প্রণব সুশান্তের কথামতো সাফারি স্যুট পরে নিয়েছে। ঐরকম পোশাকে সরকারি-সরকারি ভাব থাকে, দরকারে পাবলিক সাজতেও অসুবিধে নেই।

পিলাকের মতো দুর্গম অঞ্চলে থানা-পুলিশ অপ্রতুল। তুলনায় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের অস্তিত্ব ভালো। প্রণব বলল, বর্ডার সিকিউরিটির সাহায্য চাইলেই মিলবে। কলকাতায় মিলিটারি ইন্টালিজেন্সও বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর দুই দেশের মধ্যে আপাতত সম্পর্ক ভালো। তার একটাই কুফল, সীমান্তের এপারে-ওপারে অবাধ যাতায়াত বেড়েছে। প্রণবের বন্ধু মিজানুর রহমান বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বদলি হয়ে যাওয়াতে প্রণবের বাংলাদেশ রাইফেলসের সঙ্গে যোগাযোগ কম।

প্রণব সাব্রুমের বাসরাস্তা না ধরে জঙ্গলের পথ ধরল। এই রাস্তা ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে একরকম পায়ে চলার পথ। জিপ ছাড়া অন্য গাড়ি এ রাস্তায় অচল। রাস্তা যদিও বেশি, সময় লাগবে কম। মাইলের পর মাইল ঘন অরণ্যের গা ঘেঁষে রাস্তা। লোকজন নেই, লোকালয় অনেক দূরে উঁচু উঁচু টিলার উপর। সেসব জায়গায় চাকমা, টিপরা, মগ জাতীয় পাহাড়িরা টং বানিয়ে বসবাস করে আর জুম চাষ করে ফসল তোলে। শিকার আর জ্বালানি সংগ্রহ করা ছাড়া জঙ্গলে ঢোকে না পারতপক্ষে।

স্বস্তিক বললেন, 'এই বিস্তৃত বনাঞ্চল প্রায় দু'হাজার বর্গ কিলোমিটার। ভেতরে শ্বাপদ ছাড়াও জংলি হাতি, বাইসন, হরিণের দেখা মিলবে। নানা জাতের পাখিও গাছের ডালে ডালে শিস তুলছে। এটিকে সংরক্ষিত অভয়ারণ্য করার প্রয়াস চলছে।'

কথার মাঝখানেই একটি হস্তিনী এবং তার শাবক চোখে পড়ল। মা আর তার বাচ্চা হাতি পার হতে না হতেই প্রায় জিপের কাছাকাছি বাইসন। একটু পাঁশুটে রঙের, গায়ে মসৃণ লোম, অসম্ভব শক্তিদৃপ্ত চেহারা। বাইসন দেখার আনন্দে ঘোষ 'ঐ ঐ' করে উঠতেই স্বস্তিক প্রায় ওর মুখ চেপে ধরে ফিস ফিস করে বললেন, 'কোনো শব্দ নয়। আপনমনে রাজকীয় মেজাজে চরছে, কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কোনো কারণে বিরক্ত হলে এক গুঁতোয় জিপ উল্টে দেবে। ওরা চলাফেরায় সুবিধার জন্য জঙ্গল যেখানে পাতলা হয়ে আসে, ঐরকম জায়গায় চরতে ভালোবাসে। আশেপাশে পাহাড়ি নদী বা জলাশয় নিশ্চয়ই থাকবে।'

বলতে বলতেই সরু রুপোলি হারের মতো পাহাড়ি নদী জঙ্গলের ঢাল বেয়ে সমতলে নেমে এল। অমূল্য বলল, 'এই নদীর নাম যতটা জানি মুহুরি। এরই আবার বর্ষায় অন্য চেহারা, তখন

দু'কূল ভাসিয়ে চলবে। এরসঙ্গে পিলাকের কাছাকাছি এসে শিলাছড়ি নামের আরেকটি নদীর মিলন ঘটবে। গন্তব্যস্থল বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম। বর্ষার পরে চর ভেসে ওঠে। ভীষণ উর্বর জমি। জমির দখল নিতে এপার বাংলা-ওপার বাংলার কৃষকদের মধ্যে লাঠালাঠি, মাথা ফাটাফাটি। তখন এপারের বি এস এফ আর ওপারের বি ডি আর ফ্ল্যাগমার্চ করে শান্তি ফিরিয়ে আনে।'

শীত না এলেও শীতের হালকা আমেজ গায়ে লাগছে। পাহাড়ি নদী, পায়ের পাতা ডোবে না ডোবে এমন জল। তার মাঝেই চকচকে ছোট মাছের ঝাঁক স্রোতের উল্টোপথে মনের সুখে লাফিয়ে লাফিয়ে আসে। জিপ দুটো পাড়ের ঢাল দিয়ে নেমে আস্তে জলের রেখা পার হয়ে ওপারে উঠল। একটু না যেতেই শাল-সেগুন-শিমুলের বিশাল অরণ্য সীমাহীন অন্ধকার নিয়ে পথরোধ করে দাঁড়াল। স্বস্তিক, অমূল্য আর প্রণব তিনজনেরই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রচুর। স্বস্তিক বললেন, 'এই ঘন জঙ্গলের ভেতরে জিপ ঢুকবে না। মাঝে মাঝে মুলীবাঁশ অনেকটা জায়গা নিয়ে বেড়ে উঠেছে। পাতায় পাতায় সূর্যের আলো ঢেকে রাখে। বড় জন্তু তেমন একটা এইসব জঙ্গলে থাকে না। যা আছে তা শ্বাপদ। পায়ে চলার মতো রাস্তা, দা দিয়ে ছেঁটে পাহাড়িরা বাঁশ কেটে নিয়ে যায়। ওদের ধারালো দায়ের কোপে বাঁশের সঙ্গে বিষধর সাপের মুন্ডুও কাটা পড়ে অনেক সময়। আমাদের এই জঙ্গলের গা ঘেঁষেই পথ ধরে চলতে হবে।'

প্রণব এই সময় বলল, 'ইয়, ভাইরে—জায়গাটার কিন্তু তেমুন সুনাম নাই। মোনাগাজি ডাকাইতের পূর্বপুরুষ সামসের গাজির বাসস্থান আমলিঘাট খুব দূরের পথ না। ঐখানে এখনো সামসের গাজির বংশধররা জমিজমা নিয়ে বসবাস করে। তবে কৃষিকর্মের চাইতে সীমান্তের এইপার-ঐপারে ডাকাতির দিকেই অগো উৎসাহ আছে শোনা যায়!'

প্রণবের কথা শেষ না হতেই একটি পাঁশুটে হলদে জন্তু বিদ্যুতের মতো জিপের সামনে দিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল এক লাফে। ঘোষ সাতঙ্কে বলল, 'সারছে, এই জঙ্গলে চিতাবাঘও আছে দেখি!'

সুশান্ত হেসে বলল, 'ঘোষ, তোমার দেখছি রজ্জুতে সর্পভ্রম রোগ এখনো গেল না। এটি চিতাবাঘ নয়, তবে একটি অত্যন্ত ধূর্ত প্রাণী। জঙ্গলে নয়, লোকালয়ের কাছাকাছি থাকতে ভালোবাসে। গৃহস্থের পোষা হাঁস, মুরগির উপর অসম্ভব লোভ। মনে হচ্ছে কাছেই কোনো লোকালয় আছে।'

এমন সময় জঙ্গলের ভেতর থেকে সুতীক্ষ্ণ আওয়াজ, 'হুক্কা হুয়া কেয়া হুয়া!' প্রণব বলল, 'ইয় ঘোষ মশয়, আপনে পুবের দ্যাশের লোক হইয়া খ্যাঁকশিয়াল চিনেন না দেখি!'

হাক ফার্লং না যেতেই আধা পাহাড় আধা সমতল ভূমির উপর রিয়াং উপজাতির গ্রাম। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন টংয়ের মতো ঘরগুলোয় মুলীবাঁশের ব্যবহার লক্ষণীয়। কৃষিজমি বলতে পাহড়ের ঢালে গাছপালা ঝোপঝাড় জ্বালিয়ে মাটি কুপিয়ে ফসল বোনা, যার নাম জুমচাষ। এরা ভীষণ নরম স্বভাবের আর অতিথিবৎসল। ত্রিপুরার শেষ মহারাজ বীরবিক্রমমাণিক্য বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে এদের বিদ্রোহের আগুন শান্ত করে দিয়েছিলেন। অমূল্য বলল, 'এদের গ্রামে বাইরের লোকের জন্য নামমাত্র দক্ষিণায় থাকতে দেয়, খাবার ব্যবস্থাও করে। শহরের মতো আরামদায়ক না হলেও, অন্যরকম অভিজ্ঞতা।'

প্রণব বলল, 'বিকাল পাঁচটার মধ্যে পৌঁছাইতে পারলে ইয় খুব ভালো হয়। অন্ধকার খুব তাড়াতাড়ি আইসা যায় পূর্বাঞ্চলে, তখন গাড়ি চালাইয়া যাওয়াটা প্রায় অসম্ভব। এইখানে তো রাস্তার নামগন্ধই নাই। শান্তিরবাজার ডাকবাংলোয় বলা আছে। বি এস এফের ক্যাম্পেও থাকা যায়। তাম্বু খাটাইয়া নদীর পাড়ে থাকার ব্যবস্থা। অগো মেসে খাওন-দাওন ভালো। নদীর টাটকা মাছ ছাড়াও মাংস, সবজির ঢালাও ব্যবস্থা।'

সুশান্ত বলল, 'প্রণব, একশো কিলোমিটার ভালো রাস্তা, তারপর জিপ চলার উপযোগী বিশ-ত্রিশ কিলোমিটার রাস্তা জোলাইবাড়ি থেকে পিলাক নিয়ে যাবে। বড় জোর ঘণ্টা পাঁচেকের পথ। তুমি ঘুরপথে জঙ্গলের রাস্তা ধরলে, বললে সময় কম লাগবে। বাস্তবে পাঁচ ঘণ্টা পার করে দিয়েছি। আর একঘণ্টায় পৌঁছুতে না পারলে অন্ধকার নেমে আসবে দেখছি।'

প্রণব বলল, 'ইয়, ক্যালকুলেশনে একটু ত্রুটি হইয়া গেল বোধহয়। জিপ দুইটা এমন আস্তে চলবো ভাবি নাই।'

বিকেল পাঁচটা নাগাদ ঝপ করে সূর্য ডুবে গেল আর তারপরই চারিপাশে রাশি রাশি অন্ধকার। কায়ক্লেশে দুটো জিপের হেডলাইট জ্বালিয়ে শামুকের মতো গড়িয়ে গড়িয়ে চলা শুরু হল। সুখের কথা ঘন জঙ্গল বেশ কিছুক্ষণ পিছনে রেখে আসা হয়েছে। স্বস্তিক আর অমূল্য দুজনেই পথঘাট ভালো চেনে। জানাল ঋষ্যমুখের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, ওটা পিলাকেরই অংশ।

এমন সময় অন্ধকারের বুক চিরে জোরালো টর্চের আলো এবং সেইসঙ্গে আসুরিক চিৎকার, 'হোল্ট, হুকুমদার!'

ঘোষ বলল, 'এইটা আবার কী?'

সুশান্ত বলল, 'তোমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হচ্ছে। আর্মড পুলিশ অথবা ডিফেন্সের সেন্ট্রি এই ভাষাতেই চ্যালেঞ্জ করে। শুদ্ধ কথাটি হল হল্ট, হু কামস দেয়ার। জবাবে বলতে হবে, ফ্রেন্ডস। বি এস এফের ক্যাম্প এখানেই কোথাও টিলার আড়ালে হবে। অন্ধকারে চোখে পড়ছে না।'

অতঃপর সুশান্ত নিজেই হাঁক পাড়ল, 'ফ্রেন্ডস।'

মুহূর্তের মধ্যে গোটা চারেক টর্চের আলো চোখ ধাঁধিয়ে দিল এবং চারজনের একটি দল লাইট মেশিনগান নিয়ে অন্ধকার ফুঁড়ে সামনে এল। দলটির সর্দার সুবেদার র‍্যাঙ্কের। দু'চারটি কথায় বুঝে নিল, সুশান্তরা পুলিশের লোক। বলল, ইচ্ছে করেই আলোর ব্যবস্থা রাখা হয়নি। যখন-তখন রাতের আঁধারে উৎপাত করার লোক এসে পড়ে। এজন্যেই ঘাপটি মেরে বসে থেকে অ্যামবুশ বা অতর্কিত আঘাত রুখতে রাতের ডিউটি রাখতে হয়। এদের প্লেটুন কমান্ডার দিলীপ সাহানি দুর্গাপুরের লোক। বললেন, 'আপনারা আসছেন আমাদের কাছে খবর ছিল। শান্তিরবাজার হয়ে না এসে ঘুরপথে এসে গেছেন যখন ভালোই হল। এখানেই থেকে যান। আমার সঙ্গে এক প্ল্যাটুন বি এস এফ জোয়ান রয়েছে। আপনারা দশজন যোগ হলে আমাদের শক্তিবৃদ্ধি হবে। এক্ষুনি দুটো তাঁবু খাটাবার ব্যবস্থা করছি। আপনাদের থাকার কোনো অসুবিধে হবে না। এখানকার নদীতে প্রচুর মাছ। মাছ-ভাতের ব্যবস্থা ভালোই। মাংস বরং কম জোগাড় হয় মেসের জন্য।'

সুশান্ত বলল, 'সাহানি সাহেব, সীমান্ত বলতে তো এখানে নদীর এপার-ওপার। কী ধরনের ঝামেলা সামনে আসে আপনাদের?'

সাহানি বললেন, 'স্মাগলিং ছাড়াও চুরি-ডাকাতি করে নদীর ওপার হতে পারলেই অন্য দেশ। আজকাল আবার পুরনো যুগের মূর্তি এখানে-ওখানে উঠে আসছে। কিছু মূর্তি-পাচারকারীর আনাগোনাও হচ্ছে। আরেকটা দল হল স্বর্ণসন্ধানী।'

সুশান্ত বলল, 'এই অঞ্চলে আবিষ্কৃত প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা কলকাতার বাজারে হাতবদল হচ্ছে। বিদেশে এই-সব সামগ্রীর বেশ ভালো দাম। একটা চক্র বেশ সক্রিয়। তাদের কাজই হল বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রাচীন মূর্তি, অলঙ্কার, মুদ্রা ছলে বলে কৌশলে হাতিয়ে নিয়ে বিদেশে পাচার করা। এদের একটা বড়ো দল পিলাকের আশেপাশে ঘাঁটি গেড়ে আছে। এই দলটাকে গ্রেপ্তার করা অথবা নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারলেই আমাদের মিশন সার্থক হবে।'

ঘোষ বেমক্কা প্রশ্ন করার জন্য সদা উৎসুক। বলল, 'কমান্ডার সাহেব, আপনারা টিলার আড়ালে ক্যাম্প করলেন কেন? একখান বড় টিলা, তারপাশে আরেকখান ছোট টিলা। দুই টিলার আড়ালে এমনভাবে আছেন একদম কাছে না আসলে আপনাদের অস্তিত্বই টের পাওয়া যায় না।'

সাহানি বললেন, 'এইগুলি শত্রুর হাত থেকে সুরক্ষিত থাকার ব্যবস্থা। আমাদের কাছে রাতের অন্ধকারে দেখার জন্য যন্ত্রপাতি আছে, যাকে বলে নাইট ভিশন ইন্সট্রুম্যান্ট। এগুলো ব্যবহার করলে শত্রুপক্ষের গতিবিধি বুঝতে পারি, ওরা আমাদের দেখতে পায় না। এজন্যে ক্যাম্পে ন্যূনতম আলোর ব্যবস্থা। শত্রু এখানে কম নেই। আমাদের কাছে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র থাকলেও লোকবল কম। আপনারা আসাতে আমাদের শক্তি নিশ্চিত বাড়ল।'

সুশান্ত, স্বস্তিক, প্রণব, অমূল্য আর সত্যেন ঘোষের একই তাঁবুতে শোবার ব্যবস্থা। সারাদিনের ধকলের পর রাতের গুরুভোজন। সবাই গভীর নিদ্রায় তলিয়ে। আচমকা বিকট আওয়াজ শুনে সুশান্তের ঘুম ভেঙে গেল। হাতের রেডিয়াম লাগানো ঘড়িতে দেখল রাত তিনটে। স্বস্তিকরা কয়েক পুরুষের সৈনিক, যদিও ঐ লাইনে নিজে যায়নি। সুশান্ত একলাফে খাটিয়া ছেড়ে উঠে প্রথমেই বালিশের নীচ থেকে গুলিভরা রিভলবার বার করল। দেখল স্বস্তিকের হাতেও নিজের রাইফেল। বললেন, 'সুশান্ত, আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ? মনে হচ্ছে কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে আছি।'

সুশান্ত বলল, 'ঠিকই বলেছেন স্বস্তিকদা। কারা টিলার উপর থেকে মেশিনগান চালাচ্ছে আমাদের দিকে। আওয়াজ শুনে তাই মনে হচ্ছে।'

প্রায় এক মিনিটের ব্যবধানে সবাই তাঁবু ছেড়ে যার যা আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে টিলার আড়ালে যতটা সম্ভব কভার নিয়ে দাঁড়াল। সাহানি নিজেও বেরিয়ে এসে চাপা স্বরে তাঁর জোয়ানদের পজিশন নিয়ে দাঁড়াতে বললেন। সুশান্তকে দেখে বললেন, 'রোজ ভোর রাতের দিকে এই ধরনের আক্রমণ আসছে আমাদের উপর। প্রতিপক্ষে অন্তত জনা তিরিশ লোক রয়েছে। ওদের কাছে মর্টার, লাইট মেশিনগান, হাতবোমা ভালোই আছে। এটাও জানে, আমার কাছে লোক কম। প্রতি-আক্রমণ করতে পারছি না। রাতের সেন্ট্রিয়া আর কত করবে?'

সুশান্ত বলল, 'উদ্দেশ্য পরিষ্কার। যেকোনো কারণেই হোক আপনারা এই টিলার দখল ছাড়ুন এটাই ওরা চায়। তবে এলোপাথাড়ি গুলিছোঁড়া দেখে খানিকটা আনাড়ি লোকের দুষ্কর্ম বলেও মনে হচ্ছে। এরা বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত রাজাকার নয়তো? পাকিস্তানি আমলে এরা পাকিস্তানি ফৌজের তাঁবেদার ছিল এবং ওদের হাতেও প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ছিল।'

সাহানি বললেন—'আপনার অনুমান সঠিক। এরা সেই কুখ্যাত রাজাকার। ভীষণ নৃশংস এবং সবরকম অপরাধে অভ্যস্ত। গত ক'দিন থেকে বেশ রাতে ওরা আসে। ঘণ্টাখানেক গুলিগোলা ছুঁড়ে চলে যায়। আমাদের কাছেও গোপন সংবাদ দেবার লোক আছে। পিলাক অথবা মুহুরি নদীর পাশের ঘন জঙ্গলে ঘাপটি মেরে আছে। আমি অয়ারলেসে আরো ফোর্স পাঠাতে বলেছি আমাদের রিজিওনাল হেড কোয়ার্টার্সে। রিএনফোর্সমেন্ট এসে গেলেই আমরা ওদের চেপে ধরব।'

সুশান্ত বলল, 'সাহানি সাহেব, আরো ঘণ্টাখানেক গুলিগোলা ছুঁড়তে দিন ওদের। তারপর আপনার ফ্লেয়ার কার্টিজ ছুঁড়ে ওরা যেখানটায় আছে সে জায়গাটিকে আলোকিত করুন। এবং আজই চলুন ওদের উপর প্রতি-আক্রমণ করি। আমাদের সঙ্গেও আগ্নেয়াস্ত্র আছে। ওদের পিছনে ধাওয়া করে অন্তত একটা-দুটোকেও কাবু করতে পারি, গোটা দলটাকে চিহ্নিত করা এবং গ্রেপ্তার করা খুব অসম্ভব কাজ হবে না।'

ঘোষ বলল, 'বস, একখান কথা কই। কইলকাতায় যখন রায়ট লাগে আমরা হা রে রে রে গর্জন কইরা তাড়া করি দুষ্টদের। ঐটায় সাংঘাতিক কাজ দেয়।'

সুশান্ত বলল, 'গুড আইডিয়া। আমরা যখন তাড়া করব তুমিই প্রথম হা রে রে রে শুরু করবে।'

ঘড়িতে চারটে বাজলেও অন্ধকার ফিকে হয়নি। সাহানি নিজের হাতের ক্রনোমিটার দেখে নিয়ে সুশান্তের দিকে তাকাতেই সুশান্ত নিঃশব্দে সম্মতি জানাল। ওপাশ থেকে গোলাগুলির আওয়াজ ক্রমেই থেমে থেমে আসছে। সাহানির নির্দেশমতো টিলার এপাশ থেকে বি এস এফ জোয়ানরা দশ মিনিট বাদে বাদে দু'রাউন্ড করে ফায়ারিং করছিল। এইবারে সাহানি নিজেই একটি ছোট ব্যারেলের বন্দুক হাতে নিলেন এবং ব্যারেলে প্রায় বারো ইঞ্চি লম্বা শেল ঢোকালেন একটি। পুলিশের টিয়ার গ্যাস শেলের মতো দেখতে অবিকল। ট্রিগার দাবাতেই শেলটি খানিকটা আকাশে উঠে নীচের দিকে নামতে শুরু করল। ভূমি স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গেই চারদিক আলোয় আলো। সেই আলোয় বেশ কিছু দুষ্কৃতি, হাতে আগ্নেয়াস্ত্র নজরে এল।

সুশান্ত বলল, 'ঘোষ, এবারে তোমার হা রে রে রে গান শুরু করো। আমরা টিলা বেয়ে ওপারে যাচ্ছি।'

সাহানিদের বি এস এফেরও একটা আক্রমণাত্মক গর্জন রয়েছে। সব মিলিয়ে রক্ত-হিম-করা শব্দাঘাত। যারা শুনবে তাদের মনে ভীতির সঞ্চার হবেই।

সাহানি এবং সুশান্তের দল মিলিয়ে প্রায় পঁচিশজনের একসঙ্গে প্রতি-আক্রমণ। সাহানি মাঝে মাঝেই নির্দেশ দিচ্ছিলেন 'ফায়ার'। সঙ্গে সঙ্গে কয়েক রাউন্ড গম্ভীর নির্ঘোষ। কারা গায়ে লাগুক না লাগুক যারা এতোক্ষণ টিলার উপর থেকে গুলি চালিয়ে যাচ্ছিল তারাই এবারে লেজ গুটিয়ে পলায়নপর। গোটা দলটা প্রাণভয়ে নদীর দিকে পালাচ্ছে। দুটো দলের মধ্যে দূরত্ব প্রায় পঞ্চাশ-ষাট গজের।

সুশান্ত, স্বস্তিক, সাহানি আর অমূল্য পুলিশ আর বি এস এফ জোয়ানদের পুরোভাগে। প্রণব আর ঘোষ একটু পিছিয়ে পড়েছে। কিন্তু প্রণবের কনেস্টবল নবদ্বীপ পাঁচফুট লম্বা একটি লাঠি বনবন করে ঘোরাতে ঘোরাতে একদম সামনের সারিতে। বন্দুকে এলেম না থাকলেও লাঠিতে আছে, বোঝা যাচ্ছিল।

প্রায় এক ফার্লং দৌড়ের পর পলায়নকারীরা নদীর কাছাকাছি পৌঁছে গেল। এদের একজন দৌড়তে গিয়ে হাতের বন্দুক দু'পায়ের মধ্যে জড়িয়ে গিয়ে কুপোকাৎ। সুশান্তরা তখনো বেশ দূরে। লোকটা উঠতে গিয়ে আবার বেসামাল হয়ে পড়ে হাঁচোড়-পাঁচোড় করে ওঠার চেষ্টা করল। সুশান্ত এবং সাহানি দুজনে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, 'পাকড়ো, পাকড়ো।' বলল বটে, ক্ষিপ্রতায় দুজনেই সমান এবং কেউ পৌঁছুবার আগে সুশান্তের বাঁ হাত আর সাহানির ডান হাতের আঘাত আছড়ে পড়ল লোকটার কাঁধে। লোকটা এমনভাবে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, মনে হল সাময়িক চেতনা হারিয়েছে।

নবদ্বীপ লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে ততক্ষণে পৌঁছে গেছে। লুণ্ঠিত লোকটির পিছে একবার মোক্ষম লাঠির আঘাত হেনে বলল, 'সার, আপনারা আগে বাড়ুন। হেই চান্দুরে আমি দেখি।'

পিলাক নদী গোমতির মতো বড়ো নয়, তবে স্রোত প্রবল। এপার-ওপারের দূরত্ব এমন কিছু নয়। কিন্তু সাঁতার কাটতে গেলে অন্তত সিকি মাইল টেনে নিয়ে যাবে। আগের দিন সন্ধে পাঁচটায় হঠাৎ যেমন করে সূর্য ডুবে ঝপ করে অন্ধকার নেমেছিল, আজ সকালে তার উল্টো অভিজ্ঞতা। সামনে নদী, তার ওপারে দিগন্তবিস্তৃত সমতল কৃষিভূমি। আচমকা দৃষ্টিসীমার শেষপ্রান্তে লাল সূর্য লাফিয়ে উঠল এবং নিমেষে অন্ধকারের অবগুণ্ঠন সরে গেল।

সুশান্তরা দেখল নদীর তীরে ছোট ছোট ঝোপঝাপের আড়ালে বেশ কটি ডিঙি নৌকো। লোকগুলো সুশৃংখলভাবে ডিঙি নৌকোয় লাফিয়ে লাফিয়ে উঠল। আকারে ছোট হলেও এগুলো একেকটি মোটর বোট। মুহূর্তে বোটগুলো গতি নিয়ে চোখের আড়ালে চলে যেতে লাগল। সুশান্ত, প্রণব আর ঘোষের কাছে আটত্রিশ বোরের রিভলবার, সাহানির হাতে লুগার পিস্তল। ছোট আগ্নেয়াস্ত্র অত দূরের টার্গেটে অকেজো। তবে জোয়ানরা মেশিনগান এবং রাইফেল ফায়ারিং চালিয়ে যাচ্ছিল। দুজন মাটি নিল। সুবেদার প্রদীপ তামাং অচিরাৎ দুজনকে নিজের কব্জায় নিয়ে নিল।

পরিষ্কার আকাশ, সকালের ঝলমলে রোদ, টাটকা বাতাসে হিমেল পরশ। কিন্তু সেসব ছাপিয়ে গোলাবারুদের গন্ধ নাকে আসছে। নদীর ওপারে বাংলাদেশ। তীর থেকে বেশ খানিকটা দূরে ছোট্ট একটা দল নজরে এল। তালে তালে পা মিলিয়ে হাঁটছে, গায়ে উর্দি, কাঁধে রাইফেল। সুশান্ত বলল, 'সাহানি সাহেব, দূরে নদীর ঐ পাড় ছাড়িয়ে কিছু লোক মার্চ করে আসছে। মনে হচ্ছে বাংলাদেশ রাইফেলসের লোক। এদেরকে অয়ারলেসে ধরতে পারলে আমাদের আততায়ীদের ধরার ব্যাপারে একটা সুযোগ জুটত। আততায়ীরা রাজাকার হউক অথবা ডাকাত হউক, এরা দুই দেশেরই শত্রু। চাইলে হয়তো মদত মিলবে।'

সাহনি বললেন, 'বোস সাহেব, গুড আইডিয়া। অয়ারলেস নয় পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম রয়েছে, ব্যাটারিচালিত লাউডস্পিকার। আমরা মাঝে মাঝেই বি ডি আর-এর সঙ্গে এইভাবে যোগাযোগ করি।'

বলেই সাহানি একটি জোয়ানের হাত থেকে চোঙার মতো দেখতে লাউডস্পিকার হাতে নিলেন, বললেন, 'বি এস এফ স্পিকিং টু বি ডি আর। আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?'

ওপাশ থেকে আওয়াজ ভেসে এল, 'সাহানি সাহেব, সুপ্রভাত। কথা শুনতে পাচ্ছি, লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার। আমি বি ডি আরের অ্যাসিস্টেন্ট কম্যান্ডেন্ট আহমেদ। আমার সঙ্গে আপনার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে আগেই। বলুন, কী সাহায্য করতে পারি।'

সাহানি বললেন, 'সুপ্রভাত আহমেদ সাহেব। নদীর দিকে তাকিয়ে দেখুন। বেশ কিছু লোক ডিঙি করে আপনার এরিয়ায় ঢোকার চেষ্টায় আছে। এরা সন্দেহভাজন রাজাকার বা সীমান্ত দস্যু। যদি ধরতে পারেন খুব ভালো হয়।'

আহমেদ এক স্কোয়াড বি ডি আর ফোর্স নিয়ে পেট্রল করছিলেন। মুহূর্তে ফায়ারিং চালু হল। সাহানি আর ফায়ারিং করলেন না। ক্রস ফায়ারিং-এ নিজেদের লোকও ঘায়েল হতে পারে।

আধঘণ্টা না যেতেই আহমেদ লাউডস্পিকারে রিপোর্ট দিলেন, 'সাহানি সাহেব, অপারেশন সাকসেসফুল। আটজন ধরা পড়েছে। বাকি ক'জন জলে ঝাঁপিয়ে এধার-ওধার সাঁতরে পালাতে পেরেছে। এদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে চারজন রাজাকার, এরা হিন্দিভাষী, দুজন বাংলাদেশী ডাকাত আর দুজন আরাকানের মগ সম্প্রদায়ের। অদ্ভুত সামঞ্জস্য!'

সুশান্ত বলল, 'আমরা তিনজনকে ধরেছি। এবারে আস্তে-ধীরে এদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। এই আটজনকে আমাদের কব্জায় আনা সম্ভব হবে কি?'

সাহানি বললেন, 'সেটা একরকম অসম্ভব। তবে বিলোনিয়ার বর্ডারে ফ্ল্যাগমার্চ করার ফাঁকে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

সুশান্ত বলল, 'না, সেটা হবে পণ্ডশ্রম। লক্ষ করলেন কি, তিন ধরনের দুষ্কৃতি একযোগে ছিল। রাজাকার, ডাকাত আর আরাকানি মগ। যারা হয় গুপ্তধনের সন্ধানে এখানে আসছে, নয়তো প্রাচীন মূর্তি, মুদ্রা এসব হাতানোর ধান্ধায় ঘুরপাক খাচ্ছে।'

সাহানি বললেন, 'উনিশশো একাত্তরের আগে রাজাকাররা অসম্ভব জুলুম চালাত। বর্ডার এপার-ওপার করা ছিল জলভাত। শয়ে শয়ে রাজাকার কোনো কোনো জায়গার দখল নিয়ে আশেপাশে রাজত্ব করত। একাত্তরের শেষভাগে বাংলাদেশ স্বাধীন হল আর রাজাকার বাহিনীকে প্রথমেই ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া হল। আমরা এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানেও রাজাকার অপ্রতুল ছিল না।'

সুশান্ত বলল, 'তিনটি দল একযোগে কাজ করছে। ওদের তিনটি আলাদা আলাদা উদ্দেশ্য, অস্ত্রভাণ্ডার উদ্ধার, সামসের গাজির লুকনো ধনরত্ন খুঁজে বার করা এবং আরাকানিদের গুপ্তধনের সন্ধানে অ্যাডভেঞ্চার। কিন্তু এই অঞ্চলটাই ওদের টার্গেট। হয়তো এই টিলায় বা তার আশেপাশে তেমনভাবে খুঁজলে আমরাই কিছু আবিষ্কার করে ফেলতে পারি।'

সাহানি বললেন, 'কাজটা সহজ নয় মোটেই। এই টিলাটির আয়তন প্রায় আট ফার্লং। শাল, শিমুল, বাঁশের ঝাড়, ছোট ছোট ঝোপ, কী নেই এখানে! একবছর ধরে তন্নতন্ন করে খুঁজলে হয়তো কিছু আবিষ্কার হতে পারে। তবে হাঁ, যদি কেউ নকশা এঁকে পথনির্দেশ দেয়, তখন অন্যকথা।'

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর প্রণবের একটু গড়িয়ে নেবার অভ্যাস। চেষ্টায় ছিল কিন্তু ব্যাঘাত ঘটাল একটি শুঁটকো হলদেটে আধবুড়ো স্থানীয় মগ, নাম চংথং মগ। পিলাকের সন্নিকটবর্তী অঞ্চলের সর্দার। এ ধরনের লোক আবার ভীষণ অভিমানী। কথা না বললে জীবনে কখনো সহযোগিতা পাওয়া যাবে না। প্রণব এখানকার দায়িত্বে আছে সে খবর পেয়েই আর্জি জানাতে এসেছে।

তার বক্তব্য স্পষ্ট। কিছু আরাকানি মগ জঙ্গলে ঘাঁটি গেড়েছে। রটনা করেছে, সাপের মাথার মণি আর গুপ্তধন উদ্ধারের ব্রত নিয়ে এসেছে। আসল উদ্দেশ্য অন্য। পিলাকে উল্লেখযোগ্য মূর্তি বা মুদ্রা আবিষ্কার হলে সেটি হাতিয়ে বিদেশে চালান দেওয়া। স্থানীয় মগরা এতে ভীষণ চটে আছে। কিছু বিদেশি মগ বদ মতলবে এসে ওদের নাম খারাপ করবে, এটা এরা মেনে নিতে পারছে না। চংথং আন্দাজে জানে এই আরাকানিরা কোথায় গা ঢেকে আছে। এরা দিনে ঘুমোয় এবং রাতে ছোট ছোট মশাল নিয়ে অভিযানে বেরোয়। ছোট প্রাচীন প্রস্তরমূর্তি এবং স্বর্ণমুদ্রা এখানকার স্থানীয়

লোক কৃষিকাজ করার সময় প্রচুর সংগ্রহ করেছে। সিঁদুর লেপটে এইসব প্রত্নতাত্ত্বিক অমূল্য সামগ্রী প্রকাশ্য স্থানে রেখে পূজা করে এরা। আরাকানিরা ছলে বলে কৌশলে এদের কব্জায় না আনতে পারলে, চুরি-ডাকাতির আশ্রয় নিতেও দ্বিধা করে না। রাতের অন্ধকারে সীমান্তের ওপারের ডাকাত, রাজাকার এদের সঙ্গে হাত মেলায়। কোনো একটা পথনির্দেশও আছে এদের কাছে। বি. এস. এফের ক্যাম্প এখানে আছে বলে এরা সুবিধা করতে পারছে না।

চংথং বুড়োর ইচ্ছে, নৌকো করে নিঃশব্দে আরাকানিদের লুকনো জায়গাটা ঘিরে ফেলে, তাতে সব কটা ঠগ ধরা পড়বে।

সুশান্ত এসব কাজের গন্ধ পেলেই টগবগ করে ওঠে। বলল, 'প্রণব, গাত্রোত্থান করো। এমন সুযোগ হেলায় হারিও না। সাহানি সাহেবকে ডেকে জেনে নাও জায়গাটা ঠিক কোথায়। জলপথে না স্থলপথে গেলে সুবিধে হবে। বি. এস. এফের কাছে স্পিডবোড আছে কিনা, জলপথে প্রয়োজনে পাওয়া যাবে কিনা, এসব জেনে নাও। ফোর্স ক'জন নেবে সেটাও চিন্তা করতে হবে।'

এর মধ্যে ঘোষ এসে বলল, 'বস, যে তিনটা ধরা পড়ছে অদের অনেকক্ষণ রগরানি হইল। তিনটাই বাংলাদেশী ডাকাইত। মোনাগাজির নতুন রংরুট, পোলাপান কইলেই চলে।'

সুশান্ত বলল, 'ওদের গায়ে গুলি লেগেছে কি? লাগলে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হবে। পরে পুলিশ কাস্টডি।'

সাহানির ভাঁড়ার থেকে বেরিয়ে এল একটি মাঝারি সাইজের রাবারের তৈরি স্পিডবোট। হাল্কা অথচ মজবুত। গতিতে মোটর বোট ধারে-কাছে আসে না। একটাই অসুবিধে, জনাদশেক লোক উঠলে আর জায়গা থাকে না। প্রণব, সাহানি, ঘোষ আর সুশান্ত উঠল। উঠল চংথং বুড়োও। সাহানির চারজন চৌখস রাইফেলম্যান নিয়ে মোটর বোট ছুটল। এগুলো সেমি অটোমেটিক রাইফেল, প্রয়োজনে লাঠির মতোই ব্যবহার করা চলে। স্বস্তিক আর অমূল্যকে ক্যাম্পেই রেখে আসতে হল। নবদ্বীপ তিনজন আসামির তত্ত্বাবধানে থাকবে।

স্পিডবোটে জিপের অর্ধেক সময়ে পিলাক নদী ধরে জঙ্গলের সীমানায় পৌঁছানো গেল। এখানে জঙ্গল তেমন ঘনবিস্তৃত নয়। চংথংয়ের কথামতো রাবার বোট গুটিয়ে নিয়ে খানিকটা রাস্তা পদব্রজে গিয়ে আবার সামনে নদী। এবারে মুহুরি নদী। আরাকানিদের কাছে নৌকো আছে, কাজেই ওরা নাব্য অঞ্চলের পাশেই লুকিয়ে থাকবে। যতোটা সম্ভব নিঃশব্দে জঙ্গলের গায়ে গায়ে যেতে যেতে চংথং এক জায়গায় স্পিডবোট থামাতে বলল। দেখাল, গাছের পাতা ধোঁয়ায় কালো, গাছের ডালপালা ছেঁটে দেওয়া হয়েছে, ঝোপের আড়ালে দুটি ডিঙি নৌকো প্রায় অদৃশ্য হয়ে আছে!

চংথং ফিসফিস করে বলল, আরাকানিদের দলটা কাছাকাছি কোথাও আছে। সুশান্তের পরামর্শমতো সাহানি আগেই ডিঙি দুটো ওদের স্পিডবোটের সঙ্গে বেঁধে নিল। অর্থাৎ নদীপথে পালাবার রাস্তা বন্ধ। কিন্তু এই জঙ্গলে কেউ লুকোতে চাইলে তাকে খুঁজে বার করাও তো সহজ কর্ম নয়। যতোই দুপুরে ওরা বিশ্রাম করুক, আগন্তুকদের জুতোর শব্দ, শুকনো পাতার গুঁড়ো হয়ে যাবার আওয়াজ, আগ্নেয়াস্ত্রের সঙ্গে গাছের ডালের সংঘাত এসব ওদের সতর্ক কানে পৌঁছুবেই। সাহানি এবং সুশান্ত কিভাবে তীরে উঠে আক্রমণ করবে এই নিয়ে মিনিটখানেক পরামর্শ করলে। ঠিক হল, বিদ্যুতের মতো দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়তে পারলে কিছু লোক ধরা পড়বেই, কিছু হয়তো পালাবে। নিঃশব্দে আক্রমণ মোটেই ফলপ্রসূ হবে না।

স্পিডবোট আর ডিঙিগুলোকে এক জায়গায় দুজন আর্মড জোয়ানের দায়িত্বে রেখে বাকি ক'জন আস্তে করে জলের সীমানা ছাড়িয়ে জঙ্গলে পা রাখল। জায়গাটি তেমন ঘনসন্নিবিষ্ট গাছপালায় ঢাকা নয়। এমন জায়গায় বেশ কিছু কাঁঠালি কলাগাছ দেখে অবাক হতে লাগল। ঘোষের ধারণা, কেউ হয়তো কাঁঠালি কলা খেয়ে বীচিগুলো ছুঁড়ে দিয়েছিল, তাই থেকে আপন খেয়ালে কলাগাছের ঝাড় বেড়ে উঠেছে। এখানে লোক আসে বোঝা গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গাছের ডাল ভেঙে পড়ার আওয়াজ, ভীমাকৃতি কোনো প্রাণীর চলাফেরার ভীতিকর শব্দ এবং সর্বশেষে হস্তীর বৃংহন জানিয়ে দিল কোনো দলছুট হাতি কলাগাছের খোঁজে কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মনুষ্যকণ্ঠের আর্তনাদ এবং চারজন লোক ঊর্ধ্বশ্বাসে নদীর দিকে ছুটে এসে যেখানে ডিঙি নৌকো লুকনো ছিল সেদিকটায় পৌঁছে যেতেই সুশান্তদের আলিঙ্গনে বাঁধা পড়ল। আলিঙ্গন ছাড়াও চপেটাঘাত, মুষ্ট্যাঘাত যথেষ্ট চলল, বলাই বাহুল্য।

সাহানির কাছে সিল্কের কর্ড ছিল, তাই দিয়ে আচ্ছা করে চারজনকে বেঁধে ফেলা হল। চারজনই চংথংয়ের মতো দেখতে, মঙ্গোলিয়ান মুখ। কারো কাছে অস্ত্রশস্ত্র তেমন কিছু ছিল না, যা ছিল অনেকটা নেপালীদের কুকরির মতো ছোরা, ডালপালা কাটা চলে, তার বেশি কিছু নয়। সুশান্ত বলল, হাতি এলাকা ছেড়ে গেলে ওদের আস্তানাটা একবার দেখে নিতে হবে। কোনো কিছু পাওয়াও যেতে পারে হয়তো।

ঘোষ তল্লাশির ব্যাপারে ওস্তাদ। একজনের কোমরে মিলল থলিভরা স্বর্ণমুদ্রা, অন্তত সংখ্যায় দুশো হবে। দেখে প্রাচীন মুদ্রা বলেই মনে হয়। চংথং এদের সঙ্গে মগ ভাষায় কথা বলল। সুশান্ত বা কেউ মাথামুন্ডু কিছু বুঝল না।

এমন সময় ঘোষ সোল্লাসে একজনের প্যান্টের পকেট থেকে একটি চটি বই বার করে বলল, 'বস, এই নেন আপনার ভাইকিং বই। এরমধ্যে নিশ্চয় গুপ্তধনের সন্ধান আছে।'

চংথং বইটি দেখে বলল, 'এটি সাইকিং নামের আরাকানি পুঁথি নয়। বাপ-ঠাকুর্দার মুখে শুনেছি সেটি একটি হাতে লেখা প্রাচীন পুঁথি।' এটি তো হাতে লেখা পুঁথি নয়। ছাপানো চটি বই।'

প্রণব বলল, 'এই চাইরটা কুষ্মাণ্ড আরাকানের পেঁতি চোর-ছ্যাঁচড় বইলাই মনে হয়।'

সুশান্ত বলল, 'আমারও তাই মনে হয়। এগুলো চিংড়ি-উচ্চিংড়ি তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এদের পেছনে বিশাল চক্র। আমাদের দেশে ভৌগোলিক কারণেই এদের আনাগোনা বেশি। বাংলাদেশের চিটাগাঙের সঙ্গে জল-পথে আরাকান অঞ্চলের নিবিড় যোগাযোগ। আবার পার্বত্য চট্টগ্রামের সঙ্গে নদীপথে ত্রিপুরার সম্পর্কও সহস্র বছর ধরে। এজন্যে চিটাগাঙ এবং ত্রিপুরার এই অঞ্চলে মগদের অতিপ্রাচীন উপনিবেশ। এদের যে কটা ধরা পড়েছে কোর্ট অর্ডার নিয়ে একবার লালবাজারে ফেলতে পারলে বড় কাজ হবে।'

প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরে বুনো হাতির মাতামাতি চলল। গাছের ডাল ভাঙার শব্দ, কলাগাছ উপড়ে ফেলার আওয়াজ, মাঝে মাঝে চিৎকার। একসময় নদীর তীর ঘেঁষে ঘেঁষেই হাতিটি দূরের পথ ধরল। বহুদূর থেকে বৃংহন শোনার পর সুশান্তের দল সাহস করে নদী ছেড়ে পাড়ে উঠল আবার। এবারে বন্দী মগরাই পথ দেখিয়ে ওদের জঙ্গলের গোপন ডেরায় নিয়ে এল। চার-পাঁচজন থাকার উপযোগী ছোট তাঁবু। হাতি চরম আক্রোশে লণ্ডভণ্ড করে গেছে। রান্নার সরঞ্জাম, চাল, ডাল, তেল, নুন, চিনি হাতির পায়ের চাপে সব ছত্রাখান!

আচমকা চারজন বন্দীই একটি বড়োসড়ো বেতের ঝাঁপির চিড়ে-চ্যাপ্টা অবস্থা দেখে বুক চাপড়ে কান্না শুরু করল। ভাষা না বুঝলেও কান্নার ভাষা বোঝা যায়। সুশান্ত কৌতূহলী হয়ে একটু নেড়ে-চেড়ে দেখল কী আছে এতে। বেশ কিছু ব্রোঞ্জের মূর্তি। বুদ্ধ এবং হিন্দু দেবদেবীর প্রাচীন মূর্তি। কোনোটাই দেড়-দু'ফুটের চেয়ে বড়ো নয়। মূর্তিগুলোর একটাও আর অক্ষত নেই। কারো পা নেই, কারো হাত নেই, কারো মস্তক বিচূর্ণ।

সুশান্ত স্বগত উক্তি করল, 'সাংঘাতিক! এ যে সাতরাজার ধন, বিদেশি বাজারে লাখো ডলারে বিক্রি হবে! হায় হাতি, তুই জানলিও না কী অনিষ্ট করে গেলি!'

সুশান্তরা অতঃপর কী করবে ভাববার আগেই একটু দূরে একটি বৃহৎ বৃক্ষকাণ্ড মড়মড় আওয়াজে ভেঙে পড়ল। চমকে নজর পড়তেই দেখে, ডালটি পড়েছে নদীর জলে এবং একটি ভীমকায় লোক নদীর জলে সাঁতরে ওপারের দিকে যাবার চেষ্টায় ব্যস্ত। লোকটির দুটি হাত শালগাছের ডালের মতো পুষ্ট এবং জলের উপর সাঁতার কাটবার সময় আন্দোলিত হচ্ছে বারংবার।

প্রণব বলল, 'ইয় সুশান্ত, ভালো কইরা একবার পরখ করো দেখি, লোকটা মোনাগাজি নয় তো?'

সুশান্ত সাহানির হাত থেকে দূরবীন নিয়ে একটু দেখেই বলল, 'প্রণব, তোমার মোনাগাজি আবার বাজিমাত করল! ওর লোকজন সব ধরা পড়ে গেছে, তাই এই আরাকানি মগদের সঙ্গ ধরেছিল। হাতির ভয়ে হোক কিংবা আমাদের ভয়েই হোক ঐ বড়ো গাছটায় উঠে পড়েছিল। শেষরক্ষা হয়নি। অতো বড়ো শরীরের ভারে ডাল ভেঙে জলে পড়েছে। স্পিডবোট নিয়ে ধাওয়া করে ধরা যাবে না; ততক্ষণে বাংলাদেশের সীমানায় পৌঁছে যাবে।'

কথা বলতে বলতেই একটা বিশ্রী ভয়াল 'হক হক' আওয়াজের হাসি নদীপথ থেকে হাওয়ায় ভেসে এল। পরমুহূর্তে মোনাগাজির শরীরটা জলের নীচে ডুব সাঁতারে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল!

প্রণব বলল, 'সুশান্ত রে, রাইফেলটা কই?'

সাহানি বললেন, 'কোথায় চালাবেন? কাকে লাগাবেন? কেউ তো দেখছি না।'

সত্যিই নিস্তরঙ্গ নদীর জল। হালকা বাতাসে রুপোলি মাছের মতো ছোট্ট ঢেউ মাথা তুলেই মিলিয়ে যাচ্ছে।

ঘোষ বলল, 'অনেকক্ষণ হইয়া গেল, মোনাগাজির মাথা দেখি না দেখি। জলের তলায় ডুইবা মরল নাকি?'

সুশান্তের হাতে দূরবীন। বলল, 'পুব বাংলার বলবান লোক, বুকে অনেক দম। এক্ষুনি ঐ পারের কাছে ভেসে উঠবে।'

কথা শেষ হবার আগেই মোনাগাজির দৈত্যাকার শরীর জলের উপর জেগে উঠল। ধীরেসুস্থে ওপারে ওঠার পর তার আরেক প্রস্থ 'হক হক' হাসি এই পার থেকেও কানে ভেসে এল।

সাহানি বলেন, 'প্রণববাবু, আপনার বন্ধু ওপারের সীমানায়। ওটা বিদেশ। রাইফেলের রেঞ্জে থাকলেও কিচ্ছুটি করার নেই। ফায়ার করলেই কোর্ট অব এনকোয়ারি বসবে, হাজার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। এক্ষেত্রে চুপ থাকাই বাঞ্ছনীয়। কাছেভিতে বি ডি আর থাকলেও না হয় সাহায্য চাইতে পারতাম।'

মোনাগাজি চোখের আড়ালে চলে যাবার পর সুশান্তরা যে গাছের ডালে বসেছিল সেই গাছের নীচে এল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটি ছোট্ট পকেট ডায়েরি পড়ে থাকতে দেখল সুশান্ত। পাতা উল্টে কিছু হিসাবপত্র আর পেন্সিলে আঁকা একটি ছক দেখল। ছকের উপর লেখা ঋষ্যমুখ। তার আরেক পাতায় ছোট্ট একটি লিপি, 'সুশান্তবাবু, ছালাম। আপনে পুনরায় আলেন, ভালোই হইয়াছে। আগেরবার কাদায় পা হড়কাইয়া যাইবার দরুন ভালো লড়াই দিতে পারি নাই। আরেকবারের জন্য দাওয়াত দিলাম। হিম্মত নিয়া আসিবেন। ইতি আপনার মোনাগাজি।'

প্রণব বলল, 'সুশান্ত, এইবারে কী করণীয় কও তো? মনে হয়, এইবারে সাহানি সাহেবের ক্যাম্পে ফিরা যাওয়াই উচিত। ইয় ক্ষুধা তৃষ্ণা বিশ্রাম তিনটারই সমূহ প্রয়োজন।'

সুশান্ত বলল, 'বিশ্রাম কী হে? এখন তো নদী-পাহাড়-খাল-বিল-জঙ্গল পার হতে হবে। যেতে হবে রাতের অন্ধকারে আমলকি বনে, আর সে পথের প্রদর্শক তো তুমিই।'

প্রণব ভ্যাবাচাকা খেয়ে বলল, 'একটু খোলাসা কইরা কও।'

সুশান্ত হেসে বলল, 'তাহলে খোলাসা করি। শোনো, মোনাগাজি সদ্য জেল ভেঙে পালিয়েছে। স্বল্প সময়ে দল তেমন তৈরি করতে পারেনি। তাই রাজাকার দল আর আরাকানিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলছিল। ইতিমধ্যে ওর দলের যে কটি সদস্য প্রায় সব কটিই আমাদের হাতে বাঁধা পড়েছে। রাজাকারদেরও ছত্রভঙ্গ অবস্থা। মোনাগাজি যতোই লম্বা-চওড়া কথা বলুক, তার এখন কোণঠাসা অবস্থা। ওর একটিই নিরাপদ আশ্রয় এই মুহূর্তে, আমলিঘাট। মনে আছে, পিলাক আসার পথে জঙ্গলের পথ পার হয়ে এসেছি। হাতি, বাইসন, শেয়াল দেখলাম। তখন বলেছিলে কাছেই কোথাও আমলিঘাট।

মোনাগাজির পূর্বপুরুষ সামসের গাজির বাসস্থান, যেখানে ওর উত্তমপুরুষরা এখনো বসবাস করে। ডাকাতসর্দার মোনাগাজিকে যদি ধরতে চাও, আজ গভীর রাতে ওখানেই যেতে হবে।'

প্রণব বলল, 'তোমার কথায় যুক্তি আছে। সাব্রুমের মনুবাজার হইতে আমলিঘাট বিশ কিলোমিটারও না। কাছাকাছি টেক্কা তুলসী রিজার্ভ ফরেস্ট। থাকার ব্যবস্থাও ভালো। আশেপাশে ঐখানে মগদেরই আস্তানা। বৌদ্ধধর্ম, বুদ্ধমন্দির এই সকল আছে। বৌদ্ধ পূর্ণিমায় সাতদিন লাগাতার মেলা বসে আর ঐ মেলায় চট্টগ্রাম, আরাকান হেন জায়গা নাই বুদ্ধের ভজনাকারীরা আসে না। মোনাগাজির সঙ্গে আরাকানিদের যোগাযোগ ঐখান হইতেও শুরু হইতে পারে।'

সুশান্ত বলল, 'গুড, আমলিঘাটের কাছাকাছি ভালো পুলিশ স্টেশন কোথায়? চালাক-চতুর অফিসার থাকলে মোনাগাজির সম্ভাব্য লুকোবার জায়গা কোথায় জানতেও পারে।'

প্রণব বলল, 'আছে আছে, মনুবাজার থানার ওসি এখন বাচ্চুদেব। ভালো অফিসার, চোখ-কান খোলা রাইখা কাম করে। ওর সাহায্য নিতেই পারি। কিন্তু ইয় মনুবাজার কিছু না হইলেও চল্লিশ কিলোমিটার পথ। রাস্তাঘাট নাই, চারিপাশে জঙ্গল। কখন পৌঁছামু?'

সাহানি বললেন, 'কেন অসুবিধে কী? আমাদের স্পিডবোটে জলপথ নিমেষে পার করব। রাত আটটা নাগাদ মনুবাজার পৌঁছানো কোনো ব্যাপারই না।'

প্রণব বলল 'মানলাম, আমাদের যাওয়াটা কোনো সমস্যা নয়। কিন্তু মোনাগাজি? সে কোন যাদুমন্ত্রে অতোটা রাস্তা অতিক্রম করবো? গাড়ি-ঘোড়া সহায়-সম্বল কিছুই তো অর সাধ্যে নাই।'

সুশান্ত বলল, 'প্রণব, ভুলে গেলে মোনাগাজি পুব বাংলার কুখ্যাত ডাকাতসর্দার? ওখানকার ডাকাতরা খাল-বিল-নদী-নালা মাইলের পর মাইল পার করে রাতের অন্ধকারে কার্যসিদ্ধি করে আবার রাতারাতি ডেরায় ফিরে আসত। চিঠি-চাপাটি আগাম ছেড়ে হানা দিত। ওদের কাছে কি হেলিকোপ্টার ছিল? ছিল রণপা। সাধারণ মানুষের দশকদম, রণপার এককদম। আমি স্থির নিশ্চিত, মোনাগাজি রাত নামলেই রণপা নিয়ে আমলিঘাটে দৌড়বে। ভাইবেরাদরের সাহায্য নিয়ে নতুন করে দল গড়ে দস্যুবৃত্তি শুরু করবে। সাথে সাথে সামসের গাজির গুপ্তধন কোথাও লুকনো আছে কিনা তার উদ্ধারের চেষ্টাও চালিয়ে যাবে। মোনাগাজির মতো স্বভাব দুষ্কৃতি কখনো সাধুসন্ত হবে এমন ধারণা মনে আনাও ভুল।'

প্রণব বলল, 'তুমি ঠিক কথাই কইলা। সামসের গাজির উত্তরপুরুষের দুই-চাইর জনের নাম পুলিশের খাতায় তোলা আছে। মোনাগাজি অগো সাহায্য চাইলেই পাইবো।'

সুশান্ত বলল, 'স্বস্তিকদার মুখে শুনেছি সামসের গাজি সামান্য লোক ছিলেন না, একটি বেশ বড়োসড়ো ঐতিহাসিক চরিত্র। তাঁর নিজস্ব ফৌজ ছিল, লোকবল ছিল, পরাক্রম তো ছিলই। সতেরোশো চুয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার মহারাজ ইন্দ্রমাণিক্যের সঙ্গে এঁর ভীষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে ইন্দ্রমাণিক্যকে আত্মগোপন করতে হয়। সামসের গাজির দুর্ভাগ্য ত্রিপুরার প্রজারা ছিল অসম্ভব রাজভক্ত। সামসের গাজিকে কোনোমতেই রাজা বলে মেনে নেয়নি প্রজারা। শেষে ইন্দ্রমাণিক্যের ভ্রাতুষ্পুত্র লক্ষ্মণমাণিক্যকে রাজা বানিয়ে নিজেই পরোক্ষে রাজ্যশাসন করতেন। পরবর্তী সময়ে ইন্দ্রমাণিক্যের ছেলে কৃষ্ণমাণিক্য রাজসিংহাসন অধিকার করতে সক্ষম হন। সামসের গাজির নাম আর শোনা যায়নি পরে। সামসের গাজির উত্তরপুরুষ মোনাগাজির মতো কুখ্যাত ডাকাত এটাই ভাবতে কষ্ট হয়!'

মনুবাজার পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাত আটটা। পথে মনুবংকুল, শিলাছড়ি এসেছে। রাস্তা আছে, গাড়িই চোখে পড়ে না। দু'পাশে ঘন জঙ্গল। এই অঞ্চলটায় মগের সংখ্যা আরো বেশি। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বৌদ্ধধর্মীদের উপনিবেশ। এখানে রাতের অন্ধকার তাড়াতাড়ি নামে। জঙ্গলের পথে আঁধার আরো নিবিড়। জিপের হেডলাইটের আলো, মাঝে-মাঝে ঝিঁঝিপোকার ঐকতান আর জোনাকির শরীর থেকে বেরিয়ে আসা আলোর বিচ্ছুরণ অন্য অচেনা জগতের অনুভূতি মনে জাগায়।

মনুবাজার থানার ওসি বাচ্চুদেব বেশ ছটফটে অফিসার। প্রণবের খুব প্রিয়পাত্র। অতগুলো লোককে কীভাবে যত্ন করে খাওয়াবে সেই নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এইরকম পাণ্ডববর্জিত অঞ্চলে রাত আটটা মানে নিশুতি রাত। তারমধ্যেই হাঁকাহাঁকি করে লোকজন জোগাড় করে ডিমের ঝোল, ডাল, আলুভাজা সঙ্গে খাঁটি গব্যঘৃতের ব্যবস্থা করে ফেলল। বন্দী আরাকানিরাও অভুক্ত থাকল না। থানার লকাপে যদিও চারজনকে ঢুকিয়ে তালাবন্দী করা হল।

ভোজনপর্ব চুকে গেলে সুশান্ত, প্রণব, সাহানি আর ঘোষ বাচ্চুদেবকে নিয়ে গোপন আলোচনায় বসল। আমলিঘাট বাচ্চুদেবের এলাকায় পড়ে। বলল, 'ঐ অঞ্চলে বহু পুরনো কিছু বাড়ি আছে। সেগুলি মেরামতের অভাবে বর্তমানে জীর্ণদশায়। কয়েক-ঘর কৃষিজীবী থাকে ওখানে। ওদের প্রত্যেকেরই নামের শেষে গাজি জোড়া আছে। দৈন্যদশার মধ্যেও একটাই অহঙ্কার, সামসের গাজির বংশধর ওরা। তবে বাড়িগুলোর লোহার পাত দেখে ওদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে না। এই গাজি সম্প্রদায়ের মধ্যেও কিছু লোক আপন চেষ্টায় লেখাপড়া শিখেছে। বিষয়কর্ম করে দু'পয়সা জমাতে পেরেছে। তারা কিন্তু আর এখানে থাকে না। পনেরো-ষোলটি পরিবারের মধ্যে দুটি পরিবারের রেকর্ড ভালো না। দুয়েকটি ডাকাতি কেসে এদের নাম জড়িয়ে গেলে থানায় নিয়ে এসে রগড়ানোও হয়েছে। তবে রহমান গাজি আর আলতাব গাজি দুজনেই প্রায় পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই। আজকাল রক্তের তেজ কমে যাবার কারণে চুপচাপই আছে মনে হয়।'

সুশান্ত খুশি হয়ে বলল, 'গুড। তাহলে ঘণ্টা দুই শোবার চেষ্টা করা যাক। আমরা ঠিক রাত দুটোয় বেরোব। পৌনে দুটোয় সবাই রেডি হয়ে নেবে। গাজিপাড়া পৌঁছুবার অন্তত এক কিলোমিটার আগে গাড়ি থেকে নেমে নিঃশব্দে মার্চ করে বাড়ি দুটো ঘিরে ফেলতে হবে।'

সুশান্ত এবং সাহানি দুজনেই ছক বেঁধে কাজ করে। পাশাপাশি দুটো বাড়ি ঘিরে ফেলতে অসুবিধে হল না। পলেস্তরাখসা ভাঙাচোরা বাড়ি। তবু কাঠের দরজাগুলো মজবুত। বেশ ধাক্কাধাক্কির পর দুই বাড়ির কর্তাকেই তোলা হল। কিন্তু কোথায় মোনাগাজি! প্রত্যেকটা ঘর, উঠোন, বাড়ির আশেপাশের ঝোপঝাপ তন্ন তন্ন করে খোঁজ হল। এমনকি টর্চের আলো ফেলে ফেলে পাতকুয়োর ভেতরে কেউ লুকিয়ে আছে কিনা চেক করা হল। বৃথা শ্রম। রহমান এবং আলতাব দুজনেই কিরা কেটে বলল, মোনাগাজির নাম শুনেছে, কিন্তু কখনো চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি তার সঙ্গে। এমনকি মোনাগাজি যদি কখনো আমলিঘাটে আসে ওরা নিজেরাই গিয়ে থানায় খবর দেবে, তেমন আশ্বাসও দিল।

মোটামুটি জমিজমা আছে, একেবারে অসচ্ছল নয় এমন কৃষিজীবীদের বাড়িতে একটা করে গোয়ালঘর আর তাতে গাই-গরু ছাড়াও হালের বলদ থাকে। ঘোষ গ্রামের ছেলে, টর্চ ফেলে ফেলে রহমানের গোয়ালঘর পরিদর্শন করতে গিয়ে অকস্মাৎ হাঁক পাড়ল, 'বস, একবার এইদিকে আসেন তো। এই বস্তুটা মাটিতে শোয়ানো আছে, এইটা তো গোয়ালঘরের সরঞ্জামের মধ্যে পড়ে না।'

সুশান্ত যা দেখল তা দেখে অবাক হবার চেয়েও খুশি হল বেশি। ঘোষের পিঠ চাপড়ে বলল, 'ঘোষ, আমি তোমার জন্য গর্বিত। ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের অফিসারের পর্যবেক্ষণ শক্তি এমনই হওয়া বাঞ্ছনীয়।'

কথা কটি বলেই রহমানের প্রশস্ত গণ্ডদেশে সুশান্তের বিখ্যাত বিশুদ্ধ বাঙালি চপেটাঘাত। বলল, 'ব্যাটা ভণ্ড তস্কর, সদ্বংশের কুসন্তান, তোর গোয়ালঘরে রণপা কেন?'

রহমান নিষ্পাপ মুখে বলল, 'ও এইজন্যে আমার গালে তামাচা মারলেন? সার, ঐ রণপা নিয়া পোলাপানরা ছুটাছুটির প্র্যাকটিস করে। কী অন্যায় করলাম কন তো?'

সুশান্ত বলল, 'পোলপান রণপা নিয়ে প্র্যাকটিস করে, সেটা গোয়ালঘরে শোয়ানো থাকবে কেন? তোর গোয়ালঘরের গাই-বলদও কি প্র্যাকটিস ধরেছে? ঘোষ, আমি একটা গাল লাল করে দিয়েছি। ব্যাটার অন্য গালটাও লাল হওয়া দরকার। অনেকদিন তোমার চপেটাঘাত দেখা হয়নি।'

ঘোষ 'যো হুকুম' বলেই রহমানের অন্য গালে বিরাশি সিক্কার চড়। দুই চড় খাবার পরে প্রণব

এসে রহমানের কান ধরল আর বাচ্চুদেব ধরল চুলের মুঠি। প্রণব বলল, 'গাজিসাহেব, এইবারে তুমার কান ধইরা মাথার কেশ কর্তন কইরা সারা গ্রামে প্রদক্ষিণ করানো হইব আর ঢোল পিটাইয়া কওয়া হইব, দেখরে ভাই, রহমান গাজির দুর্দশা দেখ!'

রহমান এবারে ডুকরে উঠে হাতজোড় করে বলল, 'দোহাই ছাহেবরা, আমারে ঐরকম বেইজ্জত কইরেন না। আপনারা যা জানতে চান আমি ঠিক ঠিক জবাব দিমু। সত্য ভিন্ন মিথ্যা কমু না। হাঁ সার, কাইল মোনাগাজি ছাহেব রাইত কইরা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আমার দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা লাগাইলেন। ওনারে কে না চিনে! কইলেন, রহমান রে, আমার এখন দুঃসময়। তুই আমার ভাইধন। আমারে কয়দিনের জন্য এইখানে থাকতে দে। এই জায়গার খোঁজ কইলকাতার টিকটিকি কুনদিন পাইবো না। আমি আবার দল গুছাইয়া পুরানা ধান্ধা ধরুম। একটু ফুরসৎ পাইলেই সমসের গাজি ছাহেবের গুপ্তসম্পদ পিলাক হইতে উদ্ধার করুম। এইটা আমার কসম। আমি কইলাম, গাজি ছাহেব, পিলাকে সমসের গাজি হুজুর ধনরত্ন রাখলেন কুন দায়ে? তখন কইলেন, ত্রিপুরার রাজা ইন্দ্রমাণিক্যরে পরাস্ত করার বেশ কিছুদিন পরে ইন্দ্রমাণিক্যের পোলা কৃষ্ণমাণিক্যের লগে তেনার ঘোরতর যুদ্ধ হয় পিলাকের জমিতে। এই যুদ্ধে গাজি ছাহেব পরাস্ত হন এবং তাড়াতাড়িতে তাঁর বহুমূল্য রত্নালঙ্কার একখান পেটিতে আটকাইয়া পিলাকের মাটির নীচে পুঁইতা রাখেন। ইচ্ছা ছিল, সুদিন আসলে ঐ রত্ন উদ্ধার কইরা লইয়া যাইবেন। কিন্তু তার আগেই তাঁর এন্তেকাল হইল। গুপ্তধন সেই থাইকা ঐখানেই মাটির নীচে আছে!'

সুশান্ত বলল, 'এই পর্যন্ত ব্যাখ্যা ঠিক আছে। মোনাগাজি রণপা চড়ে এখানে এসে আশ্রয় নিল। রণপা গোয়ালঘরে লোকচক্ষুর আড়ালে লুকানো হল। কিন্তু ব্যাটা ডাকাতসর্দার পালাল কোথায়? কী করেই বা টের পেল আমরা এখানে আসছি?'

রহমান বলল, 'ছাহেব, গাজিছাহেব জিন্দা বাজিগর। খাওয়াদাওয়ার পর দাওয়ায় পাটি বিছাইয়া শুইয়া ছিলেন। আমরাও ঘুমাইয়া পড়ছি। হঠাৎ ধড়মড় কইরা উইটা কইলেন, রহমান রে, আমি চললাম। আমি ডাকাইতসর্দার, আমার কানে মাটিও কথা কয়। অনেক দূর হইতে দুইখান জিপ থামার আওয়াজ পাইলাম। তারপরে বুটের আওয়াজ। তর এইখানে পুলিশ আমার খুঁজে আসবো। কইবি, আমি ওনারে চিনি না, জানি না। আমারে একখান চাদর দে, মাথা ঢাকবার জন্য দরকার। রণপা যেখানে আছে, থাকুক। পরে কামে লাগবো। মনুবংকুলে সাতদিন ধইরা বুদ্ধ পূর্ণিমার মেলা বসে, মেলায় খরিদকরা চাদরখানা দিলাম তেনারে। মোনাগাজি ছাহেব ঐ চাদর মাথায় জড়াইয়া মুখ ঢাইকা একলাফে বাড়ি ছাড়লেন!'

প্রণব বলল, 'ইয়, সুশান্ত অখন কী করি কও। মোনাগাজি আবার হাতছাড়া হইয়া গেল!'

সুশান্ত বলল, 'প্রণব, অত হতাশ হও কেন? মোনাগাজির কাছে রণপা নেই। কদ্দূর যাবে? জঙ্গলের পথ ধরলে নদীতে পড়বে, রাস্তা ধরে গেলে পুলিশের খপ্পরে আসবে। এখানে ভোর চারটেয় আকাশ ফর্সা হতে শুরু করে। দুটো দলে ভাগ হয়ে জঙ্গল আর লোকালয়ে খুঁজি চলো।'

বাচ্চুদেব বলল, 'স্যার, এই রহমানটারে কি আটক করব?'

সুশান্ত বলল, 'অবশ্যই। মোনাগাজির মতো সাংঘাতিক ডাকাতকে আশ্রয় দেওয়াটাই আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। ও কথা ছেড়ে দাও। ও যে সব সত্যি বলছে তার নিশ্চয়তা কই? পুলিশ বাড়ি ছাড়লেই কোনো গোপন আস্তানায় গিয়ে মোনাগাজির সঙ্গে আবার যোগাযোগ করবে কিনা কে বলতে পারে? আপাতত একেও তোলো।'

প্রণব বলল, 'ইয় রহমান, আমার কথা মন দিয়া শোনো। বি এস এফের সাহেব, কইলকাতার সাহেব এনারা দুইদিনের মেহমান। থাকুম খালি তোমরা আর আমরা। সইত্য কইরা কও, মোনাগাজি কুন পথে গেল, কার কাছে গেল। চুলদাড়ি পাকছে, মিথ্যার আশ্রয় লইও না। পরিণাম ভালো হইব না।'

রহমান একমুহূর্ত চিন্তা করে বলল, 'ছাহেব, মোনাগাজি ছাব মনুবংকুলের পথে যাইবেন এইটা আমার অনুমান। ঐখানের স্থানীয় দুই-চাইরজন মগের রেকর্ড ভালো না। অদের সাহায্য নিতে পারেন। পুরাতন পরিচয়। এককালে তেনার বড় দল ছিল, দুই-পাঁচজন মগও দল ভারী করছিল। আপনারা ঐদিকে দেখতে পারেন, আর আমারে ছাইড়া দেন। আমি আর ঐসবে নাই।'

সুশান্ত বলল, 'ঠিক আছে। মোনাগাজি আগে ধরা পড়ুক তখন ছাড়ার কথা ভাবব। আপাতত বি এস এফ আর লোক্যাল থানার একটা দল জঙ্গলের পথ ধরুক, সাহানি সাহেব ঐ দলটার সঙ্গে থাকুন। বাকি দল নিয়ে আমরা মনুবংকুলের পথে এগোচ্ছি।'

ভোরের আলো আমলকি বনের ফাঁকে ফাঁকে উঁকিঝুঁকি মারছে। অন্ধকার আর নেই। প্রকৃতির অকৃত্রিম ঐশ্বর্য দেখার মতো সময় কারো হাতে নেই। জিপ মনুবংকুলের পথ ধরল। মনুবংকুল একটি এমন বৌদ্ধকেন্দ্র যেখানে বহু দূর দূর থেকে হাজার হাজার দর্শনার্থী সারা বছর ধরে যাওয়া-আসা করে। চট্টগ্রাম, আরাকান এইসব অঞ্চলের মগরাও এখানে আসেন। আরাকানি মগদের গুপ্তধনের সন্ধানে পিলাক অঞ্চলে লাঠির ডগায় বুদ্ধমূর্তি বেঁধে ওঁচাও মন্ত্র জপে রাতের আঁধারে অভিযান কিছু কিছু স্থানীয় মগকেও উৎসাহী করে তুলেছে। এই অতি উৎসাহীদের কেউ কেউ আবার জীবিকার সহজ রাস্তায় উৎসাহী না। বাচ্চুদেবের সঙ্গে এদেরই মাঝে-সাঝে দেখা-সাক্ষাৎ হয়। দেখা-সাক্ষাৎ সবসময় যে মধুর হয় তেমন নয়। যেমনটি হল আজ প্রথম প্রত্যুষে।

সুচল মগ আর হোরা মগ দুই ভাই। দুটি ভাইই হিংস্র স্বভাবের, কথায় কথায় মারপিট। বাচ্চুদেব এদেরকেই প্রথমে তুলল। মোনাগাজির কথা জিজ্ঞাসা করতেই দুজনেই আচম্বিতে ভীষণভাবে উত্তেজিত হয়ে চেঁচামেচি শুরু করল। স্থানীয় ভাষা আর বাংলা ভাষার জগখিচুড়ি বাচ্চুদেব বোঝে, প্রণবও কিছু বোঝে। সুশান্ত আর ঘোষের কিছুই বোধগম্য হল না। প্রণব এমনিতে বড় একটা অশান্ত হয় না। কথার মাঝখানেই হঠাৎ সুচলের বুকে প্রণব ধাক্কা মারল। সুচল ধাক্কা সামলেই একছুটে ঘরের ভেতর থেকে বড়ো লাঠি নিয়ে এসে প্রণবের মাথা লক্ষ করে চালিয়ে দিল।

এ ধরনের অশান্তি ত্রিপুরার মতো পরিবেশে কমই হয়, কিন্তু কলকাতায় নিত্যকার ব্যাপার। কাজেই প্রায় অজান্তেই সুশান্ত আর ঘোষ লক্ষ রাখছিল। মোক্ষম সময়ে ঘোষ প্রণবকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিল আর সুশান্তের বাঁ পায়ের একটি লাথি সুচলকে ছিটকে দিল, ওর লাঠিও হস্তচ্যুত হয়ে মাটি নিল। বাকি কাজ বাচ্চুদেবের। সব্যসাচীর মতো ওর ডানহাত আর বাঁহাত কয়েকবার সুচলের চোয়ালে আর মুখে আছড়ে পড়ল। হোরা কিছু করবার মওকা পেল না, তার আগেই ঘোষের ভীম আলিঙ্গনে নিশ্চল। সুশান্ত সুচলকে নড়া ধরে ভূমিশয্যা থেকে তুলে ধরল। ওর গোল মঙ্গোলিয়ান মুখের তিন জায়গায় ততক্ষণে প্রমাণ সাইজের আলু-পটোল!

পরিবেশ কিঞ্চিৎ শান্ত হবার পর ঘোষ বলল, 'মার্জরটা কী? কী কারণে এই দুই ষণ্ড ক্ষ্যাইপা গেল?'

বাচ্চুদেব নোয়াখালির লোক। নোয়াখালি, চিটাগাঙ আর ত্রিপুরার মগদের ভাষায় প্রচুর অনুস্বারের ছড়াছড়ি। একে অন্যের ভাষাও বোঝে। সে বলল, 'ঘটনা তুচ্ছ। প্রণববাবু স্যার কইছিলেন তোরা তো ডাকাইত মোনাগাজির চ্যালা, অরে কুথায় লুকাইয়া রাখছস কইয়া দে। না হইলে পিঠের ছাল ছাড়াইয়া লমু। সুচল আর হোরা কইল, অরা কারো চ্যালাও না, চাকরও না। পুলিশরে কিছু জানলেও কওয়ার বাধ্যবাধকতা নাই। প্রণববাবু স্যার একটু সামান্য ধাক্কা দিতেই বিপত্তি। যাই হোক, অখন মাইরমুড়া খাইয়া অগো সুমতি হইছে। ঘণ্টাখানেক আগে মোনাগাজি আসছিল এইখানে। দুই-চাইর মিনিট কথাও হইছে। এইখানে থাকাটা নিরাপদ না বুইঝা মোনাগাজি মন্দিরের পথ ধরছে।'

সুশান্ত বলল, 'এ দুটোকে আপাতত ছেড়ো না। সত্যি বলছে কিনা নিশ্চয়তা কী? তারপর কর্তব্যরত পুলিশকে আক্রমণ করাটাও কম অপরাধ নয়। মোনাগাজিকে ধরতে পারলে পরে বিবেচনার কথা উঠবে। আপাতত বুদ্ধমন্দির কোথায়, সে পথে চলি আমরা।'

বুদ্ধমন্দির উঁচু জমির উপর অনেকখানি জায়গা নিয়ে। ঢালু জমি বেয়ে বেশ উপরে উঠতে হয়। এখানে আমলকি গাছের ছড়াছড়ি। সূর্য উঁকিঝুঁকি শেষ করে আলো সোনা পাতার ফাঁকে ফাঁকে ছড়িয়ে দিয়েছে। এইপ্রান্তে বার্মিজ লুঙ্গির প্রচলন খুব বেশি। ছেলেদের পরনে বার্মিজ লুঙ্গি, গায়ে হালকা শীতের জন্য ফতুয়ার উপর চাদর জড়ানো, মাথায় কারো কারো কাপড়ের টুপি। মেয়েদের পরনে পাছড়া, ব্লাউজ আর চাদর। হলুদ রংয়ের ব্যবহার একটু বেশি। মন্দিরযাত্রীদের মুখে বৌদ্ধমন্ত্র 'বুদ্ধং শরণম গচ্ছামি, সংঘম্ শরণম গচ্ছামি।' সাত সকালে কাতারে কাতারে লোক মন্দির প্রদক্ষিণের পর দৈনন্দিন কাজ শুরু করবে।

প্রণব বলল, 'সুশান্ত, পূর্ণিমায় এইখানে ভিড় লাইগাই থাকে। এই হট্টগোলের মাঝখানে মোনাগাজিরে পামু কোথায়? আইজ মনে হয় পূর্ণিমা তিথি, এইজন্যেই ভিড় বেশি।'

কিছুলোক প্রদক্ষিণ সেরে নীচেও নামছে। তাতেও ভিড় যথেষ্ট। ঘোষ একনজর দেখে বলল, 'বস, দেখেন, ঐ লোকটারে দেখেন, হলুদ চাদরে কানমাথা ঢাকা, যেন বাঁটুলদের দেশে দৈত্য, যেমুন লম্বা, তেমুন চওড়া।'

সুশান্ত বলল, 'ঘোষ, কুইক, ধরো, লোকটাকে ধরো।'

বলতে বলতেই তিনলাফে দুজন লোকটির প্রায় কাছাকাছি। লোকটি বিশালদেহী, কিন্তু বিদ্যুতের মতো ক্ষিপ্র। সুশান্তদের একনজর দেখে সেও ছুটতে আরম্ভ করল। পাহাড়ের মতো শরীরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে সামনের লোক ছিটকে ছিটকে পড়ছে, কাউকে আবার হাত দিয়ে আঘাত করে রাস্তা করে নিতেও কসুর করছে না। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। মন্দিরের নিম্নভাগের চত্বরে এসে আর ফিরবার রাস্তা নেই। সুশান্ত আর ঘোষ পিছনে আর সামনে দুশো ফুট নীচে ঢালু জমি। লাফ দিলে হাত-পা চূর্ণ হবার সমূহ সম্ভাবনা, প্রাণপাখিও উড়ে যেতে পারে।

লোকটি এবারে 'হক হক' আওয়াজ করে ভয়াল হাসি হেসে গায়ের হলুদ চাদর ফেলে দিল। পরনে বার্মিজ লুঙ্গি, গায়ে হাতকাটা বিচিত্র ফতুয়া, বার্মিজদের মতোই অনেকগুলো পকেট তাতে। বেল্টের সঙ্গে লটকানো খাপে ঢাকা কুকরি। লোকটি খাপ থেকে একটানে ধারালো কুকরি বার করে শূন্যে আন্দোলিত করতেই সূর্যের কিরণে ঝকমক করে উঠল সেটি। সুশান্তের হাতে ততক্ষণে আটত্রিশ বোরের কোল্ট রিভলবার। সে এবারে হিস হিস করে বলল, 'মোনাগাজি, তোমার হাতের ঐ খেলনাটা ফেলে দাও। নাহলে এক্ষুনি তোমার কব্জি এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যাবে এক গুলিতে। আমি এক দুই তিন গুনে কিন্তু আর অপেক্ষা করব না।'

মোনাগাজি বলল, 'বোসছাহেব, আগের বারেও আপনে আপনার হাতের ঐ খেলনা দেখাইয়া জব্দ করছিলেন। এইবারেও একই খেলা! ঐ বস্তু আমার কাছেও আছে, কিন্তু পিলাকের জলে বিসর্জন দিতে হইছে বইলা দেখাইতে পারলাম না। আসেন, আমি আমার কুকরি মাটিতে ফেলি, আপনেও আপনার রিভলবার অন্যের হাতে দেন। তারপরে দেখি আপনার কী কেরামতি!'

সুশান্ত বলল, 'মোনাগাজি, তাহলে এসো, তোমার সাধে বাদ সাধি কেন? একহাত হয়েই যাক।'

সুশান্ত নিজের রিভলবার ঘোষের জিম্মায় ছাড়তেই মোনাগাজি কুকরি ফেলে দিয়ে তার গদার মতো দুই ঊর্ধ্ববাহুতে সশব্দে চাপড় মারল। ইতিমধ্যে প্রণব, বাচ্চুদেব আর দলবল জায়গাটা ঘিরে ফেলেছে। প্রণব আশঙ্কিত হয়ে বলল, 'ভাই রে সুশান্ত, অকারণে ডাকাইতের লগে কুস্তাকুস্তিতে যাও কেন? চারিদিক হইতে ঘিরা ফেলাইছি, বাছাধনের পালানোর পথ নাই, অরে গ্রেপ্তার করতে অসুবিধা কী?'

সুশান্ত কথা না বলে তর্জনীর ইঙ্গিতে প্রণবকে চুপ থাকতে বলে মোনাগাজির দিকে লক্ষ্য স্থির রেখে দু'কদম এগিয়ে গেল। সুশান্তের ওজন পঁচাত্তর কিলো, উচ্চতা পাঁচ ফুট দশ। তুলনায় মোনাগাজি ছ'ফুটের আশেপাশে, ওজনেও প্রায় ত্রিশ কিলো এগিয়ে। সুশান্তের শরীর শক্ত এবং সুদৃঢ়, মোনাগাজির শরীর পরিণত বয়সেও বৃহৎ এবং বলশালী।

সুশান্ত আক্রমণে গেল না। মোনাগাজি 'দীন্ দীন্' বলে ভয়ঙ্কর একটি হুঙ্কার ছেড়ে ক্ষিপ্ত গণ্ডারের মতো সুশান্তের দিকে তেড়ে গেল। সুশান্ত শেষ মুহূর্তে 'আধা বাঁয়া মুড়' (হাফ লেফট টার্ন) ভঙ্গিতে শরীরটা সরিয়ে নিল। মোনাগাজি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তিন কদম সামনে এগিয়ে গেলেও অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় নিজেকে সামলে আবার সুশান্তের দিকে তেড়ে এল। সুশান্ত বার তিনেক মুষ্টিযোদ্ধাদের মতো নিজের শরীর এদিক-ওদিক হেলিয়ে মোনাগাজির প্রতিটি আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখল। মোনাগাজি এইবারে ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, 'ছাহেব, কতো আর পালাইবেন? একবার হাতাহাতি করেন না, মজা টের পাইবেন।'

সুশান্ত বলল, 'মোনাগাজি, তোমার পাকা দাড়ি আর চুলের সম্মানে এতক্ষণ হাত তুলিনি। এইবারে তাহলে দেখ, সামলাতে পারো কিনা।'

মুখের কথা শেষ হবার আগেই সুশান্তের শরীরটা চিতাবাঘের ক্ষিপ্রতায় মোনাগাজির উপর আছড়ে পড়ল। সুশান্তের দুই হাতের কব্জিতে ভীমের মতো শক্তি। ওর লৌহমুষ্টির একটি মোনাগাজির কপালে অন্যটি কাঁধে লাগতেই অতো বড়ো শরীর নিয়ে মোনাগাজি চিৎপটাং।

সুশান্ত বলল, 'কিহে গাজি, সাধ মিটেছে?'

প্রণব উল্লসিত হয়ে বলল, 'সুশান্ত ভাই, কী খেল দেখাইলা রে! গরিলার মতো শরীর, ডর ছিল ভালো ফাইট দিব। ভিতরটা ফাঁপা নাকি! দুইডা মুড়া খাইয়াই মাটি নিল!'

সুশান্ত বলল, 'প্রণব, মোনাগাজির বয়সটা দেখবে তো? ওর পরিণত বয়সের জন্যেই আমার কাজ সহজ হয়েছে। নাও, বাচ্চুদেব, হাতে হাতকড়া লাগাও, কোমরে দড়ি বাঁধো। সাংঘাতিক লোক, একটু সুযোগ পেলেই আবারো উধাও হবে। ঘোষ আগাপাস্তালা তল্লাশি নাও। ফতুয়ার পকেটগুলোয়, কোমরের বেল্টের নীচে কিছু আছে কিনা দেখো।'

ফতুয়ার পকেটে কিছু হেকিমি ওষুধ, কয়েকখানা চিরকুট, আর কিছু না। কোমরের চামড়ার বেল্টের নীচে আরেকটি কাপড়ের থলি টন সুতোয় আটকানো। ঘোষ থলি খুলে দেখে উল্লাসে বলল, 'বস, দেখেন কী উদ্ধার হইল। সাতরাজার সম্পদ, মনে হয় সামসের গাজির গুপ্তধন!'

সুশান্ত দেখল ঘোষের অঞ্জলিতে ঝকঝক করছে একটি সোনার মোহর। কৌতূহলী হয়ে দেখে বলল, 'ঘোষ, এ যে বাদশাহী মোহর! একেকটির অনেক দাম। গুনে দেখো কটা আছে।'

ঘোষ দু'বার গুনে থলি বন্ধ করে বলল, 'পুরা একশোখান আছে। একেক-খানার সাইজ কি, কোকিলের ডিমের মতন। তেমনি উজ্জ্বল পাকা সোনা, চোখে ঝিলিক মারে! ডাকাইতের থলিতে এমন রত্ন, পাইল কই?'

মোনাগাজি এইবারে মুখ খুলল, 'ছাহেব, আপনের এই দারোগাবাবুর মাথায় কিছু নাই। আমার পূর্বপুরুষ সামসের গাজি ছিলেন শাহেনশার শাহেনশা, আর আমিও হইলাম ডাকাইতদের সর্দারের সর্দার। এই কয়খান মোহর আমার কাছে থাকবো না তোর কার কাছে থাকবো! কাগজের নোট সঙ্গে রাখি না। জলে চুবাইলে নষ্ট হয়। সোনা জলে স্থলে আশমানে সমান মূল্যের। এইজন্যেই সর্বদা সঙ্গে রাখি।'

দু'দিন বাদে সন্ধ্যায় আসর বসেছে স্বস্তিক সামন্তের বাড়িতে। স্বস্তিক আর অমূল্য পরদিনই বিলোনিয়া থেকে আরো কিছু বি এস এফ জোয়ান পিলাক ক্যাম্পে পৌঁছে যাবার পর আগরতলায় ফিরে আসে। সুশান্ত আর ঘোষ কোর্ট থেকে চারজন আরাকানি মগের কলকাতায় স্থানান্তরের আদেশ বার করাতে পুরো একদিন ব্যস্ততায় কাটাল। পরদিন সকালের ফ্লাইটে সুশান্ত আর ঘোষ ফিরে যাবে বলে স্বস্তিক এলাহি আয়োজন রেখেছেন। সাহানিও নিমন্ত্রিত।

প্রণব আপশোস করে বলল, 'সুশান্ত, তুমি আর কয়টা দিন থাইকা গেলে বড় ভালো হইত।'

সুশান্ত হেসে বলল, 'কেন ব্রাদার, তোমার কাজ তো কমপ্লিট। মোনাগাজি কব্জায়, রাজাকাররা ছত্রভঙ্গ, কিছু দুষ্কৃতিকে আমি নিয়ে চললাম কলকাতায়। তোমার তো এখন বৃহস্পতি তুঙ্গে। একটাই

কাজ বাকি, মোনাগাজির কাছে যে একশোটি বাদশাহি স্বর্ণমুদ্রা পেয়েছো সেগুলোর স্বর্ণমূল্যের চেয়েও প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য অনেক অনেক বেশি। সেগুলোকে কখনোই ঐ ডাকাতের ব্যক্তিগত সম্পদ বলে দেখাবে না। ঐ বাদশাহি মোহরগুলো সরকারের হাতে তুলে দাও। আমি চাই পণ্ডিতরা মোহরগুলো দেখুন, বিশ্লেষণ করুন এবং এদের ঐতিহাসিক মূল্য নির্ধারিত করুন।'

স্বস্তিক বললেন, 'একদম ন্যায্য কথা। দুরাত্মার আবার ব্যক্তিগত সম্পদ কী? আর কিছু না হোক এগুলো সরকারি তোষাখানায় উঠলেও দেশের স্বার্থে লাগবে।'

প্রণব বলল, 'আমার একটা অন্য কথা ছিল। পিলাকের যে স্থানে বি এস এফের ক্যাম্প তার কাছেপিঠে গুপ্তধনের অনেক সংকেত পাইয়া গেলাম। যেমন আরাকানিদের কাছে পাওয়া একখান চটি বই, মোনাগাজির পকেট বই, রাজাকারদের রটনা। সব মিলাইয়া ঐ অঞ্চলে রাশি রাশি ধনরত্ন এবং অস্ত্রাগার উদ্ধার হইবার সম্ভাবনা। তোমার মতো কেউ থাকলে এই ব্যাপারে সরকারিভাবেই কিছু না হয় নাড়াচাড়া করতাম।'

সুশান্ত হো হো করে হেসে বলল, 'প্রণব, তুমি আর আমি একসঙ্গে পুলিশ ট্রেনিং কলেজে এক বছর ট্রেনিং করেছি। তুমিও এইসব রূপকথায় বিশ্বাস করো? এগুলো একধরনের রটনা। লোকমুখে প্রচার হতে হতে কিছু লোক বিশ্বাস করতে শুরু করেছে ওখানে সত্যিই গুপ্তসম্পদ রয়েছে। কিন্তু আমরা পিলাকের আসল গুপ্তসম্পদের কথা ভুলে যাই কী করে। মৃত্তিকা খনন করে রোজ বেলেপাথরের মূর্তি, ব্রোঞ্জ মূর্তি, স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কার হচ্ছে। টেরাকোটার কত সূক্ষ্ম কাজ নজরে আসছে। সেগুলোর প্রাচীনত্ব সপ্তম-অষ্টম শতকের। প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক মূল্য-বিচারে এদের স্থান অনেক অনেক ঊর্ধ্বে। লোকচক্ষুর আড়ালে এইসব মহামূল্য সামগ্রী এতোকাল মাটির নীচে লুকিয়ে ছিল। এগুলোর উদ্ধার, সংস্কার এবং সংরক্ষণ যাঁরা করছেন তাঁদের সর্বতোভাবে সাহায্য করাটাই পুলিশ এবং বি এস এফের প্রধান কাজ। ঐ হল পিলাকের আসল গুপ্তধন।'

সাহানি বললেন, 'আমি আপনার সঙ্গে সহমত।'

[শারদীয়া ১৪১৫]

আকাশে মৃত্যুর ফাঁদ

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

।। এক ।।

ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা ব্যুরোর সিক্রেট লাইনে হঠাৎ এক জরুরী গোপন বার্তা এলো ঃ —বীপ্....বীপ্....বীপ্...বন্ধু রাষ্ট্র 'এক্স'-এর গোয়েন্দা বিভাগ থেকে জানাচ্ছি ভারতীয় বিভাগকে... বীপ্...বীপ্...

—বীপ্...বীপ্...বীপ্...একটু আগেই আমাদের কাছে খবরটা এসেছে—কলকাতা থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার যে বিমানটির আজ ভুবনেশ্বর, বোম্বাই ছুঁয়ে প্যারিস যাবার কথা, যার যাত্রী ভারতের একজন বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা, সেটিকে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের জনাকয়েক উগ্রপন্থী এজেন্ট বোম্বাই পৌঁছবার আগেই ছিনতাই করার চেষ্টা করবে....ওরা বিমানটি ধ্বংসও করে দিতে পারে...ওভার...

বার্তা রেকর্ডিং শেষ হলো। তারপরই ভারতের গোয়েন্দা ব্যুরোর দপ্তরে শুরু হয়ে গেল যুদ্ধের তৎপরতা।

গোয়েন্দা ব্যুরোর প্রধান মিঃ জয়ন্ত রামানুজম তক্ষুণি যোগাযোগ করলেন দমদম এয়ারপোর্ট অথরিটির সঙ্গে, কিন্তু সেখানকার চীফ মিঃ চন্দন সোম জানালেন এয়ার ইন্ডিয়ার সেই বিশেষ বিমানটি একশ একুশ জন যাত্রী, তার মধ্যে পার্লামেন্টের একজন বিশিষ্ট নেতা এবং সাংবাদিককে নিয়ে মিনিট দশেক আগেই দমদম ছেড়ে আকাশে উড়ে গেছে।

শুনে ঠোঁট কামড়ে কয়েক সেকেন্ড ভাবলেন মিঃ রামানুজম, তারপর বললেন, প্লেন তো একবার ভুবনেশ্বর নামবে, তাই না!

—হ্যাঁ স্যার, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে পৌঁছে যাবে। দুজন যাত্রী উঠবে সেখান থেকে। তারপর...

—গুড গড! মিঃ রামানুজম, মিঃ সোমের কথা শেষ হবার আগেই বলেন, এক্ষুণি প্লেনের চীফ পাইলটকে নির্দেশ পাঠান, যান্ত্রিক গণ্ডগোলের অজুহাতে প্লেনটিকে যেন পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ভুবনেশ্বর এয়ার-ফিল্ডেই আটক রাখা হয়।

।। দুই ।।

ঝনঝন শব্দে বেজে উঠলো রহস্যভেদী মেঘনাদ ভরদ্বাজের টেবিলে রাখা লাল রঙের টেলিফোন যন্ত্রটা।

এটা মেঘনাদের একটা আলাদা লাইন। এটার নম্বর সাধারণে জানে না। কখনও-সখনও সরকারী দপ্তর থেকে মেঘনাদকে বিশেষ কোনো বার্তা পাঠাবার দরকার হলে এটা বেজে ওঠে।

মেঘনাদ কিন্তু রিসিভার কানে দিয়ে 'হ্যালো' বলে কয়েক সেকেণ্ড ওপক্ষের কথা শুনেই কেমন টানটান হয়ে বসলো। ওর মুখে শুধু একটা কথাই শুনলাম, ইয়েস, মিঃ রামানুজম। আপনি সব ব্যবস্থা তৈরি রাখুন। আমি ঠিক কুড়ি মিনিটের মধ্যে দমদম এয়ারপোর্টে পৌঁছে যাব। বলেই লাইনটা কেটে দিল।

আমি জিজ্ঞেস করতে গেলাম, ব্যাপার কি, হঠাৎ .....

মেঘনাদের দু'চোখের দৃষ্টি এ সময়ে অসম্ভব ধারালো হয়ে উঠেছে। ওর এ ভঙ্গি আমার চেনা। আমাকে একটা কথাও বলতে না দিয়ে বললো, ঠিক তিন মিনিট সময় দিচ্ছি অর্ণব, এর মধ্যে তৈরি হয়ে নে।

।। তিন ।।

ভুবনেশ্বর এয়ার-ফিল্ডে এয়ার ইন্ডিয়ার নির্দিষ্ট বিমানটি দাঁড়িয়ে আছে বেশ কিছুক্ষণ যাবৎ। কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জানানো হয়েছে বিমানটি দমদম থেকে আকাশে ওড়ার পর বিমানে কিছু যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিয়েছে। এখন সেটাই সারানো হচ্ছে।

এ বিমানের যাত্রীরা কেউই খুব সাধারণ মানের মানুষ নন। বিশেষতঃ বিমানে রয়েছেন কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের একজন প্রভাবশালী নেতা, তাঁর সঙ্গে কিছু সাঙ্গোপাঙ্গ এবং সাংবাদিক। যাত্রাপথে এভাবে বাধা পড়ায় ওঁরা সবাই বেশ অসন্তুষ্ট। তবে এয়ার-হোস্টেস মিস যমুনা খুবই ধৈর্যের সঙ্গে যাত্রীদের শান্ত রাখার চেষ্টা করছেন।

এরই মধ্যে বিমানের দরজা খুলে উঠে এল দুজন নতুন যাত্রী।

দুজনেই বয়সে যুবক। একজনের মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। অন্যজনের চোখে চাপা গগল্‌স। একজন মিঃ বিনোদ সাকসেনা, অন্যজন মিঃ অনন্ত রথ। এয়ার-হোস্টেস মিস যমুনা মিষ্টি হেসে দুজনকেই অভ্যর্থনা জানালেন। আগন্তুকরাও মাথা ঝাঁকিয়ে ধন্যবাদ জানাল। এই দুজন যাত্রীরই এখান থেকে বিমানে ওঠার কথা ছিল।

এর পরই বিমানের ককপিট থেকে ঘোষণা শোনা গেল ঃ

'অ্যাটেনশান প্লীজ। আমাদের বিমান এক্ষুণি উড়তে শুরু করবে। যাত্রীরা অনুগ্রহ করে সীট-বেল্ট বেঁধে আসনে বসুন। কিছু যান্ত্রিক ত্রুটি মেরামতের জন্য বিমানটিকে অনেকটা বাড়তি সময় রাখতে হয়েছে বলে আমরা দুঃখিত।'

।। চার ।।

বিমানের ভেতরের দৃশ্য বড় শান্ত। যাত্রীরা যে যার চিন্তায় ব্যস্ত, বিমানের মধ্যেই পার্লামেন্টের প্রভাবশালী সদস্যটির ইন্টারভ্যু নিচ্ছেন কলকাতার এক প্রখ্যাত ইংরেজি দৈনিকের সাংবাদিক। এয়ার-হোস্টেস মিস যমুনা যাত্রীদের সুখসুবিধা বিধানে খুবই তৎপর।

পেছনের দুটি সীটে পাশাপাশি বসেছিল ভুবনেশ্বর এয়ারপোর্ট থেকে ওঠা দুই যাত্রী।

হঠাৎ ওরা একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি বিনোদ সাকসেনা পা বাড়াল প্লেনের টয়লেটের দিকে, আর চাপা গগল্‌স্ পরা অনন্ত রথ এগিয়ে চললো সামনে ককপিটের কাছে।

ব্যাপারটা প্রথমে কেউই খেয়াল করেনি। মিস যমুনার নজর পড়লো যখন অনন্ত রথ ককপিটের একেবারে কাছাকাছি পৌছে গেছে।

মিস যমুনা পেছন থেকে ডাকেন, মিঃ রথ, প্লীজ ভেতরে ঢুকবেন না। ককপিটের ভেতরে ঢোকাটা বেআইনি.....

কিন্তু মিস যমুনার কথা শেষ হবার আগেই অনন্ত রথ একবার দুর্বোধ্য হাসি হেসে পেছনে ফিরে তাকিয়েই ককপিটের ভেতরে ঢুকে পড়লো।

ককপিটের কন্ট্রোল প্যানেলে বসে চীফ পাইলট ক্যাপটেন জেকব চেরিয়ান তখন একমনে বিমানটি চালনা করছেন, একই সঙ্গে ওয়্যারলেসের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখছেন গ্রাউন্ড কন্ট্রোলের সঙ্গে।

হঠাৎ এ কি হলো!

ক্যাপটেন জেকব চেরিয়ান তাঁর ঘাড়ের কাছে একটা ঠাণ্ডা ধাতব স্পর্শ অনুভব করলেন। সেই সঙ্গে একটা হিমশীতল কণ্ঠস্বর, এই প্লেন এখন আমাদের দখলে, এখন থেকে আমি যেমনভাবে বলবো, প্লেনটাকে ঠিক সেইভাবে নিয়ে চলুন। উঁহু, পিছু ফেরার চেষ্টা করবেন না।

সহকারী পাইলট মিঃ রাজারামও পিছু ফিরতে গিয়ে বাধা পেলেন। আড়চোখে তাকিয়ে দেখলেন দু'হাতে দুটো রিভলবার তাক করে দাঁড়িয়ে আছে এক যুবক। এর মধ্যে ডান হাতের রিভলবারটা ক্যাপটেন চেরিয়ানের ঘাড়ের পেছনে ঠেকানো আর বাঁ হাতেরটা ফেরানো রয়েছে রাজারামের দিকে।

ওদিকে বিমানের মধ্যে শুরু হয়ে গেছে নাটকের দৃশ্য।

বিনোদ সাকসেনা নামে যুবকটি কখন যে টয়লেট থেকে বেরিয়ে এসেছে কেউ লক্ষ্য করেনি। হঠাৎ একটা হুঙ্কার শুনে সবাই ফিরে তাকাল।

যুবকটি বিমানের পেছন দিকে দাঁড়িয়ে আছে। তার কাঁধে একটা ঝোলা, আর এক হাতে একটা ধাতব যন্ত্র। যুবকটি চিৎকার করে বললো, আপনারা যে যেখানে যেভাবে বসে আছেন, সেইভাবে বসে থাকুন। আমার সঙ্গের এই ব্যাগ দেখছেন, এর মধ্যে বিস্ফোরক আছে। আর আমার হাতে রয়েছে অপারেটিং সুইচ। আমরা দেশের এক জঙ্গী গোষ্ঠীর আত্মঘাতী দলের সদস্য। কেউ কোনো চালাকির চেষ্টা করলেই আমি এই ফিউসান স্যুইচ পুশ করবো। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটবে। সমস্ত বিমানটা উড়ে যাবে। মনে রাখবেন এখন এই বিমান আমাদের দখলে। আমরা এই প্লেন হাইজ্যাক করেছি।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতা, তারপরই এক অস্পষ্ট ভীত গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়লো সমস্ত বিমানটির মধ্যে। অকস্মাৎ এমন ঘটনা ঘটবে কেউ ভাবতেই পারেনি।

—তোমরা কি চাও? বিমানের আরোহী একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করলো।

—এই দেশের সরকারের কাছে আমাদের কয়েকটি দাবি আছে। আমরা ঠিক সময়ে আমাদের দাবি পেশ করবো। সরকার মেনে নিলে সবাই ছাড়া পাবেন। নইলে সবাই একসঙ্গে মরবো। হাইজ্যাকার হাতের ফিউজে হাত রেখে বললো।

মাঝখানের সীটে বসে ভ্যাক করে কেঁদে ফেললেন এক ভদ্রমহিলা।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে এক ধমকে থামিয়ে দিল হাইজ্যাকার বিনোদ সাকসেনা। নিষ্ঠুর শীতল কণ্ঠস্বরে বললো, ফালতু কান্নাকাটি আমার একদম পছন্দ নয়।

এর পর আর কেউ টুঁ শব্দটি করার সাহস পেল না। শিশুরাও কেমন হতচকিত হয়ে পড়েছে। সবাই বুঝলো দুই দস্যু এই বিমানকে পুরোপুরি হাইজ্যাক করে নিয়ে চলেছে।

ওদিকে বিমান তখন নির্দিষ্ট পথের অনেক বাইরে সরে গেছে। ছিনতাইকারী রথ বিমানটিকে ভারতের পশ্চিম সীমান্ত শহর যোধপুরের দিকে চালনা করতে হুমকি দিয়েছে। ছিনতাইকারীদের মতলব বিমানটিকে যোধপুর বিমানক্ষেত্রে নামিয়ে সরকারের সঙ্গে দর কষাকষি করা।

বিমান এখন যোধপুর বিমানবন্দরের মাথায় ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে। আর হাইজ্যাকারের নির্দেশ মেনে চীফ পাইলট ক্যাপটেন জেকব চেরিয়ান যোধপুর বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন।

অনুমতি পাওয়ার পর বিমানটি যোধপুর বিমানবন্দরের মাটি স্পর্শ করলো। বিমানবন্দরের ঘড়িতে তখন দুপুর ঠিক তিনটে।

ক্যাপটেন চেরিয়ানকে রথ হুকুম দিল, আমাদের দাবিগুলো জানিয়ে দিন। দু'ঘণ্টা সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে এ দেশে আমাদের নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে হবে এবং পঞ্চাশ কোটি ডলার ক্যাশ আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে, তারপর আমাদের ইচ্ছেমতো জায়গায় প্লেনটাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে আমাদের নামিয়ে দিতে হবে। আমাদের এইসব দাবি যদি পূরণ না হয় তবে দু'ঘণ্টা বাদে এ বিমান আমরা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে উড়িয়ে দেব। সবাই একসঙ্গে মরবো।

ভয়ঙ্কর সব শর্ত। তবু চীফ পাইলট চেরিয়ানকে বেতার মারফৎ বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিমানদস্যুদের দাবির কথা জানাতেই হলো।

এর কিছুক্ষণের মধ্যেই যোধপুর বিমানবন্দরের 'ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট' গ্রুপের সদস্যরা সমবেত

হলো বিমানবন্দরের এমারজেন্সি অপরাশেন রুমে। ইতিমধ্যেই ওখানে উড়ে এসেছেন ভারতীয় গোয়েন্দা ব্যুরোর প্রধান মিঃ জয়ন্ত রামানুজম। ছিনতাইকারীদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাবার দায়িত্বটা ওঁর ওপরই ন্যস্ত করা হলো।

মিঃ রামানুজম ছাড়াও এখানে হাজির হয়েছে এসব ব্যাপারে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভারতীয় কমান্ডোবাহিনীর কয়েকজন।

এই ভাবেই সময় কেটে চলেছে—সেকেন্ড.....মিনিট.....ঘণ্টা.....

হাইজ্যাকারদের কথামতো দু'ঘণ্টা অতিক্রান্ত হতে আর দেরি নেই। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে সমস্যার কোনো সমাধানই বেরুলো না।

ঠিক এমনই সময়ে—

মিস যমুনা একটা ছোট্ট কাগজের চিরকুট এনে দিল বিনোদ সাকসেনার কাছে। চিরকুটটা পাঠিয়েছে তৃতীয় সারির সীটে বসে থাকা এক ব্যক্তি।

বিনোদ সাকসেনা খুব সাবধানে বাঁ হাতে চিরকুটটা তুলে নিল। তাতে শুধু একটা কথাই ইংরাজিতে লেখা ঃ

'জরুরী গোপন কথা বলতে চাই। আমাদের দু'পক্ষের একই স্বার্থ।'

চিরকুটের লেখাটা পড়ে প্রেরকের দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল বিমানদস্যু বিনোদ সাকসেনা।

এর মানে কি? ফাঁদে ফেলার কোনো কায়দা নয় তো?

।। পাঁচ ।।

বিমানদস্যু বিনোদ সাকসেনা বেশ কিছুক্ষণ সময় একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে চিরকুটপ্রেরকের দিকে।

বিমানের তৃতীয় সারিতে বসা লোকটার চওড়া টাইপের চেহারা। চোখ দুটো ভেতরে ঢোকা। চুল উস্কোখুস্কো। পুরু ঠোঁটে ঝুলে রয়েছে এক রহস্যময় চাপা হাসি।

বিনোদ তার বিস্ফোরকের স্যুইচে বাঁ হাতটা রেখে ডান হাতে পকেট থেকে একটা রিভলবার বার করে, তারপর লোকটাকে ইঙ্গিতে ডাকে।

লোকটা এবার সীট ছেড়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে থাকে। বিনোদ সাকসেনা অবাক হয়ে দেখলো লোকটার একটা পা কাঠের। এমন লোক তার কাছে কি চাইতে পারে?

তবু সতর্কভাবে অপেক্ষা করতে লাগলো বিনোদ সাকসেনা।

লোকটা একটা পা টেনে টেনে ওর সামনে এসে দাঁড়ালো। তারপর অকস্মাৎ তার কাঠের পায়ের ফোকর থেকে একটা ছোট্ট স্বয়ংক্রিয় সাব-মেশিনগান বার করে হাতে তুলে নিল।

বিমানদস্যু সাকসেনা চমকে উঠলো, তারপর হাতের রিভলবারের ট্রিগারে হাত ছুঁয়ে চিৎকার করে উঠলো, হুঁশিয়ার!

খোঁড়া লোকটাকে কিন্তু এতটুকু বিচলিত মনে হলো না। অস্ত্র হাতে নিয়েই সে একটা বিচিত্র হাসি হাসলো, তারপর বললো, আমার নাম শেখ আবদুল। আমরা দু'পক্ষ একসঙ্গে কাজ করতে চাই।

—তার মানে? লোকটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে প্রশ্ন করলো বিনোদ সাকসেনা।

—মানেটা আমার কাছেও ঠিক পরিষ্কার নয়। শেখ আবদুল বললো, এ প্লেন আমাদের হাইজ্যাক করার কথা ছিল। কিন্তু তোমরা হঠাৎ এসে সব গোলমাল করে দিলে।

—অদ্ভুত ব্যাপার! এখন তাহলে কি করতে চাও?

—আমরা কাজটা একসঙ্গে করতে পারি। শেখ আবদুল বললো।

—কি ভাবে? রিভলবারের নলটা স্থির রেখে বিনোদের প্রশ্ন।

—খুব সহজে। তোমাদের দাবির সঙ্গে আমাদের দুটো দাবি যোগ করে দাও। ব্যস্।

—কিন্তু তোমরা যে চালাকি করছ না তার গ্যারান্টি কি?

—গ্যারান্টি আমার হাতের এই অস্ত্র। বলে অদ্ভুতভাবে হাসলো শেখ আবদুল।

—হুঁ! কয়েক সেকেন্ড তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো প্রথম পক্ষের হাইজ্যাকার, তারপর বললো, তোমরা কোন গ্রুপ, কি তোমাদের দাবি?

—আমরা কোন গ্রুপ তা তোমার জানার দরকার নেই দোস্ত, শুধু এইটুকু জানলেই চলবে আমাদের দেশের সিক্রেট গোয়েন্দা সংস্থার অন্তত দশজন উচ্চপদস্থ এজেন্টকে এ দেশের সরকার এখানকার বিভিন্ন জায়গা থেকে গ্রেফতার করে রেখেছে। আমরা সেই দশজন এজেন্টের মুক্তি চাই। তারা তাদের ইচ্ছেমতো জায়গায় চলে যাবে।

শুনতে শুনতে এবার হা-হা করে হেসে উঠলো বিনোদ সাকসেনা, তারপর বললো, তা বিমানটা কি তুমি একাই হাইজ্যাক করবে ঠিক করেছিলে?

—আমায় তেমনি উজবুক মনে হচ্ছে নাকি? বলেই দু'বার তুড়ি বাজাল শেখ আবদুল।

সঙ্গে সঙ্গে বিমানের যাত্রীদের মধ্যে থেকে দুজন যুবক উঠে এল।

আবদুল তার কাঠের পায়ের বিচিত্র ফোকর থেকে আরও দুটো অস্ত্র বার করে ওদের হাতে তুলে দিয়ে বললো, এরা আমার শাগরেদ হামিদ আর কাল্লু।

ওরা যখন কথা বলছিল, প্লেনের অন্য যাত্রীরা ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া অবাক চোখে তাকিয়ে দেখছিল একই বিমানে দু'দল হাইজ্যাকারের মিলিত হওয়ার দৃশ্য। বিমান ছিনতাই-এর ইতিহাসে এমন নজির বোধহয় আগে কখনও দেখা যায়নি।

এবার দ্বিতীয় দলের নেতা শেখ আবদুল বিমানযাত্রীদের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে হুমকি দিল, কেউ কোনোরকম ঝামেলা করার চেষ্টা করলে গুলি করে মারবো। এ দেশের সরকার আমাদের দাবি মেনে না নেওয়া পর্যন্ত তোমরা সবাই আমাদের বন্দী।

শেখ আবদুল এবার তার দুই সঙ্গী হামিদ আর কাল্লুর দিকে তাকিয়ে কঠোর কণ্ঠে বললো, অ্যাই তোরা এখানে গার্ড থাক, বেচাল দেখলেই খতম করে দিবি।

—ইয়েস, বস্। হাতের অস্ত্র বাগিয়ে ওরা পাহারায় রইলো।

দু-দলের দুই হাইজ্যাকার একসঙ্গে ককপিটের ভেতরে ঢুকলো।

।। ছয় ।।

ককপিটের মধ্যে শেখ আবদুল আর বিনোদ সাকসেনা যখন গিয়ে দাঁড়ালো, তখন সেখানকার আবহাওয়া বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

দু'পক্ষের মধ্যে চলেছে হরদম দর কষাকষি। অনন্ত রথ বিমানদস্যুদের পক্ষ থেকে দাবি জানাচ্ছে, অপর দিকে যোধপুর এয়ারপোর্ট এমারজেন্সি অপারেশন রুমে বসে সরকারের পক্ষ থেকে দর কষাকষি করছেন মিঃ জয়ন্ত রামানুজম।

ইতিমধ্যে দিনের আলো কমে আসতে শুরু করেছে। শীতের বেলা ছোট, অন্ধকার নামতে দেরি হয় না।

এই অবস্থার মধ্যে ককপিটে পা দিল হাইজ্যাকারদের দ্বিতীয় পক্ষ।

দ্বিতীয় দলের নেতা আবদুল জানালো, আগের তিন শর্তের সঙ্গে তার নতুন একটা দাবি মানতে হবে।

তার সে দাবি হলো, ভারতের এক প্রতিবেশী রাষ্ট্রের গোয়েন্দা এজেন্সির যে দশজন এজেন্টকে এ দেশের বিভিন্ন জায়গায় আটক করা হয়েছে তাদের সবাইকে একসঙ্গে মুক্তি দিতে হবে। তারপর তাদের ইচ্ছেমতো জায়গায় চলে যেতে দিতে হবে।

বেতার মারফৎ কর্কশ কণ্ঠে আবদুল বললো, এ শর্ত যদি না মানা হয় তবে আগের শর্ত

মানলেও কেউ রক্ষা পাবে না। আরও দু'ঘণ্টা সময় দেওয়া হলো। এর মধ্যে দাবি পূরণ না হলে, সময় শেষ হবার পর থেকে এক একজন করে যাত্রীকে গুলি করে বিমানের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে। তবে সবার আগে খুন করা হবে এ দেশের পার্লামেন্টের যে অতি সম্মানিত ব্যক্তিটি বিমানে আছে তাকে।

ভয়ঙ্কর হুমকি। কিন্তু এতটুকু বিচলিত মনে হলো না মিঃ জয়ন্ত রামানুজমকে। খুবই ধীরস্থিরভাবে ঐই ভয়ঙ্কর বিমানদস্যুর সঙ্গে কথা চালিয়ে যেতে লাগলেন তিনি।

এক ঘণ্টা এইভাবেই কেটে গেল। দু'পক্ষের ওপরই দারুণ স্নায়ুর চাপ।

সরকারের সঙ্গে কথা বলার দায়িত্বটা তখন পুরোপুরিই চলে গেছে দ্বিতীয় হাইজ্যাকারদের নেতা শেখ আবদুলের ওপর।

কিন্তু মনে হচ্ছে সে ক্রমেই ধৈর্য হারাতে শুরু করেছে। ক্ষণে ক্ষণেই চিৎকার করে গালাগাল দিয়ে উঠছে।

অন্য দুই বিমানদস্যু পাথরের মূর্তির মতো শুধু চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে শেখ আবদুলের দু'পাশে। দেখে মনে হয় ওরা ওদের নেতৃত্বের রাশ তুলে দিয়েছে দ্বিতীয় দলের হাতেই।

অপরপক্ষে মিঃ রামানুজমের এতটুকু স্নায়ুদৌর্বল্য এযাবৎ টের পাওয়া যায়নি। তিনি কথা বলছেন ধীরে ধীরে। মেপে মেপে।

ওদিকে—

এসবের বাইরে চলেছে আর এক অপারেশনের প্রস্তুতি।

কিছুক্ষণ আগেই উগ্রপন্থী মোকাবিলায় বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কয়েকজন কমান্ডো সতর্ক পদক্ষেপে বিমানটির পেটের নিচে গিয়ে হাজির হয়েছে। তাদের পরনে বিশেষ বুলেট প্রুফ জ্যাকেট। কেবলমাত্র চোখ ছাড়া সারা শরীর ঢাকা। প্রত্যেকের হাতে সাব-মেশিনগান। ওদের ওপর নির্দেশ আছে, ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র ওরা বিমানের ভেতরে ঝটিতি ঢুকে পড়বে।

এদিকে অন্ধকার গাঢ় হতে শুরু করেছে। ওরা একসময় সুকৌশলে বিমানের গায়ে মজবুত হালকা মই লাগিয়ে তাতে একে একে পা রেখে দাঁড়ায়।

আরও এক ঘণ্টা কেটে গেল।

আর তারপরই চিৎকার করে উঠলো আবদুল, ব্যস। অনেক আলোচনা হয়েছে। আর কোনো দর কষাকষি নয়। বলতে বলতে সঙ্গী দস্যু বিনোদ সাকসেনার দিকে তাকায়, তুমি কি বল? এদের সঙ্গে আর কথা বলে কোনো লাভ আছে?

—ঠিক বলেছ দোস্ত। সাকসেনা তাকে সমর্থন করে, আমাদের দেওয়া সময় কেটে গেছে। আলোচনায় কোনো ফল হয়নি। এবারা আমরা আমাদের পথ বেছে নেব।

বিমানদস্যুরা যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল, কনট্রোলে বসে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ সব কথাই শুনতে পাচ্ছিল।

অনন্ত রথ বললো, এর পর এ বিমান ধ্বংস হয়ে গেলে আমরা কেউ দায়ী থাকবো না।

বিনোদ সাকসেনা তার বিস্ফোরকভর্তি ব্যাগে হাত দিয়ে বললো, মারবো এবং মরবো, এই চ্যালেঞ্জ নিয়েই তো আমরা এসেছি। আর আমরা মাত্র পাঁচ মিনিট সময় দেব আমাদের দাবি পূরণের জন্য।

—ঠিক বলেছ দোস্ত। এরপর তুমি তোমার ফিউসান স্যুইচে চাপ দেবে। বিস্ফোরণে উড়ে যাবে সমস্ত বিমানটা.....বলতে বলতে শেখ আবদুলের কণ্ঠস্বরও কাঁপতে লাগলো।

—শোন.....শোন আবদুল.....আমরা আরও আলোচনা করতে চাই, বেতার মারফৎ মিঃ রামানুজমের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

—নেহি নেহি.....অভি কাউন্ট ডাউন শুরু হো গিয়া। এখন শুধু একটাই কথা বলার আছে তোমাদের—আমাদের সব দাবি মানতে তোমরা রাজী কিনা?

পাঁচ মিনিটের মধ্যে তিন মিনিট কেটে গেল।

—আর মাত্র দু' মিনিট। বিনোদ সাকসেনা হুমকি দিল।

ওদিকে বিমানের বাইরে লাগানো মইয়ের ধাপিতে পা রেখে অন্ধকারে মিশে-থাকা কমান্ডোরা তাঁদের অধিনায়কের নির্দেশ পেল—অ্যাকশান।

সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা ঝড় বয়ে গেল।

বিমানের পেছনের দরজাটা এক ঝটকায় খুলে উগ্রপন্থী মোকাবিলায় বিশেষ শিক্ষণপ্রাপ্ত কমান্ডো দলটি ঢুকে পড়লো বিমানের ভেতরে।

ট্যা.....রা.....রা.....ট্.....ট্যা.....রা.....রা.....ট্.....!

কমান্ডোদের সাব-মেশিনগান থেকে ছুটে আসা উড়ন্ত গুলি নিপুণ কায়দায় অব্যর্থ লক্ষ্যে দুই বিমানদস্যুর হাত থেকে ফেলে দিল তাদের অস্ত্রগুলো। তারপর এক লাফে পেছন থেকে এসে ওদের চেপে ধরলো ওরা। ওরা নির্দেশ পেয়েছে বিমানদস্যুদের প্রাণে না মেরে গ্রেফতার করতে হবে, কারণ ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ এদের কাছ থেকে জানতে পারবে অনেক জরুরী তথ্য।

কিন্তু বিমানদস্যুদের চেপে ধরলেও তাদের কণ্ঠস্বর তো রোধ করা গেল না। ওরা পরিত্রাহি চেঁচাতে লাগলো, বস্, ওরা ঢুকে পড়েছে। আমাদের ধরে ফেলেছে।

ককপিটের মধ্যে গুলি আর চিৎকারের শব্দ ঠিকই পৌঁছেছে।

দ্বিতীয় হাইজ্যাকার দলের সর্দার শেখ আবদুলের এবার পাগলের মতো অবস্থা। ক্রোধ আর উত্তেজনায় তার সারা শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগলো। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলো, এত সাহস তোমরা পেলে কি করে? কিন্তু এত সহজে আমাদের কব্জা করা যাবে না। বলতে বলতেই শেখ আবদুল তার হাতের রিভলবারের নলটা চেপে ধরলো বিমানের চীফ পাইলট জেকব চেরিয়ানের মাথার পেছনে। এরপর সে প্রথম হাইজ্যাকার দলের বিনোদ সাকসেনার দিকে তাকিয়ে বললো, দোস্ত, আমি দশ গুনছি। এর মধ্যে যদি আক্রমণকারীরা আমার দুজন সঙ্গীকে ছেড়ে বিমান থেকে না নেমে যায়, তুমি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এ বিমান উড়িয়ে দেবে। আমরা সবাই একসঙ্গে মরবো।

চরম সংকট ঘনীভূত, রীতিমতো শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি।

আবদুল মুহূর্ত গুনতে শুরু করে—

এক.....দুই.....তিন.....পাঁচ.....সাত.....নয়.....

না, দশ পর্যন্ত আর গোনা হলো না। তার আগেই অত্যাশ্চর্য ব্যাপারটা ঘটে গেল—

দ্বিতীয় হাইজ্যাকার দলের সর্দার শেখ আবদুলের মাথার খুলিতে রিভলবার ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছে অন্য দলের বিমানদস্যু বিনোদ সাকসেনা। শুধু কি তাই, তার সঙ্গী অনন্ত রথের এক চকিত ঘুঁষি আবদুলের হাতের রিভলবারটি ছিটকে ফেলে দেয়। তারপর আবদুল কিছু বুঝে ওঠার আগেই বিনোদ সাকসেনার ক্যারাটের এক মোক্ষম প্যাঁচ তাকে একেবারে ধরাশায়ী করে ফেলে।

—বিনোদ সাকসেনা! বেইমান! ওই অবস্থার মধ্যেও জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে গর্জায় বিমানদস্যু শেখ আবদুল।

—উঁহু, আর ও নাম নয়। ওটা আজকের এই বিমান-ছিনতাই নাটকে আমার অভিনীত চরিত্রটির নাম মাত্র। বিনোদ সাকসেনা তার মুখের ফ্রেঞ্চকাট দাড়িটা টেনে খুলতে খুলতে বলে, আমার আসল নাম মেঘনাদ ভরদ্বাজ। এক নিপাট বাঙালী রহস্যভেদী। আর আমার এই সঙ্গীটিও কোনো বিমানদস্যু নয়। আমারই বন্ধু এবং সহকারী অর্ণব সেন। ওর অভিনয়টাও ভালই উতরে গেছে, কি বলো দোস্ত?

শুনতে শুনতে শেখ আবদুল এমন দুর্বোধ্য ভাষায় গালাগাল দিয়ে উঠলো তা বোঝার সাধ্য কারুর নেই।

ওদিকে বেতারযন্ত্র মারফৎ কন্ট্রোল রুম থেকে বিমানদস্যুদের ঐ নাটকের সবটুকুই শুনতে পাচ্ছিলেন ভারতীয় কর্তৃপক্ষ।

বেতারযন্ত্রে এবার গমগম করে বেজে উঠলো কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা অধিকর্তা মিঃ জয়ন্ত রামানুজমের উৎফুল্ল কণ্ঠস্বর, ওয়েল ডান মিঃ মেঘনাদ ভরদ্বাজ এন্ড মিঃ অর্ণব সেন। আপনাদের অপারেশন সাকসেসফুল। দেশের জন্য আপনারা আজ যা করলেন তার তুলনা নেই। আপনাদের সাহস আর বুদ্ধির জন্য দেশ এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পেল।

● **আমি অর্ণব সেন বলছি**

সারাদিন বিমান ছিনতাই-এর যে নাটকটা হয়ে গেল, তার আসল ব্যাপারটা আশা করি বোঝা গেছে।

তবু দু-চার কথায় বলে নিই।

ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা ব্যুরো যখন এয়ার ইন্ডিয়ার বিশেষ বিমানটিতে বিদেশী রাষ্ট্রের হাইজ্যাকারদের অস্তিত্বের কথা জানলো তখন বিমান আকাশে উড়তে শুরু করেছে। এ অবস্থায় ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সামনে তিনটে পথ খোলা ছিল—হয় প্লেনটিকে তক্ষুণি ফিরিয়ে এনে যাত্রা বাতিল করা, ভুবনেশ্বর এয়ারপোর্টে নামিয়ে যাত্রীদের তল্লাশি নেওয়া অথবা মাঝপথে বিমানের মধ্যে নিজস্ব লোক ঢুকিয়ে নতুন রকম কোনো অপারেশন চালানো।

এক্ষেত্রে মিঃ জয়ন্ত রামানুজম তৃতীয় পথটাই বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল, প্লেন থামিয়ে তল্লাশি চালাবার উপক্রম করলেই যাত্রী সেজে লুকিয়ে থাকা বিমানদস্যুরা মরিয়া আক্রমণ চালিয়ে বিপর্যয় ঘটাতে পারে।

তৃতীয় পথটাই কার্যকরী মনে হয়েছিল মিঃ রামানুজমের। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোর তরফ থেকে মেঘনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে মেঘনাদই পরিকল্পনাটা বাতলেছিল। পরিকল্পনাটা কি ছিল তা তো দেখা গেল। মোদ্দা কথা, আসল বিমানসদ্যুরা বিমানটাকে ছিনতাই করার আগে আমরাই ওটা ছিনতাই-এর নাটক করে বিমানদস্যুদের খুঁজে বার করলাম। তারপর যথাসময়ে তাদের ফাঁদে ফেলে জীবিত অবস্থায় গ্রেফতার করলাম। অর্থাৎ সেদিন বিদেশী রাষ্ট্রের এজেন্টরা ভারতের আকাশে যে মৃত্যুর ফাঁদ রচনা করেছিল, সেই ফাঁদে তাদেরই ধরা পড়তে হলো। মেঘনাদের কথা আলাদা, কিন্তু এ নাটকে আমিও যে শেষ অবধি এত ভাল অভিনয় করতে পারবো তা ভাবতে পারিনি।

[শারদীয়া ১৪০১]

জয়সলমীরের গাইড

মীরা বালসুব্রমনিয়ন

দূরদর্শনে "সোনার কেল্লা" ছবিখানা দেখার পর থেকেই জয়সলমীরে যাবার ইচ্ছা আমার। ঠিক করলাম মেজকা আর রেড্ডীকে বলে ক'য়ে একটা ট্রিপ ম্যানেজ করতে হবে। দেখা গেল জয়সলমীরে যাবার উৎসাহ আমার চেয়ে ওঁদের কিছু কম নয়। তাই এবার পুজোর ছুটির সঙ্গে ক'দিন ক্যাজুয়াল লীভ নিয়ে নিলেন মেজকা আর রেড্ডী। তারপর আমরা রওনা দিলাম জয়সলমীরের উদ্দেশে।

এ গল্পটা কিন্তু জয়সলমীরের কোনো দ্রষ্টব্য বস্তু নিয়ে নয়—এ গল্পটা হচ্ছে দামোদর ভাট্টিকে নিয়ে।

কোনো ঐতিহাসিক জায়গায় গেলেই রেড্ডী সঙ্গে একজন স্থানীয় গাইড নেন। যদিও মেজকা মনে করেন গাইডের খরচটা অহেতুক, রেড্ডী মেজকার আপত্তিতে কান দেন না। "বই পড়ে কয়েকটা শুকনো তথ্য জানতে পার"—বলেন রেড্ডী—"কিন্তু এই গাইডদের কাছ থেকে অনেক পুরানো গল্প আর লোকগাথা শোনা যায় যা পুরানো কালকে জীবন্ত করে তোলে।"

জয়সলমীরে যে গাইড আমরা নিয়েছিলাম, তারই নাম দামোদর ভাট্টি। ছিপছিপে, সুদর্শন দামোদর ভাট্টিকে আমাদের খুব ভাল লেগে গেল। স্থানীয় লোক দামোদর ভাট্টি, একটা স্কুলে নিচের ক্লাসে ভূগোল পড়ায়। আর ট্যুরিস্ট সীজনে মাঝে মাঝে ট্যুরিস্ট গাইড হিসেবে কাজ করে। ছেলেটি ভদ্র ও মার্জিত, ইতিহাস সম্বন্ধে বেশ জানেশোনে এবং বোঝায়ও ভাল। জয়সলমীরের ওপর ওর গল্পের স্টকও ভারী, তাই রেড্ডী ও মেজকা ওর ওপর খুশি। আর আমার ওকে ভাল লাগার একটা অতিরিক্ত কারণ হচ্ছে ভাট্টির গোঁফবিহীন মুখ। জয়সলমীরে পৌঁছবার আগে রাজস্থানের আরো দু' একটা জায়গা দেখে এসেছি আমরা। সর্বত্রই পুরুষদের মুখে ইয়া ইয়া পাকানো গোঁফ দেখে দেখে বিরক্তি ধরে গিয়েছিল। তাছাড়া ছেলেটি বেশ হাসিখুশি—তবে হঠাৎ হঠাৎ ওকে খুব মনমরা দেখাত।

ভাট্টির কাছেই জানতে পারলাম কেল্লা আর প্রাসাদ ছাড়াও জয়সলমীরের 'হাভেলী'গুলো দেখার মতো জিনিস। 'হাভেলী' কথার অর্থ হচ্ছে বাড়ি। কিন্তু যেসব হাভেলী দেখতে গেলাম আমরা, সেগুলো যথেষ্ট পুরানো, বিরাট এবং পাঁচ-ছ'তলা করে উঁচু। এগুলির মালিকেরা নিশ্চয়ই বিরাট বড়লোক ছিলেন। হাভেলীগুলোর দরজা, জানালা (রাজস্থানে ক্ষুদে ব্যালকনিওলা জানালাকে বলে ঝরোকা), দেয়াল, সর্বত্র পাথরের ওপর সূক্ষ্ম কারুকার্য। আমরা তো দেখে অবাক। কারণ কলকাতা থেকে খালি কেল্লার নামই শুনে এসেছি আমরা। রেড্ডী ওঁর ক্যামেরা খুলে হাভেলীর ছবি নিতে লাগলেন আর মেজকা তো যাকে বলে একেবারে মুগ্ধ। বারবারই ভাট্টিকে বলতে লাগলেন—"কী জিনিস দেখালেন মশাই—একেবারে ফ্যানটাস্টিক!"

সারাদিন ঘোরার পর যখন হোটেলে ফিরলাম তখন সবাই বেশ ক্লান্ত। রেড্ডী হোটেলে পা দিয়েই বললেন—"আঃ, এক কাপ কফি ছাড়া অন্য কিছুর কথা ভাবতেই পারছি না।" তারপর ভাট্টিকে বললেন—"প্লিজ, জয়েন আস।" একটু ইতস্ততঃ করে ভাট্টি রাজী হলো।

কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে মেজকা ভাট্টিকে বললেন—"আপনি মশাই দারুণ লাকী—এমন চমৎকার জায়গায় থাকেন!"

ভাট্টি একটু হাসল—আমার মনে হলো জোর করে। তারপর বলল—"হ্যাঁ, জয়সলমীর সুন্দর

জায়গা, একে ছেড়ে অন্য কোনো জায়গায় বেশিদিন থাকার কথা ভাবতেও পারি না। কিন্তু নিজেকে লাকী বলব না কিছুতেই।"

"কেন?" রেড্ডীর প্রশ্ন।

"স্যার, আপনারা বেড়াতে এসেছেন। কারুর প্যানপ্যানে জীবনকাহিনী শুনতে নয়।"

আমার কিন্তু মনে হলো ভাট্টি নিজের জীবনকাহিনী শোনাতে পারলে খুশিই হবে। রেড্ডীর সঙ্গে একবার চোখাচোখি হলো আমার। রেড্ডীও যে তাই মনে করেন তা বুঝতে পারলাম ওঁর কথা শুনে। রেড্ডী বললেন—"মিঃ ভাট্টি, বেড়ানো তো আজকের মতো শেষ। আর ইঁট-পাথরের চেয়ে মানুষের জীবন কম ইন্টারেস্টিং নয় আমার কাছে। বলুন আপনার জীবনকাহিনী।" তারপর আমায় বললেন—"রন্টু, কোনো বেয়ারাকে ডেকে বলে দাও তো আর এক রাউন্ড কফি হয়ে যাক।"

এই হোটেলের সার্ভিস খুব ভাল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে কফি এসে গেল। দ্বিতীয় কাপে সবাই চুমুক দিলাম। ভাট্টি শুরু করল ওর কথা।

"মিঃ রেড্ডী, খুব ছেলেবেলায় মা-বাবা দুজনকেই হারিয়েছি আমি। লাকী হলে এমনটি হতো কী? তাছাড়া খুব নিকট আত্মীয়ও ছিল না। একেবারে ভেসে যেতে পারতাম। কিন্তু বাঁচালেন আমারই খুব দূরসম্পর্কের একজন মামা। ওঁর বাড়িতেই আশ্রয় পেলাম। উনিই পড়ালেন আমায়। ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত এখানে পড়ার পর যোধপুর পাঠালেন বি. এ. এবং তারপর বি. টি. পড়তে। কিন্তু আমার ওপর মামার এই সুনজর ওঁর স্ত্রী বা ছেলেমেয়ের অপছন্দ ছিল। তাই সব সময়ই ওরা আমায় তুচ্ছ-তাচ্ছিলা করত—কিন্তু মামার জন্য কোনো ক্ষতি করে উঠতে পারত না। আমাকে খুব ভালবাসতেন মামা। ওঁর ছেলেরা লেখাপড়া বেশিদূর করেনি—টাকাপয়সা নিয়ে নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করে। ক্রমশঃ মামা ওদের প্রতি বিরূপ হয়ে গেলেন। আমায় বলতেন—'দামোদর, তুমিই আমার সব।' আমার বন্ধুরা আমায় বলতো—'ভাট্টি, তোমার মামা তোমাকে নিশ্চয়ই সম্পত্তির ভাগ দিয়ে যাবে।' যদিও জানতাম ওরকম কিছু হলে মামাতো ভায়েরা কোর্ট-কাছারি করবে, তবুও মনে মনে আশা করেছিলাম বৈকি। এই আশা বেড়ে উঠল মামার কথায়। ভূগোল পড়াই আমি—দেশ দেখার খুব শখ। গোটা ভারতবর্ষ, ইয়োরোপ, আমেরিকা। তারপর আমি চাই ভূগোল নিয়ে এম. এ. পড়তে। জয়সলমীর কলেজে অধ্যাপনা করতে। কিন্তু আমার এইসব স্বপ্ন সার্থক হতে পারে কিছু থোক টাকা হলেই। মামার সঙ্গেও মাঝেমাঝে কথা হতো এসব নিয়ে। মামা জানতেন আমার স্বপ্নের কথা। একদিন মামা বললনে—'দামোদর, তোমার স্বপ্ন যাতে সফল হয় তার ব্যবস্থা করে যাব আমি।' কাজেই বুঝতেই পারেন আমি মনে মনে অনেক কিছুই আশা করতে লাগলাম।

"এর কিছুদিন পরই মামা অসুখে পড়লেন এবং মাসখানেক ভুগে মারা গেলেন। মিঃ রেড্ডী, মামা মারা যাওয়াতে এই দুনিয়াতে আমার আর আপন বলতে কেউ রইল না। যেন দ্বিতীয়বার পিতৃহীন হলাম।

"শোকের সঙ্গে সঙ্গেই বিরাট একটা ধাক্কাও খেলাম। মামার মৃত্যুর পর দেখা গেল উনি একটা উইল করে গেছেন। বিষয়-সম্পত্তি ছেলেদেরই দিয়ে গেছেন প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী। বিশ্বস্ত কর্মচারীদের থোক টাকা আর আমার জন্য—হ্যাঁ, আমার জন্য একখানা রাজস্থানী পেন্টিং। ভাবতে পারেন? যে মামা আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন সব স্বপ্ন সফল করবেন বলে, সেই মামা আমাকে উইল করে দিয়ে গেছেন একখানা মিনিয়েচার পেন্টিং। এরপরও কী আমায় লাকী বলবেন?"

ভাট্টি থামতে না থামতেই মেজকা বলে উঠলেন—"দি আইডিয়া! পেন্টিংখানা নিশ্চয়ই খুব পুরানো এবং ভ্যালুয়েবল! বিক্রি করলে হয়তো অনেক টাকা পেয়ে যাবেন আপনি।"

রেড্ডীও মেজকার কথায় সায় দিলেন।

ভাট্টি হতাশভাবে মাথা নেড়ে বললে—"না, স্যার, ছবিখানা বছর তিরিশের পুরানো বটে কিন্তু তেমন ভ্যালুয়েবল নয়। বেশ কয়েকজনকে দেখিয়েছি আমি। বিদেশী টুরিস্টদের কাছে বিক্রি করলে বড়জোর চার-পাঁচশো টাকা পাওয়া যাবে, এর বেশি নয়।"

রেড্ডী প্রশ্ন করলেন—"আপনি কী করে জানলেন পেন্টিংখানা মাত্র তিরিশ বছরের পুরানো?"

"ছবিখানা হচ্ছে মরুভূমিতে একটা সুসজ্জিত উটের। জয়সলমীরের ট্রেডমার্ক বলতে পারেন, কারণ এখানকার উট বিখ্যাত। বছর দুয়েক আগে মামার ছাতের ঘরে অন্য পুরানো জিনিসের সঙ্গে ছবিটা পাওয়া যায়। তখনই মামা বলেছিলেন যে এটা তিরিশ বছর আগেকার আঁকা। তাছাড়া ছবির এক কোণে ছোট্ট করে শিল্পীর নাম লেখা আছে—যা পুরানো ছবিতে একদম পাবেন না। ছবিটা আমার ভালো লেগেছিল। মামা তখনই ছবিটা আমাকে দিতে চেয়েছিলেন—কিন্তু আমি নিইনি। কারণ তখন আমার মামাতো ভাইয়েরা প্রায়ই কথা শোনাতো যে মামাকে ভুলিয়ে আমি ওদের ধনসম্পত্তি হাতিয়ে নিচ্ছি। আমি নিতে রাজী না হওয়ায় মামা সেটা নিজের ঘরেই টাঙিয়ে রেখেছিলেন।"

আমার হঠাৎ একটা কথা মনে হলো। বললাম—"আপনি ঠিক জানেন, আপনার মামা অন্য কিছু রেখে যাননি আপনার জন্যে? হয়তো আপনার মামাতো ভায়েরা গোপন করেছে সে কথা।"

ভাট্টি মাথা নেড়ে বলল—"না হে, রন্টুবাবু, উইলখানা নিজের চোখে দেখেছি আমি। আমার নামে ঐ পেন্টিংখানাই নির্দিষ্ট।"

মেজকা বলে উঠলেন—"রেড্ডী, তুমি মিঃ ভাট্টির প্রবলেমটা সল্‌ভ করে দাও না।"

ভাট্টি ব্যাপারখানা না বুঝতে পেরে একটু হকচকিয়ে চেয়ে রইল।

মেজকা ওর দিকে তাকিয়ে বললেন—"আপনি বুঝতে পারেননি মনে হচ্ছে, ব্যাপারখানা এই যে আমি আর রেড্ডী সরকারী চাকুরে হয়েও শুধু সরকারী চাকুরে নই। অন্ততঃ রেড্ডী নয়। ওর স্পেশ্যাল হবি হচ্ছে—"

এই বলে মেজকা রেড্ডীর গোয়েন্দাগিরি নিয়ে বেশ খানিকটা বলে গেলেন গড়গড় করে। আর রেড্ডী যে নিজেকে শুধু প্রবলেম-সলভার বলে ভাবেন—তাও বললেন। রেড্ডীর সাফল্যে যে আমি আর মেজকাও মাঝেসাঝে ছোটখাটো অংশ নিই সে কথাও বলতে ভুললেন না উনি।

ভাট্টি তো অবাক। রেড্ডীকে বলল—"আপনি এত কিছু জানেন, তা তো ভাবতেই পারিনি। দেখুন না স্যার, কোনো উপায় বার হয় কী না। আমার অবশ্য এখন আপনার ফি দেবার ক্ষমতা নেই, তবে ভবিষ্যতে যদি কখনো অবস্থা ফেরে—"

রেড্ডী বাধা দিয়ে বললেন—"ফি'র প্রশ্নই ওঠে না মিঃ ভাট্টি। উই আর ফ্রেন্ডস্। কাল সকালে একবার পেন্টিংখানা এনে আমাকে দেখাতে পারেন?"

"নিশ্চয়ই—"

"আরেকটা প্রশ্ন করবো। আপনার কী মনে হয় আপনার মামা আপনাকে ঠকিয়েছেন বা মিথ্যে আশ্বাস দিয়েছেন?"

"মিঃ রেড্ডী—মামার কাছেই মানুষ আমি। উনি আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন বলেই আজ অন্ততঃ দু'বেলা ডাল-রুটির বন্দোবস্ত হয়ে যাচ্ছে। উনি না থাকলে হয়তো দিনমজুরী করে খেতে হতো আমায়। উনি আমার দূরসম্পর্কের আত্মীয়, এতখানি করার কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। তবু করেছেন। কাজেই কী করে বলি উনি আমায় ঠকিয়েছেন? কিছু দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও যদি না দিয়ে থাকেন তাহলে তা ছেলেদের ভয়েই হয়তো, নয়তো কথার খেলাপ করে না রাজপুতেরা।"

"ঠিক আছে, নিয়ে আসুন ছবিখানা, দেখি ওটা। তবে হ্যাঁ, আমি যেমন অনেক কেসে সফল হয়েছি, তেমন বিফলও হয়েছি বার দুয়েক। তাই বোসের কথা শুনে বেশি আশা করবেন না কিন্তু।"

ভাট্টি এরপর চলে গেল।

পরদিন আমাদের প্রোগ্রাম ছিল জয়সলমীরের কাছে অমরসাগর আর লুধারওয়া নামে দুটো জায়গায় যাওয়ার। পুরানো জৈন মন্দির আছে ওখানে। কথা ছিল হেভী ব্রেকফাস্ট করে রওনা হবো আমরা। লাঞ্চের জন্য সঙ্গে থাকবে কফি ও স্যান্ডুইচ। ব্রেকফাস্টের আগেই ভাট্টি চলে এল, সোজা আমাদের ঘরে। ওর হাতে কাগজে মোড়া কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো একটা পেন্টিং। ছোট, কিন্তু একেবারে

মিনিয়েচার বলা যাবে না। দেখলাম ছবিখানা সত্যি সুন্দর। চলন্ত উট এমনই জীবন্তভাবে আঁকা যে মনে হয় এক্ষুণি ছুটে যাবে। উটের গায়ে লোক বসার জন্য এম্ব্রয়ডারী করা হাওদা আর উটের গলায় পুঁতির মালা—কিন্তু সবই আঁকা। তুলির টান এত সূক্ষ্ম যে অবাক হতে হয়। কিন্তু ছবিখানা যেমন সুন্দর তার ফ্রেমখানা তেমনি বিচ্ছিরি। খোদাই করা কাঠের ফ্রেমে লাগানো ক্যাটকেটে সবুজ রঙ। কী রুচি রে বাবা!

আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে ভাট্টি হয়তো আমার মনের ভাব বুঝতে পারল। হেসে বলল—"মামার রুচিটা একটু জবরজং ছিল।"

রেড্ডী ভ্রূ কুঁচকে বললেন—"আপনার মামা কী ফ্রেমটা বদল করেছিলেন?"

"হ্যাঁ, গত বছর। পুরানো ফ্রেমটা ছিল সরু আর কালো রঙের। মামার বোধহয় পছন্দ হয়নি।"

রেড্ডী ছবিটা নেড়েচেড়ে বললেন—"আপনি শিওর যে ছবিখানা তিরিশ বছরের বেশি পুরানো নয় বা শিল্পী নামকরা কেউ নন?"

"হ্যাঁ, মিঃ রেড্ডী। ছবিখানা নিয়ে আমি যোধপুর ও জয়পুরে মিনিয়েচার পেন্টিং নিয়ে যাঁরা নাড়াচাড়া করেন তাঁদের দেখিয়েছিলাম। ওঁরা সবাই একমত এ ব্যাপারে। কিন্তু মিঃ রেড্ডী, আর বেশি দেরি করলে আপনাদের অমরসাগর যাওয়া হবে না।"

"চলুন, তাহলে।"

জায়গা দুটো দেখে ফিরলাম আমরা বিকেল তিনটে নাগাদ। সেদিন রাত্তিরের গাড়িতেই যোধপুর ফিরব আমরা। হোটেলে পৌঁছে রেড্ডী বললেন—"মিঃ ভাট্টি, আপনার যদি খুব জরুরী কাজ না থাকে তাহলে ছবিখানা নিয়ে যোধপুর আসতে পারবেন আমাদের সঙ্গে? ওখানে আমাদের ডিপার্টমেন্টের একজনের মারফৎ ছবিটা আরেকবার যাচাই করা যেত।"

ভাট্টি রাজী হলো। "ঠিক আছে, সন্ধ্যে নাগাদ তৈরি হয়ে চলে আসবো। তবে মিঃ রেড্ডী, বৃথা চেষ্টা করছেন। আমার এই ফাটা কপাল জোড়া লাগবে না।"

রেড্ডী সে কথার কোনো জবাব দিলেন না। বিকেলের চা খেয়ে মেজকা গেলেন স্যুটকেস গোছাতে আর আমি হোটেলের লাউঞ্জে বসে জয়সলমীরের ওপর লেখা কয়েকটা চটি বই উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলাম। রেড্ডী দেখলাম যোধপুরে একটা ট্রাংককল করলেন।

সারারাত মরুভূমির বুকের ওপর দিয়ে ট্রেন জার্নি করে সকালে যোধপুর পৌঁছলাম আমরা। মেজকাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাদের জন্য সার্কিট হাউসে ঘর বুক করে রাখা হয়েছিল। ভাট্টিকে নিয়ে সেখানেই উঠলাম আমরা। রেড্ডী বললেন ওঁদের কলীগ আসবেন ব্রেকফাস্টের পর, তখন যাওয়া হবে ছবিটা যাচাই করতে। মনে হলো রেড্ডী ছবিটা নিয়ে এর বেশি আলোচনা করতে অনিচ্ছুক। মেজকার মুখ থেকে রেড্ডীর বিভিন্ন কেসের বিবরণ শুনে ভাট্টিকে বেশ উৎফুল্ল মনে হচ্ছিল কিছুক্ষণ। কিন্তু রেড্ডী ছবি সম্বন্ধে কোনো আলোচনায় উৎসাহ দেখাচ্ছেন না দেখে ওকে আবার ম্রিয়মান দেখাতে লাগল।

ব্রেকফাস্টের পর রেড্ডীর কলীগ এলেন একটা জিপ নিয়ে। সেটা চড়ে আমরা সবাই বেরুলাম।

যে দোকানে এলাম আমরা তাতে নানা ধরনের ও সাইজের রাজস্থানী পেন্টিং ছাড়া বেশ কয়েকখানা কারুকাজ করা কাঠের ফ্রেম রয়েছে। রেড্ডীর কলীগ আলাপ করিয়ে দিলে মালিক আমাদের সমাদর করে বসালেন এবং কোল্ড ড্রিংকস আনতে দিলেন। তারপর আমাদের আসার উদ্দেশ্য জানার পর ভাট্টির ছবিখানা খুঁটিয়ে দেখলেন উনি। তারপর বললেন—"ছবিটা সত্যি সুন্দর। কিন্তু খুব পুরানো নয় এবং প্রচলিত অর্থে খুব ভ্যালুয়েবলও নয়।"

"ফ্রেমটা সম্বন্ধে আপনার কী মত?" রেড্ডী প্রশ্ন করলেন।

"একদম থার্ডক্লাস। আর খুব সম্প্রতি লাগানো হয়েছে, তাই না?"

"হ্যাঁ, গতবছর—" তারপর ভাট্টির দিকে ফিরে রেড্ডী জিজ্ঞেস করলেন—"মিঃ ভাট্টি, আপনার মামা ফ্রেমটা বদলে ছিলেন কেন? আগের ফ্রেমখানা কী ভেঙে গিয়েছিল?"

"না, সেরকম তো কিছু শুনিনি?"

রেড্ডী বললেন—"আমার মনে হয়, এই ফ্রেমটাতেই রহস্যের চাবিকাঠি রয়েছে। ওখানা খুলে দেখা যাক, কী বলেন?"

"আপত্তি নেই—" বললে ভাট্টি।

দোকানের মালিক একটা যন্ত্র নিয়ে খানিকটা চাপ দিতেই ফ্রেমটা খুলে বেরিয়ে এল। আমরা সবাই দেখলাম সে ফ্রেমের ভেতর দিকটায় একটা জায়গায় একটা জোড়া মতন দেখা যাচ্ছে।

রেড্ডী বললেন—"এই জোড়াটা খোলা যাবে?"

"নিশ্চয়ই—" বলে মালিক ভদ্রলোক ছুরির মতো একটা জিনিস নিয়ে জোড়ায় একটু চাড় দিতেই জোড়াটা খুলে গেল এবং দেখা গেল যে ঐ জায়গায় ফ্রেমটা ফাঁপা এবং ভেতরে সাদা কাপড়ের মতো কী একটা দেখা যাচ্ছে।

আমাদের উত্তেজনা তখন তুঙ্গে। একটা ছুঁচোলো জিনিস দিয়ে গর্ত থেকে ঐ সাদা টুকরোখানা টেনে বার করে আনা হলো। দেখা গেল ওখানা ছোট্ট একটা থলে—মুখ সেলাই করা। থলের গায়ে ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে কালিতে লেখা 'দামোদর'। একটা ছোট কাঁচি দিয়ে থলেটার সেলাই খুলে ফেললেন ঐ দোকানের মালিক। থলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ছোটয়-বড়য় মিলিয়ে প্রায় আট-দশখানা জ্বলজ্বলে হীরে।

ব্যাপারটা বুঝতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল। তারপর ভাট্টি পুল্লা রেড্ডীর হাত চেপে ধরে বলল—"থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ স্যার—" আনন্দ ও বিস্ময়ে ওর গলা প্রায় বুজে এসেছে।

রেড্ডী বললেন—"কনগ্র্যাচুলেশনস্, মিঃ ভাট্টি। দেখা যাচ্ছে আপনার মামা আপনার কথা ভোলেননি। কিন্তু সবার চোখের ওপর দিয়ে বিষয়-সম্পত্তির অংশ দিলে ওঁর ছেলেরা মামলা-মোকদ্দমা করে আপনাকে ঝামেলায় ফেলত। তাই এই ব্যবস্থা। দেখা যাচ্ছে ভদ্রলোক ছিলেন সত্যিকারের বুদ্ধিমান।"

ভাট্টি সেই রাত্রেই যোধপুরের ট্রেন ধরবে ঠিক হলো। সারাদিন কাটল উমেদ প্যালেস, মান্ডোর গার্ডেনস—এসব দেখে। যাওয়ার আগে ভাট্টি উটের ছবিখানা রেড্ডীকে প্রেজেন্ট করল। বলল—"জয়সলমীরের স্মারক এটা। নিতেই হবে।"

রাত্রে ওকে ট্রেনে তুলে দিতে এলাম আমরা। ট্রেন ছাড়ার আগে রেড্ডী বললেন—"যান, এবার আপনার স্বপ্ন সফল করার তোড়জোড় করুন গিয়ে। আফটার অল, আপনি যে লাকী সেটা এখন মানবেন তো?"

"নিশ্চয়ই—" বলল ভাট্টি। "তবে আমার গুডলাক হচ্ছে পুল্লা রেড্ডীর সঙ্গে পরিচিত হওয়া। নয়তো আমি যে তিমিরে ছিলাম থাকতামও সেই তিমিরেই।"

[শারদীয়া ১৩৯৯]

মাকড়সার জাল

ব্রজেশ তরফদার

এবার যেন শীতটা বড্ড তাড়াতাড়ি এসে গেল। পুজো শেষ হতে না হতেই সদলবলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আর এই বর্ধমানে এসে যেন শীতের প্রকোপটা আরও বেশি করে মালুম হচ্ছে।

ঋষিদার হাতে এখন কোনও কেস না থাকায় আমরা দুজনে গতকাল এখানে এসেছি। উঠেছি ঋষিদার বাল্যবন্ধু অমিত রায়ের বাড়িতে। অমিতবাবু এখানকার একজন বড় সরকারী অফিসার। যেহেতু ঋষিদার বন্ধু সেজন্য তাঁকেও আমি দাদা বলে ডাকি।

অমিতদার বাড়িটা গ্রামের একেবারে একধারে। অমিতদা আজকে যখন সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে ফিরলেন তখন তাঁর সঙ্গে অপরিচিত এক ভদ্রলোক। অমিতদা ভদ্রলোককে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভদ্রলোকের নাম রথীন সিংহ। পেশায় ব্যবসায়ী। রথীনবাবুর বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যেই হবে বোধ হয়। রং মাঝারী। পরনে পাজামা ও পাঞ্জাবি। আর চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা।

আলাপ করিয়ে দেবার পর অমিতদা আসল কথাটা ঋষিদাকে বললেন। 'ঋষি, রথীনবাবু একটু সমস্যায় পড়েছেন, এখন তুমি যদি একটু সাহায্য কর...'

ঋষিদা হাতের বইটা মুড়ে কোলের উপর রেখে বললেন, 'তুমি যখন বলছো তখন তো আর না বলতে পারি না। ভেবেছিলাম, কলকাতা ছেড়ে এখানে আসায় সমস্যাগুলোকে হয়তো কলকাতাতেই রেখে আসতে পেরেছি। এখন দেখছি আমার ধারণা ভুল ছিল। বলুন রথীনবাবু, শুনি আপনার সমস্যাটা কী ধরনের।'

রথীনবাবু বলতে শুরু করলেন, 'আমার একমাত্র ছেলে রমেন, গত এক সপ্তাহ ধরে নিখোঁজ। জানি হারানো ছেলে খুঁজে দেওয়া আপনার মতো বড় রহস্যভেদীর কাজ নয়। কিন্তু আমি একদম নিরুপায় হয়েই এসেছি। পুলিশের কাছে গেছিলাম। ওরা তো একটা রিপোর্ট লিখিয়েই কর্তব্য শেষ করল। কোনো উৎসাহই এখন দেখাচ্ছে না। তাই অমিতবাবুর মুখে যখন আপনার কথা শুনলাম, ছুটে চলে এলাম।'

ঋষিদা এবার একটু নড়েচড়ে বসে বললেন, 'গোড়া থেকে ঘটনাটা খুলে বলুন।'

'আমার স্ত্রী অনেকদিন আগেই গত হয়েছেন। আমিও ব্যবসাপত্র নিয়েই ব্যস্ত থাকি। ওর দিকে বড় একটা নজর দিতে পারিনি। রমেন এমনিতে শান্ত, ভদ্র, এককথায় ভাল ছেলে। সবে গত বছর বি. কম পাশ করেছে, নম্বরও ভাল। পাশ করার পর ওকে আমি বোঝালাম যে, আর পড়াশোনা করে দরকার নেই, তুই এবার আমার ব্যবসাটা একটু দেখাশোনা কর। ও তখন কিছু বলল না বটে কিন্তু ক'দিন পরে হঠাৎ আমাকে এসে বলল যে ওর কোনো এক বন্ধুর সঙ্গে নাকি আলাদা ব্যবসা করবে। আর সেজন্য ও আমার কাছে দু' লাখ টাকা চাইল। আমি টাকা দিতে সরাসরি অস্বীকার করলাম। ও এবারও কিছু বলল না। তবে আরও বেশি চুপচাপ হয়ে গেল। তারপর...'

'এক মিনিট রথীনবাবু। এটা কত দিনকার আগের ঘটনা!'

'তা প্রায় মাস খানেক আগের তো হবেই।'

'তারপরে কী হলো?'

'তারপর বাড়ি থেকে ও বড় একটা বের হতো না। নিজের ঘরেই সারাক্ষণ থাকত। আমি ভাবলাম, ধীরে ধীরে হয়তো মাথা থেকে ব্যবসার ভূতটা নেমে যাবে। কিন্তু গত সোমবার থেকে ওর কোনো খোঁজ নেই।'

'ওর বন্ধুবান্ধবের কাছে খোঁজ নিয়েছেন?'

'হ্যাঁ! আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সবার কাছে খোঁজ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোথাও পাওয়া যায়নি।'

'কোনও চিঠিপত্র এর মধ্যে পেয়েছেন কী?'

রথীনবাবু জামার বুকপকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করে ঋষিদার হাতে তুলে দিলেন। কাগজটা একটা পুরো সাদা পাতার অর্ধেক বলে মনে হলো। কোনো বাংলা খবরের কাগজের বড় বড় অক্ষরগুলো কেটে কেটে জুড়ে এক একটা শব্দ তৈরি করা হয়েছে। এটা বহু পুরনো পদ্ধতি। চিঠিটাতে মাত্র দু'লাইন লেখা—

'আপনার ছেলে আমাদের হেফাজতে আছে। পরে কত টাকা কবে কোথায় দিতে হবে জানাব।'

নিচে অবশ্য কারও নাম নেই।

ঋষিদা কাগজটা মুড়ে পকেটে চালান করে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা কবে পেলেন?'

'গতকাল ডাকে পেয়েছি।'

ইতিমধ্যে চা-জলখাবার এসে গেল। তাই কথা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রাখতে হলো।

জলখাবার শেষ করে চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে ঋষিদা জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার বাড়িতে আর কে কে আছেন?'

'বাড়িতে এখন আমি, ম্যানেজার সুশান্ত আর কাজের লোক সুজন আছি। ব্যস আর কেউ নেই।'

'ঠিক আছে, যা জানার মোটামুটি জেনে নিলাম। কাল সকাল ন'টা নাগাদ আপনার বাড়িতে একবার যাব। দেখি ওখানে গিয়ে আরও যদি কিছু সূত্র পাই। ভাল কথা, আপনার কোনও শত্রু আছেন যিনি এই কাজটা করতে পারেন—মানে ব্যবসার ক্ষেত্রে আজকাল সাধারণত যা হয়।'

'না মশাই, আমি এখনও অতবড় ব্যবসায়ী হইনি। আর তাছাড়া এখানে যে ক'জন আছেন সবার সঙ্গে আমার বেশ হৃদ্যতা আছে।'

'তাহলে ঐ কথাই রইল, কাল সকাল ন'টা।'

(২)

বিদেশী ধাঁচের গাড়িবারান্দাওয়ালা দোতলা বাড়ি। সামনে বিরাট বাগান। গেটের পাশের থামে রথীনবাবুর নাম লেখা ফলক।

আমরা যেতেই দারোয়ান গেট খুলে দিল। বোধহয় আগে থেকেই বলা ছিল।

আমাদের দেখে ভদ্রলোকের মুখে হাসি ফুটল। টাইলস্ বসানো ল্যান্ডিং পেরিয়ে ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করলাম। এ ঘরের মেঝের কার্পেট থেকে শুরু করে সোফা, ফার্নিচার সবকিছুই ভদ্রলোকের রুচি এবং প্রাচুর্যের পরিচয় দিচ্ছে।

আমরা বসার পরে রথীনবাবু ম্যানেজার সুশান্তবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপরে একপ্রস্থ চা-জলখাবার খাওয়ার পরে ঋষিদা রথীনবাবুর ছেলের ঘর দেখার জন্য উঠে দাঁড়ালেন।

রমেনের ঘরটা দোতলায়। জানলা দিয়ে রোদ এসে ঘরটাকে আলোয় ভরিয়ে তুলেছে। ঘরে আসবাবপত্র বলতে একটা সিঙ্গল বেডের খাট, পড়ার জন্য টেবিল, দুটো চেয়ার, আর দুটো বইভর্তি আলমারি। পড়ার বইয়ের থেকে গল্পের বইয়ের আধিক্যই যাতে বেশি।

ঋষিদা একে একে টেবিলে রাখা বইপত্র কাগজ সব তন্ন তন্ন করে খোঁজাখুঁজি করলেন। ড্রয়ারটা খুলেও সব ঘাঁটাঘাঁটি করলেন। কিন্তু কিছু পেলেন বলে মনে হলো না। খাটের দামী গদিটা পর্যন্ত তুলে দেখে মাথা নাড়তে লাগলেন।

এবার গেলেন সুশান্তবাবুর ঘরে। এখানেও আমার মনে হলো কিছুই পেলেন না। একে একে বাড়ির সব ঘরগুলো দেখা হলো। ঋষিদাকে যেন কিছুটা নিরাশ মনে হলো।

(৩)

সন্ধ্যেবেলা আমি আর ঋষিদা বারান্দায় বসে আছি। আমি একটা গল্পের বই পড়ছি আর ঋষিদা সামনের দিকে তাকিয়ে একটার পর একটা সিগারেট বানাচ্ছেন আর খাচ্ছেন। কোনও বিষয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন।

এমন সময় অমিতদার বাড়ির কাজের লোক কিনু এসে বলল, ঋষিদার ফোন এসেছে।

ফোনটা অ্যাটেন্ড করে এসে ঋষিদা বললেন, 'তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে। একবার রথীনবাবুর বাড়িতে যেতে হবে, এক্ষুণি।'

আমরা যখন রথীনবাবুর বাড়িতে পৌঁছলাম, রথীনবাবু তখন ঘরময় পায়চারি করছেন আর ম্যানেজার সুশান্তবাবু এককোণে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছেন।

আমাদের দেখার পর রথীনবাবুর পায়চারি থামল। আমাদের বসতে বলে নিজেও বসলেন। তারপর পকেট থেকে আগের মতো ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করে ঋষিদার হাতে দিলেন।

ঋষিদা কাগজটা খুললেন। এবারও সেই আগের মতো খবরের কাগজের অক্ষর কেটে শব্দ তৈরি করা চিঠি। তফাৎটা শুধু এই আগের চিঠির চেয়েও এটা বেশ খানিকটা বড়।

'কাল রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় নাটমন্দিরের পশ্চিমের থামের কোণে একশ টাকার নোটে তিন লাখ টাকা রেখে আসবেন। টাকা পেলে ছেলে আপনার বাড়িতে পৌঁছে যাবে। তা না পেলে ছেলের কি হবে সেটা নিশ্চয় বলে দিতে হবে না। টাকা নিয়ে একা আসবেন। কোনও রকম চালাকির ফল কিন্তু মারাত্মক হবে।'

চিঠি পড়ে ঋষিদা বললেন, 'খামটা কোথায়?'

খামটা নিয়ে ঋষিদা উল্টেপাল্টে দেখলেন তারপর চিঠিটা আলোর দিকে তুলে ধরলেন। কি দেখলেন তা তিনিই জানেন। কিছুক্ষণ দেখার পর চিঠিটা খামের মধ্যে ভরে রথীনবাবুকে ফেরত দিলেন।

আমাদের আসার পরই সুশান্তবাবু কোথায় যেন বেরিয়ে গেছেন।

ঋষিদা বললেন, 'ঠিক আছে আমাদের হাতে এখনও ২৪ ঘণ্টা সময়। আপনি হট করে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে যাবেন না। যদি আমার ওপর আপনার ভরসা থাকে তবে নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার ছেলে ফেরত পেয়ে যাবেন। আচ্ছা একটা কথা, সুশান্তবাবু আপনার কাছে কতদিন আছেন?'

'তা বছর পাঁচেক হবে! কেন বলুন তো?'

'না, এমনিই। তাঁর সঙ্গে তো এখনও ভাল করে আলাপই হলো না।'

'আমার এখন কী করণীয়?'

'আপনাকে যা করতে হবে তা কালকে সকালেই আমি জানিয়ে দেব।'

'ঠিক আছে। আপনি যে কিছু একটা করবেন সে ভরসা আমার আছে।'

'ভাল কথা, আপনার ছেলের একটা রিসেন্ট ফোটো আমাকে দেবেন।'

রথীনবাবু একটা ফোটো এনে ঋষিদার হাতে দিলেন। ঋষিদা ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন, 'ব্যস, এতেই হবে।'

(৪)

পরদিন দুপুর তিনটে নাগাদ রথীনবাবুর বাড়িতে আমরা গেলাম। আজকে অমিতদাও অফিস কামাই করে আমাদের সঙ্গে এসেছেন। মনে মনে নিশ্চয়ই এই ঘটনার ক্লাইম্যাক্স দেখার ইচ্ছে হয়েছে। যাই হোক আমরা চারজনে একটা সেন্টার টেবিলের চারধার ঘিরে বসলাম। টেবিলের উপর একটা ব্যাগ আর একটা আঠারো ইঞ্চি মাপের স্যুটকেস।

রথীনবাবু ঋষিদাকে বললেন, 'আপনার কথামতো এর মধ্যে সব ঠিক করে রেখেছি।'

ঋষিদা ব্যাগটা ভাল করে একবার দেখে নিলেন। তারপর স্যুটকেসটা খুলে একে একে একশ টাকার নোটের বান্ডিলগুলো বের করে স্যুটকেসে সাজিয়ে রাখলেন। মোট তিরিশটা বান্ডিল রাখলেন। তারপর স্যুটকেসটা বন্ধ করে দিলেন। স্যুটকেসে এখন মোট তিন লাখ টাকা রাখা আছে। একসঙ্গে এত টাকা আমি কখনও দেখিনি।

ঋষিদা স্যুটকেসটাতে কিন্তু চাবি বন্ধ করলেন না। চাবিটা নিজের পকেটে রেখে বললেন, 'চাবিটার আর বোধহয় কোনো দরকার নেই। অপহরণকারী মহাশয় স্যুটকেসটা নিশ্চয় খুলে দেখে নেবেন। ওঁর জন্য এটুকু সুবিধা আমাদের করে দেওয়া উচিত।'

'ঋষিবাবু, আমার ছেলেকে ওরা ফেরত দেবে তো?'

'নিশ্চয়ই দেবে!'

'কিন্তু...'

রথীনবাবু কিন্তু বলার সঙ্গে সঙ্গেই ঋষিদাকে দেখলাম কটমট করে তাঁর দিকে একবার তাকালেন আর তাতেই ভদ্রলোক আর কিছু না বলে মাথাটা নিচু করে নিলেন।

আমার মনে হলো রথীনবাবু আমাদের সামনে কিছু লুকিয়ে গেলেন, যেটা অবশ্যই ঋষিদা জানেন।

'স্যুটকেসটা কত নিল?' ঋষিদা রথীনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন।

'ওটা আমি কিনিনি। সুশান্তকে টাকা দিয়ে দিয়েছিলাম। ওই কিনে এনেছে।'

'ঠিক আছে। এবার আপনারা সবাই আমার প্ল্যান মন দিয়ে শুনুন। রথীনবাবু আপনি আপনার গাড়িতে করে একা গিয়ে টাকাটা ওরা যে জায়গায় বলেছে ঠিক সেখানে রেখে বাড়ি ফিরে আসবেন। একদম দাঁড়াবেন না। গুবুল, তুই আর অমিত ওখানে নাটমন্দির থেকে যে রাস্তাটা এই বাড়ির দিকে এসেছে সেই রাস্তায় 'গোপালের চা' নামে একটা চা-এর দোকান আছে, সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করবি। আমি তোদের সঙ্গে ওখানেই দেখা করব।'

'আর আমার ছেলে?' রথীনবাবু কঁকিয়ে উঠলেন।

'আশা করছি আজ রাতের মধ্যেই বাড়িতে হাজির হবে।'

'তাহলে ঋষি, তুমি নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পেরেছ, কে অপহরণ করেছে?' এতক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পরে অমিতদা প্রশ্নটা করলেন।

'হয়তো কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছি। সবটা আজ রাতেই জানতে পারব।'

ঋষিদা একটা সিগারেট বানিয়ে ধরালেন। ঋষিদাকে আজ বেশ ফ্রি মুডে দেখলাম। চা, জলখাবার আর ঋষিদার মজার মজার গল্পের মধ্যে দিয়ে ছ'টা বেজে গেল। ঋষিদা উঠে দাঁড়ালেন।

'আমি চললাম। আমার আবার ওদিকে একটু কাজ বাকি আছে। রথীনবাবু আপনাকে আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি টাকাটা ঠিক জায়গায় রেখে দিয়ে এক মিনিটও দাঁড়াবেন না। আর হ্যাঁ, সুশান্তবাবুকে আটটার পরে এই ঘরে হাজির থাকতে বলেছেন তো?'

'হ্যাঁ!'

'ঠিক আছে, তাহলে এবার চলি।'

ঋষিদার কাজকারবার তো আমার কিছুই মাথায় ঢুকছে না।

(৫)

সাতটা দশ নাগাদ রথীনবাবু ব্যাগটা ভাল করে দেখে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। আমাদের দিকে একবার তাকিয়ে ম্লান হেসে বললেন, 'আমি এগোচ্ছি।' তারপরে নিজের সাদা অ্যামবাসাডারে করে বেরিয়ে গেলেন। আমি আর অমিতদাও আর অপেক্ষা না করে রওনা দিলাম। আমাদের গন্তব্যস্থল 'গোপালের চা'-এর দোকান। মাত্র মিনিট দশেকের রাস্তা। আমি অবশ্য চা-এর দোকানটা চিনি না।

অমিতদার সঙ্গে যখন দোকানে হাজির হলাম তখন আমার হাতঘড়িতে পাক্কা সাড়ে সাতটা বাজে। অমিতদা দুটো চায়ের অর্ডার দিলেন। দোকানী ছাড়াও আরও একজন বুড়ো মতন লোক বসে চা খাচ্ছে। আমি চা খেতে খেতে অমিতদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখান থেকে নাটমন্দির কত দূরে?'

'হাঁটা পথে পনেরো মিনিট মতো হবে।'

মিনিট দশেক পরে দেখলাম রথীনবাবুর গাড়িটা বাড়িমুখো বেরিয়ে গেল। মানে রথীনবাবু টাকা ঠিক জায়গায় রেখে বাড়ি গেলেন। এবার আমাদের এখানে ঋষিদার জন্য কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে কে জানে!

আটটা বাজার মিনিট পাঁচেক আগে ঋষিদা সঙ্গে একজন পুলিশ অফিসারকে নিয়ে হাজির হলেন। দোকানে ঢুকেই দু'কাপ চা-এর অর্ডার দিলেন। আমি ঋষিদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'খালি হাতে ফিরলেন! কাউকে ধরতে পারলেন না?'

'রথীনবাবুর বাড়ি চল। ওখানেই সব জানতে পারবি।'

'আর রথীনবাবুর ছেলে? সে কোথায়?'

'তোর সব কৌতূহলের উত্তর রথীনবাবুর বাড়িতেই পাবি!' ঋষিদা আমার এ প্রশ্নের উত্তরেও পাশ কাটিয়ে গেলেন।

(৬)

রথীনবাবুর বাড়িতে পৌঁছে দেখি রথীনবাবু আর তাঁর ছেলে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। রমেনবাবুর ফোটো আগে দেখা ছিল তাই চিনতে অসুবিধা হলো না।

রথীনবাবু আমাদের চারজনকে দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বললেন, 'আসুন, আসুন ঋষিবাবু। আপনার জন্যই ছেলেকে ফিরে পেলাম। রমেন এই সবে ফিরেছে। ও সব বলতে চাইলেও আমি শুনিনি। ওকে যে ফিরে পেয়েছি এই যথেষ্ট। আমার আর কিছু জানার প্রয়োজন নেই।'

ইতিমধ্যে সুশান্তবাবু এসে হাজির হলেন। ঋষিদা সুশান্তবাবুকে দেখে বললেন, 'আপনার অনুপস্থিতিটাই এখানে বড় বেশি চোখে লাগছিল।'

'না—মানে একটু দেরি হয়ে গেল।'

'সুশান্ত, চা আর মিষ্টি পাঠিয়ে দাও।' রথীনবাবু হুকুম করলেন।

সুশান্তবাবু ভেতরে চলে গেলেন।

মিষ্টি আর চা খাওয়ার পর ঋষিদা একটা সিগারেট বানিয়ে ধরালেন। অমিতদা ঋষিদার উদ্দেশে বললেন, 'রথীনবাবু না হয় কিছুই জানতে চান না, কিন্তু আমাদের তো কৌতূহল হচ্ছে। অপহরণকারী কে আর তাকে ধরলেই বা কী করে?'

'অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি অপহরণকারী কে তা জানতে পারলেও তাকে এখনও ধরতে পারিনি! কিন্তু...।'

'কিন্তু কি?'

'অপহরণকারীকে মাকড়সার জালই চিনিয়ে দেবে!'

'তুমি কি বলছ ঋষি? মাকড়সার জালই বা কে, আর সে চিনিয়ে দেবেই বা কী করে?' অমিতদা আমাদের সবার হয়েই জিজ্ঞাসা করলেন।

'নাটমন্দিরের ভেতরে যেখানে আসল অপহরণকারী লুকিয়েছিল, সেই জায়গাটা মাকড়সার জালে ভর্তি। আর অপহরণকারীর মাথার পিছনে লেগে আছে সেই মাকড়সার জাল। আরে সুশান্তবাবু, আপনি যে এত বোকা তা তো আগে বুঝতে পারিনি। ও কি সুশান্তবাবু, চললেন কোথায়?' বলেই ঋষিদা লাফ দিয়ে পলায়মান সুশান্তবাবুর কলার চেপে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় থানার ও.সি. মিঃ সোম উঠে সুশান্তবাবুকে হাতকড়া লাগিয়ে আবার এনে চেয়ারে বসালেন।

'সুশান্তবাবু, আপনি যে এত বোকার মতো কাজ করবেন তা কিন্তু আমি ভাবিনি। অপহরণকারীর মাথার পিছনে মাকড়সার জাল লেগে আছে বলার সঙ্গে সঙ্গে আপনি মাথার পিছনে হাত দিলেন অথচ আর যাঁরা এখানে বসে আছেন তাঁরা কেউই কোনও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেননি। আবার যখন আপনাকে বোকা বানালাম তখন আপনি পালাতে গিয়েই নিজেকে আবার চিনিয়ে দিলেন। ছিঃ ছিঃ।' ঋষিদার কথাগুলো সুশান্তবাবু মাথা নিচু করে সব হজম করলেন। ঋষিদা এবার রথীনবাবুকে বললেন, 'রথীনবাবু, রমেনবাবু আপনাকে যে স্যুটকেসটা এনে দিয়েছেন সেটা আনুন তো।'

'সেটার কথা আপনি কি করে জানলেন?'

'আমি সবই জানি!' ঋষিদা মুচকি হেসে উত্তর দিলেন।

রথীনবাবু উঠে গিয়ে পাশের ঘর থেকে টাকা ভর্তি স্যুটকেসটা এনে দিলেন।

ঋষিদা স্যুটকেসটা খুললেন। একি! ভেতরের সব টাকা কোথায়? যত সব পুরনো খবরের কাগজ কেটে স্যুটকেসটা ভর্তি করা হয়েছে। দেখেই রথীনবাবু চিৎকার করে উঠলেন, 'তুইও শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে বেইমানী করলি রমেন?'

'না, আপনার ছেলে এ বিষয়ে বিন্দুবিসর্গও জানেন না। কি, ঠিক বলিনি রমেনবাবু?'

রমেনবাবু কোনও উত্তর না দিয়ে মাথা নিচু করে বসে রইলেন।

(৭)

সবার অনুরোধে শেষ পর্যন্ত ঋষিদা এই কেসে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলতে শুরু করলেন, 'রমেনবাবুর হঠাৎ ইচ্ছে হয় বাবার ব্যবসা না করে পার্টনারশিপে অন্য একটা ব্যবসা করার। কিন্তু ব্যবসা করতে হলে চাই টাকা। আর সেই টাকা বাবার কাছে চাইতেই হলো যত বিপত্তি। রথীনবাবু রমেনবাবুকে টাকা দিলেন না। এখানে বলে নেওয়া দরকার যে রমেনবাবু বাড়িতে একমাত্র সুশান্তবাবুকেই সবচেয়ে কাছের লোক বলে মনে করতেন। রমেনবাবুর কাছ থেকে সব শুনে সুশান্তবাবু তাঁকে একটা বুদ্ধি দেন। রমেনবাবুকে সুশান্তবাবু তাঁর নিজের বাড়ি বা অন্য কোথাও লুকিয়ে থাকতে পরামর্শ দেন। আর সুশান্তবাবু এখান থেকে বেনামীতে চিঠি দেন। প্রথম চিঠির কাগজটা পরীক্ষা করে দেখলাম যে চিঠিটা 'এক্সিকিউটিভ বন্ড' নামে একটা দামী কাগজে লেখা। খুঁজতে খুঁজতে ঐ রকমই কাগজ পেয়ে গেলাম সুশান্তবাবুর ঘরে। ভাবলাম তাহলে কি...।

'যাই হোক পরের চিঠি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। পরের চিঠিতে রথীনবাবুর কাছে দাবি করা হলো তিন লক্ষ টাকা। এবং কোথায় কখন দিতে হবে তাও জানানো হলো। এবারও সেই একই কাগজ।'

এমন সময় কথার মাঝে রমেনবাবু বললেন, 'সুশান্তদা, আমি তোমাকে বাবার কাছ থেকে দু'লাখ টাকা চাইতে বলেছিলাম। তুমি তিন লাখ টাকা চাইলে কেন?'

'রমেনবাবু, সুশান্তবাবু এখন আপনার কোনও প্রশ্নের জবাব দেবার অবস্থায় নেই। প্রশ্ন করা বৃথাই। যাই হোক, আমি রথীনবাবুকে দিয়ে ত্রিশ হাজার টাকা যোগাড় করালাম। এবার একশ টাকার মাপে সাদা কাগজ কেটে ওপরে পাঁচটা আর নিচে পাঁচটা করে একশ টাকা দিয়ে মোট ত্রিশটা বান্ডিল তৈরি করলাম। আমি যে স্যুটকেসে টাকাটা ভরলাম তার হ্যান্ডেলে একটু রং লাগিয়ে চিহ্ন দিয়ে রাখলাম। এই চিহ্নটা দিতেই হলো যখন শুনলাম সে সুশান্তবাবুই স্যুটকেসটা কিনে এনেছেন। সুশান্তবাবু কিন্তু আমার আন্দাজ মতো কেনার সময় দুটো একই রকম দেখতে এবং একই রং-এর স্যুটকেস কেনেন। রথীনবাবু, রমেনবাবু আপনাকে যে স্যুটকেসটা এনে দিয়েছেন সেটা নকল। আসল টাকা ভর্তি স্যুটকেসটা সঠিক হেফাজতেই আছে।

'রথীনবাবুর চিঠিতে লেখা জায়গাতেই টাকাটা যখন রেখে আসেন, আমি আর মিঃ সোম তখন নাটমন্দিরের সামনের দিকে একটা আমগাছের ডালে বসে সব দেখছি। কিন্তু আমরা হঠাৎ একটা জিনিস দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। রমেনবাবু নাটমন্দিরের পেছনের দিক থেকে বেরিয়ে যে থামের আড়ালে

টাকা ভর্তি স্যুটকেসটা রাখা আছে তার উল্টোদিকের থামের আড়াল থেকে অন্য একটা স্যুটকেস নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আমরা আরও কিছুক্ষণ গাছের ডালে বসে থাকলাম। কারণ টাকা ভর্তি আসল স্যুটকেসটা তখনও সেখানে পড়ে। কিছুক্ষণ পরে সুশান্তবাবু নাটমন্দিরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসল জিনিস হাতিয়ে নিলেন। রমেনবাবু, সুশান্তবাবু নিশ্চয়ই আপনাকে বলেছিলেন যে টাকার ব্যাগ পুবদিকের থামের আড়ালে থাকবে?'

'হ্যাঁ! আমি বাগানে লুকিয়ে ছিলাম, একটা গাড়ির আওয়াজ শুনলাম, তারপরেই সুশান্তদা এসে বলল, তোমার বাবা টাকা ঠিক জায়গায় রেখে গেছেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে টাকার ব্যাগটা নিয়ে সোজা বাড়িতে এলাম। সুশান্তদা ঐ পুবদিকের থামের পিছনেই টাকাভর্তি স্যুটকেসটা থাকবে বলেছিল!'

'আচ্ছা ঋষিবাবু, টাকাটা এখন তাহলে কোথায় আছে?' রথীনবাবু এবার জিজ্ঞাসা করলেন।

'মিঃ সোম।' ঋষিদার ইশারা পাওয়ামাত্র মিঃ সোম একজন কনস্টেবলকে ভেতরে ডাকলেন। কখন যে কনস্টেবলরা এসে দরজার পাশে দাঁড়িয়েছে তা আমি বুঝতেও পারিনি। সুশান্তবাবু যাতে কোনো রকমে পালাতে না পারেন তার জন্য ঋষিদা বোধহয় সব ব্যবস্থাই করে রেখেছিলেন। একজন কনস্টেবল একটা স্যুটকেস এনে ঋষিদার হাতে দিল। ঋষিদা ওঁর দেওয়া চিহ্নটা হ্যান্ডেলে দেখে নিয়ে স্যুটকেসটা খুলে বললেন, 'এই দেখুন সুশান্তবাবু, আপনি মাত্র এই ত্রিশ হাজার টাকার জন্য এতবড় বদনামের ভাগী হলেন।'

ঋষিদা স্যুটকেসের ভেতর থেকে একটা একশ টাকার নোটের বান্ডিল তুলে দেখালেন ওপরে পাঁচটা একশ টাকার নোট আর নিচে পাঁচটা একশ টাকার নোট। মাঝখানে সব ওই নোটের মাপে কাটা সাদা কাগজ।

(৮)

মিঃ সোম আসামীকে নিয়ে চলে গেলেন। আমাদের তিনজনকে রাত্রের খাওয়াটা ওনার বাড়িতেই করতে অনুরোধ জানালেন রথীনবাবু। খাওয়া-দাওয়া সেরে ফেরার সময় রথীনবাবু বললেন, 'ঋষিবাবু, আপনি আমার যে উপকার করলেন তা আমি জীবনে কোনোদিন ভুলব না। সেই উপকারের বদলে এই সামান্য কিছু যদি আপনি গ্রহণ করেন তবে বড়ই কৃতার্থ হই।'

রথীনবাবু ঋষিদার হাতে একটা চেক তুলে দিলেন। ঋষিদা চেকটা ভাঁজ করে পকেটে ঢোকানোর সময় আমি উঁকি মেরে টাকার অঙ্কটা দেখে নিলাম, দশ হাজার! এই সামান্য কাজের জন্য নেহাৎ মন্দ নয়।

ঋষিদার রথও দেখা হলো আবার কলাও বেচা হলো!

[ভাদ্র ১৪০৫]

বাঘের ঘরে

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

একেবারে আচমকাই ঘুমটা ভেঙে গেল ডিডোর।

এরকম হঠাৎ ঘুম ভাঙলে কারণটা বুঝতে একটু সময় লাগে। সময় অবশ্য তেমন লাগল না এখন। ডিডো শুনতে পাচ্ছিল ভুলুয়া তখনও চিৎকার করছে।

ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল ডিডো। এরকম করে কেন ডাকছে ভুলুয়া! এতো চিৎকার তো সে কখনো করে না। দূরেও তো খুব নয় মনে হচ্ছে, বাড়ির আশপাশেই ডাকছে যেন। বাড়ির ভেতরেও হতে পারে, বাগানের দিকে।

রাত্তির এখন কতো কে জানে। বিধু মাসি অসাড়ে ঘুমোচ্ছে। বিধু মাসির ঘুমোতে অবশ্য রাত বেশি হওয়ার দরকার হয় না। কানে শুনতে পায় না বিশেষ, কাজেই ভুলুয়া ঘরে এসে চেঁচামেচি শুরু করলেও মাসির ঘুম ভাঙবে না।

কিন্তু কথা হচ্ছে, রাত যতোই হোক, ভুলুয়াটা এমন চেঁচায় কেন!

আস্তে আস্তে নামল ডিডো বিছানা থেকে, এগিয়ে গেল জানলার দিকে।

বাবার পড়ার ঘরের আলোও নিবে গিয়েছে। তার মানে রাত এখন মন্দ হয়নি। ওই ঘরে বসে বাবা অনেকক্ষণ অফিসের কাজকর্ম করে। মা অনেক আগেই ঢুকে পড়ে শোবার ঘরে, বিধু মাসির সঙ্গে ডিডো নিজের ঘরে ঢুকে পড়বার পরেই। বাবার পড়ার ঘরেই শুধু আলো জ্বলে। এখন সে ঘরেও আলো জ্বলছে না।

ভুলুয়া এখনও ডাকছে। বেশ জোরে জোরেই। বেরিয়ে দেখতে পারলে ভালো হতো। ভুলুয়াকে ডিডো ভালোবাসে খুবই, কিন্তু এতো রাতে বাইরে বেরুতে ওর সাহস হচ্ছে না। আসলে বাড়িটা যে একেবারে হাওদাখানা। বিরাট উঠোনটা পেরুতেই গা ছমছম করে ডিডোর, মানে সন্ধ্যের পর-টর হলে। উঠোন পেরিয়ে বিশাল বাগান। বাগানে না গেলে তো আর ভুলুয়াকে দেখা যাবে না।

ভুলুয়াকে শুধু দেখা গেলে তো হতো, সেই সঙ্গে ওই বিচ্ছিরি লোকটাকে যদি দেখা যায়, তাহলেই তো মুশকিল। ওর ঘরটা তো বাগানের শেষের দিকেই, একেবারে ফটকের কাছে।

বুধনকে ডিডোর কোনোদিনই ভালো লাগেনি, এখন ওর বউটাকে মেরেধরে তাড়িয়ে দেবার পর আরো লাগে না। বাবা বলে ওকে মালী কাকু বলতে, মাও বলে। কিন্তু এই দশ বছর বয়স পর্যন্ত কোনোদিনই সেটা বলেনি ডিডো। অসুরের মতো চেহারা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, লাল লাল চোখ—বুধনকে দেখলেই ওর অস্বস্তি লাগে। অথচ লোকটা খাটতে পারে খুব। সারাদিন বাগানের কাজ করে। সপ্তাহে দু'দিন বাজার করে আনে দূরের বাজার থেকে, ফাইফরমাসও খাটে বিস্তর। কেবল সন্ধ্যেটি হয়ে গেলে ওকে আর পাওয়া যাবে না, ঘরের মধ্যে সেঁধিয়ে যাবে।

বরং ডিডোর অনেক বেশি ভালো লাগতো ওর বউ বাসন্তীকে। বাবা বেরিয়ে যায় নটার মধ্যে, জিপ আসে বাবাকে নিয়ে যেতে। মা যায় ঘণ্টাখানেক পরে। তারপর সুনসান বাড়ি। বুধন মাটি কোপাচ্ছে আর মাসি আপন মনে রান্নাবান্না করছে। বাসন্তীও ঘরদোর পরিষ্কার করতো, তবে সেই সঙ্গে গল্পও করতো সারাদিন। ঝগড়া-টগড়া খুচখাচ লেগেই থাকতো ওর বুধনের সঙ্গে সন্ধ্যের পর, কিন্তু সাতদিন আগে যা হলো, একেবারে তুলকালাম কাণ্ড। ঘরে বসে ভয়ে কাঁপছিল ডিডো। অথচ আশ্চর্য,

বাবা একবার বেরোল না, কিছু বললও না ওকে। সকালে শুধু যখন একবার বলল, 'কী শুরু করেছিলি তোরা কাল?' তখনই বুধন বললে, 'বউ পালিয়ে গেছে।'

গেছে তো গেছে, আবার আসবে তো। একদিন গেল, দু'দিন গেল—আজ সাতদিন হয়ে গেল, বাসন্তী আর ফিরে এলো না।

ভাবতে গেলে এখনও কান্না পেয়ে যায় ডিডোর। বুধনের কথা ছেড়েই না হয় দিল, বাবাও তো একটু খোঁজখবর করবে! তা না, বুধনকে ডেকে বলল কাল, 'হ্যাঁরে, কাজের লোক-টোক দ্যাখ একটা। নইলে তো আর চলছে না!' যেন কাজের লোকটাই আসল সমস্যা, বউটা যে কোথায় চলে গেল, সেটা যেন কোনো ব্যাপারই নয়।

ইস্! কী যে হলো ভুলুয়ার! দেখার চেষ্টা করছিল ডিডো, কিন্তু অন্ধকারে ঠিক নজর হচ্ছিল না।

ভুলুয়াটাও খুব ভালবাসতো বাসন্তীকে। সব সময় পায়ের কাছে ঘুরঘুর করতো। ডিডোও আদর করতো খুব ভুলুয়াকে। কিছু খেতে দিলেই আনন্দে লেজ নাড়তে শুরু করতো।

না, ভুলুয়াকে ওরা অবশ্য পোষেনি। কোথা থেকে আসে ভুলুয়া, তাও জানে না। কিন্তু হয়ে গিয়েছিল ভুলুয়া বাড়িরই কুকুর। বাসন্তী চলে যাওয়ার পর ভুলুয়াটা সুদ্ধু বাড়ি আসা ছেড়ে দিয়েছে। প্রথম দু-দিন ওদের ঘরের কাছে ছুটে ছুটে এসেছিল বেশ কয়েকবার, ডিডোর কাছেও এসেছিল। মুখ তুলে কান্নার মতো সুরে ডেকেছিল মাঝে মাঝে। সে ওই প্রথম কয়েকটা দিনই। আজ এক সপ্তাহ পরে আবার হঠাৎ তার কী হলো!

ভাবছিল ডিডো, হঠাৎ চমকে পিছিয়ে এলো খানিক।

যা ভয় করেছিল, তাই। বুধনের ঘরের দরজা খুলে গিয়েছে, আলো জ্বলেছে। আর দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ওই ঝাঁকড়া চুলের বিচ্ছিরি মানুষটা।

কিন্তু ওর হাতে ওটা কী! বড়ো যে বেলচাটা দিয়ে বাগানের সমস্ত ময়লা, আগাছা সব ঝুড়িতে জড়ো করে, সেটা ওর কী দরকার পড়ল এখন!

বাইরে আর চোখ ছিল না। বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করছিল। নিজেকে সামলাতে সামলাতে ডিডো ভাবার চেষ্টা করছিল।

বেলচা হাতে বেরিয়ে এলো কেন লোকটা! বউটাকে তাড়িয়েছে, থাকার মধ্যে ছিল ভুলুয়া, এবার কি সেটাকেও তাড়াবে নাকি! আসা তো একরকম ছেড়েই দিয়েছে ভুলুয়া, এবার যদি ওইভাবে তেড়ে যায় মাঝরাত্তিরে—

মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল ডিডো। মাথাই ফাটতো, যদি কোনোরকমে দেয়াল ধরে নিজেকে সামলে নিতে না পারতো।

অথচ উপায়ও ছিল না। ভুলুয়ার অকস্মাৎ ওই আর্তনাদ কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা ঘুরে গিয়েছে ওর। আচমকা মেরে বসলে যেমন চেঁচায় আর কী কুকুর।

ভুলুয়ার কোনো বিপদ হয়েছে, ডিডো বুঝতে পারছিল। নিশ্চয়ই লোকটা ওই বেলচা দিয়ে সজোরে এক ঘা কষিয়ে দিয়েছে। তা নইলে ভুলুয়া অমনি করে ককিয়ে উঠতে পারে না, কক্ষণো না।

একেবারে রাক্ষস লোকটা। বউটাকে তাড়িয়ে হয়নি, এবার একটা নিরীহ কুকুরকে ধরে ঠ্যাঙাচ্ছে। বাবা যে কী করে এইরকম একটা লোককে রেখেছে এতোদিন বাড়িতে!

ভাবছিল, হঠাৎ খেয়াল হলো, ভুলুয়ার চিৎকারটা আর তো শোনা যাচ্ছে না! তাড়িয়ে দিয়েছে কুকুরটাকে! চলে গিয়েছে ভুলুয়া? কিন্তু তাহলে তো সে আওয়াজটা অন্তত শোনা যেতো। কোনোরকম শব্দই তো আর শোনা যাচ্ছে না। তাহলে! ভুলুয়া কি—

একটা আশঙ্কার কথা মনে আসতেই বুকটা এই দ্বিতীয়বারের জন্যে ধড়াস ধড়াস করে উঠল ডিডোর। ভুলুয়া বেঁচে আছে তো!

কোনোরকমে উঠে দাঁড়াল ডিডো। আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো ফের জানলার কাছে। আশঙ্কাটা কমল না একটুও, বরং এবার ভুরু কুঁচকে উঠল ওর।

ঘরের আলো জ্বলছে বুধনের। দরজা হাট খোলা। তার মানে বুধন এখনও ঘরে ঢোকেনি। কী করছে বুধন এখনও বাইরে?

অস্থির লাগছিল শরীরটা। এতো কাণ্ড হয়ে গেল, বাবাদের ঘরের আলো কিন্তু এখনো জ্বলেনি, বাবার পড়ার ঘরের আলোও না। জানলার সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না ডিডো। ঘরের ভেতর তাকাল। হালকা আলো জ্বলে ঘরে। বিধু মাসি অকাতরে ঘুমোচ্ছে। ডেকে ওর ঘুম ভাঙানো এখন অসম্ভব। বাইরে যেতে গেলে ডিডোকে একাই যেতে হবে। একা এই অন্ধকারে ঘরের বাইরে বেরোনো—বাবাও ঘুমোচ্ছে এখন অঘোরে, তার ওপর ওই বিচ্ছিরি লোকটা ঘরের বাইরে, সেই বা কী করছে এতোক্ষণ কে জানে।

তবু ডিডো থাকতে পারছিল না। ওপরে দরজার ছিটকিনিতে হাত পায় না সে, তাই বিধু মাসি ছিটকিনি লাগায় না, খিলটাই তুলে দেয়। ডিডো খিলেই হাত দিল।

দরজা খুলে বেরোতে গিয়ে গাটা কেমন ছমছম করছিল ডিডোর। কেউ কোত্থাও জেগে নেই, শুধু ওই ঝাঁকড়াচুলো লোকটা বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে—একা একা যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে কিনা বুঝতে পারছিল না ডিডো।

আবার না গিয়েও সে পারছিল না। তাই যেন প্রায় নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই এগোচ্ছিল উঠোনের দিকে।

বুধনের দরজার সামনে এসে একবার থমকে দাঁড়াল। এই পর্যন্ত যা আলো ছিল, উঠোন পর্যন্ত বেশ দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু উঠোন পেরিয়ে সামনের বাগানটা অন্ধকার। সেখানে কে আছে আর না আছে, কিছুই বোঝা যায় না। আশ্চর্য, ভুলুয়াকেও সেখানে দেখা যাচ্ছে না, বুধনকেও না।

না, দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছে ডিডো। মাটির ওপর জোরে জোরে কোদাল পড়লে যেমন হয়, তেমনি শব্দ। সেই সঙ্গে বেশি খাটাখাটি করলে বুধনের গলা থেকে যেমন একটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ ভেসে আসে, তেমনি শব্দ।

কী করছে ওখানে বুধন! বাগানের মাটি কাটছে! কিন্তু এতো রাতে তো বাগানের কাজ ও কখনো করে না। তাহলে কি অন্য কোনো কাজে—

অন্য কাজের কথাটা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই মাথার ভেতরটা কেমন শিরশির করে উঠল ডিডোর। হতে পারে বাচ্চা ছেলে, কিন্তু এতোগুলো ঘটনা চোখের সামনে ঘটে যাবার পর অন্য কাজটা যে কী হতে পারে সেটা অন্তত আন্দাজ করতে না পারার মতো বাচ্চা ও নয়। যে মুহূর্তে এগিয়ে যাবার কথা ও ভেবেছে, প্রায় সেই মুহূর্তেই মাটি কোপানোর শব্দটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

তাহলে! এবার তো ফিরে আসবে বুধন। তার মানেই মুখোমুখি হবে ডিডোর সঙ্গে। তার আগেই কি ছুটে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে পড়াটা ভালো হবে না!

কিন্তু ঘটনাটা যে জানা হবে না তাহলে, মানে ঠিক কী ব্যাপারটা ঘটে গেল একটু আগে! ভুলুয়ার চিৎকার। বুধনের বেলচা হাতে বেরিয়ে আসা ঘর থেকে। ভুলুয়ার চিৎকার হঠাৎ থেমে যাওয়া। এতোক্ষণ ধরে বুধনের না ফেরা, তারপর মাটি কোপানো—

নিজের অজান্তে কখন পা চলতে শুরু করেছে, নিজেই জানে না ডিডো। থেমেছে, যখন চোখের সামনে ছায়ামূর্তিটাকে বুধন বলে চিনতে পেরেছে।

না, সামনে ফিরে ছিল না বুধন—অন্ধকারেও বোঝা যাচ্ছে সে দাঁড়িয়ে আছে ডিডোর দিকে পেছন ফিরে। তা আছে বটে, কিন্তু কী কাজ সে করছে সেটা এখান থেকেই মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে।

গর্তটা নেহাৎ মন্দ বড়ো হয়নি, সেটাই এখন ভরাট করছে বুধন। কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে। অসুরের শক্তিতে বেলচা ভরে মাটি তুলছে আর ঢেলে দিচ্ছে গর্তের মধ্যে।

কী নিষ্ঠুর কাজটা একটু আগে বুধন করেছে, এবং এতোক্ষণ ধরে বিরাট রাজকার্য করে চলেছে, সেটা না বোঝার মতো বোকা ডিডো নয়। যা ভেবেছিল ঠিক তাই। ওই চমৎকার সুন্দর কুকুরটাকে

বেলচার এক ঘায়ে ও খতম করেছে, তারপর সেটা যাতে কেউ জানতে না পারে সেই জন্যে এতোক্ষণ পর্যন্ত পরিশ্রম করে চলেছে।

যা জানার সবই জানা হয়ে গিয়েছে, ইচ্ছে করলেই এখন ঘরে চলে যাওয়া যায়। বোধহয় সেটাই উচিত ছিল, কারণ ওই রাক্ষুসে লোকটার মুখোমুখি হলে ব্যাপারটা মোটেই সুবিধের হবে না।

বুঝেও নড়তে পারছিল না ডিডো। এবং তার ফলে যা হবার, তাই হলো। কাজ শেষ করে এদিকে ফিরেই যেন চমকে উঠল বুধন।

হাতে বেলচা, কয়েক মুহূর্ত কথাই বলতে পারছিল না কোনো। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে এসেছে সামনে।

চোখ জ্বলছে ওর আগুনের মতো। লাল লাল ভাঁটার মতো দুটো চোখ যেন ভুরুর নিচে জ্বলজ্বল করছে। নিচু গলায় বললে, 'তুই, এত রাতে এখানে?'

ডিডো কি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে এবার! গলার স্বর কেঁপে যাবে! দৌড়ে পালাবে এখান থেকে?

কী আশ্চর্য, কিছুই করল না ডিডো। পা-দুটোকে শক্ত করে কে যেন বেঁধে রেখেছিল মাটিতে, বলল, 'আমিও তো তোমাকে তাই জিজ্ঞেস করছি।'

'আমাকে জিজ্ঞেস করছিস? তুই!' বুধনের মুখে বীভৎস একটা হাসি ফুটে উঠল, বলল, 'বটে! খুব বেড়েছিস তো!'

'কথার উত্তর দিলে না যে!' যেন একটাও কথা শুনতে পায়নি, এই ভাবে বললে ডিডো, 'কী করছো তুমি, এতো রাতে?'

'দেখতে পাচ্ছিস না কী করছি! ক্ষুদে শয়তান কোথাকার'—শব্দ করে মাটিতে খানিকটা থুতু ফেললে বুধন, বললে, 'গাল টিপলে দুধ বেরোয়, আমার সঙ্গে পেজোমি করতে এসেছে। তুই যাবি এখান থেকে?'

'ভুলুয়াকে মারলে কেন তুমি! কী করেছিল ও তোমার? একটু চিৎকার করে ডাকছিল বলে শুধু শুধু তুমি—'

'চোপ!' এবার গর্জন করে উঠল বুধন, 'আর একটা কথা বললে তোকে সুদ্ধু পুঁতে ফেলবো আমি, ওই বিটকেল কুকুরটার মতোই মাটির তলায় চলে যাবি। দেবো, তোর পেয়ারের ওই ভুলুয়ার পাশে তোকে পাঠিয়ে?'

মাথার ভেতর ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল যেন!

কী বলছে লোকটা! ওকেও মেরে পুঁতে ফেলবে ওখানে! এতো সাহস ওর!

এবার ডিডোর ঠোঁট কাঁপছিল। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। গলার স্বরও ঠিকমতো ফুটছিল না, বলার চেষ্টা করল, 'তুমি আমায় মারবে! ভুলুয়ার মতো! তুমি আমায় ওই বেলচা দিয়ে—'

'ধুত্তেরি ছাই বিচ্ছুর নিকুচি করেছে—' খপ করে একটা হাত চেপে ধরার চেষ্টা করেছে বুধন। এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়েছে ডিডো। তারপর পাগলের মতো একটা আর্ত চিৎকার করে ছুটতে শুরু করেছে।

দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছিল। পেছনে পেছনে রাক্ষসটাও ছুটে আসছে, বুঝতে পারছিল। একেবারে বাবার শোবার ঘরে এসে দুম দুম করে কিল মারতে শুরু করেছে দরজায়।

তারপরও হয়তো পেছন ছাড়তো না লোকটা, বাবার ঘরে আলো জ্বলে উঠতে থেমে গিয়েছে।

দরজা খুলে গেল। তখনও হাঁই হাঁই করে নিশ্বাস নিচ্ছে ডিডো! দম বন্ধ হয়ে আসছিল। শুনতে পাচ্ছিল বাবা জিজ্ঞেস করছে, 'কী হয়েছে!' কিন্তু উত্তরই দিতে পারছিল না কথার।

দ্বিতীয়বার কথাটা বাবা জিজ্ঞেস করতে বুধনই এগিয়ে এল সামনে। যেন কিছুই হয়নি, এইভাবে একটু হেসে বলল, 'খোকাবাবু ভয় পেয়েছে। কিচ্ছু ভয় নেই ডিডোবাবু, আমি তো আছি—'

'কী হয়েছিল কী?'

'কিছুই না, ওই একটা কুকুর আসে না এই বাড়িতে, মরে পড়েছিল বাগানে। কেউ বিষ-টিষ খাইয়ে দিয়েছে বোধহয়—' নির্বিকার ভাবে বলে যাচ্ছে দেখে ডিডো নির্বাক হয়ে শুধু চেয়ে দেখছিল, বুধন বলছিল, 'বাগানে পুঁতে দিলাম। সেই দেখে ডিডোবাবু ভয়ে একেবারে—'

'মিথ্যে কথা!' এতোক্ষণে কথা বলার শক্তি ফিরে পেল যেন ডিডো, বাবার দিকে চেয়ে বলল, 'সমস্ত বানিয়ে বলছে, বাবা। ভুলুয়া ওর কিচ্ছু করেনি, ও শুধু চিৎকার করছিল জোরে জোরে। চোর-টোর কিছু দেখেছিল বোধহয়। সেই জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে এসে একটা বেলচা দিয়ে পিটিয়ে, তুমি ভাবতে পারবে না বাবা, একটা অসহায় কুকুরকে পিটিয়ে মেরে ফেলে বাগানে গর্ত খুঁড়ে তাকে পুঁতে—একেবারে মিছিমিছি বাবা, কিচ্ছু করেনি ভুলুয়া ওকে, তাও ও—'

'বড্ডো ভয় পেয়েছে—' দাঁত বার করেই বলল বুধন, 'যাও যাও, শুয়ে পড়ো খোকাবাবু, রাতদুপুরে আবোলতাবোল বকে শুধু শুধু—'

'আবোলতাবোল! শুধু শুধু!' এবার চিৎকার করার পালা ডিডোর, 'মারোনি তুমি ভুলুয়াকে? গর্ত খুঁড়ে পুঁতে দাওনি? আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম বলে আমাকে সুদ্ধু তুমি মেরে পুঁতে ফেলতে চেয়েছিলে! কী, বলোনি তুমি সে কথা? বাবাকে বলো—'

'ব্যস ব্যস, খুব হয়েছে! এবার চুপ করো—' বাবা থামিয়ে দিল ডিডোকে, 'তুমিই বা এতো রাতে কী করছিলে ওখানে গিয়ে? রাত কতো হয়েছে খেয়াল আছে তোমার?'

'আমার তো ঘুম ভেঙে গিয়েছিল ভুলুয়ার চিৎকার শুনে। তারপর—'

'তারপর তুমিও ঘরের দরজা খুলে ভুলুয়ার সঙ্গে চোর ধরতে এলে! একবার মনে হলো না তোমার, এতো রাতে বাইরে বেরোনো উচিত নয়! নেহাৎ বুধন বাইরে ছিল, নইলে তোমার একটা কিছু হয়ে গেলে দেখতো কে শুনি!'

'কী বলছো বাবা', বিস্ময়ে মুখ দিয়ে কোনো কথা বার হচ্ছিল না ডিডোর, 'যা করার সব তো ওই লোকটাই করল! তাও তুমি বলছো ও ছিল বলে আমার—ওর দোষটা তুমি দেখছোই না।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। বাচ্চা ছেলে বাচ্চার মতো থাকো। অতো পাকা পাকা কথা তোমায় বলতে হবে না। যাও, শুয়ে পড়ো গিয়ে নিজের ঘরে।'

'কিন্তু ওকে তুমি—'

'আঃ কথা বাড়িয়ো না, যাও।'

রাগে-দুঃখে-অভিমানে চোখে জল এসে যাচ্ছিল ডিডোর। বাবা নাকি পুলিশের নামকরা অফিসার। বাবাই যদি এসব কথা না বোঝে, তো অন্য লোক কী বুঝবে! কাকে আর বলবে ডিডো! বাবা তো ডিডোর চেয়ে ওই বিচ্ছিরি লোকটাকে অনেক বেশি বিশ্বাস করে!

সারাটা সকাল কারো সঙ্গে কথা বলেনি ডিডো। বাবার সঙ্গে তো নয়ই, মায়ের সঙ্গেও নয়। বেরুবার আগে মা ওর গায়ে মাথায় একটু হাত বুলিয়ে যায়, ডিডো কাছেই আসেনি মায়ের। দূর থেকেই হাত নেড়ে টা-টা করেছিল।

সাধারণত যে সব কাজ নিয়ে রোজই একটু-আধটু ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট বাধায় ডিডো, আজ প্রায় বিনা বাধায় সে সব কাজ সেরে নিয়েছে। স্নান-খাওয়া শেষ করে একটু শোবার কথা, শুয়েও ছিল। কিন্তু ঘুমোতে পারেনি, ঘুম আসেনি তার। শুয়ে শুয়ে শুধু ভেবেছে, কী করা যায়।

যতোবারই ভেবেছে কিচ্ছু করবে না, বাবা ওই যে বলেছে—বাচ্চা ছেলে বাচ্চার মতো থাকো, তাই থাকবে—ততোবারই মাথার ভেতর যেন আগুন জ্বলে উঠেছে। চোখের সামনে দেখল জলজ্যান্তো একটা কুকুরকে পিটিয়ে মেরে ফেলল—একেবারে বিনা কারণে, অথচ সে কথা তাকে বলা যাবে না! ঠিক আছে, ডিডো না হয় বাচ্চা ছেলে, কিছু বলাটা তার ঠিক নয়, কিন্তু বাবা! বাবার নামে নাকি বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খায়, সেই বাবাও কিছু বলতে পারবে না বুধনকে! আশ্চর্য তো, বুধন তো এ বাড়ির মালী, না কী!

এক-একবার ভেবেছে, দূর ছাই ছেড়েই দিই ওসব। ভুলুয়ার জন্যে মনটা ক-দিন খারাপ থাকবে, তারপর একদিন ভুলেই যাবো ওর কথা। কিন্তু তার পরই মনে হয়েছে, ভুলুয়া তো আমাকেও ভালোবাসতো! চোখের সামনে দেখলাম তাকে পিটিয়ে মারা হলো, অথচ লোকটাকে একেবারে বেমালুম ছেড়ে দেব! শেষ পর্যন্ত প্রায় মরিয়া হয়েই ফোনটা করেছিল ডিডো।

মরিয়া না হলে অবশ্য ফোনটা ডিডো করতে পারতোই না। একে থানার লোকজন অনেকেই তাদের বাড়িতে এসেছে, ডিডোবাবু ডিডোবাবু বলে আদর-টাদরও করে কেউ কেউ। তাদের কাউকে ফোন করে এসব কথা বলছে, গোটা ব্যাপারটাই কেমন হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়। আর বাবা নিজেই যদি ফোনটা ধরে তাহলেই তো হয়েছে, গম্ভীর গলায় বলবে, 'আবার কী হলো তোমার!'

না, সেরকম হলে সঙ্গে সঙ্গে বানিয়ে কিছু একটা বলে দেওয়া যেতো। বাবার মতো জাঁদরেল অফিসারকে যে ফোন তুললেই পাওয়া যাবে না, সেটুকু ভরসা ডিডোর ছিল, ওর ভয় ছিল ওখানকার চেনা কাকুরা হয়তো বলে বসবে, 'মুশকিল কী জানো ডিডোবাবু, রাস্তার কুকুরকে মারলে তো তাকে ফাঁসি দেওয়া যায় না!'

কিন্তু সেরকম কিছু হয়নি। ডিডোকে অবাক করে দিয়ে তাপসকাকু মন দিয়ে সব কথা শুনেছিল।

ফোনটা অবশ্য ধরেই বলেছিল, 'আরিব্বাস..., ডিডোবাবু! বাবাকে খুঁজছো নাকি? বাবাকে তো বিকেলের আগে পাবে না!'

'না না, বাবাকে দরকার নেই—' স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ডিডো বলেছিল, 'তোমাকে হলেই চলবে তাপসকাকু।'

'বাঁচা গেল। কথাটা তাহলে বলে ফেলো।'

'প্রথম কথা হচ্ছে বাবাকে কিছু বলবে না আমার কথা, মানে আমার ফোন করার কথা।'

'কেন বলো দিকি?'

'বাবা আমাকে পাত্তা দেয়নি, বাবাকেই প্রথম বলতে গিয়েছিলাম কথাটা।'

'সত্যি! এইরকম ইনসাল্ট! বাবার তো ঠিক হয়নি এটা—ডিডোবাবুকে অপমান।'

'তুমিও পাত্তা না দিতে পারো, কিন্তু কথাটা তুমি শোনো। বাচ্চা ছেলে বলে না শুনেই উড়িয়ে দিয়ো না।'

'কক্ষণো না। নিশ্চিন্তে কথাটা তুমি বলতে পারো আমাকে। তোমার বাবার মতো বড়ো অফিসার না হলেও ছোটখাটো অফিসার তো আমি বটেই। কথাটা কী নিয়ে?'

'বুধনকে নিয়ে। বুধনকে তোমার মনে আছে তো?'

'মনে থাকবে না কেন, তোমাদের মালী তো?' তাপসকাকু বলেছিল—'ওর বউটা তো পালিয়েছে সপ্তাহখানেক আগে, তাই না?'

'পালিয়েছে না আরো কিছু, মেরেধরে তাড়িয়েছে ও'—ডিডো বলেছিল, 'লোকটা মোটেই সুবিধের নয়!'

'তাই বুঝি?'

'এক্কেবারে তাই। কাল রাত্তিরে যা করেছে, শুনলে পরে তুমিও তাই বলবে।'

'সত্যি! কী করেছে বলো তো।'

গোটা ব্যাপারটা মন দিয়ে শুনেছিল তাপসকাকু। তারপর বলেছিল, 'ভুলুয়া কোথায় চিৎকার করছিল, তোমাদের বাড়ির ভেতরে, না রাস্তায়?'

'ঠিক বুঝতে পারিনি। মনে হয় ভেতরেই বাগানের দিকে। নইলে আমার ঘুম ভাঙতো না।'

'তোমাদের বাড়িতে এখন কম আসতো ভুলুয়া?'

'আসতোই না তো প্রায়। বুধনের বউ ওকে খুব ভালবাসতো, সে চলে যাবার পর ভুলুয়াও আসা কমিয়ে দিয়েছিল।'

'অথচ অতো রাত্তিরে ও এসেছিল?'

'এসেছিল তো এসেছিল। তাই বলে তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলতে হবে?'

'খুব অন্যায় করেছে। পুঁতে ফেলেছে বাগানে?'

'হ্যাঁ গো। রাত্তিরে তো ভালো দেখতে পাইনি, সকালে একবার গিয়ে দেখে এসেছি।'

'বুধন কিছু বলল না?'

'ও থাকতে যাই? পাগল নাকি! ও যখন বাজারে গিয়েছিল, তখন জায়গাটা দেখে এসেছি। তাতে অবশ্য আমার মনটা আরো খারাপ হয়ে গিয়েছে।'

'তা তো হবেই, বেচারি ভুলুয়াকে ওখানে পুঁতে রেখেছে!'

'শুধু সেজন্যে নয়, বাসন্তীর একটা চুড়ি পেয়েছি ওখানে।'

'বাসন্তী কে? বুধনের বউ?'

'হ্যাঁ গো। এমনি শস্তা দুটো চুড়ি পরে থাকতো, তারই একটা দেখলাম বাগানের একটা কোণে পড়ে আছে। ঝগড়াঝাঁটি করে গেছে তো, টানাহ্যাঁচড়ায় খুলে গেছে হয়তো!'

সেই প্রথম ডিডোর মনে হয়েছিল, তাপসকাকু বোধহয় মন দিয়ে শুনছে না ওর কথা। ওদিকে কেমন চুপচাপ। পুরো এক মিনিট প্রায় লাইন কেটে গেছে মনে করে ডিডো বলেছিল, 'হ্যালো, তাপসকাকু!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো। আমি শুনছি।'

'তুমি হঠাৎ চুপ করে গেলে—'

'না না, চুড়ির কথা বলছিলে তো তুমি? সেটা আছে তোমার কাছে?'

'হ্যাঁ, কুড়িয়ে নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু সেটা নিয়ে তুমি—'

'না রে বাবা, এমনি বললাম। এবার বলো তুমি কী বলতে চাও।'

'কী আবার বলবো? বদমাইশ লোকটা এমনি এমনি ছাড়া পেয়ে যাবে! আমাদের ভুলুয়াকে বিনাদোষে মেরে ফেলল—'

'ঠিক। ভালো করে একটু ধমকে অন্তত দিয়ে আসা উচিত ওকে, কী বলো?'

'তুমি আসবে?'

'বাঃ, ডিডোবাবু বলছে, না গেলে চলে!'

'এসো তো! এতো বড়ো সাহস, বলে কিনা আমাকেও পুঁতে ফেলবে!'

'দেখাচ্ছি মজা! তুমি শুধু চুপ করে বসে থাকো একটু।'

তাই ছিল ডিডো। দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত।

পাঁচটা বাজে প্রায়, পুলিশের গাড়ি এলো। জিপ নয়, বড়ো গাড়ি।

গাড়ি থেকে নেমে তাপসকাকু সোজা একেবারে বাগানে, বুধনের ঘরের দরজায় ধাক্কা। গুটি গুটি এগিয়ে এসেছে ডিডো। কিন্তু তাপসকাকু তখন যেন আর তাকে চেনেই না।

'কী ব্যাপার!' বুধন দরজা খুলে হকচকিয়ে গেছে।

'বাগানটা আমরা একবার খুঁড়বো।'

'মানে!' এবার বুধন নিজেকে যেন একটু সামলে নিয়েছে, 'হঠাৎ আমাদের বাগান খুঁড়বেন কেন?'

'বাগানে কিছু একটা লুকোনো রয়েছে, আমরা খবর পেয়েছি।'

'লুকোনো কিছু নেই, আমি একটা মরা কুকুর পুঁতেছি—' বুধন বললে, 'বাবু সেটা জানেন।'

'বাবু জানেন না, এমন কিছুও থাকতে পারে—' তাপসকাকু কঠিন গলায় বললে, 'যেমন ধরো তোমার বউ।'

'কী?'

'হ্যাঁ। কুকুর পুঁততে পারো, বাবুর ছেলেকে পোঁতার ভয় দেখাতে পারো, আর নিজের বউকে মেরে, পুঁততে পারো না! একটা জলজ্যান্তো মানুষ উবে গেল?'

'দাঁড়ান।' বুধন নিজমূর্তি ধারণ করে বললে, 'বাবু বাড়ি নেই, এখন এখানে আমি কিছু করতে দেবো না। যা করবার—'

'হ্যাঁ, আমি ফেরার পরেই ওরা করছে—' বাবা গাড়ি থেকে নামছিল, সঙ্গে কোদাল নিয়ে দুটো সেপাই। তাপসকাকুর দিকে চেয়ে বাবা বলল, 'তুমি ডিডোর কাছে যাও। এদিকটা আমি দেখছি।'

ভয়ে কাঁপছিল ডিডো, তাপসকাকু আসতে বলল, 'কী গো কাকু, বউকেও ও পুঁতে রেখেছে ওখানে?'

'মনে হচ্ছে, তাই। নইলে ভুলুয়া হঠাৎ মাঝরাত্তিরে ওখানে গিয়ে চেঁচাতে যাবে কেন বলো, আর তাতে ও-ই বা এতো রেগে যাবে কেন?'

'কেন রেগে গেল!'

'বা, মেরে ওখানে পুঁতে রেখেছে বউটাকে—কুকুরটা এরকম চেঁচামেচি শুরু করলে ওর কীর্তিকলাপ সব ফাঁস হয়ে যাবে না!'

'ভুলুয়া কী করে বুঝল?'

'ওই যে, যে চুড়িটা তুমি নিয়ে এসেছো, সেটা পড়েছিল বলে। তাছাড়া ওদের নাক তো খুব খরো—গন্ধ শুঁকে ঠিক ধরে ফেলতে পারে।'

ডিডো খানিকক্ষণ চুপ করে চেয়ে বললে, 'আর তুমি কী করে ধরলে! আমি তো তোমায় শুধু ভুলুয়ার কথা বলেছিলাম।'

'বুঝে গেলাম। পুলিশের লোক না আমরা!' তাপসকাকু ওর গাল টিপে দিয়ে বললে, 'তাছাড়া ডিডোবাবুর কাকু বলে কথা।'

কাকুর কথা যে মিথ্যে নয়, সেটা ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই টের পাওয়া গেল। বাবা অবশ্য ডিডোকে ওদিকে যেতে বারণ করেছে, কিন্তু গর্ত খোঁড়া, ডেডবডি গাড়িতে তোলা, গর্ত বোজানো—দূর থেকে সবই দেখতে পেয়েছে ডিডো। সবচেয়ে মজা লেগেছে বুধনকে দেখে। হাতে দড়ি, কোমরে দড়ি—সে মানুষই যেন নয়। একজন টানছে সামনে থেকে, আর একজন পেছনে ধাক্কা মারছে।

শুধু মজা অবশ্য নয়, বুধনের জন্যে একটু মায়াও লাগছিল ডিডোর এখন। ও তো ভেবেছিল ভুলুয়াকে মারার জন্যে একটু ধমক-ধামক খাবে বুঝি। কিন্তু কেঁচো খুঁড়তে যে এমনি করে সাপ বেরিয়ে যাবে—

[ভাদ্র ১৪১০]

বন্ধ কারখানার অন্ধকারে

ঘনশ্যাম চৌধুরী

গোয়েন্দা কেদার মজুমদার সেদিন সকালে ক্যারাটে প্র্যাকটিসের পর পায়চারি করতে করতে ভেজা ছোলা খাচ্ছিলেন। তখনই গেটম্যান দিলানন্দ সিং একখানা খাম তাঁর হাতে দিয়ে বলল, কিদারবাবু, আপনার পত্র। কেদার সহকারী বদ্রীকে ডাকলেন, বদ্রী, শুনে যা তো!

বদ্রীনারায়ণ ছুটে এল। জিগ্যেস করল, কী হল আবার?

খামটা খুলে দ্যাখ তো, কে কী পাঠিয়েছে?

খামটা ছিঁড়ে বদ্রী দেখল, তার মধ্যে বিয়ের নিমন্ত্রণের একটা খাম। সেই খামের ভেতর বিয়ের চিঠি। এক নিঃশ্বাসে চিঠিটা পড়ে ফেলল বদ্রী।

কেদারদা, তোমাকে বিয়ের নেমন্তন্ন করেছে কাঁচরাপাড়ার অসীমেশ রায়। তাঁর মেয়ে সুরঞ্জনার বিয়ে ফেব্রুয়ারির দশে।

ও হো! অসীমেশ ব্যাটা আমাকে ভোলেনি দেখছি! অনেক দিন ওর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ, কথাবার্তা নেই। আজ বিকেলেই ওকে একটা টেলিফোন করব। ও-ব্যাটা আমার কলেজ লাইফের জিগরি দোস্ত!

বদ্রী দেখল, অসীমেশ রায়ের নাম শুনে কেদার একেবারে টগবগ করে ফুটছেন।

বিকেলেই কেদার ফোন করলেন অসীমেশ রায়কে।

আমি কেদার বলছি রে! তোর চিঠি পেলাম।

আরে কেদার! তুই চিঠি পেয়ে ফোন করবি, এমনটা আমি ভাবতেই পারিনি। তুই তো এখন বিখ্যাত লোক। খবরের কাগজে তো মাঝে মাঝেই তোর নাম দেখছি।

তুই যে আমাকে মনে রেখেছিস, এই তো অনেক। যাব তোর মেয়ের বিয়েয়। একঘেয়ে জীবনে একটু বৈচিত্র্য আসবে।

তাহলে আগের দিনই চলে আয় না।

দেখা যাক। তেমন হলে আগে তোকে খবর দেব।

হাতে কতগুলো খুচরো কাজ ছিল। সপ্তাহখানেক লেগে-পড়ে থেকে সেই কাজগুলো শেষ করলেন কেদার। বদ্রীকে বললেন, কি রে, বিয়ের একদিন আগেই যাই। এধার-ওধার একটু ঘোরা যাবে।

চলো। তেমন জম্পেশ কেসও নেই হাতে। কী হবে কলকাতায় বসে থেকে!

কেদারও অসীমেশবাবুকে জানিয়ে দিলেন বিয়ের আগের দিনই তাঁরা যাচ্ছেন।

কলকাতা থেকে কতক্ষণ আর কাঁচরাপাড়া? ওরা দমদম জংশন থেকে ট্রেনে উঠেছিল। দেড়ঘণ্টায় পৌঁছে গেল গন্তব্যে। তারপর রিকশা। একেবারে গঙ্গার তীরে অসীমেশ রায়ের বাড়ি। কেদার-বদ্রীকে দেখে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লেন অসীমেশবাবু। বদ্রী দেখল, বাড়ির সামনেটায় বিরাট উঠোনে প্যান্ডেল বাঁধা হয়েছে। অসীমেশবাবুর বয়েস কেদারের মতোই হবে। কাঁচাপাকা চাপদাড়ি। চুলেও পাক ধরেছে। দোহারা গড়ন। চৌকশ-বুদ্ধিদীপ্ত না হলেও তাঁর গৃহীসুলভ আটপৌরে ভাবটুকু ভালোই লাগে। ওঁদের বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেলেন তিনি। পরিচয় করিয়ে দিলেন সবার সঙ্গে। বললেন, ছেলে গৌতম নৈহাটি গেছে বিয়ের জিনিসপত্র কিনতে। এই যে আমার মেয়ে। চিঠিতে তো নাম জেনেছিসই। সুরঞ্জনা। বুঝলি সুরো, তোর কেদারকাকু কিন্তু মস্ত বড়ো ডিটেকটিভ। খুব নাম-ডাক।

সুরঞ্জনা কেদারের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল, আমি আপনাদের নাম খুব শুনেছি। যেদিনই খবরের কাগজে আপনাদের নাম বেরোয়, সেদিনই বাবা বাড়িতে হৈ-হৈ শুরু করেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কেদার-বদ্রী এ-বাড়ির আপনজন হয়ে উঠল। বাড়ির দক্ষিণে একতলাতেই একটা ঘরের ব্যবস্থা ছিল কেদার-বদ্রীর জন্য। লাগোয়া বাথরুমও আছে সেটায়। শাওয়ার খুলে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলেন কেদার। বাথরুম থেকে বেরিয়ে বদ্রীকে বললেন, অসীমেশ কলেজে কেমন ভোঁদা টাইপের ছেলে ছিল। সে তো দেখছি বেশ গুছিয়ে বসেছে। বাথরুমখানা খাসা বানিয়েছে। একেবারে সরকারি গেস্ট হাউসের মতো।

কলেজে যখন তোমার বন্ধু ছিল, তাহলে অসীমেশবাবু একেবারে ভোঁদা টাইপের ছিলেন, এমন কথা মানতে পারলুম না।

বদ্রীর এই মন্তব্য শুনে কেদার বললেন, সবেতেই একটা পাল্টা যুক্তি খাড়া করে আমার কথা নস্যাৎ করাটা তোর তো দেখছি হ্যাবিট হয়ে গেছে।

কী আর করা যাবে!

কিছু যখন করার নেই, তবে স্নানটা সেরে ফ্যাল।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া হল ভালোই। পেটুক কেদার সমানে চেয়ে চেয়ে খেয়ে যাচ্ছেন, আর বদ্রীনারায়ণ তাই দেখে চলেছে।

হাঁ করে দেখছিস কী? খা ঠিকমতো!

আমার খাওয়া হয়ে গেছে।

ভালো কথা। সুরঞ্জনা, আমাকে আর একটু পায়েস দাও তো!

সুরঞ্জনার মা-ও এমন একজন খাইয়ে মানুষকে পেয়ে খুব খুশি।

খেয়েদেয়ে ঘরে এসে একটা লম্বা ঘুম দিলেন কেদার। উঠলেন বিকেল পৌনে পাঁচটায়। চা-বিস্কুট খেয়ে কেদার-বদ্রী দু'জনে বেরিয়ে পড়লো অঞ্চল পরিভ্রমণে।

দুই

খাসা জায়গা। কি বলিস? গঙ্গার ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কেদার কথাটা ছুঁড়ে দিলেন বদ্রীর দিকে।

যা ফুরফুরে বাতাস দিচ্ছে, একেবারে মিঠে বাতাস! খারাপ বলি কি করে!

কেদার তো উচ্চস্বরে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু করলেন—

'যদিও বাতাস বহিছে মন্দ-মন্থরে সব সঙ্গীত ইঙ্গিতে গেছে থামিয়া—'

তক্ষুনি বদ্রী বলে উঠল, দ্যাখো, ওদিকটায় দ্যাখো কেদারদা।

সঙ্গে সঙ্গে কেদার সেদিকে চোখ ফেরালেন। কিন্তু প্রথমে কিছু বুঝতে পারলেন না।

কী? কিছু দেখছি না তো!

বদ্রীর অবচেতন মন আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রহস্য খুঁজে পেয়েছে। সে কেদারকে বলল, ওই যে বাগানের পেছনে পোড়ো বাড়িটা, ভালো করে লক্ষ করো। ধোঁয়া উঠছে। দেখতে পেয়েছ?

দেখেছি। ধোঁয়া উঠছে তো কী হয়েছে?

অমন একটা পোড়ো বাড়ি থেকে ওভাবে ধোঁয়া উঠছে, কেমন একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার মনে হচ্ছে আমার।

চল্, এগিয়ে দেখে আসি!

চলো যাই।

গঙ্গার একেবারে পাড়েই পোড়ো বাড়িটা। খানিকটা হেঁটেই সেখানে পৌঁছে গেল ওরা। একটা বড়ো আম-কাঁঠাল-লিচুর বাগান তার পাশেই।

কেদার বললেন, বোঝা যাচ্ছে, এককালে এটা কোনো কারখানা ছিল।

তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু বাড়িটার চারধারে যেভাবে কাঁটাগাছের ঝোপ-জঙ্গল ছেয়ে গেছে, ঢুকব কী করে?

ধোঁয়া যখন বেরোচ্ছে, মানুষ ঢোকার রাস্তা ঠিকই আছে।

হুঁ, ঠিকই বলেছ। কথা হচ্ছে, সূর্য ডুবে গেছে অনেকক্ষণ। অন্ধকার হয়ে আসছে। বাড়িটায় ঢোকা যাবে কিনা তাই ভাবছি।

দেখা যাক।

কেদার-বদ্রী পোড়ো বাড়িটাকে ঘিরে থাকা ঝোপ-জঙ্গল আর কাঁটাতারের বেড়ার পাশ দিয়ে রাস্তা ধরে অনেকটা গোলাকৃতি জায়গা হাঁটল। কিন্তু বাড়িটায় ঢুকবার মতো কোনো হাঁটাপথ পেল না। তবে দু'জনের জেদও কম নয়। কেদার বললেন, গঙ্গার লাগোয়া দিকটায় চল্।

কিন্তু ওদিকটা পাড় ভেঙে কেমন বিপজ্জনক হয়ে গেছে।

চল্ যাই তো।

উঁচু-নিচু মাটির ঢিবিগুলো পেরিয়ে খাড়া পাড়ের ধার ঘেঁষে ওরা সেই পোড়ো কারখানার পেছন দিকে গেল খানিকটা।

কেদারদা, দ্যাখো!

কেদার দেখলেন, কারখানা থেকে বেরিয়ে আসা একটা ভাঙাচোরা জেটির থামের সঙ্গে একটা ডিঙি নৌকো বাঁধা। বদ্রী কী বুঝে বলল, কেদারদা সাবধান! পিছিয়ে এস।

বদ্রীর চিন্তাধারার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে কেদার দারুণ সচেতন। বদ্রীর সতর্কতার সঙ্কেত মানে একেবারে শেষতম সিদ্ধান্ত।

দু'জনেই দ্রুত পিছিয়ে এসে মূল রাস্তায় চলে এল। ওরা এবার মানুষজনের গলা পেল। জলে নৌকার বৈঠা পড়ার ছপ্ ছপ্ শব্দ হচ্ছে। মিনিট পাঁচেক পরে পাড় থেকে বেশ খানিকটা দূরে ওরা নৌকোটা দেখতে পেল। বদ্রীনারায়ণের দৃষ্টিশক্তি নাকি ভিন্ন গ্রহের মানুষের মতো অসম্ভব তীব্র। এই কথাটা খুব চালু আছে। এখনও ডিঙি নৌকোটার ওপর তীক্ষ্ণ নজর ফেলে বদ্রীর নীল চোখ-দুটো যেন ঘূর্ণির মতো ঘুরতে লেগেছে।

ও দেখছিল, একজন নৌকোর দাঁড় বাইছে। আর দু'জন মানুষ তাতে বসে আছে। বদ্রীনারায়ণ তার দৃষ্টিশক্তিকে তীব্রতম করে তুলল মানুষগুলোর মুখের আদল বুঝে নিতে। পাক খেতে থাকা বদ্রীর নীল চোখের মণি থেকে একটা আলোকরশ্মি যেন ছুটে গেল ডিঙি নৌকোর ওপর। সেই আলোয় বদ্রী দেখতে পেল লোক তিনটের মুখ। সঙ্গে সঙ্গেই তা রেকর্ড হয়ে গেল তার মস্তিষ্কে। এই মুখগুলো বদ্রী আর কোনোদিনই ভুলবে না।

নৌকোটা এখন ওপারের দিকেই যাচ্ছে। অসীমেশবাবুর বাড়ির দিকে যেতে যেতে কেদার বললেন, ইস্, টর্চটা সঙ্গে থাকলে বাড়িটায় ঢোকা যেত।

ওরা বাড়ি পৌঁছে দেখল, বিয়েবাড়ির আগের দিনের গোছগাছ চলছে। বেশ কর্মব্যস্ততা। গৌতম নৈহাটি থেকে অনেক আগেই ফিরে এসেছে। সে কেদার-বদ্রীর সঙ্গে আলাপ করে গেল।

এখানে কলকাতা শহরের থেকে অনেক আগেই রাত নামে। রাত সাড়ে এগারোটা-বারোটার মধ্যেই এদের বাড়ি নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কেদার-বদ্রী খেয়ে-দেয়ে নিজেদের ঘরে শুয়ে পড়লেও ওদের ঘুম আসছিল না। কেমন একটা ভীতিজনক থমথমে নৈঃশব্দ্য যেন চারধারে। দু'জনের কেউ কোনো কথা না বললেও দু'জনের মনের মধ্যেই নানা চিন্তা তোলপাড় হচ্ছিল। ডিঙি নৌকোয় বসে থাকা সেই তিনটে মানুষের মুখ বদ্রীর চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠছিল।

কেন ওই মুখগুলো বার-বার ভাসছে? অবাক হয়ে তাই ভাবছিল বদ্রীনারায়ণ। কোনো অঘটনের মুখোমুখি হতে হবে নিশ্চয়ই! না হলে মনটা এমন ছটফটই বা করছে কেন!

একসময় ওরা দু'জনই ঘুমিয়ে পড়ল।

তিন

পরের দিন বিয়েবাড়ির ব্যস্ততা সারাদিন। কেদার-বদ্রী আর কী করবে সেখানে? সকালে ব্রেকফাস্টের পরেই ওরা বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। যাবার সময় কেদার অসীমেশবাবুকে বলে গেলেন, আমরা একটু বেরোচ্ছি। আমাদের দেরি হলে চিন্তা করিস না। দু'একজন চেনাজানা মানুষজন আছে কাঁচরাপাড়ায়। সুযোগ পেলে তাদের সঙ্গে একটু দেখা করে আসব।

রাস্তায় বেরিয়েই বদ্রী বলল, কেদারদা, কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা সেই পোড়ো কারখানায় যাব আগে। ওই ব্যাপারটা নিয়ে মনটা কেমন খুঁতখুঁত করছে। নৌকোর লোকগুলোকে ভালো ঠেকল না। সকাল সকালই যাওয়া ভালো।

সেই একই ভাবে গঙ্গার ভাঙাচোরা বিপজ্জনক পাড় ঘেঁষে ওরা দু'জন পোড়ো কারখানার পেছন দিকে এল। দেখা গেল একটা সরু পথ। দ্বিরুক্তি না করে ওরা সেই পথ ধরে একটা বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

আজকে তৈরি হয়েই এসেছিল ওরা। মাস্টার কি দিয়ে খুলে ফেলল দরজা। ভেতরে ঢুকল দু'জনই।

বাইরে থেকে ভাঙাচোরা, মরচে পড়া, কাত হয়ে যাওয়া চিমনি, ঝোপ-জঙ্গলে আচ্ছন্ন কারখানা মনে হলেও ওরা ভেতরে ঢুকে বুঝল, বাড়িটি সাঙ্ঘাতিক মজবুত। কেদার বললেন, বোধহয় এটা জুটমিলই ছিল মনে হচ্ছে। আমি বাউড়িয়াতে একবার জুটমিলে ঢুকেছিলাম। এ-রকমই দেখতে।

সামনের দিকে বেশ কয়েকটা ঘর। এগুলো সম্ভবত অফিস ঘর ছিল। সেগুলো পেরোলে একটা বিরাট চত্বর। ওপরে অ্যাসবেস্টাসের শেড। বিরাট বিরাট মেশিনপত্র রয়েছে এখানে। ভেতরটা আধো-অন্ধকার। কেদার টর্চ নিয়ে এসেছিলেন। টর্চের আলো এখানে-ওখানে আছড়ে পড়ল।

বদ্রী চারধারে তীক্ষ্ণ নজর ফেলতে ফেলতে এক-পা দু-পা করে এগোচ্ছে। যদিও সমস্ত জায়গাটাই অসম্ভব নিস্তব্ধ, তবুও বদ্রীর মনে হচ্ছিল, কিছু একটা অস্বাভাবিকতা আছে। কোনো মানুষ নেই, কিন্তু মানুষের উপস্থিতির গন্ধ আছে। কেদার দেখছিলেন, যন্ত্রপাতি সব মরচে ধরে গেছে। বললেন, ক'বছর ধরে কারখানাটা বন্ধ হয়েছে, কে জানে!

ওরা চত্বরটা পেরোল। কেদার বললেন, এটা বয়লার রুম। দ্যাখ, বয়লার থেকে চিমনির পাইপ ওপরে উঠে গেছে।

এই ঘরটায় আগাছা আর ছোট ছোট জংলা গাছ গজিয়ে গেছে। তার মধ্যেও একটা সরু পায়ে চলা পথ এগিয়েছে পাশের ঘরের দিকে। ওরা পাশের ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেল। বদ্রী অস্ফুটে বলল, কেদারদা, দ্যাখো কারবার!

কেদারেরও অবাক হবার পালা।

ওরা দেখল ছিমছাম একটা সাজানো ঘর। সেই ঘরের ডানপাশ ঘেঁষে একটা আধুনিক মেশিন বসানো। তার পাশেই একটা বড়সড় লোহার বাক্স। অনেকটা সিন্দুকের মতো। তাতে একটা হাতল। হাতলের পাশেই চাবি ঢোকানোর ফুটো। কেদার সেই হাতলটা নানাভাবে ঘোরানোর চেষ্টা করে কিছুতেই নাড়াতে পারলেন না। তারপর বদ্রীকে মজা করে বললেন, পাতালপুরীর কোন রাজার গুপ্তধন ঠাসা রয়েছে এই লোহার সিন্দুকে, কে জানে!

কিন্তু এই ঝকঝকে টাটকা নতুন মেশিনটা কিসের? বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানায় যখন সব যন্ত্রপাতি মরচে ধরে গেছে, তখন এই তেল চকচকে মেশিনটা এল কোথা থেকে?

তাই তো ভাবছি। শুধু তাই নয়। এই কারখানার ইলেকট্রিক লাইনও বোধহয় চালু আছে। দ্যাখ, দেওয়ালের সুইচ বক্স থেকে আলগা তার দিয়ে মেশিনের সঙ্গে কানেকশন করা হয়েছে।

কেদার মেশিনের চারপাশ ঘুরে দেখছিলেন। পেছনদিকটা দেখতে দেখতে থমকে দাঁড়ালেন। বললেন,

মেশিনটা মেড ইন জার্মানি লেখা আছে। বদ্রী, বললাম না, ইলেকট্রিকের কানেকশন দেওয়া আছে! এই যে, ইন্ডিকেশন বোর্ডে লাল আলো জ্বলছে।

বদ্রী ঘরটার আনাচে-কানাচে খুঁজে কিছু একটা বোঝার চেষ্টা করে চলেছে। একটা ঘুপচি অন্ধকার জায়গা দেখে সে কেদারকে বলল, টর্চের আলোটা ফেলো তো এখানটায়।

কেদার তাই করলেন। ছোট একটা ঘরের মতো। কোনো দরজা নেই। তার চারপাশের দেওয়াল জুড়ে অনেক র‍্যাক। তবে সেগুলো খালি। ঘরের ভেতর ছেঁড়া কাগজপত্র ডাঁই হয়ে আছে। বদ্রী এগিয়ে এল ছেঁড়া দোমড়ানো-মোচড়ানো কাগজের স্তূপের কাছে। একটা কাগজ তুলে নিল। বলল, কেদারদা, আলোটা ধরো।

টর্চের আলো এসে পড়ল বদ্রীর হাতের কাগজটার ওপর। বদ্রী মোচড়ানো কাগজটা সমান করে তার লেখাগুলো পড়বার চেষ্টা করছিল। এবার সে খুব গম্ভীর গলায় কেদারকে বলল, দ্যাখো তো ব্যাপারটা কী!

কেদার দেখে বললেন, এটা তো দেখছি একটা ছেঁড়া পাঁচশো টাকার নোট!

বদ্রীনারায়ণ সেই ঘুপচি থেকে আরও কয়েকটা কাগজ তুলে কেদারের হাতে দিল। কেদার এক একটা কাগজ দেখছেন আর অবাক হয়ে যাচ্ছেন। অবাক হচ্ছে বদ্রীও। কেদার অস্ফুটে বললেন, আশ্চর্য!

এদিকে বদ্রী ডাঁই থেকে একের পর এক কাগজের টুকরো তুলে আনছে। দোমড়ানো-মোচড়ানো কাগজের টুকরোগুলো যতটা সম্ভব সমান করে তার মধ্যে ছাপা অক্ষরগুলো পড়ে নিচ্ছে। তারপরই সেটা দিয়ে দিচ্ছে কেদারের হাতে।

কেদার টর্চের আলোয় পরখ করে দেখে তা একটা একটা করে ভাঁজ করে পকেটে রাখছেন। তারই মাঝখানে কেদার বললেন, বোঝা যাচ্ছে, এ-সব রিজেক্টেড।

বদ্রী এবার বলল, আর নয়। ক'টা বাজে?

দশটা উনষাট।

তা হলে এক্ষুনি বেরোই।

হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি করাই ভালো।

একই পথে বেরিয়ে লোকালয়ের কাছাকাছি এসে ওরা একটা রিকশায় চেপে বসল। কেদার বললেন, থানা কত দূর?

মাইলখানেক।

চলো থানায়!

মিনিট কুড়ির মধ্যে থানায় এসেই কেদার-বদ্রী ওসি-র সঙ্গে দেখা করল। কেদার ওসি-কে তাঁর ভিজিটিং কার্ড দিয়ে বললেন, আমি কেদার মজুমদার। প্রাইভেট ডিটেকটিভ। আর এ হচ্ছে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট বদ্রীনারায়ণ মুখার্জি।

ওসি বললেন, হ্যাঁ, আপনাদের নাম শুনেছি।

এরপর কেদার-বদ্রী ওসি-র সঙ্গে আধঘণ্টার মতো একান্ত আলোচনা সেরে নিল। ওসি ওদের কোল্ড ড্রিংকস খাওয়ালেন।

বেরিয়ে পড়ল কেদার-বদ্রী। ওখান থেকে সোজা অসীমেশ রায়ের বাড়ি। বাড়িতে তখন সাঙ্ঘাতিক ব্যস্ততা। ওরা বাড়ি ঢুকতেই গৌতম ছুটে এল।

কাকা, কোথায় গিয়েছিলেন? বাবা খুঁজছেন আপনাদের।

আমার এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম।

এই যে কেদার! তোকে খুঁজছি কতক্ষণ ধরে। অসীমেশবাবু চলে এসেছেন ততক্ষণে।

বুঝতেই পারছিলাম, তোরা খোঁজাখুঁজি করবি। তাই ফের এলাম। বললাম না তোকে, আমার এক পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা করতে যাব।

দেখা হয়েছে?

হ্যাঁ, হয়েছে। একটা বিষয়ে তার সঙ্গে আমার দরকারও আছে। ঝট করে স্নানটা সেরে নিচ্ছি। তোদের দুপুরের রান্না কদ্দূর?

সে তোর চান করতে করতে হয়ে যাবে।

কেদার-বদ্রী দ্রুত স্নান-খাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়ল। কেদার অসীমেশ রায়কে বললেন, সন্ধেয় অনুষ্ঠান শুরু থেকে আমরা আছি। মোটে ভাবিস না!

ওরা যখন একই পথে ফের বন্ধ কারখানার পেছনের দিকে চলে এল, ঘড়িতে তখন বেলা তিনটে বারো। এবার ওরা একেবারে তৈরি হয়ে এসেছে। কেদারের পকেটে তাঁর প্রিয় কোল্ট রিভলবার, বদ্রীর পকেটে সেই দু'মুখো ছুরিটা। ওদের আর কি লাগে! এই দিয়েই ওরা কেল্লা মেরে দিচ্ছে।

ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সরু পথ ধরে ওরা সেই কারখানার ভেতরে ঢুকল এবার পা টিপে টিপে। এখন কোনো লোকজন ভেতরে ঢুকে পড়েছে কিনা, কে জানে! ওরা খানিকটা হেঁটে সেই চত্বরে এল। বদ্রী কান খাড়া করে কারো উপস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছিল। না, বোধহয় কেউ নেই। ওরা নিঃশব্দে মেশিনঘরে এল। কেদার আগেরবারই দেখে গিয়েছিলেন। এবার মেশিনঘরের পেছন দিকটায় একটা কোনাচে জায়গার সামনে গিয়ে টর্চের আলো ফেললেন। একটা লোহার চাদর ঘেরা জায়গা। কারখানা চলাকালীন নিশ্চয়ই এর কোনো প্রয়োজনীয়তা ছিল।

টর্চ নেভালেই এই কোণটা বেশ অন্ধকার। বদ্রী বলল, এখানে ডেরা বাঁধা যেতে পারে। জায়গাটায় নোংরা আবর্জনা জমে আছে। বোধহয় এখানটায় কেউ ঢোকে না। কিন্তু—

বদ্রী হঠাৎ চুপ হয়ে যায়। ওর তীব্র শ্রবণশক্তি কিছু শুনতে পেয়েছে। সে ফিসফিস করে বলে, কেদারদা, সাবধান! ওরা আসছে!

কিন্তু ওরা কারা? ওরা ক'জন? কতটাই বা শক্তি রাখে ওরা? কেদার সে-সবই ভাবছিলেন।

পদশব্দ এবার শুনতে পাচ্ছিলেন কেদার। এগিয়ে আসছিল সেই শব্দ। বদ্রীর অবচেতন মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল। কেদার সবরকম বিপদের মোকাবিলা করবার জন্য তৈরি হয়ে রইলেন। পদশব্দ এগিয়ে এসেছে। বদ্রীনারায়ণ উৎকর্ণ। কেদার দারুণ সতর্ক।

বোঝা যাচ্ছিল, লোকগুলো কারখানার ভেতরের চত্বরে এসে দাঁড়িয়েছে। ক'জন লোক? কেদার তাই বোঝার চেষ্টা করছিলেন।

মেন সুইচটা অন করে দে! একজনের গলা পাওয়া গেল।

ঘটাস করে শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে একটা অল্প আলোর বাল্বও জ্বলল। এরপর কয়েকটা সুইচ অন করার পটাপট শব্দ।

মেশিনে কাগজ দেওয়া আছে? সেই একই কণ্ঠস্বর।

হ্যাঁ। আরেকজনের উত্তর পাওয়া গেল।

মেশিন চেক করে নে। সন্ধের আগেই কাজ শেষ করতে হবে।

কেদার-বদ্রী কান খাড়া করে আছে। কতগুলো সুইচ অন করা হল। মেশিন চালুর শব্দ। ভারী মেশিন চললে যেমন গোঁ-গোঁ শব্দ হয়, তেমন শব্দ। ফের সুইচ অফ হল। মেশিন চলতে চলতে থেমে গেল। লোকটা ফের বলল, সব ঠিক আছে?

আছে। দ্বিতীয়জন বলল। তৃতীয় ব্যক্তিরও গলা পাওয়া গেল, মেশিনে কাগজ দেওয়া আছে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। সব রেডি।

ফের সুইচ অন হল। মেশিন চলতে শুরু করেছে। পুরোদমে মেশিন চলছে। তখন শব্দও অনেক কম। কেদার-বদ্রী দু'জনই বুঝতে পারছে, ওদের কাজ শুরু হয়ে গেছে। মেশিন থেকে কাগজ বেরিয়ে আসার খস-খস শব্দ হচ্ছিল।

সময় এগোচ্ছে। আস্তে হলেও একটানা যান্ত্রিক আওয়াজের পাশাপাশি ওদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। একজন বলল, ছাপা মালগুলো ভাঁজ করে কাটিং চ্যানেলে ঢোকা।

কেদার ঘড়ি দেখলেন। ত্রিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে। ওরা যে খুব দ্রুতগতিতে কাজ করছে, তা বোঝা যাচ্ছিল। কেদার বদ্রীকে সতর্ক করে নিজে গাঢ় অন্ধকার কোণ থেকে বেরিয়ে এলেন। উঁকি দিয়ে দেখলেন চালু যন্ত্রটাকে। ওদিকটায় বেশ আলো। মেশিন থেকে ছাপা কাগজগুলো বেরিয়ে এসে পাশেই পাট হয়ে জমছে। একজনের হাত দেখা গেল। হাতে একটা ছুরি। পাট হয়ে পড়ে থাকা ছাপা কাগজের অংশটুকু ছুরি দিয়ে কেটে আলাদা করে সেগুলো তুলে নেওয়া হল। তখনই কেদার সামনের দিকের আলোয় স্পষ্ট দেখলেন ছাপা অংশগুলো। একেবারে স্পষ্ট। মনে মনে বললেন, আমরা কোনো ভুল করিনি। সবই ঠিক আছে।

কেদার আরো একটু এগোলেন। কোনাকুনি তাকিয়ে একজনকে পুরোই দেখতে পেলেন। বদ্রীকে ইশারা করলেন কেদার। বদ্রী অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে মেশিনের পেছনে ডানদিকটায় দাঁড়াল। কেদার বাঁদিকে। কেদার আরো একটু উঁকি দিলেন। দেখলেন, দু'জন সাধারণ গোছের লোক কাজ করছে। আর একজন ষণ্ডা লোক সবটা দেখভাল করছে। সেই লোকটাই বলল এবার, কাগজগুলো সেট হয়েছে?

হ্যাঁ।

কাটিং চ্যানেল চালু কর।

একটা লিভার টানার শব্দ। সঙ্গে সঙ্গেই কটাকট-কটাকট আওয়াজ উঠল। বোঝা গেল, ছাপা কাগজগুলো কাটিং হচ্ছে।

বদ্রী ইশারা করল। আর দেরি করা যাবে না।

কেদার পকেট থেকে কোল্ট রিভলবারটা বের করলেন দ্রুত। তারপর এক লাফে সেই মেশিনের সামনে এসে দাঁড়িয়ে হুঙ্কার দিলেন, হ্যান্ডস্ আপ! যে যেভাবে আছো, সেভাবে দাঁড়াও!

বজ্রপাত হলেও লোকগুলো বোধহয় এমন চমকাত না। সাঙ্ঘাতিক ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে ওরা। কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। কেদার এবার গর্জন করে উঠলেন, মাথার ওপর হাত তোলো! না হলে গুলি করে খুলি উড়িয়ে দেব!

দুটো লোক হাত তুলে দাঁড়িয়ে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। ষণ্ডা লোকটা মুহূর্তের মধ্যে একটা কাণ্ড করে ফেলল। বিকট চিৎকার করে কেদারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কেদার ছিটকে পড়লেন। হাতের রিভলবারটা মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে ছুটে এল বদ্রী। কেদার নিমেষে উঠে পড়েছেন। দারুণ ক্ষিপ্রতায় তিনি ষণ্ডা লোকটার কপাল লক্ষ করে ডান পা ছুঁড়লেন। লোকটা ঝট করে সরে গেল। কিন্তু কেদারের দ্বিতীয় মারটা এসে পড়ল ঘাড়ে। লোকটা শক্তিশালী। মারটা সহ্য করে সেও কেদারকে লক্ষ করে দারুণ একটা লাথি ছুঁড়ল। কেদারের চোখ-কান সজাগ। তিনি দু'পাক ঘুরে গিয়ে ক্যারাটের মোক্ষম কায়দায় শরীরটাকে শূন্যে তুলে জোড়া পায়ে আঘাত করলেন লোকটার বুকে। লোকটা চলতে থাকা মেশিনটার গায়ে গিয়ে পড়ল প্রচণ্ড শব্দে।

সম্ভবত ওখানটাতেই অফ-অন করার সুইচ ছিল। মেশিনের শব্দ থেমে গেল। ষণ্ডা লোকটার বোধহয় শিরদাঁড়াই ভেঙে গেছে। সে যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠছে। তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। জোরে চিৎকার করতে পারছে না। বুক ভরে নিঃশ্বাস নেবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। তাই হাঁপানির টানের মতো শব্দ বেরোচ্ছে গলা দিয়ে।

এই ফাঁকে বাদবাকি লোকদুটো ছুট লাগাল বাইরের দিকে। বদ্রী কেদারের পড়ে থাকা রিভলবারটা হাতে তুলে নিয়েছিল। সেটাই বাগিয়ে ধরে সে চিৎকার করল, খবরদার! পালালেই গুলি করব!

ততক্ষণে ব্ল্যাক বেল্ট ক্যারাটে মাস্টার কেদার মজুমদার বিদ্যুৎগতিতে ছুটে গিয়ে একজনকে পাকড়ে নিয়েছে। তাকে কষিয়ে এক চড়। লোকটা ভিরমি খেয়ে পড়ল মাটিতে। তৃতীয় লোকটা ভয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কেদার-বদ্রীর কতগুলো প্রায়োজনীয় জিনিস সঙ্গে থাকেই। পকেট থেকে নাইলন দড়ি বের

করে কেদার আহত ষণ্ডা লোকটাকে পিছমোড়া করে বাঁধলেন। একে একে বাকি দু'জনকে। কেদার ধীর-স্থিরভাবে বললেন, বদ্রী, বাইরে গিয়ে সিগনাল দে।

বদ্রীনারায়ণ মেশিনঘর থেকে কারখানার চত্বর পেরিয়ে গঙ্গার একদম ধারে এসে হাত নাড়ল।

এ-রকমই কথা ছিল। এবার সে ফের কারখানার ভেতরে ঢুকে পড়ল। কেদার তাঁর রিভলবার উঁচিয়েই দাঁড়িয়েছিলেন। এবার বললেন, বদ্রী, কাটিং হওয়া ছাপা কাগজগুলো নিয়ে আয় দেখি।

বদ্রী কাটিং চ্যানেল থেকে একগোছা কাগজ নিয়ে এল। কেদার তার থেকে দুটো কাগজ নিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। বদ্রী অবাক বিস্ময়ে বলল, একেবারে নিখুঁত! একইরকম দেখতে!

তখনই দুদ্দাড় করে কারখানা চত্বরে ঢুকে পড়ল থানার ওসি সহ ছ'জন বন্দুকধারী পুলিশ। দেখেই কেদার সহাস্যে বললেন, আসুন অমিতবাবু, আপনার থানা এলাকায় লক্ষ লক্ষ টাকা ছাপা হচ্ছে, তার কিছু নমুনা দেখুন।

ওকি কেদারের হাত থেকে সেই ছাপা কাগজগুলো নিয়ে উলটেপালটে দেখলেন। দেখতে দেখতে তাঁর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। তিনি বিস্মিত উক্তি করলেন, ওরে বাবা! এ যে দেখছি একেবারে সত্যিকারের পাঁচশো টাকার নোট!

হ্যাঁ। এই বন্ধ কারখানার ভেতর আধুনিক মেশিন বসিয়ে পাঁচশো টাকার জাল নোট ছাপা হচ্ছে।

বদ্রী বলল, আমরা স্রেফ কৌতূহলী হয়েই এখানে ঢুকে পড়েছিলাম। ঢুকে খুঁজে পেলাম একটা বাতিল কাগজের স্তূপ। তাতে দেখি সব ছেঁড়া-ফাটা দোমড়ানো-মোচড়ানো পাঁচশো টাকার নোট। তার পাশে এত আধুনিক এই ছাপার যন্ত্র। তখনই সন্দেহ হল। তাই ছুটে গেলাম আপনাদের কাছে। ফার্স্ট রাউন্ডের অপারেশন কিন্তু বেশ তাড়াতাড়িই সাকসেসফুল হয়েছে।

কেদার সেই কথায় খেই ধরে বললেন, এদের অ্যারেস্ট করার ব্যাপারটা গোপন রাখুন। দেখুন, আর কোনো হুলো বেড়াল খোঁজ নিতে আসে কিনা। জাল পেতে রাখুন। শিকার ঠিক আসবে।

সেই তিনজনকে নিয়ে ওসি কারখানা থেকে চুপচাপ বেরিয়ে গেলেন। সমস্ত জাল নোট আর কাগজপত্র সবই তুলে নেওয়া হল। রইল ছাপাযন্ত্রটা।

যাবার আগে ওসি অমিতকিরণ ঘোষাল কেদারকে বললেন, থানায় আসুন না একবার!

না না। আজ আর যাব না। আজ সন্ধে থেকে বিয়েবাড়িতেই থাকব। বন্ধুর মেয়ের বিয়ে, খেতে এসেছি। সেটাও তো দেখতে হবে! কেদার বললেন।

বদ্রীনারায়ণ বলল, আপনারা ইনভেস্টিগেশন করতে থাকুন অমিতবাবু। দরকার পড়লে খবর দেবেন।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ কেদার-বদ্রী অসীমেশ রায়ের বাড়িতে ঢুকে পড়ল। দেখা গেল, বিয়েবাড়িতে অতিথি-অভ্যাগতদের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে। গৌতম দেখে ছুটে এলে।

কি কাকাবাবু, আপনার বন্ধুর সঙ্গে কাজকর্ম মিটল?

হ্যাঁ। এবার একদম ফ্রি। এখন থেকে আছি তোমাদের সঙ্গে।

অসীমেশবাবু এসে বললেন, তোদের ঘরে টিফিন পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোরা ফ্রেশ হয়ে নে। সন্ধেতেই বিয়ের লগ্ন। আমাকে তো সেখানে থাকতে হবে।

কেদার বললেন, কোনো চিন্তা করিস না অসীম। আমরা এবার আছি সারাক্ষণ।

[ভাদ্র ১৪১১]

শয়তানের শেষ অভিযান

বরুণ দত্ত

প্রথমে ট্রেন, তারপরে বাস এবং অবশেষে নৌকোয় খেয়া পার হয়ে সুদেব যখন মামার বাড়ির গ্রামে পৌঁছুল, তখন সন্ধ্যা হয় হয়।

সুদেবের বয়স যদিও কৈশোরের সীমা পেরোয়নি, তবু তার মনে নানা যুক্তি-তর্ক-জিজ্ঞাসা। সব কিছু জানার ও বোঝার জন্য দারুণ কৌতূহল। এজন্য মামাবাড়িতে সুদেবের সমাদরও যথেষ্ট।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পরে বসল গল্পের আসর। তার অনেক আগেই চারদিক নিঃঝুম হয়ে পড়েছিল। কেমন যেন একটা ভয়-ভয় ভাব সেই গ্রাম্য রাতের অন্ধকারে।

দিদা, মামীমা, মামা—সকলের কাছে একই রকম বর্ণনা শুনে সুদেব ভাবতে থাকল ঘটনাটা কি হতে পারে! ভূত বলে তো আর সত্যি সত্যি কিছু নেই, তাছাড়া 'নিশি', 'অতৃপ্ত আত্মা' এসব প্রচলিত কথাগুলোও যুক্তি-তর্কে টেকে না। কিন্তু যা ঘটে চলেছে, তাকেও অস্বীকার করা যাচ্ছে না সম্পূর্ণভাবে। বিশেষ করে বিভিন্ন রাতের ঘটনা বর্ণনা করতে করতে মেজমামা থেকে বড়মামার বড় ছেলে দীপনদাদা পর্যন্ত সকলের চোখেমুখে ফুটে উঠেছিল ভয় এবং অসহায়তা।

সুদেব ছাদের চিলেকোঠায় একা শুতে চাইলে ওঁদের সবার চোখ কপালে উঠল। একযোগে সবাই বললেন, 'না। তা হবে না। দস্যি ছেলে, তুমি কালই ফিরে যাও কলকাতায়। নাহলে কি হতে কি ঘটিয়ে বসবে!'

সুদেব অবাধ্য হতে পারল না বড়দের কথায়। শুতে এলো দীপনদাদার সঙ্গে একই বিছানায়, দোতলার ঘরে। কথা বলতে বলতে দীপনদাদা একসময় হারিয়ে গেল ঘুমের দেশে। সুদেবের কিন্তু ঘুম আসছে না কিছুতেই। পুরনো আমলের বিশাল দেওয়াল ঘড়িতে একটা শব্দ হলো ঢং করে। সুদেব ঘড়ি দেখল টর্চ জ্বেলে—সাড়ে বারোটা। পাশ ফিরে শুল, ঘুম আসছে এবার। সারাদিন ধকলটা তো কম যায়নি শরীরের উপর দিয়ে।

সবেমাত্র দু' চোখের পাতা এক করেছিল সুদেব, ঠিক তখনই শুনতে পেল সেই শব্দ—শক্ত মাটিতে খড়ম পায়ে কেউ যেন হেঁটে চলেছে। রাতের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিচ্ছিল সেই শব্দ।

গ্রামের আরাধ্য দেবতা বাবা পঞ্চাননের মন্দিরের দিক থেকে শব্দটা উঠে ক্রমশ স্পষ্ট ও কাছাকাছি হতে হতে একসময় আবার পুবদিকে গ্রামের শেষ সীমা খেয়াঘাটের দিকে চলে গেল। ক্রমে মিলিয়েও গেল। এর পরে অন্তত এক ঘণ্টা জেগে থেকেও আর কোনো শব্দ পেল না সুদেব। নানা চিন্তা ভিড় করে আসছিল ওর মাথায়।

পরদিন বেশ দেরিই হলো ঘুম ভাঙতে। দিদা জানতে চাইলেন, 'শরীর-টরীর খারাপ হয়নি তো ভাই?'

সুদেব তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না, না, দিদা। এমনিই একটু দেরি করে উঠলাম। কলকাতায় স্কুলের জন্য তো রোজই তাড়াতাড়ি উঠতে হয়। এখানে এসে তাই একটু আরাম করে নিচ্ছি।'

'তা হ্যাঁরে, কাল রাতে তোরা দুটিতে তো অনেকক্ষণ গল্প করছিলি, কোনো শব্দ-টব্দ শুনিসনি?'

'না তো দিদা!' চটপট উত্তর দিল সুদেব। উদ্দেশ্য দিদাকে সত্যি কথা বলবে না। কিন্তু যেভাবেই হোক আজ রাতে ওকে ছাদে থাকতেই হবে। বৃথা সময় নষ্ট করা চলে না। ঐ একটা অজানা শব্দ গ্রামের সকলকে ভয়ে পঙ্গু করে দিয়েছে।

দিদা ওর মনের কথা টের পান না। তাই বললেন, 'কিন্তু ভাই, আমরা তো শুনেছি!'

'ও বোধহয় হাওয়ায় বাঁশবনে গাছে গাছে ঘষটানির শব্দ।' ব্যাপারটা চাপা দিতে চায় সুদেব। কিন্তু দিদার মুখের দিকে চেয়ে বুঝল যে দিদা ওর উত্তরে খুশিও হননি, বিশ্বাসও করেননি।

সেদিনই দিদার অলক্ষ্যে ছাদের দরজার চাবিটি হস্তগত করল সুদেব। এবং মনে মনে তৈরি হয়ে থাকল সেই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। দীপনদাদা ঘুমিয়ে পড়তেই খুব সাবধানে মশারি সরিয়ে বিছানা থেকে নেমে নিঃশব্দে ছাদে উঠে এল। তালা খোলার সময় একটু ভয় ভয় করছিল, পাছে শব্দ হয়! না, দারুণ সাক্‌সেসফুল হয়েছে সুদেব প্রথম চেষ্টাতেই। নিঃশব্দে খুলে ফেলল দরজাটা।

ছাদের উপরে পা ফেলতে থাকল আরও সাবধানে। আকাশে একফালি চাঁদ, হালকা বেশ মিষ্টি বাতাস মধ্যরাতের পরিবেশকে মায়াময় করে তুলেছে। ছাদের কোনোদিকেই তেমনভাবে পরিষ্কার নয়—জামরুল, সবেদা, আম, বেল, কাঁঠাল গাছের জটলা সব দিকেই। তবু তার মধ্য দিয়ে দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ করে তুলল সুদেব পঞ্চাননতলার দিকে।

অধীর প্রতীক্ষা। কলকাতার মতো মশার উপদ্রব নেই, তাই রক্ষে, নাহলে এতক্ষণে তার প্ল্যানই ভেস্তে যেত। কালকের মতো ঠিক একটা ঘণ্টা বাজল দোতলার ঘড়িতে, এটা রাত একটার শব্দ। সচকিত হলো, উৎকর্ণ হলো সুদেব। টের পেল ভেতরে ভেতরে সে নিজেই বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠছে।

অনেক চেষ্টায়, অনেক কষ্টে, গাছগাছালির আঁকাবাঁকা ছায়ায় দেখল একজন দীর্ঘদেহ মানুষ পঞ্চাননতলার পিছনের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে প্রথমে যেন একটু থমকে দাঁড়াল। শব্দটাও তখন নেই। থমকে থেমে কিছু বুঝি যাচাই করে দেখছিল সেই ছায়ামূর্তি। তারপর হেঁটে চলল খেয়াঘাটের পথের দিকে। অমনি আওয়াজ উঠল খট.....খট.....খট।

সুদেব নিজের চোখকে সইয়ে নেবার আগে পর্যন্ত ভেবেছিল ক্ষীণ জ্যোৎস্নায় গাছগাছালির ছায়া কেঁপে কেঁপে উঠছে, তা থেকেই একটি মনুষ্যদেহের আকার নিচ্ছে। এই আলো-আঁধারিতে কত মানুষ তো ভয় পেয়েছে, ভূত দেখেছে! সে যাই হোক, সুদেব নিজের চোখ-কানের উপর নির্ভর করে ছাদের রেনপাইপ বেয়ে তরতর করে নামল বেশ ঝুঁকি নিয়ে। তারপর যতদূর সম্ভব দ্রুতপায়ে খুব সাবধানে এগোতে থাকল শব্দের পিছু পিছু। শব্দটা কিন্তু মাটি থেকে বেশ কিছুটা উঁচুতে হচ্ছে! শব্দ হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু শব্দের উৎস কি তা ধরতে পারছে না। আরও একটা বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, সব পথটা তো ইটবাঁধানো নয়, তবে কি করে অমন কঠিন শব্দ উঠছে!

হঠাৎ চমকে উঠল সুদেব। যাকে আবিষ্কার করে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল ও, সে গেল কোথায়? খেয়াঘাটে নৌকোটা তো বাঁধাই রয়েছে, জলও নিস্তরঙ্গ! তবে কি সুদেব যে তাকে এভাবে অনুসরণ করছে তা বুঝতে পেরে কোনো ঝোপঝাড়ে ঢুকে পড়ে ওকেই লক্ষ্য করছে!

গ্রামের মানুষরা, বিশেষ করে প্রাচীনরা, বড় বেশি দৈবনির্ভর, ভয়ই তাঁদের ভক্তির কারণ। আর তাই বিভিন্ন সময়ে এঁরা ঠকেনও কিছু লোভী মানুষের ছল-চাতুরির কাছে।

আশাহত হয়ে সুদেব শেষ পর্যন্ত ফিরে এল বিছানায়—একই পথে, একই পদ্ধতিতে। তখন তার শরীর ভেঙে পড়ছে ক্লান্তিতে। তবু সে তার বিশ্বাসে দৃঢ় হলো—এ রহস্য উদঘাটনে সক্ষম হবেই।

পরদিন আর একটু হলেই সুদেব ধরা পড়ে যাচ্ছিল দিদার কাছে। কোনোরকমে পালিয়ে বাঁচল। নাহলে দিদার জেরার মুখে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও হয়তো সত্যি কথা বেরিয়ে পড়ত। কারণ মিথ্যে কথায় অভ্যস্ত নয় সুদেব। প্রয়োজনে তাই নীরব থাকে তেমন হলে।

এই দেড়দিন সুদেব গ্রামের কারুর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেনি, সে যে গ্রামে এসেছে তাই-ই বুঝতে দেয়নি। কিন্তু আজ সারাদিন যেন ব্যস্ত নেতার মতোই জনসংযোগ করল সাহসী ক'জন সমবয়সী

বন্ধুদের সঙ্গে। তাদের সঙ্গে ঘুরল বনজঙ্গল, মন্দির, খেয়াঘাট, খেলার মাঠ, নদীর পাড়ের শ্মশান পর্যন্ত। সবাই দেখল সান্যালদের ডানপিটে ভাগ্নে সুদেব গ্রাম দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তার বন্ধুদের সঙ্গে। এই বলছে ফিস্ট করবে, এই বলছে এবার গাজনে যাত্রা করবে, তার রিহার্সালের জায়গা কে দেবে বলো?

ছেলেটা বড় ভাল। তাই তার এসব হুজুগে কেউ কখনও বিরক্ত হয় না—বরং খুশিই হয়। শুধু কি তাই! এ বাড়িতে ডেকে চা-ওমলেট খাওয়ায় তো আর এক বাড়িতে দুপুরে খাবার নিমন্ত্রণ। আর তাকে কোনো আপত্তি বা সংকোচ নেই সুদেবের। শুধু দিদার অনুমতিটুকু ছাড়া আর কোনো বাধা নেই তার।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া বেশ ভালই হয়েছে, হয়েছে কিঞ্চিৎ দিবানিদ্রাও। সুতরাং বিকেল বিকেল খুশমেজাজে সুদেব আবার বেরিয়ে পড়ল গ্রাম পরিক্রমায়। খুঁজে খুঁজে দেখল খড়মের দাগ কোথাও কোথাও আঁকা আছে মাটির বুকে। পুরোহিত নাকি সবাইকে সাবধান করে বলেছেন, 'শব্দ শুনে কেউ বাইরে যাবে না। কিছু অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য দেখলেও চিৎকার করবে না। তাতে সাংঘাতিক ক্ষতি হতে পারে, এমনকি দৃষ্টিশক্তি পর্যন্ত হারাতে হতে পারে।'

পুরোহিত ঠাকুরের দীর্ঘ ঋজু চেহারা, চোখ দুটি বিশাল, নাক-মুখ কাটা কাটা, কেউ তাঁর মুখের দিকে সোজা তাকাতেই পারে না। সুতরাং তাঁর সঙ্গে কেউ তর্কে যেমন যাচ্ছে না, অবিশ্বাসও করছে না। তাই একটা ভয় এবং অজানা প্রশ্নে মানুষের মন রাতের দ্বিতীয় প্রহরের পর থেকেই ভারী হয়ে ওঠে।

ক্রমে মানুষের মন জিজ্ঞাসায় ভরে উঠতে থাকে। বাতাসে ছড়াতে থাকে কত না সম্ভব-অসম্ভব কাহিনী। এই সময়েই সুদেব এসে জমিয়ে বসেছে মামাবাড়িতে। তার বাউণ্ডুলে স্বভাব আর দস্যিপনা নিয়ে দিদার তাই সারাক্ষণ চিন্তা।

সেদিন রাতে পূর্বব্যবস্থামতো চারিদিকে সতর্ক ও সাহসী প্রহরা চলছে খুবই সন্তর্পণে। নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেছে অনেক আগেই, তবু শোনা যাচ্ছে না সেই বিশেষ শব্দ। চাঁদের আলোছায়ায় এগিয়ে যাচ্ছে না কোনো সাদা কাপড় পরিহিত দীর্ঘ দেহ।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে শোনা গেল সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত ও বিশেষ শব্দ। কিন্তু দৃষ্টিতে ধরা পড়ছে না কোনো ছায়ামূর্তি বা কিছুই।

পলকহীন সুদেবের দৃষ্টি, কান তার সজাগ, বুকে উৎকণ্ঠার ধুকপুক শব্দ। অধৈর্য হয়ে খুবই সাবধানে পা টিপে টিপে এগোতে থাকল সে। এতদিনের পরিকল্পনা, হিসেব-নিকেশ, আশা কি মিথ্যে হবে! তাহলে যে ভবিষ্যতে আর ওকে বিশ্বাস করবেন না শিবসুন্দর।

ভয় কিছুটা ছিল, যদি ছুরি মেরে দেয় বা চালিয়ে দেয় পিস্তল! কিন্তু উত্তেজনায় এসব কিছুই নিরস্ত করতে পারল না সুদেবকে। সামান্য শব্দেই সচকিত হয়ে দেখল কালো একটা ছায়া প্রায় পৌঁছে গেছে খেয়াঘাটে।

সুদেব দিকবিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে যান্ত্রিক গতিতে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ছায়ামূর্তির উপরে। জাপটে ধরল কালো আলখাল্লায় ঢাকা গ্রামের সহজ-সরল মানুষগুলোর এতদিনের আতঙ্কের জীবটিকে। এবং ঠোঁটে চেপে ধরা বাঁশিও বাজিয়ে দিল প্রাণপণ শক্তিতে।

সুদেবকে কাহিল করে প্রায় উঠে পড়েছিল রাতের অজানা অতিথিটি, কিন্তু ততক্ষণে চারিদিক থেকে জ্বলে উঠেছে ছ'-সাতটা টর্চের জোরালো আলো। শুধু তাই নয়, সুদেবের পূর্বনির্দেশ মতো দুজন মূর্তির চোখের উপরে ধরে রাখল টর্চের তীব্র আলো। ফলে অজানা সেই অতিথির সব চেষ্টাই ব্যর্থ হলো।

প্রকাশ পেল সব কথা। গ্রামের পুরোহিতকে সকলে সন্দেহ করলেও, তিনি প্রকৃত দোষী নন, প্রাণের ভয়ে বাধ্য হয়ে কিছুটা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলেন মাত্র।

ক্রমে জানা গেল সেই আসল দোষী একজন পুরাতত্ত্ববিদ্, শিক্ষিত, জানে দেশি-বিদেশি অনেকগুলো ভাষা। কিন্তু পুরাতত্ত্ব সম্পদের চোরাই ব্যবসা তার বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে আছে। তার নেশা ও পেশা হচ্ছে

গ্রামে-গ্রামান্তরে, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শহরে, তীর্থে, ভগ্ন পরিত্যক্ত মন্দিরে ঘুরে বেড়ানো এবং সময় বুঝে সেখানকার পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো আত্মসাৎ করা। সহজ পথে না হলে বাঁকা পথে নিতেও সে পিছপা হতো না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসে ডুবতে বাধ্য হলো এই গোষ্পদে! কোনোভাবেই কল্পনা করতে পারেনি যে এই সুদূর গ্রামে সে মাত্র তিন-চার মাসের মধ্যেই ধরা পড়ে যাবে, তাও কাজ সম্পূর্ণ করার আগে।

হিসেবমতো দেখা যাচ্ছে সুদেবের মামাবাড়ির গ্রামের এই মন্দিরটির বয়স কমবেশি একশো ষাট বছর। পর পর তিন বছর গাজনের মেলায় দর্শক হয়ে এসে ঐ বহিরাগত সব হিসেবই সংগ্রহ করে নিয়েছিল আগে। তারপর গ্রামের মানুষকে ভূতের ভয় দেখিয়ে কাবু করে তবেই হাত দিয়েছিল 'অপারেশনে'। কিন্তু এত করেও শেষ রক্ষা হলো না।

শহর থেকে এতদূরে, এমন শান্ত গ্রাম্য পরিবেশেও যে কোনো পুরাতাত্ত্বিক চোরের দৃষ্টি পড়তে পারে তা শুনে গ্রামের শিক্ষিত মানুষরাও প্রায় বোবা হয়ে রইলেন, বিস্ময়ের ঘোরে। কিন্তু শত জেরার মুখেও সে নিজের নাম 'শয়তান' ছাড়া আর কিছুই বলল না।

'শয়তান'-কে নিয়ে শিবসুন্দর তাঁর দলবলকে রওনা করে দিয়েছেন শহরের পথে। তারপর সমবেত জনতার সামনে দাঁড়িয়ে বিবৃত করলেন উপরের কাহিনী। পরে বললেন, 'এই সফলতা সম্ভব হয়েছে একটি কিশোরের অদম্য কৌতূহল ও অবিশ্বাস্য সাহসিকতায়। এই কেসটি নিয়ে ঐ কিশোর মোট তিনটি কেসে সম্পূর্ণ সফল হলো। কিশোরটি কে, আশা করি তা আপনারা সকলেই অনুমান করতে পারছেন। এখনও সে ছাত্র। ছাত্র হিসেবেও সে দারুণ মেধাবী। ভবিষ্যতে সে আমাদের এই পেশায় আসতে আগ্রহী। পরিণত বয়সে সে যে একজন সফল ও বিখ্যাত গোয়েন্দা হবে, এ বিষয়ে আমরা একশো ভাগই নিশ্চিত।

'এই দেখুন শয়তানের হালকা সহজ যন্ত্রটি—যা দিয়ে এতদিন সে আপনাদের আতঙ্কিত করে রেখেছিল।' বলে শিবসুন্দর ছোট্ট দুটি যন্ত্র দেখালেন। সবাই সে ক্ষুদ্র যন্ত্র দেখে এবং তা থেকে সৃষ্ট শব্দ শুনে বিস্ময়ে হতবাক।

স্বনামধন্য গোয়েন্দা শিবসুন্দর এবার সেই সব কিশোর-যুবকদের সঙ্গে সহাস্য করমর্দন করলেন যারা সুদেবের এই সফলতার সঙ্গী হয়েছিল জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। সব শেষে হাত বাড়িয়ে দিলেন সুদেবের দিকে। চোখে-মুখে তখন তাঁর প্রশংসা ও প্রশ্রয়ের হাসি। তারপর বিদায় নেবার আগে বলে গেলেন, এই মন্দিরের সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা তিনি করবেন, এবং অনতিবিলম্বেই।

এক বিশাল জনতা খেয়াঘাট পর্যন্ত এসে শিবসুন্দরকে আন্তরিক ও সশ্রদ্ধভাবে বিদায় জানাল। সুদেব ও শিবসুন্দরের চোখে চোখে কথা হলো। সুদেব সকলের কান বাঁচিয়ে দৃষ্টি এড়িয়ে বলল, 'কলকাতায় ফিরেই আমি আপনার কাছে যাব পরবর্তী নির্দেশের জন্য।'

[অগ্রহায়ণ ১৪০৫]

অনুতোষের অন্তর্ধান

শচীন দাশ

প্রায় ছুটতে ছুটতে স্টেশনে এসেই ট্রেনটা ধরতে হলো। এমন যে হবে আগে বুঝতে পারিনি। বেরিয়েছি তো কত তাড়াতাড়ি। ট্রেনের সময়েরও প্রায় আড়াই ঘণ্টা আগে। ভেবেছিলাম, বাড়ির সামনেই বাস স্ট্যান্ড। আস্তে ধীরে বাসে বসে একসময় হাওড়ায় পৌঁছোলেই চলবে। তারপর টিকিট কেটে আর ট্রেনে উঠতে কতক্ষণ!

কিন্তু বাড়ি থেকে বেরোতেই সব হিসেবে গোলমাল হয়ে গেল। বাস স্ট্যান্ডে বাস নেই। হাওড়ার দিকে নাকি প্রচণ্ড জ্যাম। তাই বাস কখন আসবে ঠিক করে বলা যাচ্ছে না। অগত্যা হাতের পাঁচ ট্যাক্সি। এদিকে-ওদিকে দেখতে দেখতে একটা যোগাড় হয়ে গেল। কিন্তু দরজা খুলে উঠতেই ড্রাইভার ভুরু কোঁচকালো।

যাচ্ছেন তো, কিন্তু হাওড়া ব্রিজ ধরে যেতে গেলে আজ আর পৌঁছোতে পারবেন না। তার চেয়ে আমি বলি বাবুঘাট থেকে লঞ্চ-এ পার হয়ে যান। ঠিক সময়েই ট্রেন ধরতে পারবেন।

বুদ্ধিটা মন্দ নয়। অতএব তাই হলো। অন্তত শেষ সময়ে হলেও ছুটতে ছুটতে এসে তবু ট্রেনটা ধরতে পারলাম।

কিন্তু ট্রেনে উঠতেই অবাক। লোক কোথায়! অত বড় একটা কামরায় চার-পাঁচজন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে!

অনুতোষ ঠিকই বলেছিল, এ সময়টায় এ ট্রেনে তেমন ভিড় হয় না; দরকার হলে শুয়ে শুয়েও আসতে পারবি। তবে দেখিস ঘুমিয়ে পড়িস না; ট্রেন কিন্তু ঠিক রাত ন'টায় বাঁকুড়ায় পৌঁছোবে।

তা যে পৌঁছোবে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, যেমন কাঁটায় কাঁটায় ঘড়ি ধরে ছাড়ল। ভাবলাম, ঘুমিয়ে তো পড়বই না, উপরন্তু শুয়েও যাবো না। নতুন জায়গা, যাইনি কোনোদিন—জানলার পাশের সীট যখন খালি আছে দেখতে দেখতেই যাবো।

বেশ ভালো দেখে একটা জায়গায় বসে পকেটের রুমালটা টেনে আনলাম। অনেকটা ছুটতে হয়েছে, তাই এই শীতেও ঘামছি আমি। ভালো করে চেপে চেপে ঘামটা মুছতেই হঠাৎ কে যেন আমাকে ডেকে উঠল।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই অবাক হলাম।

অনুতোষ!

এ কীরে! তুই এখানে? কর্মক্ষেত্রে ফিরে যাস্‌নি!

কর্মক্ষেত্র মানে, অনুতোষের অফিস বাঁকুড়ায়! বছর দুই হলো ওখানে ট্রান্সফার হয়ে গেছে সে। আর গিয়ে অবধি আমাকে অসংখ্য চিঠি দিয়েছে আর প্রতি চিঠিতেই অনুরোধ জানিয়েছে একবার অন্তত আমি যেন বাঁকুড়া থেকে ঘুরে আসি।

অনুতোষ অনুরোধ জানাত আর আমিও প্রতি চিঠিতে জবাব দেওয়ার সময় জানাতাম, এবারে যাবো.....এই যাচ্ছি—কিন্তু যাবো যাচ্ছি করেও যখন যেতে পারিনি এ দু'বছরে তখন অনুতোষের দিক থেকে যেন উৎসাহ কমে গেল। অনুতোষ আসত; কলকাতায় এসেই আমার সঙ্গে দেখা করত কিন্তু

যাবার কথা আর বলত না। শেষে আমিই, এই সেদিন ও কলকাতায় এলে দিন-তারিখ দিয়ে বলেছিলাম, এবার আমি সত্যিই যাচ্ছি। স্টেশনে যেন ও দাঁড়িয়ে থাকে।

আমার কথায় অনুতোষ লাফিয়ে উঠেছিল। আমি যাবো বলাতে ও জানিয়েছিল, ওকে আগে যেতেই হবে। না হলে আমাকে নিয়েই একসঙ্গে যেত সে। যাক্‌গে, তার জন্য কোনো অসুবিধে হবে না। সব কিছু বুঝিয়ে দিয়ে আমাকে বলেছিল, বাঁকুড়া স্টেশনে সে ঠিক দাঁড়িয়ে থাকবে। রাত ন'টায় ট্রেন ঢুকবে। আর ট্রেন থেকে নেমেই আমি ওকে দেখতে পাবো।

তা এই কথাই তো ঠিক হয়েছিল; হঠাৎ এর ভেতরে আবার কী ঘটল! তবে কি কোনো কারণে অনুতোষের যাওয়াও পিছিয়ে গেছে! আগের তারিখের বদলে সে আজই রওনা হয়েছে! কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো অনুতোষ আমাকে একটা খবর দিত। একই সঙ্গে আড্ডা মারতে মারতে তাহলে যাওয়া যেত।

কিছুই বুঝতে না পেরে একটু অবাক হয়ে তাকাতেই অনুতোষ হাসল। আমার সামনের জানলার পাশের সীটটায় বসে পড়ে বলল, খুব অবাক হয়েছিস, তাই না? আসলে বাড়িতে মায়ের অসুখের জন্যই আমার যাওয়াটা পিছিয়ে গেল।

মনে মনে এবারে একটু আহত হলাম। বেশ ক্ষোভের সঙ্গেই জানালাম, কিন্তু তাই বলে একটা খবরও দিতে পারলি না? দেখা না হলে তো আলাদা আলাদাই যেতাম।

অনুতোষ দেখি মিটিমিটি হাসছে, হ্যাঁ, খবর একটা দিতে পারতাম। তবে ইচ্ছে করেই দিইনি—

ইচ্ছে করে!

হ্যাঁ—অনুতোষ তখনো তেমনি হাসছে, কেন জানিস? কথা দিয়েও তো এ-দু'বছরে তোর যাওয়া হয়নি, তাই ভাবলাম আজ দেখি তুই কেমন সত্যি সত্যিই কথা রাখিস।

এবারে আমি না হেসে পারলাম না। সত্যি, অনুতোষটা এখনো তেমনি আছে। ছেলেবেলা থেকেই ও এরকম। যখন আমরা সবই একদম বোবা হয়ে গেছি, কী করবো কিছুই বুঝতে পারছি না, সেই সময়ে সবাইকে অবাক করে দিয়ে অনুতোষই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে।

এখনও দিল।

আমি বললাম, যাক্ গে এ-একরকম ভালোই হলো। বেশ কথা বলতে বলতে যাওয়া যাবে।.....তোর মা কেমন আছেন?

এখন ভালোই। সেজন্যই তো দেরি হয়ে গেল।

অনুতোষ জানলার বাইরে মুখ রাখল।

ডিসেম্বরের বেলা। দিন ছোট। একটু আগে যে সূর্য পশ্চিম আকাশে লাল খুনি রঙ ছড়িয়ে বিদায় নিচ্ছিল এখন সেখানে গাঢ় অন্ধকার। বাইরে গাছপালাও ভালো চোখে পড়ে না।

বেশ ঠাণ্ডা লাগছিল। আমার দিকের জানলার কাচটা নামিয়ে অনুতোষকে বললাম, তোর দিকেরটাও নামিয়ে দে অনুতোষ। ঠাণ্ডা আসছে।

ধুস্। ঠাণ্ডা কোথায়! আমার তো ভীষণ গরম লাগছে। গায়ে বোধহয় ফোস্কা পড়ে গেল। এই দেখ—দেখ—

বলতে বলতে জামার হাতার বেশ খানিকটা তুলে আমার দিকে হাতটা বাড়িয়ে ধরল অনুতোষ।

আর তাকাতেই আমি চমকে উঠলাম।

অনুতোষের বাহুতে ছোট ছোট আঙুরের মতো দু'তিনটে ফোস্কা।

এ কীরে, ডাক্তার দেখাসনি!

হুঁ। দেখিয়েছি। ওষুধ খেতে দিয়েছে। লাগাবার মলমও দিয়েছে। কিন্তু কিছুতেই কমছে না। এবার ভাবছি—

কী ভাবছে আর জানা গেল না। তার আগেই একজন হকার এসে কাছে দাঁড়াল।

অনুতোষ বলল, মুড়ি খাবি, ঝালমুড়ি—

বলেই হকার-এর দিকে তাকাল, এই যে এখানে দেখি,....ঝাল কিন্তু কম করেই দিও।

মুড়িওয়ালা মাথা নেড়েই তার মুড়ি নামাল। ট্রেন ততক্ষণে ফুলেশ্বরে দাঁড়িয়েছে।

জানলা দিয়ে একবার তাকিয়ে, স্টেশনটা দেখে অনুতোষ জানাল, বুঝলি আমার আর ওখানে ভালো লাগছে না; কবে যে আবার কলকাতায় আসতে পারবো—

বিষণ্ণ হয়ে আমার চোখে চোখ রাখল অনুতোষ। আর সেই সময়েই আমি চমকে উঠলাম। অনুতোষের চোখের ভিতরটায় যেন মণি নেই; শুধুই অন্ধকার। কিন্তু তাও এক ঝলক মাত্র; পরেই আবার চোখের সেই বিষণ্ণতা ফিরে এল।

এমন সময় ঝমঝম করে শব্দ উঠলো। অনুতোষ ও আমি—আমরা দু'জনেই বাইরে তাকালাম। আধো অন্ধকার। আধো আলো। তারই ভেতর দিয়ে ট্রেন ছুটছে এখন রূপনারায়ণের ওপর দিয়ে।

অনুতোষ লাফিয়ে উঠল।

আরে কোলাঘাট! আমরা একবার পিকনিকে এসেছিলাম মনে আছে?

থাকবে না আবার! ইলিশ না পেয়ে তুই তো জেলেদের নৌকায় চলে গিয়েছিলি।

আমি না গেলে তোরা কি সেদিন ইলিশ পেতিস নাকি?

তা অবশ্য ঠিক। শুধু ইলিশ কেন, এমনি যে কোনো ব্যাপারে, যে কোনো দিকে আমরা কোনো সমস্যায় পড়লেই জানি ঠিক সময়মতোই এসে হাজির হবে অনুতোষ। আমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করবে। তাছাড়া ছেলেবেলা থেকেই আমরা একসঙ্গে পড়াশোনা করেছি, বন্ধুত্বটা সেজন্য আমার সঙ্গেই প্রবল।

মুড়িওয়ালাকে পয়সা দিতে যাচ্ছিল, হাত বাড়িয়ে অনুতোষকে বাধা দিতে গিয়েই চমকে উঠলাম। এ কী—! অনুতোষের হাত দুটো এত ঠাণ্ডা কেন! যেন বরফের ভেতরে ঢুকিয়ে রেখেছিল অনেকক্ষণ। তাতেই হাত দুটো এত ঠাণ্ডা আর শক্ত।

কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই অনু জানাল, কী হলো, অবাক হলি! আসলে ভয়ে আমার হাত-পা এমনি ঠাণ্ডা মেরে আসছে যে তোকে কী বলব!

কেন? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

তবে খুলেই বলি—

বলে অনু আরও আমার দিকে ঝুঁকে পড়ল। আর তখুনি কেমন একটা গন্ধ ভেসে এল আমার নাকে। গন্ধটা ওষুধের।

অনুতোষ বলল, বাড়ি থেকে বেরোবার সময়ই হঠাৎ একটা হাঁচির শব্দ কানে এল। ব্যস, তখন থেকেই মনটা খুঁত খুঁত করছিল। ভাবছিলাম, আজ ভালোয় ভালোয় পৌঁছোতে পারলে হয়। রাস্তায় না দুর্ঘটনায় পড়ি—

ধুর, ওসব তোর কুসংস্কার—

না রে, না—অনুতোষ কাতর গলায় বলে উঠল, রাস্তায়ও বেরোলাম, সঙ্গে সঙ্গে একটা বাস প্রায় ঘাড়ের ওপরে.....

ইস্, সে কী—

হ্যাঁরে, একদম গায়ের ওপর দিয়ে চলে গেল। তবে হ্যাঁ, মারা যে যাইনি এই রক্ষে—

অনুতোষ খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠল।

ইস্! কী বিচ্ছিরি হাসিটা! এমন তো হাসতো না ও কোনোদিন! কী জানি, হয়তো বাইরে গিয়েই এসব ওর পাল্টেছে। আমি চোখ ফেরালাম।

গাড়ি দাঁড়াল এসে মেদিনীপুরে। জানলার শার্সিটা একটু তুলে ধরলাম। সঙ্গে সঙ্গে ছোবল মারল এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া।

কিন্তু অনুতোষ জানলা খুলে তেমনি নির্বিকার।

একসময় আমি একটা সিগেরেট ধরালাম। কিন্তু দেশলাইটা জ্বালাতেই সে চেঁচিয়ে উঠল, এ কী—না—না, না.....,

অনুতোষ দাঁড়িয়ে পড়েছে। মুখ-চোখে ভীষণ ভয়। ওর ভয়ার্ত মুখটা দেখে আশেপাশের সীটের দু'চারজনও এগিয়ে এল।

আমি বললাম, কী হয়েছে অনু?

অনুতোষ বসে পড়ল; মুখের ওপরে দু'হাত দিয়ে ঢেকে বলল, একটু আগুন.....ব্যস, আগুনটা তারপর—

ব্যাপারটা মাথায় ঢুকল না। দেশলাইটা ততক্ষণে পকেটে রেখেছি। সিগারেটটাও যথাস্থানে। ঠিকঠাক রেখে শুধু অনুতোষকেই লক্ষ্য করছি। ট্রেন এর মধ্যে ফেলে এল আরও কয়েকটা স্টেশন। রাত প্রায় আটটা চল্লিশ।

বিষ্ণুপুর আসতেই অনুতোষ উঠে দাঁড়াল। এবারে দরজার কাছে দাঁড়াই। দেখতে দেখতে তো বাঁকুড়া এসে যাবে—

দেখতে দেখতেই বাঁকুড়া এসে গেল একসময়। দুই বন্ধুতে স্যুটকেস নিয়েই নামলাম। একটু হেঁটে একটা রিকশয় তুলল অনুতোষ। রিকশটা লাল কাঁকরের রাস্তা ধরে এগোল।

যদিও রাত বেশি নয়, সবে ন'টা। কিন্তু প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় রাস্তা তাই সুনশান। লোক প্রায় নেই বললেই চলে। মাঝে মাঝে দু'একটা দোকান অবশ্য খোলা আছে, কিন্তু লোক সেখানেও নেই।

দু'ধারে ইউক্যালিপ্টাসের সারি। তারই মধ্যে কালো পাথরের মতো রাস্তা। রিকশটা এগোল সেই রাস্তা ধরে। আমি ততক্ষণে কাঁপছি। দাঁতে দাঁত লেগে ঠকঠক করে শব্দও হচ্ছে ভেতরে ভেতরে। কিন্তু অনুতোষের কোনো বিকার নেই।

হঠাৎ গান ধরল অনুতোষ।.....ও মন পাখি—কী ফল খেলি বাগানে গিয়া.....

আশ্চর্য! চমৎকার গলা। এমন গলা কোথায় পেল ও! যতদূর জানি ও তো কোনোদিন গান গাইত না। ঠিক এমনি সুরের একটা গান আমি আব্বাসউদ্দিনের গলায় শুনেছিলাম। ঠিক তেমনি সুর।

গান থামিয়ে অনুতোষ বলল, ব্যস, এসে গেছি। ঐ স্কুলডাঙা। আর ঐ যে আমার বাড়ি। মানে আমি যে বাড়িতে ভাড়া আছি।

রিকশঅলা নির্দেশ পেয়ে, প্রায় ফাঁকা ছোট্ট একটা মাঠের সামনের একটা দোতলা বাড়ির কাছাকাছি এনে রিকশটা দাঁড় করালো।

নেমে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে এগোচ্ছি, অনুতোষ হঠাৎ হাওয়া। আমি প্রথমটায় বুঝতে পারিনি। ওর গানের ব্যাপারটা ভাবতে ভাবতেই এগোচ্ছিলাম, হঠাৎ পাশে কাউকে না দেখতে পেয়ে চমকে উঠলাম।

কী ব্যাপার! অনুতোষটা গেল কোথায়! এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে ঘুরঘুটে অন্ধকারে কিছুই বুঝতে পারলাম না। তবে চোখ জোড়া অন্ধকারে মানিয়ে যেতেই চোখে পড়ল, সামনেই বাড়ির দরজা। পকেট থেকে দেশলাইটা বের করে জ্বালালাম। দরজার মাথায় কলিং বেলও আছে।

আশ্চর্য! এখানে নেমে অনুতোষ কোথায় গেল? একটু সময় আবার ভালো করে তাকিয়েই অনুতোষের নাম ধরে ডেকে উঠলাম—

অনু.....অনুতোষ—

সাড়া নেই।

একটু পরে আবারও ডাকলাম, অনুতোষ.....অনুতোষ.....কি ব্যাপার কী!

এবারেও সাড়া এল না। তবে দোতলার ওপরের একটা জানলা খুলে গেল।

আসছি—এখুনি আসছি। আপনি দাঁড়ান—

যত দ্রুত বলেছিল, তার চেয়েও দ্রুত বোধহয় স্বরের মালিক নেমে এল।

ওফ্ আপনি এলেন তাহলে! দু'দিন ধরে কী যমে-মানুষে টানাটানিই না চলছে ওকে নিয়ে।

কাকে নিয়ে! কি বলছেন আপনি?

আপনা থেকেই গলা দিয়ে কথাগুলো বেরিয়ে এল আমার।

ভদ্রমহিলা বললেন, সে কী! আপনি কলকাতা থেকে আসছেন না?

হ্যাঁ, তাইতো আসছি—

তবে! টেলিগ্রাম পাননি এখান থেকে—

কিসের টেলিগ্রাম?

ভদ্রমহিলা তড়িঘড়ি আমাকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। নিচেই একটা চেয়ারে বসিয়ে যা বললেন তাতে আমি চমকে উঠলাম।

মাত্র তিন দিন আগে বাসে পুরুলিয়া যাবার সময় এক ভয়ংকর দুর্ঘটনায় পড়ে অনুতোষ। সারা দেহে আগুন লেগে যায়। মাথায়ও চোট পায়। সব থেকে খারাপ পেটের দিকটা। এখনও বেঁচে আছে। তবে তিন দিন ধরে জ্ঞান নেই। জ্ঞান ফেরাতে পারছেও না ডাক্তাররা। জানি না কী হবে—! আপনি তো ওর দাদা?

মাথা নাড়লাম। প্রকৃত সম্পর্কটা বললাম।

বলবো কী, তখনো যে আমিই নিজে বিশ্বাস করতে পারছি না। পারছি না আরও এই কারণে যে অনুতোষ তো মারা যায়নি!

রাতটা কোনো রকমে কাটল।

কিন্তু পরের দিন বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজে যেতেই সব শেষ। শুনলাম, প্রায় তিন দিন 'কোমা' অবস্থায় থাকার পর আজ সকলেই অনুতোষ মারা গেছে।

প্রচণ্ড ধাক্কায় মনটা ভেঙে পড়ল। কৌতূহলকে তবু চেপে রাখতে পারলাম না। তিন দিন ধরে হাসপাতালে অনুতোষ। ছিল বাহ্যজ্ঞানলুপ্ত অবস্থায়। কোমা-র ভেতরে। তাহলে ঐ সময়টাতেই কি সে নিজের দেহ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল আমার কাছে! আর একটা অনুতোষ হয়ে?

[শারদীয়া ১৩৯৩]

এক টিপ নস্যি

মনোরঞ্জন ঘোষ

সেদিন সকালে সমর সবেমাত্র বসেছে এক গোয়েন্দা গল্পের কাহিনীকে সাদা কাগজের কারাগারে অক্ষরের শৃঙ্খলে বন্দী করে রাখার জন্য, এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল। সে বিরক্তির সঙ্গে রিসিভার তুলে নিয়ে বলল, হ্যালো?

অন্য দিক থেকে তার বন্ধু ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনার ভুজঙ্গ ধরের কণ্ঠস্বর কানে এল, সমর? বাড়ি আছ তাহলে?

না, আমি বাড়ি নেই।

তার মানে?

সাহেবদের 'নট অ্যাট হোমে'র মতন। লোকের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা না থাকলে বাড়ি থাকা সত্ত্বেও ও-কথা বললে মিথ্যা বলা হয় না। আমরা বাচ্চা চাকর হারানকে শিখিয়ে রেখেছি, কেউ দেখা করতে এলে সোজা বলে দেবে আমি বাড়ি নেই। টেলিফোন তাকে ধরতে না দিয়ে দেখছি ভুল করেছি।

আমাকে এড়ানো অত সহজ নয়। লোককে ধরাই তো আমার কাজ।

লোককে, না বদলোককে?

একই কথা। ধরার আগে পর্যন্ত সবাই ভাল লোক, ধরে তারপর প্রমাণ করি তারা বদলোক।

তা বেশ! কিন্তু আপাতত আমাকে ধরার উদ্দেশ্য কী? এক নিরীহ গল্পলেখককে—

বাজে কথা অনেক হয়েছে। শোনো! আমার হাতে মোটেই সময় নেই। এখুনি তোমার বাড়ি যাচ্ছি। গিয়েই তোমাকে গ্রেপ্তার করে আমার গাড়িতে তুলে নেবো। প্রস্তুত থাকবে।

দোহাই! এক সপ্তাহ আমার বাড়ির চৌকাঠ মাড়িও না। আমার হাতে মোটে সময় নেই। পূজো সংখ্যার একটা লেখা শেষ—

সমরকে শেষ করতে না দিয়েই ভুজঙ্গ ধর লাইন কেটে দিল। সমর হতাশ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মানুষের বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ মানেই খানিকটা সময় ব্যয়, যদি সে পুলিসের লোক হয় তাহলে সেই সঙ্গে কিছু বিপদও যোগ হয়।

গোয়েন্দা-গল্প লেখায় সমর চৌধুরীর পাঠকমহলে বেশ সুনাম আছে। নিছক কল্পনাবিলাসী লেখক সে নয়। বাস্তব ঘটনার উপর ভিত্তি করে লেখা অনেক তদন্ত-রহস্যের কাহিনী তাকে জনপ্রিয় করেছে। তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বিশ্লেষণ শক্তি, অণুমাত্র ক্ষমতা তাকে যেমন রহস্য-গল্প রচনায় খ্যাতি এনে দিয়েছে, তেমনি মর্যাদাও দিয়েছে পুলিস মহলে। তার কলেজ-জীবনের সহপাঠী ভুজঙ্গ ধর ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি পাওয়ার পর পুলিসে চাকরি নিয়েছিল। তারপর অনেক জটিল কেস সতীর্থ সমরের সাহায্যে সমাধান করার ফলে বর্তমানে সে প্রমোশন পেয়ে ডি. সি. (ডি. ডি.) হয়েছে। তার পাল্লায় পড়ে মাঝে মাঝে শখের গোয়েন্দাগিরি সমরকে করতে হয়।

পূজা সংখ্যায় কয়েক জায়গায় সমরের গল্প দেবার কথা আছে। ঘুম থেকে উঠেই সে মনস্থ করেছিল আজ যে করেই হোক একটি গল্প শেষ করবে।

কিন্তু আধঘণ্টার মধ্যেই ভুজঙ্গ এসে তাকে ঘর থেকে টেনে বের করল। কোনো ওজর-আপত্তিতে কান না দিয়ে সমরের হাত ধরে প্রায় হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে নিজের গাড়িতে তুলল।

সমর বলে, ঘোড়ায় জিন দিয়ে আসা বলে একটা কথা শুনেছিলাম। এ যুগে অশ্বারোহণ অচল হয়ে এলেও অনেকের সেই আচরণটা বদলায়নি দেখছি।

ভুজঙ্গ সিগারেট-কেসটা সমরের দিকে ধরে বলল, ঘোড়ার জিন তবু আরোহীর ইচ্ছেমতো খুলে ফেলে যাত্রা স্থগিত রাখা চলত। কিন্তু চার্টার্ড প্লেনের যাত্রা তো তোমার আমার ইচ্ছেমতো স্থগিত রাখা যায় না। আর পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরেই দমদম এরোড্রোম থেকে একটি প্লেন সিঙ্গাপুর রওনা হবে।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে সমর বলল, তাতে তোমার আমার কি? আদার ব্যাপারীরা জাহাজের খোঁজ রাখে না। তুমি দেখছি উড়োজাহাজের খোঁজ রাখছ কলকাতার পাহারাওয়ালা হয়ে।

পাহারাওয়ালাই বটে। প্লেনের পাইলটকে ভদ্রভাবে পাহারা দিচ্ছি আমরা সবাই, কাস্টমসের প্রিভেন্টিভ অফিসার, সেন্ট্রাল এক্সাইজের অ্যাসিস্টেন্ট কালেক্টার, সিকিউরিটি কন্ট্রোলার, ডি. সি. ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের আমি। এক আমেরিকান পাইলট আমাদের কলা দেখিয়ে বোম্বের এক বিখ্যাত জুয়েলার্সকে পথে বসিয়ে হাওয়াই জাহাজে হাওয়া হয়ে যাবার চেষ্টায় আছেন।

হুঁ! তোমার কথার মধ্যে রহস্যের গন্ধ রয়েছে। পাঠকদের কৌতূহল সৃষ্টির জন্য এভাবে কথা বলা লেখকদের একচেটিয়া ব্যাপার। তুমি পুলিসের লোক, সহজ সরল ভাষায় ব্যাপারটা সোজা বলে ফেল!

ভি আই পি রোড ধরে দমদম এয়ারপোর্টের উদ্দেশে যেতে যেতে ভুজঙ্গ ধর বলল, খবরের কাগজে নিশ্চয় দেখেছ যে আজকাল আন্তর্জাতিক চোরাকারবারীর দল এই দেশের ওপর একটু নেকনজর দিয়েছে। ওয়ালকটের ব্যাপারটা মনে আছে? নিজস্ব প্লেনে বেআইনী সোনা পাচারের সময় দিল্লিতে ধরা পড়েছিল? তারপর জামিনে খালাস থাকার সময় একদিন পালাম এরোড্রোমে তার আটক করা প্লেনের তদারক করতে আসে। এক ফঁকে পড়ে থাকা প্লেনে চেপেই পালিয়ে যায়। দিল্লির পুলিস, এরোড্রোমের অফিসাররা, কাস্টমসের কর্মচারী বোকা বনল। কাগজে হৈচৈ, পার্লামেন্টে চেঁচামেচি—

হ্যাঁ, এসব আমি জানি। আরও জানি যে সেদিন তোমরা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বুক ফুলিয়ে বলেছিলে, দিল্লির ছাতুখেকো পুলিস বলেই ওয়ালকট বোকা বানাতে পারল। আমরা বাঘা ভাতখেকো বুদ্ধিমান বাঙালী, বহু ঘুঘু স্মাগলারকে ঘায়েল করেছি। আমাদের চোখে ধুলো দেওয়া সহজ নয়।

সমর আরও বলে, তা এখন যেমন হন্তদন্ত হয়ে এরোড্রোমে ছুটেছ, তাতে বুঝেছি তোমাদের কোনো কৃতী শ্বশুর-পুত্রের পদার্পণ হয়েছে।

পদার্পণ নয়, এখন পলায়ন-পর্বের প্রস্তুতি চলছে। ব্যাটা আমাদের নাকের ডগা দিয়ে বুক ফুলিয়ে উড়ে পালাতে চায়। সব জানা সত্ত্বেও হাতে-নাতে ধরতে না পারায় আইনের সাহায্যে তাকে আমরা আটকাতে পারছি না। ওয়ালকটকে নায়ক করে তুমি এক গল্প লিখবে বলেছিলে। এখন দেখছি এই ববি গিলকি হচ্ছে ওয়ালকটের বাবার বাবা। ইনি শুধু স্মাগলার নন, পি. সি. সরকারের স্বগোত্রীয়।

তার মানে? ম্যাজিশিয়ান নাকি?

রীতিমতো। জিনিস অদৃশ্য করায় সিদ্ধহস্ত। পি.সি. সরকার লোকের চোখের সামনে মোটর গাড়ি অদৃশ্য করতেন, আর ইনি মোটরের চেয়ে দামী মটরের মতো হীরে সকলের সতর্ক নজর সত্ত্বেও অদৃশ্য করতে পারেন। আমরা তো প্রথমে ভেবেছিলাম তোমার কাছে আসার বদলে ঐ ভোজবাজি রহস্য সমাধানের জন্য জুনিয়র পি. সি. সরকারের সাহায্য নেব। নেহাৎ তিনি এখন বিদেশে শো করতে গেছেন—

হুঁ! আমায় উত্তেজিত করার জন্য আত্মসম্মানে ঘা দিয়ে কথা বলছ তা বুঝতে পেরেছি। অর্থাৎ কেসটা জটিল, তোমরা হালে পানি পাচ্ছ না, তাই আমায় তাতিয়ে কাজ উদ্ধারের তালে আছ।

ভুজঙ্গ হেসে ফেলে বলল, সরকারের ম্যাজিক আর সমরের লজিক দুয়েরই আমি ভক্ত, দুটোই আমার কাছে সমান বিস্ময়কর।

প্রশংসা শুনে প্রসন্ন হলাম। দেবতারাও স্তবে তুষ্ট হয়, আমি তো কোন ছার। এবার কেসটা বিশদভাবে বলো।

কিছুদিন আগে কাগজে দেখেছিলে একটা প্লেন রাতের অন্ধকারে ভুবনেশ্বরে নেমেছিল। পাইলট বলেছিল পথ ভুল করায় তার তেল ফুরিয়ে গেছে বলে সেখানে নামতে বাধ্য হয়েছে। তেল নিয়ে সে আবার উড়ে যায়। কে জানে কোন এরোড্রোমে! পরে সন্দেহ করা হয়েছিল সেটা আন্তর্জাতিক চোরাকারবারীদের প্লেন। আমাদের গোপন খবর আছে, ওইরকম আর একটা প্লেন কলকাতায় এসেছে।

তার মানে কোনো ট্রাভেল কোম্পানীর প্লেন নয়, প্রাইভেট প্লেন?

হ্যাঁ। প্লেনটা এখানে এসেছে আর তার সঙ্গে আরও অনেক খবর এসেছে। সেগুলো খবর-কাগজের রিপোর্টারের খবর নয়, গোয়েন্দা বিভাগের গোপন রিপোর্ট। বোম্বে থেকে ওয়ারলেসে আমাদের হেড-কোয়ার্টার্সে এসেছে। ববি গিলকি এখানে আসার আগে তিন দিন বোম্বেতে কাটিয়েছে। সেখানে তাজমহল হোটেলে উঠেছিল। বোম্বে পৌঁছাবার পরদিন সে সেখানকার বিখ্যাত জুয়েলার মেসার্স লীলারাম অ্যান্ড কোম্পানীর শো-রুমে গিয়েছিল। একটা খুব কম দামের হীরে সে কেনে সাড়ে পাঁচশো টাকা দিয়ে। নগদ দাম সে পকেট থেকে নোট বের করে তখুনি দিয়ে দিল। আমরা এখন বুঝছি নগদ নোট দেখিয়ে হীরেটা কেনা তার এক চালাকি, তার চিটিং-বিজনেসের এটা একটা ইনভেস্টমেন্ট। এইভাবে সে লীলারামের বিশ্বাস অর্জন করল। কথায় কথায় শুনিয়ে দিল সে তাজমহল হোটেলে উঠেছে, তার নিজস্ব প্লেন সান্তাক্রুজ এরোড্রোমে রয়েছে, সে আমেরিকার এক ফিল্ম প্রোডিউসার, পৃথিবী ঘুরতে বেরিয়েছে, বিভিন্ন দেশে ছবি বেচাকেনা তার ব্যবসা। লীলারাম ভাবল যে মাইক টডের মতোই এ লোকটা মিলিয়ন নয়, বিলিয়ন ডলারের মালিক, একটি শাঁসাল মক্কেল। গিলিক তারপর লীলারামকে জানায় যে মনের মতো হীরে পেলে যত টাকাই দাম হোক না কেন সে কিনতে প্রস্তুত। লীলারাম তখন তার আয়রন সেফ থেকে দামী-দামী সব হীরে সাহেবকে দেখানো শুরু করল। সাহেবও সেগুলি হাতে নিয়ে নেড়েচড়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে একটা একটা করে লীলারামের সামনের টেবিলে রাখতে শুরু করে। নানা ধরনের নানা জাতের সব হীরে—স্বচ্ছ হীরে, কমল হীরে, নীলাভ হীরে, পলকী হীরে, ব্রাহ্মণ হীরে, ক্ষত্রিয় হীরে, বৈশ্য হীরে.....

দাঁড়াও, দাঁড়াও। বাধা দিয়ে সমর বলল, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এসব বর্ণ-বিভাগ তো মানুষের মধ্যেই আছে জানি, তাও শুধু ভারতের মানুষের মধ্যে। হীরেদের মধ্যেও আবার জাতিভেদ আছে?

বাঃ। সব হীরেই কি এক জাতের নাকি? বর্ণ অনুসারেই তাদের বর্ণ-বিভাগ করা হয়েছে। ব্রহ্মণ হীরে হচ্ছে শ্বেতবর্ণের, ক্ষত্রিয় হীরে রক্তবর্ণ, বৈশ্য হীরে পিঙ্গল, শূদ্র হীরে কৃষ্ণবর্ণ। যাক, লীলারাম গিলকিকে বিদেশী খনিরও অনেক হীরে দেখায়—দক্ষিণ আফ্রিকার জেগার্স ফন্টিনের নীল হীরে, কিম্বারলির হলদে হীরে, ওয়েসেলটনের শ্বেত হীরে, ডি বিয়ার্সের মেটে হীরে, ব্রিলিয়ান্ট কাট হীরে, টেবল-কাট হীরে, রোজ-কাট হীরে.....

সমর আবার বাধা দিয়ে বলে, বাহান্ন গোষ্ঠী হীরের বংশ পরিচয়ে আমার কাজ নেই। তুমি কি জুয়েলার্সদের কাছে খুব যাতায়াত করছ? এত নাম জানলে কি করে?

আরে ভাই, গোয়েন্দাগিরি করার জন্য এসব জানতে হয়। ভারতের মধ্যে যে সব দামী হীরে-জহরত আছে, দেশের সেই সম্পদ যাতে বাইরে চালান না যায়, সেদিকে নজর রাখতে হয়। তোমরা তো শুধু কোহিনূরের কথা জান। সেটা ছাড়াও পৃথিবীর নামকরা প্রথম দশটা হীরের মধ্যে তিনটে এককালে ভারতবর্ষে ছিল। পৃথিবীর মধ্যে চতুর্থ স্থান যার, সেই অর্লফ হীরে মহীশূরের এক দেবমন্দির থেকে এক ফরাসী নাবিক চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। সেই চুরির ব্যাপার তোমার ডিটেকটিভ গল্পের প্লট হতে পারে। নাবিকটি মন্দিরের দ্বাররক্ষীদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে তাদের সিদ্ধির শরবতের নেশায় কাৎ করেছিল। তারপর গভীর রাতে মন্দিরে ঢুকে দেবতার তৃতীয় নয়নস্বরূপ সেই হীরেটা খুলে নিয়ে সেখানে অবিকল ওই আকারের এক কাচের চোখ বসিয়ে দেয়। তা সত্ত্বেও ধরা পড়ার ভয়ে সে নিজের জানুতে গভীর গর্ত করে হীরেটা লুকিয়ে রাখে। যে জাহাজে করে সে এ দেশ থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল, সেই জাহাজের ক্যাপ্টেনকে ওই হীরে বেচে দেয়। ক্যাপ্টেন আমস্টারডামের কাউন্ট অর্লফকে বেচে দেয়।

অর্লফ নিজের নামেই হীরেটার নামকরণ করে রাশিয়ার রানি ক্যাথারিনের কাছে বেচে। হীরেটা এখন রুশ সরকারের সম্পত্তি। ওটার দাম প্রায় তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড।

দমদম বিমান বন্দরে পৌঁছাতে আর একটু সময় লাগবে বুঝে ভুজঙ্গ তার বন্ধুকে ভারতের বিখ্যাত হীরেগুলির ইতিহাস শোনায়। সে বলে, পৃথিবীর সপ্তম হীরে 'পিট-ডায়মন্ড'-এর আবিষ্কর্তা শ্রমিকটিকে হত্যা করে এক দস্যু সেটি হস্তগত করে। নানা হাত-ঘোরা হীরেটার সংবাদ পেয়ে মাদ্রাজের তখনকার গভর্নর উইলিয়াম পিট মাত্র বিশ হাজার পাউন্ডে সেটা কিনে ফ্রান্সের রিজেন্ট ফিলিপসকে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার পাউন্ডে বিক্রি করে দেয়। হীরেটা পঞ্চদশ লুইয়ের রাজমুকুটে স্থান পায়। তারপর নেপোলিয়ান ক্ষমতা দখল করার পর হীরেটা তাঁর তলোয়ারের বাঁটে বসান। বর্তমানে প্যারিসের লুভর মিউজিয়ামে সেটা আছে।

পৃথিবীর অষ্টম স্থানাধিকারী ভারতীয় হীরেটা কোনো ব্যবসায়ীর মারফৎ ইউরোপে বিক্রির জন্য চালান হয়েছিল। সেখানে বিখ্যাত বীর চার্লস দি বারগান্ডি সেটা কেনেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত হারিয়ে ফেলেন। এক ফরাসী নাবিক সেটা পেয়ে মাত্র কয়েক ফ্রাঙ্কে বিক্রি করে দেয় ডিউক অব টাস্কানিকে। তাঁর নামানুসারে হীরের নাম হয় গ্রান্ড ডিউক। সেটা পরে অস্ট্রিয়ার রাজার সম্পত্তি হয়েছিল।

সমর আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, প্রাচীন ভারতে ভুজঙ্গ ধরের মতো কোনো ডিটেকটিভ না থাকায় ভারতের সম্পদ বিদেশের রাজভাণ্ডার পূর্ণ করেছে। এখন আর সে ভয় নেই।

ঠাট্টা নয়। তোমাকে হীরে সম্বন্ধে এত কথা বললাম এইজন্য যে যাতে তুমি কেসটার গুরুত্ব বোঝ। স্মাগলার বব গিলকি আর একটি ওইরকম দামী হীরে নিয়ে আর আধঘণ্টার মধ্যে ভারত থেকে পালাবে।

হীরের কথা ছেড়ে গিলকির কথা বলো। লীলারামের দোকানে সে কী করেছিল?

লীলারামের দেখানো দামী হীরেগুলোর মধ্যে কোনোটাই তার পছন্দ হলো না। সবগুলি ভাল করে দেখার পর সে জানাল কোনোটাই কিনতে ইচ্ছুক নয়। লীলারামের কর্মচারীরা সাহেবের সামনে থেকে হীরেগুলো উঠিয়ে আয়রন সেফে পুরে রাখতে গিয়ে দেখল একটি হীরে উধাও। ঐতিহাসিক ভার্গাস হীরকের ষোল খণ্ডের একটি সেট, সাইজ চিনে বাদামের মতন, কিন্তু খুব দামী। দোকানে হৈচৈ পড়ে যায়। সাহেব স্বেচ্ছায় দু'হাত মাথার উপরে তুলে নিজেকে সার্চ করতে দেয়। সাহেবের কোট-প্যান্টের পকেট হাতড়ে কিছু পাওয়া যায় না। সাহেব বলে যে ওই বিশেষ হীরেটা তাকে দেখানো হয়নি, জহুরী ভুল করছে। জহুরী লীলারাম বলে যে তার সংসারের ছেলেমেয়ের নাম ও সংখ্যা তার ভুল হতে পারে, কিন্তু তার দোকানের হীরের সংখ্যা ও দাম কখনো ভুল হবে না। তখনি পুলিস ডাকা হয়। তারা এসে আবার রীতিমতো সার্চ করে, কিন্তু হীরেটা পায় না। প্রমাণাভাবে শুধু সন্দেহের বশে সাহেবকে আটকানো যায় না। পুলিস সাহেবকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু সাদা পোশাকে গোয়েন্দারা তার ওপর কড়া নজর রাখে। গোপনে হোটেলের মালিকদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে এক গোয়েন্দা হোটেলের বয় সেজে দিনরাত্তির সাহেবের উপর নজর রাখে। সাহেব হোটেলের বাইরে কোথাও যায় না, কেউ তার সঙ্গে দেখা করতেও আসে না। তার মানে দোকান থেকে হীরেটা হাতসাফাই করে সরিয়ে থাকলেও সেটা সে বোম্বোতে কারুকে বিক্রি করেনি। বোধহয় ভারতের বাইরে নিয়ে গিয়ে বেশ ভাল দামে বেচার ইচ্ছে তার আছে। বোম্বের পুলিসের ধারণা যে ম্যাজিশিয়ানরা যাকে পাসিং বলে সেই হাতের কৌশলের সাহায্যে সে হীরেটা হস্তগত করেছে, কিন্তু কোথায় সেটা লুকিয়েছে তার হদিস পাওয়া যাচ্ছে না।

সমর প্রশ্ন করে, তারপর?

গিলকি বোম্বে থেকে কলকাতায় কাল এসেছে। আজ সকালে সিঙ্গাপুর যাওয়া তার প্ল্যান। এখানেও কারুকে সে হীরে বেচার চেষ্টা করেনি। এরোপ্লেন থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে আমরা তার ওপর নজর রেখেছি। কাল রাত্তিরে সে গ্র্যান্ড হোটেলে ছিল। সেখানেও এক গোয়েন্দা হোটেল-বয় সেজে নজর রাখে। তার কাছে কেউ আসেনি। এখন সে এরোড্রোমে গেছে, একটু বাদেই তার ফ্লাই করার কথা। আমি

টেলিফোনে সেখানকার অফিসারদের বলেছি তোমাকে না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত যে করেই হোক তার ফ্লাইট্ দেরি করিয়ে দিতে। এরোড্রোম অফিসার রাজী হয়েছে তুমি না পৌঁছানো পর্যন্ত তার প্লেনে তেল ভরা বা অন্য প্লেন এখনি ল্যান্ড করবে এই অজুহাতে গিলকির টেক-অফ দেরি করিয়ে দিতে।

ভুজঙ্গ গাড়ির বাইরে দৃষ্টিপাত করে বলল, আমরা এরোড্রোমে এসে পড়েছি। আইনত সাহেবকে আটকাবার ক্ষমতা আমাদের নেই, অথচ আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস তার কাছে হীরেটা আছেই আছে। মাত্র পনেরো মিনিট সময় তুমি পাবে। দেখ তার মধ্যে যদি হীরেটা উদ্ধার করতে পার। আমরা হার মেনেছি। বাট উইশ ইউ সাকসেস!

সমরদের গাড়ি এসে এয়ারপোর্ট বিল্ডিং-এর কাছে থামল। তারা দুজনে নেমে পড়ল। ভেতরে ঢুকে দেখাল লাউঞ্জের এক সোফায় আরাম করে বসে ববি গিলকি সিগারেট টানছে। মুখ বন্ধ করে নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে। তাকে বেশ নিশ্চিন্ত দেখাচ্ছে। মনে মনে হয়তো বুঝেছে কলকাতার পুলিস ও কাস্টমস তার কাছে হার মেনেছে। আর কিছুক্ষণ পরেই সে নিরাপদে ভারত ত্যাগ করতে পারবে।

ডি. সি. ভুজঙ্গ ধরকে দেখে অন্যান্য অফিসাররা তার কাছে এল। তাদের কথাবার্তা সমরের কানে আসে ঃ

আবার আমরা ওর সমস্ত মালপত্তর তন্নতন্ন করে সার্চ করেছি।

জামাকাপড় খুলিয়ে বডি সার্চ করেছি। পায়ের জুতো-মোজাও পরীক্ষা করা হয়েছে।

কোটের লাইনিং, স্যুটকেসের সিক্রেট পকেট ইত্যাদি স্মাগলারদের যত রকম লুকোবার জায়গা থাকতে পারে সবেরই সন্ধান করেছি।

আমার মনে হয় হীরেটা ও গিলে ফেলেছে। একমাত্র ওর পেটের মধ্যেই থাকা সম্ভব। হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে এক্স-রে করে কিংবা জোলাপ খাইয়ে দেখতে হবে।

কিন্তু তাতেও না পাওয়া গেলে তখন?

এমনিতেই ও বলা শুরু করেছে তোমরা আমায় অনর্থক হয়রান করছ। তোমাদের জন্যে ঠিক সময়ে সিঙ্গাপুরে না পৌঁছাই যদি তাহলে আমার বিজনেসের ভীষণ ক্ষতি হবে। তখন তোমাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আমি আমেরিকার কনসালকে জানাব। তিনি দিল্লির হোম-ডিপার্টমেন্টকে বলবেন এক নিরীহ বিদেশীকে তোমরা অনর্থক জ্বালাতন করেছ।

হুঁ। শেষে আমাদের চোখের সামনে দিয়ে চোরটা বুক ফুলিয়ে বেরিয়ে যাবে? কাগজে টি-টি পড়বে।

সমর ওদের আলোচনা শুনতে শুনতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ববি গিলকিকে লক্ষ্য করছিল। সাহেব এক নাক দিয়ে স্টিম ইঞ্জিনের মতোই ধোঁয়া ছেড়ে চলেছে।

সিগারেট শেষ হয়ে আসতে সেটা থেকে আর একটা ধরিয়ে সে অফিসারদের উদ্দেশে বলল, ফাইভ মিনিটস মোর। আই হোপ এভরিথিং ইজ অলরাইট। আই ক্যান টেক-অফ অ্যাট দি সিডিউলড টাইম।

ভুজঙ্গ সমরকে বলল, ভারতের রত্ন ভারতের রাখার জন্য আমি একটা লাস্ট চান্স নেব। তাতে আমার চাকরি যায় যাক।

সমর হেসে বলল, সেকি! আমি যে তোমায় প্রমোশন পেয়ে পুলিস কমিশনাররূপে ভবিষ্যতে দেখতে চাই। শীগগির এক টিপ নস্যি জোগাড় করো দেখি!

কিছু বুঝতে না পেরে ভুজঙ্গ প্রশ্ন করে, নস্যি? তুমি নস্যি চাইছ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। এরোড্রোমের কর্মচারী বা প্যাসেঞ্জার কারও কাছে আছে কিনা তাড়াতাড়ি খোঁজ করো। নিশ্চয় কারও না কারও নস্যি নেওয়া অভ্যাস আছে। নস্যির উপর তোমার চাকরির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। শীগগির—

সমরের উদ্দেশ্য বুঝতে না পারলেও তার ওপর আস্থা থাকায় ভুজঙ্গ ছুটে চলে যায় নস্যিখোর খুঁজে বের করতে।

সমর এগিয়ে গিয়ে গিলকির সঙ্গে আলাপ শুরু করল ইংরাজিতে। গুড মর্নিং।

গুড মর্নিং! আপনি আবার কে? পুলিস না কাস্টমসের লোক?

ওদের কেউ নয়। একজন লেখক।

লেখক! সাংবাদিক! দেখুন তো, মিছিমিছি সন্দেহ করে আমায় এরা কিরকম জ্বালাতন করছে! এ নিয়ে আপনি কাগজে খুব লিখুন। কি রকম বিরক্ত করলে আর কোনো আত্মসম্মানী বিদেশী এদেশে বেড়াতে আসবে? আপনারা ফরেন এক্সচেঞ্জ সহজে পাবেন?

সত্যি কথা! নিশ্চয়ই লিখব। তা আপনি তো এখুনি রওনা হচ্ছেন?

হ্যাঁ। ওরা আমায় অনেকবার সার্চ করেছে। গিলকি অফিসারদের দিকে চেয়ে ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল, পাঁচ মিনিটের মধ্যে না হয় আর একবার সার্চ করুক। তাতেও সন্তুষ্ট না হলে বলুক, আমি না হয় উলঙ্গ হয়েই প্লেনে উঠব।

সমর বলল, তার দরকার হবে না। ওরা আর সার্চ করবে না। যাবার আগে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আপনার মতামত একটু শুনি।

ও, জার্নালিজমের জন্য? আপনাদের দেশটা বড় গরম লাগে আমাদের কাছে। সাহেব সমরকে একটা সিগারেট অফার করে বলল।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশ তো! অনেকেরই গরমে ঘাম বসে সর্দি হয়। আপনার সর্দি হয়নি তো?

না। অবশ্য আমি গরমের মধ্যে খুব ঘোরাঘুরি করিনি।

ইতিমধ্যে ভুজঙ্গ ধর এক নস্যির ডিবে এনে সমরের হাতে দিল। কৌতূহলী সাহেব সমরকে জিজ্ঞাসা করল, ওটা কি?

নস্যি।

ন্যাস্টি থিং। আপনি নেন নাকি?

হ্যাঁ। আপনি সিগারেট টানেন মুখ দিয়ে, এটা টানতে হয় নাক দিয়ে। মুখের এক ইঞ্চি উপরে নাক। তাই আপনার চেয়ে আমি এক ইঞ্চি সুপিরিয়র। আসুন, দুজনে সমান হই। আপনি সিগারেট অফার করলেন, তার বদলে আমি দেব এক টিপ নস্যি.....

ও, নো নো! সাহেব সোফা থেকে লাফিয়ে উঠে বলল, আই মাস্ট টেক-অফ নাউ।

সমরও উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ভুজঙ্গ। সাহেবকে ধরে জোর করে নাকে নস্যি দিয়ে দাও। নাকের গর্তে সাহেব হীরেটা পুরে রেখেছে।

অফিসাররা সঙ্গে সঙ্গে সাহেবকে ঘিরে ধরে। ধস্তাধস্তি করে সাহেবের নাকে নস্যি দেওয়া হয়। তার হাঁচির সঙ্গে হীরেটা বেরিয়ে আসে। হাঁচতে হাঁচতে সাহেবের নাকানির একশেষ হয়। নাকের জলে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে তাকে প্লেনের বদলে পুলিসের গাড়িতে চাপতে হয়।

ভুজঙ্গ সমরকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি করে টের পেলে যে ওর নাকের মধ্যে হীরেটা লুকানো আছে?

সমর জবাব দিল, যখন শুনলাম সাহেবের মালপত্তর জামা-কাপড়ের মধ্যে হীরেটা নেই, তখনই বুঝলাম সেটা তার দেহেই আছে। তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করে দেখলাম সাহেব যখন মুখ বন্ধ করে নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে, তখন ধোঁয়া একদিকের নাকের গর্ত দিয়েই শুধু বের হচ্ছে। জেনে নিলাম সাহেবের সর্দি হয়নি। অতএব নাকের একদিক বোজার একটি মাত্র কারণই থাকতে পারে। হীরেটা নাকে পুরে তোমাদের নাকাল করছে।

[শারদীয়া ১৪০০]

রাধাগোবিন্দ রহস্য

মনোজ সেন

ইস্কুল থেকে বেরিয়ে শ্রীলতা বলল, 'আইসক্রীম খাবি, দাদা?'

সাগর ধমকে উঠল। বলল, 'তোর লজ্জা করে না আইসক্রীম খাওয়ার কথা বলতে? কাল পর্যন্ত ঘঙ্ ঘঙ্ করে কাশছিলি। এখন আইসক্রীম খেলে কি অবস্থা হবে জানিস?'

'ইয়ে, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে রে!'

'ক্ষিদে পেয়েছে তো বাড়ি গিয়ে খাবি। অমন গদাইলস্করি চালে না হেঁটে পা চালিয়ে চল। এক্ষুণি পৌছে যাব।'

প্রস্তাবটা একেবারেই মনঃপূত হলো না শ্রীলতার। খুঁতখুঁত করতে করতে সাগরের পেছনে পেছনে যেতে যেতে বলল, 'তুই কবে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে কলেজে উঠবি বল তো? আমি তখন রোজ ইস্কুল থেকে বেরিয়ে আইসক্রীম খাব, ভেলপুরী খাব, আলু চীপস খাব।'

'হ্যাঁ, আর রোজ অসুখে ভুগব। আজ জ্বর, কাল পেট ব্যথা, পরশু মাথা ধরা। নে, নে, তাড়াতাড়ি চল। ক্লাস টেনের বুড়োধাড়ি মেয়ে হাঁটছে দেখ না? যেন নতুন হাঁটতে শিখেছে।'

রামতনু মিত্র সরণির মোড়ে আসতেই কিন্তু ওদের হাঁটা বন্ধ হয়ে গেল। দেখা গেল, আভাসদের বাড়ির সামনে বেশ কিছু লোকের জটলা আর গেটের সামনে আভাস উদ্‌ভ্রান্ত মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সাগর তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বলল, 'কী হয়েছে রে আভাস? তুই এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন?'

আভাস কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে রে, সাগর! আমাদের গৃহদেবতা চুরি হয়ে গেছে।'

'তোদের গৃহদেবতা? কই, তোদের বাড়িতে তো কোনো ঠাকুরঘর বা মন্দির দেখিনি কোনোদিন?'

'আমাদের গৃহদেবতা মানে আমাদের রায়চৌধুরী পরিবারের গৃহদেবতা। প্রত্যেক বছর বংশের এক একজনের বাড়িতে তাঁর পুজো হয়। দশ বছর বাদে এবার আমাদের পালা ছিল। বাবা পরশু দিন চক্রধরপুরে আমার ন'কাকার বাড়ি থেকে নিয়ে আসেন। আগামী কাল পুজো হবার কথা। তারপর এক বছর গৃহদেবতা থাকবেন আমাদের বাড়ি, এরকম কথা ছিল।'

'পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে?'

'হ্যাঁ। পুলিশ এসেছিল। বাবা আর কনকদিকে থানায় নিয়ে গেছে। কনকদিকে বোধহয় ছাড়বে না।'

'কনকদিকে? বলিস কি?'

'হ্যাঁ। কি বলব বল তো? আমার জন্মের আগে থেকে এবাড়িতে আছে। আমরা ছাড়া ওর আর তিনকুলে কেউ নেই। আমরাই ওর আত্মীয়। কিন্তু পুলিশ কোনো কথাই শুনছে না।'

'ভেতরে চল তো। জ্যাঠাইমার সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।'

আভাসের মা স্বর্ণলতা ফর্সা মোটাসোটা মহিলা, অনবরত পান খান আর অনর্গল কথা বলেন। সাগরের প্রশ্নের জবাবে বললেন, 'কষ্টিপাথরের রাধাগোবিন্দের মূর্তি, কী সুন্দর দুটি মুখ। এক গা গয়নাও ছিল—সোনার। ভাগ্যিস সেগুলো সরিয়ে রেখেছিলুম। সেগুলো বেঁচে গেছে।'

সাগর জিজ্ঞেস করল, 'কত বড় মূর্তিটা?'

'তা হাতখানেক লম্বা তো হবেই। চওড়াতেও প্রায় তাই। বেজায় ভারী। শুনেছি প্রায় দেড়শো বছর আগে এদের কোন এক পূর্বপুরুষ তাঁর এক প্রতিপক্ষ জমিদারের বাড়ি থেকে মূর্তিটা তুলে নিয়ে আসেন। ডাকাত ছিলেন তো সব। এখনও এরা কিছু কম যায় না। সক্কলের চণ্ডাল রাগ। তা, এদের সেই পূর্বপুরুষ নাকি প্রকাণ্ড ষণ্ডা জোয়ান ছিলেন। তোমার জ্যাঠামশায়ের চেয়েও লম্বা-চওড়া। ঐ বিশাল ভারী মূর্তিটা উনি নাকি বগলদাবা করে ঘোড়ার চড়ে নিজের জমিদারীতে নিয়ে আসেন। সেই থেকে তার নিত্যপূজা হয়ে আসছে।'

আভাস বলল, 'মূর্তিটা খুবই প্রাচীন জানিস। ইতিহাসের বইতে যে সব ছবি দেখেছি, তাতে মনে হয় গুপ্ত যুগ-টুগের হতে পারে।'

সাগর প্রশ্ন করল, 'কোথায় ছিল মূর্তিটা?'

স্বর্ণলতা বললেন, 'একতলাতেই ছিল। আভাসের পড়বার ঘরটা খালি করে সেখানেই রাখা হয়েছিল। ঠাকুরমশাই বললেন, ওটা ভালো জায়গা। পুবমুখো ঘর। ভারী না হলে হয়তো দোতলায় নিয়ে যাওয়া যেতো। ঠাকুরমশাইয়ের প্রস্তাবটা আমাদের পছন্দই হয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে.....'

'ঠাকুরমশাই কে? আপনাদের পরিবারিক পুরোহিত?'

'আমাদের আবার পারিবারিক পুরোহিত! তুমিও যেমন! যেমন তোমার জ্যাঠামশাই তেমনি তোমার বন্ধু, দুটোই ঘোর নাস্তিক। নেহাৎ পরিবারের সবাই ছি ছি করবে, তাই পুজোর দায়িত্ব নিতে বাধ্য হয়েছিল এরা। সেইজন্য কোত্থেকে যেন ঐ হাড়জিরজিরে খুটকোমুখো পুরুতমশাই-কে ধরে এনেছিলেন উনি। মূর্তিটা চুরি যাওয়ায় তোমার জ্যাঠামশাই-এর এখন খুশি হওয়ারই কথা।' বলে ক্রুদ্ধভঙ্গিতে মুখে একটা পান ঠুসে এমন প্রবল বেগে চিবুতে লাগলেন যে মনে হলো কোনো অনুপস্থিত ভদ্রলোকের মুণ্ডুটাই বুঝি চিবিয়ে খাচ্ছেন।

মৃদু হেসে সাগর বলল, 'জ্যাঠামশাই-এর খুশি হবার কথা কেন?'

আভাস বলল, 'বাবার ব্যবসা এখন একেবারেই ভালো চলছে না। রোজগারপাতি বন্ধ। এ অবস্থায় এই পুজোর ভার নেওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। তাই.....'

'এই ঠাকুরমশাইকে কোথায় পেলি?'

'বাবা নিয়ে এসেছিলেন কি এক মহাবিষ্ণু হিন্দুধর্ম প্রচারক সঙ্ঘ থেকে। সেটা বেশি দূরে নয়। আমাদের পেছনের রাস্তা গৌরীশঙ্কর লেনে। এখন ব্যাপারটা কি বল তো? তোরা কি গোয়েন্দাগিরি করবি নাকি?'

'করে দেখতে চোষ কি? এ ব্যাপারে পুলিশ বেশি মাথা ঘামাবে বলে মনে হয় না। চল না, আমরাই মাথা ঘামিয়ে দেখি। দ্যাখ, এটা ছিঁচকে চুরি নয়। যে চোর সে ভেবেচিন্তে প্ল্যান করে করেছে। তাহলে, ধর যদি আমরা সেই প্ল্যানটা ভেবে বের করতে পারি, তাহলে চোরের পরিচয় কিছুটা প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে।'

'মন্দ বলিসনি। কিভাবে এগোবি বল তো? কাদের তোর সন্দেহজনক বলে মনে হয়?'

'আমি যা বুঝতে পারছি, ঐ মূর্তি চুরি করেছে হয় একাধিক লোক নয়তো একজন তাগড়া জোয়ান। কিন্তু সেটা চিন্তা করবার আগে জানতে হবে, মূর্তিটা চুরি হলো কখন।'

'আজ সকাল আটটা থেকে বেলা বারোটার মধ্যে। মা সকাল ছ'টায় আমার পড়ার ঘর খুলে ঘর পরিষ্কার করে ফুলটুল পাল্টে দেয়। তখন কনকদি সঙ্গে ছিল। সাতটার সময় পুরুতমশাই তাঁর এক শাগরেদকে নিয়ে আসেন পুজোর কিছু জিনিসপত্র নিয়ে। তিনি ছিলেন আধঘণ্টা। তার আধঘণ্টা পরে কনকদি দরজায় তালা দিয়ে চাবি মাকে দিয়ে আসে।'

'পুরুতমশাই যাবার আধঘণ্টা পরে? কেন? এই আধঘণ্টা জ্যাঠাইমা কোথায় ছিলেন?'

'আধঘণ্টা পরে কারণ কনকদি হাতের কাজগুলো সারছিল, তাই। সকালবেলা অনেক কাজ তো

থাকে। মা এই সময় বাইরের ঘরে খবরের কাগজ পড়ছিল। কনকদি যে দরজায় তালা দিচ্ছিল সেটা বাবা দেখেছিল। বাবা তখন সিঁড়ি দিয়ে নামছিল বাজারে যাবে বলে। কনকদির কাছ থেকে বাজারের থলি নিয়ে বাবা বাজারে যায়। ফেরে ঘণ্টাখানেক বাদে। মা তখন রান্নাঘরে যায়। বাবা স্নান সেরে চা-বিস্কুট খেয়ে অফিসে চলে যায়। তুই তো জানিস, আমাদের বাড়ির প্রায় উল্টোদিকে 'দিগঙ্গনা' অ্যাপার্টমেন্টসের একতলায় বাবার অফিস। আমি স্কুলে চলে গেলুম পৌনে দশটায়। বারোটার সময় আমাদের রান্নার লোক ভুবন বাবার লাঞ্চ নিয়ে দিগঙ্গনায় যায়। সেই সময় কনকদিও বেরিয়েছিল কিছু ছোটখাট কেনাকাটা করবার জন্য। মা তখন পেছনের বাগানে ফুলগাছগুলো দেখাশোনা করছিল। ভুবনদা আর কনকদি বেরিয়ে গেলে, বাড়ি ফাঁকা হয়ে গেল বলে মা ভেতরে আসে। তখন দেখে যে আমার পড়ার ঘরের দরজার তালাটা খোলা। ঘরে ঢুকে দেখে মূর্তি নেই। মার তো তখন মাথায় হাত। তাড়াতাড়ি বাবাকে ফোন করার চেষ্টা করল। ফোন খারাপ। তার একটু বাদেই কনকদি ফিরে আসে। মা কনকদিকে দিয়ে তখন বাবাকে খবর পাঠায়।'

'তোদের বাড়ির উল্টোদিকে তো দুটো পাশাপাশি মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং দিগঙ্গনা আর হংসদূত। তাদের গেটে তো সবসময় দু-তিনজন করে গার্ড বসে থাকে। তাদের কেউ কি দেখেছে, তোদের বাড়ির সামনে কোনো গাড়ি বা রিকশা এসে দাঁড়াতে আর তার ভেতরে কাউকে কোনো মাল ওঠাতে?'

'পুলিশও এই প্রশ্নই করেছিল। উত্তর হলো 'না'।'

'তাহলে প্রশ্ন হলো, মূর্তিটা বেরুল কি করে? তোদের বাড়ির চারদিকে উঁচু পাঁচিল। অত ভারী মূর্তি সকালবেলায় কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ না করে সেই পাঁচিল পার করা কঠিন ব্যাপার। অসম্ভব বলা চলে। তাহলে সেটা মেন গেট দিয়ে বেরিয়েছে। আটটা থেকে বারোটার মধ্যে যারা যারা এ বাড়ি থেকে বেরিয়েছে তাদেরই কেউ সেটা নিয়ে গেছে। জ্যাঠাইমা বাগানে ছিলেন কাজেই খিড়কি দিয়ে মূর্তি বেরোয়নি। বসবার ঘরের সদর দরজা দিয়েই বেরিয়েছে। আচ্ছা, কনকদি যখন দরজায় তালা দেয় তখন কি মূর্তিটা লক্ষ্য করেছিল?'

'না, করেনি।'

'তুই যাদের কথা বললি, তারা ছাড়া আর কেউ কি আজ সকালে এ বাড়িতে এসেছিল?'

'আমার তো জানা নেই।'

স্বর্ণলতা এতক্ষণ গভীর মনোযোগ দিয়ে দুই বন্ধুর কথা শুনছিলেন। এখন বললেন, 'এসেছিল। জমাদার।'

শ্রীলতা জিজ্ঞেস করল, 'তার হাতে বড় বালতি ছিল?'

'তা তো দেখিনি রে। সে দুমদুম করে আসে, ঝপাঝপ ঝ্যাঁটা চালায়, দুমদুম করতে করতে চলে যায়। তাকে লক্ষ্যই করি না বেশির ভাগ সময়।'

সাগর চোখ বিস্ফারিত করে বলল, 'বালতি, না? ঠিক বলেছিস তো। বালতিটা খুব জরুরি বলে মনে হচ্ছে। কেন, ঠিক ধরতে পারছি না।'

আভাস হাসতে হাসতে বলল, 'এত প্রশ্ন-ট্রশ্ন করে শেষ পর্যন্ত তোর একটা জমাদারের বালতি খুব জরুরি বলে মনে হলো? এরকম গোয়েন্দাগিরি করলে আর দেখতে হবে না।'

সাগর কিন্তু হাসল না। গম্ভীর চিন্তিত মুখে বলল, 'বালতিটা খুব জরুরি। এক বা একাধিক লোক বালতি হাতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তারা অদৃশ্য।'

'কি যা তা বকছিস? অদৃশ্য লোক? তুই ভাবছিস ভূতে চুরি করেছে?'

শ্রীলতা বলল, 'তুমি থাম তো, আভাসদা। দাদাকে চিন্তা করতে দাও।'

সাগর আপনমনে বলে চলল, 'লোকটা বা লোকেরা অদৃশ্যভাবে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। কোথায়? চুরিটা তো তক্ষুণি ধরা পড়ে যাবার কথা। গোলমাল হবে। পুলিশ প্রথমে বাড়ির লোককে ধরবে তারপরে বাইরের লোককে। বাইরের লোক? ঠিকই তো। ট্যাকসি বা রিকশা এল না কেন? কাল থেকে পুজো

শুরু হবার কথা।' বলে হঠাৎ মুখ তুলে হাসল। বলল, 'হ্যাঁরে আভাস, জ্যাঠামশাই-এর অফিসে প্যান্ট্রি আছে না যেখানে চা-টা বানানো হয়?'

আভাস হাঁ করে বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। চটকা ভেঙে বলল, 'হ্যাঁ, আছে।'

'চা কে করে?'

'ভুবনদা। দুপুরে একবার যায়, তখন বাবার লাঞ্চ নিয়ে যায় আর বিকেলে একবার যায়। চা করে অফিসের সবাইকে দিয়ে ফিরে আসে।'

সাগর বলল, 'ভুবনদাকে একবার ডাকবি?'

আভাস গিয়ে একতলা থেকে ভুবনকে ডেকে নিয়ে এলো। বেঁটেখাটো গাট্টা-গোট্টা লোক ভুবন, ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, পরনে ধুতি আর ফতুয়া, কাঁধে গামছা।

স্বর্ণলতার অনুমতি নিয়ে সাগর ভুবনকে প্রশ্ন করল, 'তুমি কত বছর এ বাড়িতে কাজ করছ, ভুবনদা?'

ভুবন বলল, 'তা প্রায় পনেরো বছর হবে। যখন এসেছিলুম, দাদাবাবু একদম বাচ্চা ছিল।'

'তোমার ছেলেমেয়ে কটি, ভুবনদা?'

'আমার দুটি মেয়ে। বড়টি এবার পনেরো হলো, ছোটটা দশ।'

'এ বাড়িতে যে মূর্তিটা এসেছিল, সেটার কতো দাম তুমি জানো?'

ভুবন ভয়ানক গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, 'আমি গরীব মানুষ, লেখাপড়া জানিনে, মূর্তির দাম আমি কি করে জানব?'

'তা হলে জেনে রাখো। ওটার দাম কয়েক লক্ষ টাকা। ঐ মূর্তিটা যাকে দিয়ে চুরি করানো হয়েছে, তাকে তো অনেক ঝুঁকি নিতে হয়েছিল। তাকে, যারা চুরি করিয়েছে তাদের অন্তত ষাট-সত্তর হাজার টাকা দেওয়া উচিত ছিল। পুরুতমশাই তোমাকে কতো টাকা দেবেন বলেছেন?'

ভুবন উদ্‌ভ্রান্ত গলায় বলল, 'তুমি কি বলছ, আমি তো বুঝতে পারছি না।'

'আমি কি বলছি সেটা তুমি ঠিকই বুঝতে পারছ কিন্তু যেটা বুঝতে পারছ না তা হলো তোমাকে ঐ পুরুতঠাকুরটি কতখানি ঠকিয়েছে। আজ সন্ধ্যের মধ্যে পুলিশ যখন জ্যাঠামশাইয়ের অফিসের প্যান্ট্রি থেকে মূর্তিটা উদ্ধার করবে, তখন তোমার কী অবস্থা হবে বুঝতে পারছ? তোমার জেল তো হবেই। অথচ যে টাকা ওরা তোমাকে দেবে বলেছে, তাতে এই ভয়ানক বিপদের হাত থেকে কী উদ্ধার পাবে? যদি সব স্বীকার কর তাহলে তোমার শাস্তিটা কম হতে পারে, চাই কি মকুবও হয়ে যেতে পারে।'

হঠাৎ, বলা নেই কওয়া নেই, ভুবন হাউমাউ করে কেঁদে স্বর্ণলতার পা জড়িয়ে ধরল। তার কথায় যা বোঝা গেল তা হচ্ছে, তার বড় মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে, পাত্রপক্ষ কুড়ি হাজার টাকা পণ চেয়েছে, সে মেরে-কেটে দশ হাজার টাকা জোগাড় করেছে। স্বর্ণলতা পাঁচ হাজার দেবেন বলেছেন, বাকিটা সে জোগাড় করতে পারেনি। সেই পাঁচ হাজার পুরুতমশাই দেবেন বলেছেন যদি মূর্তিটা সে তাঁর কাছে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারে।

সাগর আভাসকে বলল, 'তুই এখুনি থানায় ফোন করে জ্যাঠামশাইকে বল যে মূর্তিটা তাঁর অফিসে রয়েছে। কি করে সেটা ওখানে গেল সেটা পরে বলিস। আর বলিস যে পুলিশ যদি পারে তো পুরুতমশাইয়ের বাড়ি যেন যত শিগগির সম্ভব রেড করে। আরও অনেক পরিবারের হারানো গৃহদেবতার হদিস হয়তো সেখানে পাওয়া যেতে পারে।'

সাগর বলল, 'মূর্তিটা যে বিদেশের বাজারে চড়া দামে বিক্রি হতে পারে সেটা কে কে জানতে পারে? আভাস কিছুটা আন্দাজ করতে পারে হয়তো। ভুবনদা আর কনকদির প্রশ্নই ওঠে না। আপনিও জানেন না। জানেন তাহলে দুজন, জ্যাঠামশাই আর পুরুতঠাকুর। মূর্তিটা সরাতে পারলে দুজনেরই লাভ। জ্যাঠামশাই-এর তো ডবল লাভ। পুজোর ঝক্কি পোয়াতে হয় না, আর ওঁর ব্যবসাতেও টাকা ঢালা যেতে পারে।'

আভাস আশ্চর্য হয়ে বলল, 'তুই কি বাবাকেও সন্দেহ করেছিলি?'

'নিশ্চয়ই। গোয়েন্দাগিরি করতে গেলে কাউকে বাদ দেওয়া যায় না, জানিস না? কিন্তু, জ্যাঠামশাইকে বাদ দিতে হলো যখন চিন্তা করলুম মূর্তিটা বাড়ি থেকে বেরুল কি করে? মূর্তিটা ভারী। ব্রিফকেসে করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাঁর পূর্বপুরুষ যাই করে থাকুন না কেন, জ্যাঠামশাই সকাল নটা, সাড়ে নটার সময় ঐ মূর্তি, প্রকাশ্যেই হোক বা কাপড় জড়িয়েই হোক বগলদাবা করে গটগট করে হেঁটে রাস্তা দিয়ে যাবেন, তা হতেই পারে না।

'তাহলে বাকি রইলেন পুরুতমশাই। মূর্তিটা চুরি যাবার একটু আগে উনি এসেছিলেন একজন শাগরেদকে নিয়ে। উনি সেটা নিয়ে যেতে পারেন না কারণ উনি রোগাপটকা লোক। তাঁর শাগরেদটার কথা জানি না। কিন্তু, তার পক্ষেও মূর্তিটা থলেয় ভরে নিয়ে যাওয়া কঠিন ছিল। জ্যাঠাইমা বা কনকদি ওদের পুজোর সামগ্রী নিয়ে ঢুকতে দেখেছেন। সেগুলো নামিয়ে দিয়ে খালি থলে নিয়ে যাবার কথা। তার বদলে ভারী কোনো জিনিস থলের ভেতরে আছে টের পেলে তাঁরা প্রশ্ন করতে পারতেন।

'সেক্ষেত্রে সন্দেহ হয় আর যে দুজন সকালবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল, সেই দুজনের উপর। পুলিশ কনকদিকে সন্দেহ করল কারণ কনকদিই মূর্তিটা শেষবার দেখেছে এবং দরজায় তালা বন্ধ করেছে। তার ওপরে আবার চুরির ঠিক পরেই বাজারে যাবে বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। আমার কিন্তু সন্দেহ হলো দুজনের ওপরেই। বিশেষ করে ভুবনদার ওপরে। সে রান্না করে, ভারী ভারী বাসনপত্র, হাঁড়ি-কড়াই উনোনে তোলে নামায়। তার পক্ষে মূর্তিটা নিয়ে যাওয়া কোনো কঠিন ব্যাপার নয়।

'এখানেই বালতির কথাটা এল। বালতির ভেতরে মূর্তিটা রেখে একটা লোক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে অথচ সে কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে না। সে এক হতে পারে জমাদার অথবা হতে পারে ভুবনদা, পাড়ার সবাই জানে। ভুবনদা রান্না করে। সে যদি একটা বালতি হাতে রাস্তা দিয়ে যায়, তার ভেতরে একটা গামছা ঢাকা কিছু আর ওপরে একটি টিফিন ক্যারিয়ার উঁকি দিচ্ছে, তাহলে কারুর মনে কোনো সন্দেহই জাগবে না। সে তো রোজ ঐ সময়ই খাবার নিয়ে উল্টোদিকের বাড়িটাতে যায়। কাজেই তাকে সবাই দেখলেও, সে অদৃশ্যই থেকে যায়। সে যদি অফিসে রোজকার মতো না গিয়ে অন্য কোনো দিকে যেত, তাহলে কেউ জিজ্ঞাসু হলেও হতে পারত।

'তাইতেই মনে হলো, চোরাই মাল এখন জ্যাঠামশাই-এর অফিসেই আছে। এবং প্যান্ট্রিতে যেখানে ভুবনদা ছাড়া আর হয়তো কেউ যায় না। ভুবনদা ভেবেছিল, গোলমাল মিটে গেলে মাল পাচার হবে। কোনো অফিসের সামনে ট্যাক্সিতে মাল উঠছে দেখলে কেউ সন্দেহ করবে না।

'একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। মূর্তিটা ভুবনদা ঘর থেকে সরালো কি করে? হয় কনকদি দরজা খুলে দিয়েছিল নয়তো আজ সকালে পুরুতমশাই এসে একটা পরচাবি দিয়ে যান। এর মধ্যে কোনটা ঠিক, তা আমার জানা নেই। তবে, ভুবনদাকে জিজ্ঞেস করলে এ প্রশ্নের সঠিক উত্তরই পাওয়া যাবে বলে মনে হয়।'

[ভাদ্র ১৪০৯]

কারবাইনস কোভে আতঙ্ক

আশিস সান্যাল

ভোরের অনেক আগেই আজ ঘুম ভেঙে গেলো তমালের। দরজা খুলে বেরিয়ে এলো বারান্দায়। একটা ইজি-চেয়ার টেনে শরীর এলিয়ে দিলো তাতে। তাকিয়ে দেখলো, সামনের উত্তাল সমুদ্রের বুকে তখনও লেপটে আছে কুয়াশা। আকাশের পশ্চিম কিনারে একটা তারা তখনও দপদপ করছে।

অন্যদিন হলে হয়তো তমাল আবার ফিরে যেতো ঘরে। হয়তো আবার ঝাঁপিয়ে পড়তো বিছানায়। কিন্তু আজ একটা অদ্ভুত আহ্লাদে টগবগ করছে তার মন। এক অজানা রহস্য যেন তাকে ইশারায় ডাকছে।

কারবাইনস কোভ সমুদ্রসৈকতটি এমনিতেই একটু নির্জন। আন্দামানের পোর্টব্লেয়ার থেকে দূরত্ব প্রায় দশ কিলোমিটার। বিদেশী পর্যটকরা এলে অবশ্য ভোর থেকেই হৈ-চৈ লেগে যায়। নইলে কদাচিৎ দল বেঁধে লোকজন আসে পিকনিক করতে। পোর্টব্লোয়ার থেকে কখনও হেঁটে আবার কখনও বাসে। তাছাড়া বাকি সময় নির্জনে ঝিমোয় এই সৈকত।

তমাল বারান্দা ছেড়ে নেমে এলো নিচে। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলো সমুদ্রসৈকতে। আজ একেবারে নির্জন কারবাইনস কোভ। কোনও পর্যটক নেই। মাঝে মাঝে দু'একটা বড় ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে পাড়ে। সেই আছড়ে পড়ার শব্দ নির্জনতা ভেদ করে ছড়িয়ে পড়ছে বহুদূর।

তমাল আপন মনে গুনগুন গাইতে গাইতে এগিয়ে চলেছে জল ঘেঁষে ডান দিকে। সমুদ্রের ঠাণ্ডা হাওয়ায় জুড়িয়ে যাচ্ছে শরীর।

দেখতে দেখতে ফিকে হয়ে এলো আকাশটা। চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো সোনালি রোদ্দুর। ঢেউয়ের চূড়ায় চূড়ায় সেই রোদের সে কী ঝিকমিক। এক ঝাঁক ছোট ছাই রঙের পাখি ডানা মেলে উড়তে শুরু করেছে আকাশে।

হাঁটতে হাঁটতে তমাল চলে এলো অনেকদূর সেই পাথুরে ন্যাড়া ছোট পাহাড়গুলোর ঠিক পাশে। পাহাড়গুলোর গায়ে ছোট ছোট গর্ত। কিছুক্ষণ আগে ছাই রঙের যে পাখিগুলোকে উড়তে দেখেছিলো আকাশে, সেই পাখিগুলোই ফিরে এসে ঢুকে পড়ছে সেই সব গর্তে। কিছুক্ষণ পরেই আবার দেখতে পেলো, একসঙ্গে কিচিরমিচির করতে করতে উড়ে গেলো আকাশে। তাড়া খেয়ে হরিণ যেরকম পালিয়ে যায়, ঠিক সেই রকমের একটা সন্ত্রস্ত ভাব। হাসি পেলো তমালের।

পাহাড়গুলোর দিকে আরো কিছুটা এগিয়ে গেলো তমাল। হঠাৎ আঁতকে উঠলো সে। কালো পোশাক পরা একটি মানুষের দেহ পড়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে, যেন কিছুক্ষণ আগে খুন করা হয়েছে লোকটাকে।

ভয়ে কাঁপতে থাকলো তমালের সমস্ত শরীর। চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখলো। না, কেউ কোনোখানে নেই। একটা অজানা আতঙ্কে শিউরে উঠলো সে। দ্রুত ছুটে চললো বাড়ির দিকে। হাঁফাতে হাঁফাতে গিয়ে একেবারে বারান্দায় লুটিয়ে পড়লো।

ছোট কাকা তখন খাবার টেবিলে বসে ব্রেকফাস্ট সারছিলেন। তমালকে এভাবে বারান্দায় লুটিয়ে পড়তে দেখে প্রায় ছুটে এলেন বাইরে। দু'হাতে শরীরটাকে তুলে বসিয়ে দিলেন ইজি-চেয়ারটায়। উদ্বেগভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে? এভাবে ছুটে এলি কেন?'

'খুন।' হাঁফাতে হাঁফাতে উত্তর দিতে গিয়ে তমালের সমস্ত শরীর থরথর করে উঠলো।

ছোট কাকা কিছুটা বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, 'খুন? এই জনহীন সৈকতে? অসম্ভব। কি দেখতে কি দেখেছিস!'

'ঠিক দেখছি। একটা লাশ পড়ে আছে।'

'কোথায়?'

'ওই.....ন্যাড়া পাহাড়গুলোর নিচে।'

'ঠিক দেখেছিস তো?' ছোট কাকার যেন কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না।

তমাল বললো, 'সন্দেহ হচ্ছে তোমার? চলো না, দেখিয়ে দিচ্ছি।'

তমাল পথ দেখিয়ে আগে আগে চললো। পেছনে ছোট কাকা ও হাতে লাঠি নিয়ে বাড়ির দারোয়ান বদ্রিপ্রসাদ। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা পৌঁছে গেলো জায়গাটায়।

এবার ছোট কাকার বিস্মিত হবার পালা। সত্যি, পড়ে আছে একটা লাশ। গায়ে কালো পোশাক। দেখে চেনার কোনও উপায় নেই। মুণ্ডটা একেবারে থেঁতলে রেখেছে। পাশেই পড়ে আছে একটা রক্তমাখা বড় পাথরের টুকরো। বোঝাই যায়, ওই পাথরটা দিয়ে আঘাত করে খুন করা হয়েছে।

তমাল বলল, 'পুলিশকে এখুনি খবর দেওয়া দরকার।'

'ঠিক বলেছিল', ছোট কাকা উত্তর দিলেন, 'তুই চলে যা পোর্টব্লেয়ারে পুলিশকে খবর দিতে।'

'সে তো অনেক সময় লাগবে। দশ কিলোমিটার পথ। আপনি বরং গাড়িটা নিয়ে যান। আমি গেলে পুলিশের লোক পাত্তাই দেবে না।'

'তা অবশ্য ঠিক-ই বলেছিস। চল, বাড়ি ফিরে কি করা উচিত, ভাবা যাবে।'

কিছুক্ষণের মধ্যে সবাই ফিরে এলো বাড়িতে—বাড়ি মানে সরকারি বাংলোয়। তমালের ছোট কাকা এখানকার একজন পদস্থ সরকারি অফিসার। পনেরো বছর ধরে এখানেই আছেন। একা মানুষ। বিয়ে করেননি।

একা একা থাকতে হয় বলেই তমালকে নিয়ে এসেছিলেন এখানে। সে অনেকদিন আগেকার কথা। তমাল তখন সবে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। তমালকে দেখাশুনার জন্য একজন আয়া রাখা হয়েছিলো। রান্নবান্নার কাজও করতে হতো তাকে। তমাল তাকে মাসি বলে ডাকে। তমালকে পোর্টব্লেয়ারের একটি বিখ্যাত স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন ছোট কাকা। এখন সে দশম শ্রেণীর ছাত্র।

সব শুনে মাসির মুখটাও কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। ছোটো কাকাকে বললো, 'এতদিন আছি এখানে। এমন ঘটনার কথা তো কখনও শুনিনি। একটা কিছু বিহিত করুন। দেখবেন, তমালের যেন কোনও ক্ষতি না হয়।'

ছোট কাকাও কথাটা শুনে শিউরে উঠলেন। এতক্ষণ তমালের যে কিছু হতে পারে, তা ভাবেননি। এখন মাসির কথায় বুকের মধ্যে একটা চিন্তা দাপাদাপি শুরু করে দিলো। সত্যিই তো, খুনীর যদি তমালকে দেখে থাকে, তাহলে তথ্য লোপাটের জন্য তমালকেও সরিয়ে দিতে পারে। তিনি তো সকাল দশটায় বেরিয়ে যান আর ফেরেন রাতে। স্কুল থেকে ফেরার পর তমাল একাই ঘুরে বেড়ায় এই নির্জন সৈকতে। সুতরাং, খুনীদের ইচ্ছে থাকলে কাজ হাসিল করতে আর কতক্ষণ!

ছোট কাকার মনের সব চিন্তা কেবলই জট পাকিয়ে যেতে থাকলো। তমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই হবে। তাই আর সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়লেন গাড়ি করে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আবার ফিরে এলেন। সঙ্গে একটা পুলিশ ভ্যান। তাতে পুলিশের বড়বাবু এবং কয়েকজন কনস্টেবল। বড়বাবু ছাড়া সকলের হাতেই রাইফেল। ছোট কাকা মারুতি থেকেই তমালকে ডেকে বললেন, 'চলো তমাল।' তমাল এসে বসলো ছোট কাকার পাশে। দুটো গাড়ি এগিয়ে চললো সমুদ্রসৈকত ধরে ন্যাড়া পাহাড়গুলোর দিকে।

দেখতে দেখতে তারা পৌঁছে গেলো জায়গাটায়। কিন্তু একি! লাশটা গেলো কোথায়? এপাশ-ওপাশ

খোঁজাখুঁজি করলো তারা। দু'জন পুলিশ পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত উঠলো। কিন্তু সব বৃথা। লাশ পাওয়া গেলো না। বড়বাবু বললেন, 'খুনীরা খুব সেয়ানা। এর মধ্যেই লাশটা সরিয়ে ফেলেছে। তার মানে, কাছাকাছি পাহাড়ের মধ্যে লুকিয়ে ছিলো তারা। সব লক্ষ্য করেছে। আপনারা একটু সাবধানে থাকবেন।'

বড়বাবুর নির্দেশ মতো রক্তমাখা পাথরটা একজন পুলিশ তুলে নিলো ভ্যানে। তারপর তমালেরা চলে এলো বাড়িতে। পুলিশ চলে গেলো পোর্টব্লেয়ারের দিকে। সেদিনেই বিকেলে একজন কনস্টেবল এসে খবর দিলো যে, ছোট কাকা এবং তমালকে বড়বাবু তলব করেছেন। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব পোর্টব্লেয়ারের থানায় গিয়ে দেখা করতে হবে তাঁর সঙ্গে।

সময় নষ্ট না করে ছোট কাকা তক্ষুণি তমালকে নিয়ে গাড়ি করে বেরিয়ে গেলেন। পেছনের সিটে বসলো থানা থেকে আসা কনস্টেবলটি।

বড়বাবু অপেক্ষা করছিলেন তাঁদের জন্যই। ঘরে ঢুকতেই কিছুটা কৈফিয়তের সুরে তিনি বললেন, 'অসময়ে ডেকে পাঠালাম। কিছু মনে করবেন না। আসলে একটা জরুরি বিষয় আপনাদের জানানো দরকার।'

'বলুন।'

'এখানে নয়। যেতে হবে একজনের সঙ্গে দেখা করতে। শঙ্কর পিল্লাইয়ের নাম শুনেছেন তো?'

'পক্ষীবিজ্ঞানী শঙ্কর পিল্লাই?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তাঁর নাম কে না জানে!'

'কিছুক্ষণ আগে তিনি ফোন করেছিলেন আমাকে। আজকের খুনটার ব্যাপারে তিনি চিন্তিত।'

'কেমন করে জানলেন তিনি খুনটার কথা?'

'হয়তো লোকমুখে। মুখে মুখে ছড়িয়ে গেছে সারা তল্লাটে এই খুনের কথা। কিছু জরুরি তথ্য তিনি শোনাতে চান আমাদের। তাঁর ধারণা, এটা সবে আরম্ভ।'

'কি বলছেন এসব!' বেশ জোরেই বলে ফেললেন কাকাবাবু, 'মনে হচ্ছে, এখুনি বাংলোটা ছেড়ে চলে আসি পোর্টব্লেয়ারে।'

'এতো বিচলিত হবেন না। আমরা তো আছি। চলুন পিল্লাইয়ের বাড়িতে। কি বলেন তিনি শুনে আসি।'

ছোট দোতলা বাড়ি শঙ্কর পিল্লাইয়ের। একতলায় তাঁর বসবার ঘর। পাশেই গবেষণাগার। তার পাশে টিনের একটা বিরাট দোচালা ঘর। তাতে খাঁচায় বন্দী নানা ধরনের অজস্র পাখি। বাইরে থেকেও তাদের কিচিরমিচির শোনা যায়। দরজার কলিং বেল টিপতেই পিল্লাই নিজেই এসে দরজা খুলে দিলেন। বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, 'প্লিস, বি সিটেড।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।' বলে তমালেরা সোফায় গিয়ে বসলো। ডঃ পিল্লাই বসলেন একটা কাঠের চেয়ারে। জানতে চাইলেন, 'চা না কফি?'

'কফি।' বললেন বড়বাবু।

ডঃ পিল্লাই বেশ জোরেই হাঁকলেন, 'ইন্দু!'

পাশের ঘর থেকে একজন পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের মেয়ে এগিয়ে এলো। গায়ের রঙ—ঠিক ফর্সা বলতে যা বোঝায়, তা নয়। কিন্তু সর্বাঙ্গে লাবণ্যের ছাপ। টানা টানা চোখ। দীঘল চুল। পরনে লাল ব্লাউস আর হলুদ রঙের শাড়ি। মেয়েটি ডঃ পিল্লাইকে জিজ্ঞেস করলো, 'আমাকে ডেকেছেন?'

'হ্যাঁ।' উত্তর দিলেন পিল্লাই, 'বাড়িতে অতিথি। একটু কফির ব্যবস্থা করতে হবে।'

'ঠিক আছে।' বলেই মেয়েটি আবার চলে গেলো পাশের ঘরে। বড়বাবুর কৌতূহল, জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার মেয়ে বুঝি?'

'আজ্ঞে না। আমার কাছে গবেষণা করে। নাম ইন্দু যোশি। বাড়ি গুজরাটের সুরাটে।'

'এখানে কোথায় থাকেন?'

'এ বাড়িতেই। ওর জন্যে ওপরে একটা আলাদা ঘর রয়েছে। অন্যরা দু'জন বা তিনজন মিলে একটা ঘরে থাকে। কিন্তু ওর সবই আলাদা। ওর বাবার প্রচুর পয়সা। জাকার্তা, হংকং, সিঙ্গাপুর, টোকিও— মানে সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়েই নাকি তাঁর ব্যবসা। মেয়ের জন্য তাই সব আলাদা ব্যবস্থা করেছেন। মাঝে-মধ্যে তিনিও এসে থাকেন মেয়ের সঙ্গে। এখন কয়েকদিন তো এখানেই আছেন। আগামী মাসে যাবেন। হর্ষবর্ধন জাহাজে কেবিন বুক্ করা হয়ে গেছে। প্রথমে যাবেন কলকাতায়। তারপর সেখান থেকে নাকি হংকং যাবেন।'

'ওনার কথা পরে শোনা যাবে। এখন আসল কথা বলুন।'

'বলছি। এতো ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আচ্ছা, লাশটা প্রথমে কে দেখেছিলো?'

'আমি।' উত্তর দিলো তমাল।

'কোথায়?'

'ন্যাড়া পাহাড়গুলোর নিচে সমুদ্র পাড়ে।'

'পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট গর্ত দেখেছো?'

'অনেক।'

'লক্ষ্য করেছো নিশ্চয়ই, এক ধরনের ছোট ছাই রঙের পাখি তাতে থাকে।'

'হ্যাঁ। মাঝে মাঝে দল বেঁধে উড়ে যাচ্ছিলো আকাশে আবার ফিরে আসছিলো সেভাবেই। তারপর যে যার গর্তে ঢুকে পড়ছিলো।'

'ওগুলো এক ধরনের বিরল প্রজাতির পাখি। আন্দামানের এইদিকে এবং নিকোবরের কয়েকটি জায়গা ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও এই পাখি নেই। সমুদ্রের পাড়ে ন্যাড়া পাথুরে পাহাড়ে এই সব পাখিদের বাস। পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট গর্তে মুখের লালা দিয়ে ওরা বাসা বানায়। মুখের লালা দলা পাকিয়ে যায়। দেখলে মনে হয় যেন ফিটকিরির ঢেলা। দেখবে?'

নিজেই উঠে গিয়ে আলমারি খুলে ওই ধরনের পাখির একটা বাসা নিয়ে এলেন ডঃ পিল্লাই। সবাই দেখলেন নেড়েচেড়ে। ছোট কাকা মন্তব্য করলেন, 'আশ্চর্য তো!'

'সত্যিই আশ্চর্য হবার মতো।' বলে চললেন ডঃ পিল্লাই, 'জানেন, ওই বাসাগুলো মানুষ খায়?'

'খায়!'

'তাহলে বলছি কি! হংকং, ম্যানিলা, জাকার্তা, টোকিও প্রভৃতি জায়গায় এ হলো ডেলিসাস ফুড। পাঁচতারা হোটেলে পর্যন্ত এর স্যুপের দারুণ কদর।'

'কি বলছেন আপনি?'

'ঠিক-ই বলছি। এতো বছর ধরে তো এই নিয়েই গবেষণা করছি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ওই সব দেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে এ-রকম বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, বয়স ধরে রাখার জন্য এই স্যুপ হলো মোক্ষম খাদ্য। মেয়েরা তো ওই স্যুপের জন্য পাগল।'

'তার মানে, ওখানে ওই পাখির বাসার বেশ চড়া দাম।'

'প্রতি কেজির দাম ভারতীয় মুদ্রায় দু'হাজার টাকার মতো।'

'দু'হাজার টাকা!' ছোট কাকা এবং থানার বড়বাবু দু'জনেই রীতিমতো বিস্মিত হলেন কথাটা শুনে। ডঃ পিল্লাই বলে চললেন, 'ওই পাখির মাংসের দাম ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় পাঁচ হাজার টাকা কেজি। কিছু জীবনদায়ী ওষুধের জন্যও ওই পাখির বাসা একান্ত জরুরি।'

এবার তমাল যোগ দিলো আলোচনায়। ডঃ পিল্লাইকে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি বললেন যে, আন্দামান ও নিকোবরের কয়েকটি জায়গা ছাড়া এই পাখি পাওয়া যায় না। তাহলে—?'

'এখান থেকেই পাচার হয় ওই সব জায়গায়। আগে তো এই পাখি ধরা বা এদের বাসা চালান দেবার কোনও বাধা ছিলো না। যখন দেখা গেলো, এই প্রজাতির পাখি প্রায় বিলুপ্তির পথে, তখন সরকার বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনে এই পাখি ধরা বা তাদের বাসা ভাঙা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। তখন থেকেই চোরাপথে পাচারের চেষ্টা বৃদ্ধি পেতে থাকলো। এখন তো—!'

'তার মানে, আপনি বলতে চান যে আজকের এই খুনটার পেছনে রয়েছে চোরাকারবারিদের হাত?' জানতে চাইলেন বড়বাবু।

ডঃ পিল্লাই নির্লিপ্তভাবে উত্তর দিলেন, 'বুঝে নিন। একটু পুলিশী নজরদারির ব্যবস্থা করুন কারবাইনস কোভের ওই জায়গাটায়।'

'আজ থেকেই করছি।'

ডঃ পিল্লাইকে নমস্কার জানিয়ে সেখান থেকে বিদায় নিলো তারা। কিছুক্ষণের মধ্যেই তমালকে নিয়ে ছোট কাকা ফিরে এলেন তাঁদের বাংলোয়। থানার বড়বাবু গেলেন পুলিশ চিফ-এর সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে।

কারবাইনস কোভে সেদিন থেকেই শুরু হলো পুলিশের জোর টহলদারি। দিনে-রাতে, দফায় দফায়। কিন্তু এর মধ্যেই ঘটে গেলো আরেকটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা।

খুন হলেন ডঃ শঙ্কর পিল্লাই। সন্ধ্যার পর বেড়াতে বেরিয়েছিলেন রাস্তায়। সমুদ্রপাড়ের একটা নির্জন জায়গা দিয়ে যখন যাচ্ছিলেন, তখন নাকি কয়েকজন লোক পেছন থেকে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বড় পাথর দিয়ে আঘাত করে মুণ্ডটা এমনভাবে থেঁতলে দেওয়া হয়েছে যে দেখে চেনার উপায় নেই। দেহ শনাক্ত করেছে ইন্দু যোশি। কারণ, ডঃ পিল্লাইয়ের কোনও আত্মীয়-স্বজন ছিলো না শনাক্ত করার মতো।

এই খুনের মধ্যেও তমাল যেন একটা রহস্যের গন্ধ পায়। তার মনে হয়, একটা বিরাট চক্র যেন এ সবের পেছনে সক্রিয়।

সেদিন মাঝ রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় তমালের। বাইরে তখন টিপ টিপ বৃষ্টির শব্দ। আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা। হয়তো কিছুক্ষণ পরে আরো জোর বৃষ্টি নামবে। সমুদ্র বেশ উত্তাল। তরঙ্গভঙ্গের বিপুল আওয়াজ ভেসে আসছে। হঠাৎ দূরের সেই ন্যাড়া পাহাড়ের চূড়ার দিকে লক্ষ্য করলো তমাল—টর্চের আলো জ্বলছে আর নিভছে।

এই দুর্যোগের রাতে কে বা কারা আসতে পারে ওখানে? হয়তো পুলিশ টহল দিচ্ছে। কিন্তু পাহাড়চূড়ায় এই দুর্গম রাতে পুলিশ যাবে কেন? একটা অদ্ভুত ভাবনা তমালের মনে দুপদাপ করতে শুরু করলো।

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো তমাল। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলো আলমারির দিকে। একটা কালো রেন-কোট জড়িয়ে নিলো শরীরে। তারপর চুপি চুপি পাশের ঘরে ঢুকে ছোট কাকার রিভলভারটা তুলে নিলো পকেটে। খুব সন্তর্পণে বেরিয়ে এলো বাংলো থেকে। সমুদ্রসৈকত ধরে এগিয়ে চললো সেই ন্যাড়া পাহাড়গুলোর দিকে।

তখন সমুদ্রের সে কী গর্জন! ঝড়ো হাওয়া এসে থাবা মারছিলো তমালের গায়ে। তাল রাখতে না পেরে মাঝে মাঝে সে পড়ে যাচ্ছিলো বালিতে। কিন্তু তমাল আজ মরিয়া। যে করেই হোক, তাকে যেতে হবেই।

এক সময় সে ঝড়-ঝাপটা সামলাতে সামলাতে পৌঁছে গেলো পাহাড়গুলোর পাশে। লক্ষ্য করে দেখলো, পাহাড়গুলোর চূড়ায় চূড়ায় যেন কয়েকটা কঙ্কাল ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাহলে কি কিছু অশরীরী আত্মা এসে ভিড় করেছে এখানে? এমন সময় হঠাৎ একটা টর্চের আলো এসে পড়লো তার গায়ে।

'কে? কে ওখানে?' কে যেন গর্জে উঠলো।

তমাল পেছন ফিরে দৌড় দেবে ভাবছিলো। কিন্তু তার আগেই কয়েকটা কঙ্কাল ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর। একটা কাপড়ের টুকরো দিয়ে মুখ বেঁধে দিলো তার। যেন টুঁ শব্দটিও সে না করতে পারে। তারপর তমালের হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখলো সমুদ্রপাড়ের বালিয়াড়িতে।

তমাল দেখতে পেলো, তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে দশ-বারো জন লোক। প্রত্যেকের পরনে কালো পোশাক। পোশাকের ওপর হাড়ের মতো সাদা সাদা দাগ। দূর থেকে এদেরই মনে হয়েছিলো তমালের কঙ্কালের মতো। একজন বললো, 'এ তো দেখছি সেই বিচ্ছুটা! দেবো নাকি সাবাড় করে?'

'না-না। সাবধানে কাজ করতে হবে। এখন আরেকটা খুন হলে চারদিকে হৈ-চৈ পড়ে যাবে।' উত্তর দিলো আরেকজন।

'তাহলে?'

'নিয়ে চল সঙ্গে। পরে দেখা যাবে।'

দেখতে দেখতে একটা কালো রঙের ভ্যান এসে দাঁড়ালো সামনে। লোকগুলো সবাই উঠে বসলো তাতে। সকলের পিঠেই একটা করে ভর্তি বস্তা। তারপর একজন এসে চ্যাংদোলা করে হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থাতেই তমালকে তুলে নিলো সেই গাড়িতে।

ঘণ্টাখানেকের ভেতর পোর্টব্লেয়ার জাহাজ ডকের পাশে জঙ্গলের মধ্যে একটা টিনের চাল দেওয়া ঘরের সামনে এসে থামলো গাড়িটা। সবাই মালপত্র নিয়ে নেমে সেই ঘরে ঢুকলো। তমালকেও দু'জন লোক চ্যাংদোলা করে নিয়ে গেলো।

ঘরের মধ্যে টিম টিম করে জ্বলছে একটা লণ্ঠন। তার সামনে একটা ভাঙা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে একটা লোক। স্তিমিত আলোতেও তমালকে চিনতে অসুবিধা হলো না। আঁতকে উঠলো সে। পক্ষীবিজ্ঞানী ডঃ পিল্লাই বসে বসে হিসেব করছেন। লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে নির্দেশ দিলেন, 'তাড়াতাড়ি ওজন করে প্যাকেট কর। প্রতিটি প্যাকেটের উপরে আর নিচে থাকবে ফিটকিরি। চারটি বাক্সে সব প্যাকেট করতে হবে। হর্ষবর্ধন জাহাজে ইন্দু যোশি, তার বাবা উমেশভাই যোশি, দুই বোন ইলা বেন ও কুমুদ বেনের নামে বুক করা আছে একটা কেবিন। সব মাল ওই কেবিনে উঠবে।'

'এবার কতো টাকার মাল যাচ্ছে?'

'পঞ্চাশ লক্ষ টাকার মতো।'

'তা আমাদের বখশিস?'

'কাল সকলেই মিটিয়ে দেবো। কিন্তু কাজ চালিয়ে যাবি ঠিকমতো। মাস তিনেক বাদেই আবার ফিরছি। তখন আবার মাল চাই কিন্তু।'

'এখন কোথায় যাবে?'

'কাল তো হর্ষবর্ধন জাহাজে উঠছি। খিদিরপুর ডকে গিয়ে নামবো। সেখান থেকে সোজা দমদম বিমানবন্দরে, তারপর হংকং। লোক ফিট করা আছে সব জায়গায়।'

'এই বিচ্ছুটাকে কি করবো? মুণ্ড থেঁতলে ফেলে দেবো সমুদ্রে?'

'না। আবার লাশটা জলে ভেসে পাড়ে এসে আটকে গেলে পুলিশ ক্লু পেয়ে যাবে। তার চেয়ে যে অবস্থায় আছে, ঠিক সেইভাবেই একটা বস্তায় পুরে তুলে দে জাহাজে। কাল রাতে যখন মাঝ সমুদ্রে গিয়ে পড়বে, তখন চুপি চুপি বস্তাটা ডেকে তুলে ফেলে দেবো সমুদ্রে। কেউ জানতেও পারবে না কোনোদিন।'

'তাই ভালো।'

'সব কিছু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে-চিন্তে করতে হয়। এই লাইনে একটু ভুল হলেই বিপদ। দেখলি না, ডঃ পিল্লাইয়ের খুনটা কেমন প্ল্যান করে করা হয়েছে।'

'সত্যি, তুলনা হয় না। কেউ বুঝতে পারলো না ডঃ পিল্লাই বলে আদপে কেউ ছিলো না।'

'অভিনয়টা কেমন হয়েছিলো, বল। এখন আমি উমেশভাই যোশি।'

'লাশটা পেলে কোথায়?'

'হাসপাতালে আমার এক পরিচিত নার্স আছে। তাকে বলে রেখেছিলাম, কেউ মারা গেলে যদি তার লাশের কোন দাবিদার না থাকে, তবে যেন আমাকে জানায়। এতো তাড়াতাড়ি যে সুযোগটা এসে যাবে, ভাবিনি। নইলে হয়তো—?'

'আরো একটা খুন।'

'ঠিক। তবে সেই দায় থেকে বাঁচালো হাসপাতালের সেই নার্স। খবর পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে চলে গিয়েছিলাম হাসপাতালের মর্গে। ডোমকে কিছু টাকা দিয়ে লাশটা গাড়িতে তুলে সোজা চলে এলাম বাড়িতে। পিল্লাইয়ের সাজে আমি যে-সব পোশাক পরতাম, তাই পরিয়ে দিলাম লোকটার গায়ে। তারপর তো খুবই সোজা। রাস্তার নির্জন জায়গায় লাশটা রেখে একটা বড় পাথর দিয়ে মুণ্ডটা একেবারে থেঁতলে দিলাম। যাতে কেউ চিনতে না পারে।'

'ঠিক মতো ফরেনসিক পরীক্ষা হলে কিন্তু সব ধরা পড়তো।'

'কোনও সন্দেহ হলে তবে তো? এখানে সন্দেহের কোনও পথ খোলা রাখিনি। দেখলি না, সবাই কেমন সহজেই মেনে নিলো যে ডঃ পিল্লাই খুন হয়েছেন। তা ছাড়া অন্য ব্যবস্থাও করা ছিলো।'

'তবে শ্যামাচরণকে খুন করে ভালো করেননি।'

'উপায় ছিলো না।'

'কেন?'

'ও বিশ্বাসঘাতকতা করতে চেয়েছিলো আমার সঙ্গে। গোপনে যোগ দিয়েছিলো শ্রীকান্তন নায়ারের সঙ্গে। ওকে না সরালে আমাদের ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যেতো।'

পরদিন দুপুরের আগেই হর্ষবর্ধন জাহাজের বুক করা কেবিন চারজন যাত্রী সহ সব মাল তুলে দেওয়া হলো।

তমালকেও একটা বস্তায় হাত-পা বাঁধা অবস্থায় গোপনে তুলে দেওয়া হলো। মুখও বাঁধা ছিলো তার শক্ত করে। যাতে টুঁ শব্দটিও না করতে পারে। কেউ টের পেলো না। জাহাজ উঠবার ঠিক আগে উমেশভাই যোশি বখশিসের টাকা তুলে দিলো একজনের হাতে।

জাহাজ চলতে শুরু করেছে। তমাল স্পষ্ট অনুভব করলো জাহাজের দোলানি। যতো সময় যাচ্ছে, ততোই আতঙ্কে অবশ হয়ে আসছে তার শরীর। আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে অজান্তে তার দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। ছোট কাকার জন্য তার মনটা কেমন যেন করতে লাগলো। হয়তো হন্যে হয়ে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন তার জন্যে।

এর মধ্যেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে অন্ধকার। রাত আটটায় বাজলো জাহাজের ডিনারের ঘণ্টা। ইন্দু যোশি একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে কি যেন ভাবলো। তারপর উমেশভাইকে লক্ষ্য করে বললো, 'খেতে যেতে হবে তো?'

'একজনকে তো পাহারায় রেখে যেতে হবে। নইলে—'

'আমিই থাকি তাহলে। আপনারা যান। আপনারা খেয়ে এলে তারপরে আমি যাবো।'

কথা শুনে বাকি তিনজন চলে গেলো খেতে। একা হতেই ইন্দু যোশি তমালের বস্তার মুখ চাকু দিয়ে কেটে দিলো। খুলে দিলো হাত-পা-মুখের বাঁধন। তমাল বস্তা থেকে বেরিয়ে এলে বললো, 'একদম চুপ। এসো, আমার পেছন পেছন। যেন কেউ টের না পায়।'

'কোথায়?'

'সে সব কথা পরে হবে। বাঁচতে যদি চাও, তবে এসো।'

তমাল আর কোনও কথা না বাড়িয়ে অন্ধের মতো চললো ইন্দুর পেছন পেছন। একটা সরু সিঁড়ি দিয়ে তারা উঠে গেলো উপরে সোজা ক্যাপ্টেনের ঘরে। সব শুনে ক্যাপ্টেন সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠিয়ে

দিলেন পোর্টব্লেয়ারের জাহাজ-অফিসে। ইন্দু যোশি আর তমালকে নিয়ে গেলেন আরেকটা ঘরে। বললেন, 'চুপচাপ বসে থাকো এখানে। ওরা পাগলের মতো খুঁজে বেড়াবে তোমাদের দু'জনকে। এটা আমার ঘর। বাইরে থেকে তালা দিয়ে যাচ্ছি।'

রাত ক্রমশ গভীর হতে থাকলো। অন্ধকারের বুক চিরে কালো জলের ওপর সাঁতরাতে সাঁতরাতে ছুটে চলেছে হর্ষবর্ধন। কিন্তু জাহাজের গতি তুলনায় কম। ক্যাপ্টেন ইচ্ছে করেই গতি কমিয়ে দিয়েছেন।

হঠাৎ চারদিক থেকে জাহাজটায় ছড়িয়ে পড়লো সার্চলাইটের আলো। জল-পুলিশের দশটি পুলিশের বোট ঘিরে ফেলেছে হর্ষবর্ধনকে। উমেশভাই কিছু করবার আগেই দেখতে পেলো, চারজন জল-পুলিশ হাতে রিভলবার তাক করে দাঁড়িয়ে আছে তার কেবিনের সামনে। একজন চেঁচিয়ে বলে উঠলো, 'হ্যান্ডস্ আপ। নইলে বুক এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যাবে।'

সুবোধ বালকের মতো হাত তুলে দাঁড়ালো উমেশভাই। সঙ্গে আরো দু'জন। উমেশভাই জানতে চাইলো, 'আমার অপরাধ?'

'খুন, প্রতারণা, চোরা-কারবার। ভারতীয় দণ্ডবিধির অনেক কটা আইনেই গ্রেপ্তার করা হচ্ছে তোমাকে।'

'প্রমাণ?'

'এখুনি দেখতে পাবে।' বলেই ওদের তিনজনকে হাত-কড়া পরিয়ে নিয়ে আসা হলো ক্যাপ্টেনের কেবিনে। সেখানে তখন নিশ্চুপ বসেছিলো ইন্দু যোশি ও তমাল।

পুলিশের জেরায় ইন্দু যোশি জানালো, 'উনি উমেশভাই যোশি নন। ডঃ শঙ্কর পিল্লাইও নন। ডঃ শঙ্কর পিল্লাইয়ের ছদ্মবেশে এক শয়তান। উমেশ যোশি আমার বাবা। এই শয়তানটাই খুন করেছে আমার বাবাকে। দলের সবাই জানে, খুন করা হয়েছে শ্যামাচরণকে। কিন্তু আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি। ভয়ে আমি বলতে পারিনি এতদিন। আমি অনুমান করতে পেরেছি জেনে শয়তানটা আমাকেও শাসিয়েছে। কাউকে জানালে শেষ করে দেবে আমাকে। শ্যামাচরণকে যে কোথায় গুম্ করে রেখেছে, তা বলতে পারবো না।'

'কিন্তু তোমার বাবা, মানে উমেশ যোশিকে খুন করলো কেন?'

'অনেক দিন ধরেই বাবা আমাকে দেখতে চাইছিলেন। সেই সুযোগটাই নিলো এই শয়তানটা। বাবাকে চিঠি লিখে আনালো এখানে। যাবার বুকিংও করা হয়েছিলো। এখন বুঝতে পারছি, এটাও ছিলো একটা চালাকি। নিজের নামে কেবিন বুক করলে আবগারী পুলিশের দৃষ্টি এড়ানো কঠিন হবে ভেবে। তাছাড়া ডঃ পিল্লাইয়ের ছদ্মবেশ থেকে মুক্তি পাবার এ ছিলো একটা সহজ উপায়।'

ইন্দু যোশির চোখ বেয়ে অঝোরে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। জল-পুলিশের বোটে যখন তারা পোর্টব্লেয়ারে এসে পৌঁছালো, তখন রীতিমতো সকাল। তমাল দেখতে পেলো, পাড়ে গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ছোট কাকা। তাঁর পাশে মাসি ও বদ্রিপ্রসাদ। অন্যদিকে পুলিশের বড়বাবু এবং একদল কনস্টেবল।

বোট থেকে কোমরে দড়ি বাঁধা অবস্থায় তিনজনকে নিয়ে নামলো জল-পুলিশ। থানার বড়বাবু গাড়িতে করে ওদের পাঠিয়ে দিলেন হাজতে। চার নম্বর কেবিন থেকে পাওয়া জিনিসপত্র তোলা হলো অন্য একটা গাড়িতে।

তমাল ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো ছোট কাকার বুকে। ইন্দু যোশির দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞ-ভরা চোখে বললো, 'তাহলে যাই?'

'যাও। ভালো থেকো। কিন্তু আমি?'

'আপনাকে বেশ কিছুদিন থাকতে হবে এখানে।' বললেন থানার বড়বাবু। 'আপনিই প্রধান সাক্ষী। আপনার বাবা ও ডঃ পিল্লাইয়ের খুনের একমাত্র সাক্ষ্য আপনিই দিতে পারেন।'

'কিন্তু?'

'ভয় নেই। আপনার নিরাপত্তার পুরো দায়িত্ব আমার।'

একটু থেমে আবার জিজ্ঞেস করলেন ইন্দু যোশিকে, 'তার মানে, প্রথম যে লাশটা পাওয়া গিয়েছিলো, সেটাই ডঃ পিল্লাইয়ের?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ। ওই বিরল প্রজাতির পাখিদের সম্বন্ধে গবেষণার জন্য তিনি গভীর রাতেও যেতেন সেখানে।'

ইন্দু যোশিকে নিয়ে বড়বাবু উঠলেন একটা মারুতি গাড়িতে। বিষাদভরা মুখে অনেকক্ষণ তমালের দিকে তাকিয়ে থাকলো ইন্দু যোশি। ছোট কাকাও তমাল, বদ্রিপ্রসাদ আর মাসিকে নিয়ে রওনা হলেন বাংলোর দিকে। চারদিকে তখন ছড়িয়ে পড়েছে ঝলমলে রোদ।

[মাঘ ১৪০৫]

চুপিচুপি গুপ্ত এন্ড কোং

দীপঙ্কর বিশ্বাস

রবিবার সকালবেলা হেদুয়া থেকে সাঁতার কেটে এসে সবে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছি, হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল গণেশ। হাতে চিনেবাদামের ঠোঙা। আমার মেজাজটা একটু বিগড়েই গেল। রোজ, এই সময়ে কেউ না কেউ ডিস্টার্ব করবেই। হয় সেজদা, নয় ছোড়দি, নাহলে অন্য কেউ। মাত্র পনেরোটা মিনিট মনোযোগ দিয়ে চুল আঁচড়াবো, তার যো নেই। এদিকে নিজেরা বিয়েবাড়ি যাবার আগে যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুল আঁচড়ায় তখন ঘরে ঢুকলেই তো তুলকালাম। ছোট হওয়ার এই বিপদ। গণেশ যতোই নিকট বন্ধু হোক না কেন, এই সময়টাতে কাউকেই সহ্য করা যায় না। আমি বললাম, 'দাঁড়া চুলটা একটু.....'

গণেশ যথারীতি আমাকে মাঝরাস্তায় থামিয়ে, হাতে খানিকটা বাদাম ভাজা ঢেলে দিয়ে বলল, 'একটা কাজ করতে পারবি?'

আমি চিরুনি মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি কাজ?'

গণেশ মুখের ভেতর আরো খানিকটা বাদামভাজা চালান করল, 'কাজটা একটু শক্ত কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং।'

আমি গণেশকে বহুদিন চিনি। তাই কাজটা যে চাঁদে যাওয়া, এভারেস্টে ওঠা, হাউই তৈরি না ইঁদুর মারা গোছের, যা কিছুই একটা হতে পারে সেটা আমার জানা, তাই বললাম, 'ভণিতা না করে বলেই ফেল না কি কাজ।'

গণেশ শেষ বাদামগুলো মুখে ফেলে ঠোঙাটা মুড়িয়ে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলতে ফেলতে বলল, 'ডিটেকটিভের অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ করতে পারবি?'

মুহূর্তে আমার মানসপটে কতোগুলো ছবি ফুটে উঠল। আমি বললাম, 'না ভাই, আমি অতো হামাগুড়ি দিতে পারবো না। আমি অনেক সিনেমায় দেখেছি, ডিটেকটিভের অ্যাসিস্ট্যান্ট হাতে একটা আতস কাচ নিয়ে মাইলের পর মাইল, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত পার হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে। তিন হাত-পায়ে হামা দেওয়া ভারি শক্ত।'

গণেশকে একটু চিন্তিত দেখায়, 'আহা ওরকম একটু-আধটু হামাগুড়ি নামকরা অনেককেই দিতে হয়। সাজাহান থিয়েটারে সাজাহান, মা দুর্গার সিংহ আর তাছাড়া ডিটেকটিভ স্বয়ংও তো হামাগুড়ি দেয়।'

আমি বললাম, 'আমাকে বরং ডিটেকটিভ কর না।'

গণেশ একটু হাসল, 'ওটা তোকে দিয়ে হবে না। ওতে অনেক জানতে হয়, প্রচুর এক্সপিরিয়েন্স লাগে। তাই ডিটেকটিভটা আমাকেই হতে হবে।'

কথাগুলো অবশ্য বাজে বলেনি গণেশ। গোয়েন্দাগিরি সম্বন্ধে গণেশের অগাধ জ্ঞান। যত রকমের রহস্য উপন্যাস বাজারে পাওয়া যায় সবই গণেশের নখদর্পণে। মাঝে-মধ্যেই গণেশ আমাদের তা থেকে রোমহর্ষক জায়গাগুলো পড়ে শোনায়। কোথাও গোয়েন্দা বারোতলা বাড়ির ছাদ থেকে একহাতে ঝুলতে ঝুলতে আততায়ীকে খামচে দিচ্ছে, কোথাও গোলাবারুদের বৃষ্টির ভেতর গোয়েন্দা এমন ডিগবাজি খাচ্ছে যে একটাও গুলি গোয়েন্দাদের গায়ে লাগছে না, আরো কত রকম। তাছাড়া গোয়েন্দা হবার জন্য প্রয়োজনীয় ক্যারাটে-ফ্যারাটের মতন হরেকরকম কসরত গণেশের জানা।

গণেশ বলল, 'অভিজ্ঞতা দেখবি?'

আমি দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হলাম। গণেশ ঘাড় বেঁকিয়ে আড়চোখে চাইল, 'তুই আজ সকালে সাইকেল নিয়ে পড়ে গেছিস। তাতে তোর ডান পায়ের হাঁটুর একটু নিচে কেটে গেছে।'

আমি বললাম, 'একটু রং নাম্বার হলো গণেশ। আমি আজ সকালে ট্রামে চড়ে সাঁতার কাটতে গেছি। প্যান্টের হাঁটুর কাছে, ওটা রক্তের দাগ না! একটা লোক পানের পিক ফেলেছে তারই দাগ।'

গণেশের মুখটা একটু ভারী দেখাল। বলল, 'চিরুনিটা দেখি।' চিরুনিটা কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে গণেশ বলল, 'এটা যে দোকানে কেনা সেই দোকানীর সামনের দুটো দাঁত নেই, মাথায় টাক আব ডান ভুরুর ওপর একটা কাটা দাগ আছে।'

আমি এবার মুগ্ধ না হয়ে পারি না। একটা চিরুনি দেখে দোকানী সম্বন্ধে এত কথা বলা..... সত্যি প্রচুর অভিজ্ঞতা ছাড়া হয় না। চিরুনিটা আমি টেনে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখলাম। না! অসম্ভব!!

পাঞ্জাবির পকেট থেকে পটাং করে একটা বই টেনে বার করল গণেশ। বইটার নাম 'সরল গোয়েন্দাগিরি'। আমি বইটা ছোঁ মারবার জন্যে হাত বাড়ালাম। গণেশ টপ্ করে বইটা পকেটে পুরে ফেলে বলল, 'ধীরে। ডিটেকটিভদের প্রথম কর্তব্য উত্তেজিত না হওয়া।'

গোয়েন্দার পদের জায়গায় শাগরেদের পদটা গ্রহণ করা ঠিক হবে কিনা মনে মনে ভাবছিলাম। গণেশ বলে চলল, 'তোকে দিয়ে শাগরেদের কাজটা বেশ ভালো চলে যাবে। তুই খুব ভালো দৌড়তে পারিস। আমার থেকেও ভালো। আততায়ীর সামনে বা পেছনে ওটা খুবই জরুরী।'

আমি একটু খুশি না হয়ে পারি না, 'আততায়ীর পেছনেটা বোঝা গেল কিন্তু আততায়ীব সামনেটা .....'

'আততায়ী যদি খুব ষণ্ডামার্কা হয় আর তাড়া করে, সে ক্ষেত্রে আততায়ী পেছনেই তো থাকবে।' বুঝিয়ে দেয় গণেশ—'তাছাড়া তোর মতন একটু বোকাসোকা শাগরেদ হলেই ভালো। তোকে সব দেখে শুনে একটু ভুল বলতে হবে, তখন আমি তোর ভুলগুলো ভাঙিয়ে দেবো।'

এবাব গণেশেব কথায় আমার খুব রাগ ধরে গেল। মনে মনে বললাম, 'তোর কতো বুদ্ধি তা আমার জানা আছে। কালও অঙ্কের ক্লাস দাঁড়িয়ে কাটিয়েছিস।'

আমার মুখ দেখে গণেশ বলল, 'আহা চটছিস কেন? গোয়েন্দা দলের ওটাহ দস্তুর। ধর, আমরা তদন্ত করতে গেছি, দেখলাম খুনী একটা সিগারেটের টুকরো ফেলে গেছে। এমনি লোক হয়তো চিনতে পারতো, কিন্তু গোয়েন্দার শাগরেদ মানে তুই ওটাকে বিড়ি বা পেন্সিল বা অন্য কিছু ভাববি। আমি তখন বুঝিয়ে বলব—ওটা বিড়ি বা পেন্সিল নয় হে, ওটা আধপোড়া সিগারেট। আমার ভারতে তৈরি পঞ্চাশ রকমের সিগারেটের সঙ্গে পরিচয় আছে.....। পোশাক-আশাক সম্বন্ধে কতগুলো কড়া নিয়ম পালন করতেই হয় গোয়েন্দাদের।' বলে চলে গণেশ—'একটা বর্ষাতি আর একটা চোখ-অবধি নামানো টুপি পরতেই হয়। যেগুলো ছদ্মবেশ ধারণ না করলে কিছুতেই খুলতে পাবি না। গ্রীষ্ম, বর্ষা, ভূমিকম্প, পেটফাঁপা কিছুতেই না।'

আমি মনে মনে পরিস্থিতিটা কল্পনার চেষ্টা করি, 'ছদ্মবেশের ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বল।'

'এটা বুঝছিস না! আততায়ীকে ফলো করার সময় বেদুইন, ভবঘুরে, হনুমান—এই ধরনের কিছু সেজে নিতে হয় যাতে আততায়ী মোটে টেরটি না পায়। কি? গোয়েন্দার শাগরেদ হতে রাজী?' জিজ্ঞেস করে গণেশ।

আমি বলি, 'একট দিন ভাববার সময় দিবি তো?'

গণেশ বলে, 'এক ঘণ্টাও না। তুই আমার এতো বন্ধু বলে তোকেই প্রথম অফারটা দিচ্ছি। তুই রাজী না হলে অনেক লোক আছে। হাতের সামনে কেস হাজির—আসামী ধরতে পারলে অনেক টাকা। নষ্ট করার সময় একটুও নেই। আমি অনেকদূর ভেবে এসেছি তুই রাজী হলেই এক্ষুণি বলব।'

আমি বললাম, 'রাজী।'

গণেশ বলল 'ওরকমভাবে রাজী হলে হবে না। একটা ভালো সাদা কাগজ নিয়ে আয়।'

আমি একটা কাগজ নিয়ে এলাম তাতে গণেশ ওপরে নিজের নাম লিখে পাশে লিখল ওরফে চুপিচুপি। তার তলায় আমার নাম লিখে পাশে লিখল ওরফে গুপ্ত। কাগজটার প্রায় নিচের কাছাকাছি লিখল 'চুপিচুপি গুপ্ত এন্ড কোং'। বুকপকেট থেকে একটা আলপিন বার করল গণেশ। নিজের বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে সেটা ফুটিয়ে এক ফোঁটা বক্ত বার করে নিজের নামের পাশে একটা টিপ ছাপ দিল। আমি বিষিয়ে যাবার ভয়ে আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু একটু লজ্জাই করল। আঙুলে পিন ফুটিয়ে টিপ ছাপ দিয়ে কাগজটা গণেশের দিকে এগিয়ে দিলাম।

গণেশ বলল, 'আজ থেকে আমি গোয়েন্দা 'চুপিচুপি' আর তুই আমার শাগরেদ 'গুপ্ত'। আমাদের সংস্থার নাম 'চুপিচুপি গুপ্ত এন্ড কোং'।

আমি মুগ্ধ—'তোর এলেম আছে গণেশ। দারুণ নাম দিয়েছিস। কে বুঝবে গোয়েন্দার বাসা। লোকে ভাববে মুদিখানা। কিন্তু একটা কথা বলবি, কি করে চিরুনি দেখে বুঝলি দোকানীর চেহারা?'

গণেশ বলল, 'বাজে বকার সময় নেই। এক্ষুণি কেসের পেছনে ছুটতে হবে। নেহাৎ শুনতে চাইছিস যখন বলছি। ও চিরুনিটা আমার সেজদার ফ্যাক্টরির মাল। বাজে বলে এ তল্লাটে কেউ রাখে না একমাত্র অরিন্দম স্টোরস্ ছাড়া। ওর মালিকের.....।'

আমি বললাম, 'ও!'

গণেশ আমার হাতে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলল, 'এক মিনিটও নষ্ট করার নেই। এক্ষুণি মোড়ের মাথায় পোস্ট অফিসে যেতে হবে।'

আমরা যখন পোস্ট অফিসে পৌঁছলাম তখন প্রায় এগারোটা বাজে। প্রচুর লোকের ভিড়। তার ভেতর দিয়ে গণেশ আমাকে হিড়হিড় করে শেষ প্রান্তে টেনে নিয়ে গিয়ে দেওয়ালের দিকে আঙুল তুলে ফিসফিস করে বলল, 'ভালো করে চেয়ে দেখ।'

আমি বললাম, 'ফিসফিস করে বলছিস কেন? পোস্ট অফিসে টাকা রাখলে সুবিধের কথা লেখা। এ তো সব পোস্ট অফিসেই থাকে।'

গণেশ এবার আমার প্রায় কানে কানে বলল, 'আঃ, তার পাশের ছবিটা দেখ।'

আমি দেখলাম পাশেই একটা লোকের বুক পর্যন্ত ছবি। ফটোগ্রাফ নয়। হাতে আঁকা ছবির কপি। তলায় লেখা—'সন্ধান দিতে পারলে নগদ পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার।'

গণেশ বলল, 'চিনতে পারছিস?'

আমি একটু চটে গেলাম, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ পারছি। মানুষের ছবি। পরিষ্কারই তো বোঝা যাচ্ছে।'

'আঃ! বোকামো করিস না। লোকটাকে চিনতে পারছিস?'

'কেন তুই-ই তো একটু বোকামো করতে বলেছিস।'

আমার কানে প্রায় মুখ ঢুকিয়ে দিল গণেশ, 'আঃ, সে সব পরে।'

আমি ভালো করে ছবিটাকে নিরীক্ষণ করলাম। মুখটা সত্যিই খুব চেনা। অনেকবার দেখেছি। মুহূর্তে গণেশের অনেকগুলো কথা পরিষ্কার হয়ে গেল। এটাই আমাদের, মানে 'চুপিচুপি গুপ্ত'র প্রথম কেস। ছবিটা দেখে আগেভাগে কেউ যদি পুরস্কারটা পেয়ে যায়, তাই গণেশের এত তাড়া।

গণেশ বলল, 'এটা পুলিশের আর্টিস্টের আঁকা ক্রিমিনালের ছবি। ওরা যে লোক ঠ্যাঙানি খায় বা মারা যায় তার মৌখিক বিবরণ থেকে আঁকে। তাই ছবিটা বেশিরভাগ সময় একটু অসম্পূর্ণ থাকে। লোকটা আমাদের ভীষণ দেখা। ওই অসম্পূর্ণতার জন্য কিছুতেই ঠিক ঠিক চিনতে পারছি না।'

আমি বললাম, 'ঠিক বলেছিস। ভীষণ চেনা—ভেবে বার করতেই হবে। এটা আমাদের প্রথম কেস আর অনেকগুলো টাকা।'

'একটা কথা কিন্তু মনে রাখিস। আমাদের ইস্কুলের মদন আর দেবাশিসও একটা গোয়েন্দা দল গোছের করেছে। এই ছবিটার কপি সামনের ব্যাঙ্কেও আছে। আমি ওদের কাল সকালে ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। দেরি মোটেই করা চলবে না।' গণেশের গলায় উদ্বেগ।

আমি অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম ছবিটার দিকে। খুব চেনা মুখ, কিন্তু কিছুতেই ঠাহর করতে পারলাম না, লোকটা সঠিক কে!

বাড়ি ফিরতে ফিরতে গণেশ ভারী গলায় বলল, 'গুপ্ত, আততায়ী আমাদের কাছেই আছে—খুঁজে বার করা চাই।'

আমি বললাম, 'চুপিচুপি, তোর জ্ঞান আর অভিজ্ঞতার ভাঁড়ার উজাড় করতে কসুর করিস না। প্রয়োজনে সরল গোয়েন্দাগিরি'র উপদেশগুলো ঝালিয়ে নিস।'

ঘরের ভেতর একটা ঝিঁঝিপোকা ডাকলে যে অবস্থা হয়, আমার মনের অবস্থাটা ঠিক সেইরকম হলো। ঝিঁঝি পোকাটা ঘরের ভেতরেই যে ডাকছে সেটা জানা, কিন্তু কোথায় আছে সেটা কিছুতেই ঠাহর হয় না। পোস্ট অফিসে দেখা প্রতিকৃতিটা মনের আনাচে-কানাচে ক্রমাগত নেচে বেড়াতেই থাকল। বহু চেনা হলেও লোকটা যে কে সেটা কিছুতেই মগজে এল না।

বাকি দিনটা ভেবেই কাটালাম। খেতে খেতে ভাবলাম, শুয়ে শুয়ে ভাবলাম, কান চুলকোতে চুলকোতে ভাবলাম, খেলার মাঠে গিয়ে ভাবলাম কিন্তু কোনও হদিশ নেই। বারবার গণেশের কথাটা মনে হলো। কোথাও একটা অসম্পূর্ণতা থেকে যাচ্ছে.....

রাত্রে যখন খেতে বসলাম, মা বলল, 'কিরে এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন? জ্বরটর আসেনি তো?'

আমি আর সেজদা এক খাটে শুই। সারারাত শুধু চিৎ হলাম, উপুড় হলাম—যতো ধরনের কাত হওয়া যায় সব হলাম। মনের প্রতিকৃতিটার সঙ্গে চেনাশোনা সব মুখগুলো একবার করে মেলালাম। ছোটোকাকীমার থেকে শুরু করে স্কুলের হেডস্যার পর্যন্ত। সেজদা নাক ডাকা বন্ধ করে একবার বলল, 'ওরকম ছটফট করছিস কেন? ছারপোকা কামড়াচ্ছে?'

প্রত্যেকটা রাত যে কতো লম্বা, তা জেগে না থাকলে বোঝা যায় না। যখন কারুর সঙ্গেই মিলল না তখন মনের প্রতিকৃতিটা সম্পূর্ণ করার চেষ্টা শুরু করলাম। একটার পর একটা ট্রাই করে চললাম। মাথায় ঘোমটা, নাকে গোঁফের সঙ্গে নথ, কপালে টিপ ইত্যাদি লাগিয়ে চেনা মুখের সঙ্গে মেলাতে থাকলাম। ভোরের আলো যখন প্রায় ফুটিফুটি তখন হঠাৎ আমার সারা শরীরে একটা শিহরণ বয়ে গেল। পাছে ভুল হয় তাই আবার মেলালাম। হ্যাঁ ঠিক আছে। আবার মেলালাম। আবার ঠিক। স্বপ্ন দেখছি না তো। সেজদাকে একটা চিমটি কেটে দেখলাম। না জেগে, আছি। চিমটিটা ঠিকই কেটেছি। সেজদা চিমটি খেয়ে 'ঘ্যাঁও' বলে লাফিয়ে উঠে আমার দিকে তাকালো। মুখ দেখে মনে হলো ঠিক বুঝতে পারছে না। চিমটিটা স্বপ্নের না বাইরের জগতের।

আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না, 'পেয়ে গেছি' বলে উল্লাসে সেজদাকেই জড়িয়ে ধরলাম।

সেজদা একটা 'ঘোঁৎ' করে আওয়াজ ছেড়ে বলল, 'গুচ্ছের ক্রিমি হয়েছে পেটে, কাল সকালেই মাকে বলবো তোকে ওষুধ দিতে।'

সাফল্যের আনন্দ-সমুদ্রে হাবুডুবুর ভেতর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। ঘুম ভাঙলো বেলা ন'টায়। মুখটা কোনোক্রমে ধুয়ে এক দৌড়ে হাজির হলাম গণেশের বাড়ি।

গণেশে ওদের বাড়িব সামনের রোয়াকে বসে একমনে পা দোলাচ্ছিল। চেহারাটা অনেকটা খাণ্ডবদাহনে পড়া ঝুলঝাড়ার মতন। দেখলেই বোঝা যায় সারারাত মোটে ঘুমোয়নি।

আমি দেয়ালে হেলান দিয়ে কায়দা করে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'গোয়েন্দা চুপিচুপির কি খবর? রহস্যের সমাধান কিছু মিলল?'

গণেশের গলা বেশ ম্রিয়মাণ, 'মিল তো প্রথম থেকেই পাচ্ছি গুপ্ত, কিন্তু পাকা খবর কিছুই নেই। অনেক রকম করে ভেবেছি—সোজা হয়ে, ব্যাঁকা হয়ে এমনকি একটা পুরোনো পাইপ যোগাড় করে ভাববার সময় কপালে ঘষে দেখেছি, ঠিক যেমনটা ডিটেকটিভরা করে—কিন্তু কোথায় কি!' শীতের উত্তুরে বাতাসের মতন একটা করুণ দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো গণেশের মুখ দিয়ে।

আমি গোয়েন্দাসুলভ কায়দামাফিক গলা নামিয়ে বললাম, 'পাকা খবর আমার কাছে আছে হে চুপিচুপি, কষ্ট করে একবার শুধু পোস্ট অফিসে ছবিটার কাছে যেতে হবে।'

গণেশ আমাকে তেমন পাত্তা দিচ্ছে না দেখে আমি গণেশের নড়া ধরে এক হ্যাঁচকা টানে রোয়াক থেকে তুলে বললাম, 'নষ্ট করার সময় মোটেই নেই চুপিচুপি।'

পোস্ট অফিসে অত সকালেই দিব্যি লোকের ভিড় জমে গেছে। তার মাঝখান দিয়ে আমি গণেশকে টেনে নিয়ে গেলাম সেই ছবিটার সামনে। পকেটে করে আমি একটা মোটা স্কেচপেন নিতে ভুলিনি। ঝটপট বার করে ছবিটায় একটা মোটা গোঁফ লাগিয়ে দিলাম—'এখন কি আর চিনতে অসুবিধে হচ্ছে? গোয়েন্দাপ্রবর?' প্রবর কথাটার মানে আমার অজানা, কিন্তু কথাটা এরকম জায়গাতেই ব্যবহার হয় আর ওটা যে গণেশের অজানা সেটাও আমার জানা।

গণেশ গোঁফ লাগানো ছবিটার দিকে মিনিট কয়েক তাকিয়ে থাকলো, তারপর উল্লাসে স্বভাবসুলভ (ক্যারাটেসুলভও বলা চলে) 'ইয়াং ফুঃ' বলে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'সাবাস গুপ্ত, তোমার জবাব নেই। তুমি একদিন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা হতে পারবে নিশ্চয়ই।'

আমিও আহ্লাদে ডগমগ, কিন্তু যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব করে রইলাম। সম্বিৎ ফিরল এক বৃদ্ধের হুংকারে, 'কি সব অসভ্য ছেলেপুলে হয়েছে আজকাল.....।' তাকিয়ে দেখি ভিড়ের ভেতর ভদ্রলোক আমাদের জাপটা-জাপটির মাঝে পড়ে গেছেন।

গণেশ বলল, 'কি সাংঘাতিক! এ তো তপনের সেজকাকা! লোকটাকে দেখলে তো ভিজে বেড়াল মনে হয়। ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। কিন্তু তুমি একটা বিপদ বাধালে গুপ্ত। এতো লোকের ভিড়ে এই ছবিটাতে গোঁফ লাগালে? সব্বাই দেখবে। পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার আর আততায়ী থাকে একশো গজের ভেতর।'

গতকাল বোকা বলার রাগটা আমার পোষাই ছিল। একহাত বদলা নিলাম, 'দরকার হতো না হে চুপিচুপি, তোমার মাথায় আর একটু ঘিলু থাকলে। গোঁফ ছাড়াই চিনতে। ছবিটা ছিঁড়ে দেবার চেষ্টা করবো?'

গণেশ উত্তেজনায় অপমানটাও গায়ে মাখল না, 'মন্দ হয় না।' আমরা ছবিটা দেওয়াল থেকে তুলতে গিয়ে দেখলাম খুব মজবুত আঠা দিয়ে সাঁটা। খুঁটে খুঁটে তুলতে হবে। তাছাড়া হরেক ধরনের লোক কটমট করে তাকিয়ে আছে। হয়তো আততায়ীর আত্মীয় বলে চালান করে দেবে। গণেশ গজগজ করতে থাকে, 'কি দরকার এত ভালো আঠা দিয়ে সাঁটার! খাম, ইনল্যান্ডের মতন আঠা দিলে কত্তো সহজে উঠে যেত.....।'

ছবিটা তোলা গেল না। আমি বললাম, 'চুপিচুপি, এই পোস্ট অফিসের অন্ধকার কোণে ক'জনই বা দেখবে। তাছাড়া আমরা যদি সময় নষ্ট না করে পুলিশে খবরটা পৌঁছে দিতে পারি তাহলে তো.....'

গণেশ দেখলাম আমাকে একটু ধর্তব্যের ভেতর আনছে, 'তা ঠিক। কিন্তু গোয়েন্দাদের পরের পদক্ষেপ হলো আততায়ীর সম্বন্ধে যাবতীয় খবর সংগ্রহ করা। খায় কিনা, কেন খায়, দাঁত মাজে কিনা, কখন ঘুম থেকে ওঠে, কেন ওঠে ইত্যাদি যত খবর আমরা রাখবো ততই সুবিধে।'

আমি বললাম, 'চুপিচুপি, খবরের বেশ খানিকটা আমাদের জানা। সেজকাকা দাড়ি কামায়, খাওয়াদাওয়া করে, ঘুম থেকে দেরিতে ওঠে, কখন বাড়ি থেকে বেরোয়, সবই জানা। কিন্তু কোন কাজটা যে কেন করে মানে কেন বাড়ি ফেরে, কখন ঘুমোয়, কেন ঘুমোয় এগুলো জানতে হবে বৈকি।'

গণেশ দেখলাম আমাকে শাগরেদ হিসেবে শুধু বিশ্বাসই না, প্রচুর শ্রদ্ধাও করছে। অবশ্য বিশ্বাস আর শ্রদ্ধায় প্রচুর মিল আছে। তালব্য 'শ' ছাড়াও। গণেশ ভাবতে ভাবতে বললো, 'শুধুই কি এই?'

আমি বললাম, 'আর কিছু বাকি থাকলে পরে দেখা যাবে।'

গণেশ বললো, 'লোকটাকে আমার বরাবরই বেশ সন্দেহজনক লাগতো। এখন দেখছি হুবহু মিলে যাচ্ছে। এ খবরগুলো পাওয়া তেমন শক্ত হবে না। তপনদের বাড়ির সামনের ফ্ল্যাট বাড়ির ছাদে আমাদের অবাধ গতি। আজ রাতে একটু নজর রাখলেই অনেক জানা যাবে। তপনের সেজকাকার ঘরটা তো রাস্তার ওপর। কিন্তু গোঁফ লাগানো ছবিটা, পোস্ট অফিসে থেকেই গেল। তুই যতো সহজ ভাবছিস

তা না। গতকাল সন্ধ্যেয় আমি ওখানে বেশ ভিড় দেখেছি। দু'একজন এঁকেও নিচ্ছিল। পাঁচ হাজার টাকা বলে কথা।'

বাড়িতে কোনোভাবে ম্যানেজ করে সন্ধ্যে আটটার পর থেকে আমরা ফ্ল্যাট বাড়ির ছাদে বসে। নিজেদের পাড়ায় নতুন মানুষ পেয়ে মশারা মশগুল। আমি একটা মশাকে চটাশ করে মারাতে গণেশ বলল, 'অতো জোরে মশা মারে না গুপ্ত। ফিসফিস করে মারো।'

আমি প্রতিবাদ করলাম। আততায়ীর ঘরের সঙ্গে এখনও অন্তত চল্লিশ ফিটের ফারাক। তাছাড়া আততায়ীর যখন পাত্তা নেই। গণেশ বুঝিয়ে বলল, 'এটা গোয়েন্দাদের কর্তব্য। আওয়াজ করে মশা মারা তো দুরের কথা, এই সময়ে 'সরল গোয়েন্দাগিরি'র মতে আওয়াজ করে কান চুলকোনো পর্যন্ত মানা।'

ফিসফিস করে মশা মারা কি সহজ কাজ.....

বসে আছি তো আছিই। যখন মশার দল প্রচুর খেয়ে বেসুরোয় গান গাইছে, যখন চাঁদ মাথার উপর দিয়ে ওপাশে চলে গেছে, যখন আমি প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়ে নিয়েছি তখন হঠাৎ গণেশের খোঁচায় সংবিৎ ফিরে এল, 'একটা গাড়ি এইমাত্র কাউকে যেন নামিয়ে দিয়ে গেল।'

সেজকাকার ঘরটা আমাদের চেনা। আলো জ্বলে উঠল। দেখলাম এক গেরুয়া পরা রুদ্রাক্ষধারী কাপালিক সেঁধিয়েছে সেখানে। আমি গণেশকে টিপতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তার আগেই রুদ্রাক্ষ, আলখাল্লা, নিবিড় চুলদাড়ি থেকে নিজেকে মুক্ত করে জেগে উঠলেন তপনের সেজকাকা। এই সময় আমি আমার মশার কামড়ে চিত্রিত হাতে গণেশের হাত অনুভব করলাম। যা দেখলাম তাতে চক্ষুস্থির। গেঞ্জিপরা সেজকাকা পরনের গেরুয়া পাজামা থেকে টেনে বার করলেন একটা ছ'ঘরা রিভলবার। সত্যি বলছি, আমি এতো উত্তেজিত হয়ে পড়লাম যে দুটো মশা চিবিয়ে ফেললাম।

গণেশ বলল, 'দেখেছিস?'

সেজকাকা রিভলবারটা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। গণেশ আবার বলল, 'ডাকাতি সেরে ফিরল মনে হচ্ছে।'

আমি বললাম, 'যা যা জানার ছিল জানা গেছে তো। বাড়ি চল। কাল সকালে থানায়!'

গণেশ বলল, 'সকালে নয়। গোয়েন্দার কর্তব্য সকালে আততায়ী সম্বন্ধে আরো বেশি খোঁজ নেওয়া। এক্ষেত্রে অবশ্য সহকারী নিষ্প্রয়োজন। তোর বাড়ি আসবো। সন্ধ্যেবেলা। তারপর থানায় যাবো।'

গণেশের সময়জ্ঞান আছে বলতেই হবে। সন্ধ্যে সাতটার সময় এল। হাতে হাত ঘষে, শরীরটাকে পেছন দিকে এলিয়ে একটা হাই তুলল গণেশ। 'আর কোনও সন্দেহই নেই—আততায়ী আর পাঁচ হাজার আমাদের হাতের মুঠোয়। এখন খালি ছিপে ধরা মাছ ডাঙায় তোলা।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'হে চুপিচুপি, কি এমন সংবাদ পেলে?'

গণেশ বলল, 'সংবাদ পেলাম না। সেটাই তো সংবাদ। তপনকে হাজার প্রশ্ন করাতেও ও কিছুই বলল না। বলল, বলা বারণ।'

আমরা থানার কাছেই থাকি, তবে কপালগুণে তেমন যাতায়াত নেই। থানায় লোক গমগম করছে। একপাল লোক দাঁড়িয়ে আছে আর থানার বড়বাবু তাদের সঙ্গে কথা বলছেন। গণেশ কি একটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, সামনের কনস্টেবলটা ওকে থামিয়ে দিয়ে চুপিচুপি বলল, 'আস্তে, চেঁচাবেন না। ডি সি ডি ডি নিজে এসেছেন একটা কেসের ব্যাপারে খবর করতে। পাশের ঘরে বসে আছেন। বড়বাবুর প্রাথমিক প্রশ্নোত্তরের পর নিজে জেরা করবেন। থানার সক্কলে মায় বড়বাবু অবধি তটস্থ।'

গণেশ আমার কানে কানে বলল, 'ডি ডি মান ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট, কিন্তু ডি সি মানে কি কে জানে।'

আমি বললাম, 'আরে ইলেকট্রিকের যেমন এ সি, ডি সি থাকে ডিটেকটিভদেরও থাকতেই পারে।'

কনস্টেবলটা আমাদের চাপা স্বরে বলল, 'আরে তা না। ডি সি মানে ডিপুটি কমিশনার।'

গণেশ মুগ্ধ। পকেট থেকে সট্ করে একটা নোটবই বার করল, 'গুপ্ত অনেক ভাগ্য করলে এমন লোকের সাক্ষাৎ মেলে। জেরার ধরনটা নোট করে রাখতেই হবে। কাজে লাগবে।'

আমি বললাম, 'আমরা ভাগ্যবান হে চুপিচুপি। ডি সি ডি ডি-কেই সটান জানাবো তদন্তের ফল।'

বড়োবাবু লোকটি অনেকটা প্রাইমারি স্কুলের বাঘাটে হেডস্যারের মতোন। দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর সামনে পায়চারি করতে করতে প্রশ্ন করছেন। প্রশ্ন শক্ত, গলা নরম।

বড়বাবু বললেন, 'পুরস্কারটা তাহলে পুরো পনেরোজনকেই ভাগ করে দিতে হবে।' সঙ্গে সঙ্গে লোকেদের ভেতর একটা হুটোপুটি লাগল, 'কেন স্যার আমি প্রথম। না আমি আগে। আমি তারও আগে, আমরা তো সেই সকালবেলা.....'

আমি বললাম, 'চুপিচুপি, সরকার মনে হচ্ছে বেশ উদার। সব কেসেই পুরস্কার দিচ্ছে।'

'দেখেছ গুপ্ত', হাসলো গণেশ, 'আমরা তাড়াহুড়ো না করলে আমাদের কেসের বেলাতেও ওই অবস্থাই হত।'

বড়োবাবু বললেন, 'আপনাদের ভেতর যাঁরা ওই ছবিটাতে গোঁফ এঁকেছেন তাঁদেরই এই পুরস্কারটা পাবার কথা।'

মুহূর্তে তিনটে হাত উঠলো আকাশে, সমবেত, 'আমি স্যার।'

ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হতে পাক্কা তিরিশ সেকেন্ড লাগল। ছবিটা সেই পোস্ট অফিসের ছবি। মানে আমাদের আততায়ীর। আমি লাফিয়ে উঠে বলতে যাচ্ছিলাম, 'ওটা আমার আঁকা। পুরস্কারটা আমাদের.....' কিন্তু গণেশ আমাকে জাপটে ধরে বলল, 'দেরি হয়ে গেছে গুপ্ত। সরল গোয়েন্দাগিরির মতে.....'

রাগে, দুঃখে, অভিমানে আমার চোখে জল এসে গেল। মনে পড়ে গেল সেই কাতর রাতজাগা।

বড়োবাবু হাঁকলেন, 'স্যার, এই দিন আপনার পুরস্কার দেবার লোক।'

চকিতে ঘরে ঢুকলেন ডি সি ডি ডি। ঘরের মধ্যে যেন একটা বোমা ফাটল, 'ল.....ক আপ্। তিনটেকেই।'

ডি সি ডি ডি-কে দেখে আমি এমন চমকে উঠলাম যে পাশের টুলে বসে থাকা কনস্টেবলের কোলে ধপ্ করে বসে পড়লাম। এ তো স্বয়ং তপনের সেজকাকা!

কনস্টেবলটা ফিসফিস করে আর্তনাদ করল, 'আই বাপ্।'

গণেশের মুখের দিকে তাকালাম, গণেশ পুরো স্ট্যাচু। নাকের ওপরে একটা মশা একমনে রক্ত খেয়ে চলেছে।

সেজকাকা বলে চললেন, 'পুরস্কার লোভ দেখানো খুনীর ছবিটায় আমার সঙ্গে মিল ছিল। এই হতভাগাগুলো তার ওপর গোঁফ বসিয়ে একেবারে আমার ছবি বানিয়ে দিয়েছে। তারপর থেকে লোকে আর টেলিফোনে প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তুলেছে। গোঁফটা কামিয়েই ফেললাম। কিন্তু তাতেও কি রেহাই আছে। যারা গোঁফ ছাড়া ছবিটা দেখেছে তাদের দল পড়লো পেছনে।'

হঠাৎ সেজকাকা ফিরলেন আমাদের দিকে। আমাদের দেখে বেশ ঘনিষ্ঠ গলায় বললেন, 'তোদের আবার কি চাই এখানে?'

আমি আবার চমকে সেপায়ের কোলে বসে পড়লাম প্রায়। কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধি দেখাল গণেশ, 'সেজকা, কালকে কালীপুজো! চাঁদাটা.....'

ডি সি ডি ডি বললেন, 'কাল সকালে বাড়িতে আসিস। এখন পালা।'

আমরা থানার বাইরে এসে দাঁড়ালাম। গণেশ বলল, 'গুপ্ত, গোয়েন্দাদের পরের কর্তব্য.....'

আমি বললাম, 'ছুট লাগানো।'

ছুটতে ছুটতে গণেশ বলল, 'হতাশ হয়ো না গুপ্ত। পরের কেস নাকের ডগায় ঝুলছে। ও টাকাটা পাবোই।'

[শ্রাবণ ১৩৯৯]

চৌধুরীবাড়ির গোলাপী মুক্তোর মালা

দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(এক)

রাত প্রায় সাড়ে দশটা। রোজকার মতো ঘুমোবার আগে একটা বিদেশী ম্যাগাজিন খুলে বসেছেন সৃজনকাকা। এমন সময় ফোন বাজল। এত রাতে কে আবার ফোন করল, ভাবতে ভাবতে উঠে ফোনটা ধরলেন।

হ্যালো.....কে বলছেন?

চৌধুরীবাড়ি থেকে আমি মহিম চৌধুরী বলছি। আমি কি সৃজনবাবুর সঙ্গে কথা বলতে পারি?

হ্যাঁ, আমিই সৃজন বসু।

এত রাত্তিরে ফোন করার জন্য ক্ষমা করবেন মিঃ বসু। আমার বাড়ি থেকে একটা গোলাপী মুক্তোর মালা চুরি হয়ে গেছে। দাম অন্তত দশ লাখ টাকা। তাই সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা না করে রাতেই ফোন করলাম।

ঠিক আছে, আপনার বাড়ির ঠিকানাটা দিন। কাল সকালে দেখা করব।

মহিম চৌধুরীর বাড়ির ঠিকানা, ফোন নম্বর ও আরো কীসব টুকিটাকি নিজের ডায়েরিতে টুকে রাখলেন সৃজনকাকা। আর তখনই আমি ঢুকে পড়লাম কাকার ঘরে। এত রাতে ফোন মানে জবরদস্ত কোনো রহস্য নিশ্চয়ই।

আমাকে দেখে সৃজনকাকা বললেন, এই যে বাদল, তুই এখনো ঘুমোসনি। আর এদিকে—

কাকার কথা শেষ হওয়ার আগেই সবজান্তার ভঙ্গিতে বলে উঠলাম, টেলিফোনের সব কথাবার্তাই শুনেছি। ভালোই হলো, বেশ কিছুদিন বসে থেকে সবকিছু কেমন একঘেয়ে লাগছিল। এবার আবার রোমাঞ্চের মুখোমুখি হওয়া যাবে, তাই না কাকা!

(দুই)

মহিম চৌধুরীর বাড়িটা নিউ আলিপুরের অভিজাত পাড়ায়। উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা বেশ বড় তিনতলা বাড়ি। সামনে লন, দু'পাশে বাগান। মহিম চৌধুরীর ম্যানেজার মিঃ দত্ত অপেক্ষা করছিলেন আমাদের জন্য। বেঁটেখাটো চেহারা। ছোট ছোট চোখ। আমাদের সাদরে নিয়ে গেলেন ভিতরে। তিনতলা বাড়ি হলেও লিফ্‌ট্ আছে। সেই লিফ্‌টে চেপেই আমরা উঠলাম দোতলায়।

দোতলায় সাজানো-গোছানো ড্রয়িংরুমে নরম সোফায় বসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন মহিম চৌধুরী। বয়স ষাটের কাছাকাছি। আমরা ঘরে ঢোকামাত্র উঠে দাঁড়িয়ে সাদর সম্ভাষণ জানালেন, আরে, আসুন মিঃ বসু। আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি। সঙ্গে এটি কে?

আমার ভাইপো বাদল। বলতে পারেন আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট।

মৃদু হেসে মিঃ চৌধুরী বললেন, ভালোই তো। কম বয়েস থেকেই এসব কাজের অভিজ্ঞতা হয়ে যাচ্ছে।

ঘরের চারদিকে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে কাকা বললেন, আপনার গোলাপী মুক্তোর মালা যে চুরি হয়েছে, সেটা কখন জানতে পারলেন?

মহিমবাবু বললেন, এটা একটা অদ্ভুত চুরি। আমার বাড়িতে সিন্দুকের ভেতরে যে গোলাপী মুক্তোর মালাটা রাখা ছিল, সেটার বদলে অবিকল একই রকমের আর একটা নকল মুক্তোর মালা রেখে গেছে চোর। আমিও বুঝতে পারিনি। চুরিটা প্রথমে বুঝতে পারেন আমার স্ত্রী। আর ওঁর ইচ্ছেতেই আপনাকে ডেকে এনেছি।

সৃজনকাকা অবাক হয়ে বললেন, তাই নাকি! মনে হচ্ছে, চোর নকল মুক্তোর মালাটা রেখে গেছে এই কারণে, যাতে চুরির ব্যাপারটা সহজে ধরা না পড়ে।

হতে পারে।

ঠিক আছে। এবার বরং চোরের রেখে যাওয়া নকল মুক্তোর মালাটা একবার দেখব।

দেখাবো, কিন্তু তার আগে আসল মুক্তোর মালার ইতিহাসটা জেনে নিলে বোধহয় আপনার কাজ করতে সুবিধে হবে।

ঠিক আছে, আপনি বলতে শুরু করুন।

খোশগল্পের মেজাজে মহিমবাবু বলতে শুরু করলেন, প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে আমার বাবা প্রতাপ চৌধুরী নিউ আলিপুরের এই বাড়িটা তৈরি করেন। আগে বাড়িটা দোতলা ছিল, আমিই তিনতলাটা তৈরি করি বছর পনেরো আগে। আমি বাবার একমাত্র ছেলে হলেও আমার এক ছোট বোন আছে। থাকে হায়দ্রবাদে, স্বামী-পুত্র-কন্যা নিয়ে। আমার নিজের দুই ছেলে ও এক মেয়ে। বড় ছেলে সুপ্রতিম কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। আমেরিকায় থাকে। বছর দুই আগে ওখানেই বিয়ে করেছে। ছোট ছেলে সুপ্রকাশ ইংরেজি নিয়ে এম. এ. পড়ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। দ্বিতীয় সন্তান দময়ন্তী বিয়ে করেছে বছরখানেক আগে। জামাই বিকাশ চ্যাটার্জী টিভি সিরিয়ালের ডিরেকটর। সেই সুবাদে দময়ন্তী টিভি স্টার। তবে এই বিয়েতে আমার মোটেই মত ছিল না।

আমার বাবা প্রতাপ চৌধুরী প্রথম যৌবনে কাজ করতেন হায়দ্রাবাদের নিজামের অফিসে। হায়দ্রাবাদে থাকার সময় এক দোকান থেকে আমার মায়ের জন্য এই গোলাপী মুক্তোর মালাটা কেনেন। দোকানীর সঙ্গে বাবার খুব বন্ধুত্ব ছিল। তাই খুব কম দামেই মালাটা পেয়ে যান। মালার মুক্তোগুলো একেবারে 'ন্যাচারাল' মুক্তো, 'কালচারড্' বা চাষ করা মুক্তো নয়।

আমার বিয়ের সময় মা মালাটা দিয়ে দেন পুত্রবধূ মৃন্ময়ীকে। আমার স্ত্রীই ওটা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছেন। তিনি ভেবেছিলেন, বড় ছেলে সুপ্রতিমের বউকে মালাটা দেবেন, কিন্তু মেমসাহেব বউ বলে শেষ পর্যন্ত আর দেননি। হয়তো পরে ছোট ছেলের বউকেই দিতেন।

কথা বলতে বলতে একটু থেমে মহিম চৌধুরী একটা ছবির অ্যালবাম খোলেন। পাতা উলটে মৃন্ময়ীদেবীর একটা রঙিন ছবি দেখিয়ে মহিমবাবু বলেন, আমার স্ত্রীর গলায় যে মালাটা দেখছেন সেটাই আসল মুক্তোর মালা।

সত্যিই সে এক অপূর্ব সুন্দর মুক্তোর মালা। গোল মুক্তোগুলোর রঙ গোলাপী। তবে লকেট তৈরি হয়েছে চারটে সবুজ মুক্তো দিয়ে। সব মিলিয়ে সত্যিই অপরূপ।

ছবিটা খুঁটিয়ে দেখে সৃজনকাকা বললেন, আপনার আসল মুক্তোর মালার ছবি তো দেখলাম। এবার তাহলে দেখা যাক চোরের রেখে যাওয়া নকল মুক্তোর মালা। কী বলেন!

একটু ইতস্তত করে মহিম চৌধুরী বলেন, সেটা রাখা আছে আমার শোবার ঘরের সিন্দুকে। সেটা এখানে নিয়ে আসব না ওখানে গিয়ে দেখবেন?

ওখানে গিয়ে দেখাই ভালো। কোথায় কোন পরিবেশে কীভাবে মালা বদল করা হলো, সেটা বুঝতে সুবিধে হবে।

মহিম চৌধুরীর পেছন পেছন লম্বা বারান্দা পেরিয়ে আমরা হাজির হলাম ওঁর শোবার ঘরে। শোবার

ঘরেই পরিচয় হলো মহিমবাবুর স্ত্রী মৃন্ময়ীদেবীর সঙ্গে। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স। দোহারা গড়ন, ফর্সা সুন্দর চেহারা। বোধহয় মুক্তোর মালা চুরি যাওয়ায় মুখে একটা বিষণ্ণতার প্রলেপ।

মহিমবাবু স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন আমাদের। তারপর পকেট থেকে চাবি বের করে দেওয়ালের গায়ে ফিট-করা সিন্দুকের পাল্লাটা খুললেন। সিন্দুকের ভেতরটা অন্ধকার, ভালো করে কিছু দেখা যায় না। তবে বোঝা গেল, সিন্দুকটা জিনিসপত্রে ঠাসা। তারই ভেতর থেকে উনি বের করে আনলেন নীল ভেলভেটে মোড়া একটা গয়নার বাক্স। বাক্সটা চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের পুরনো তো হবেই। সেটা খোলামাত্র আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। দেখলাম, একটু আগে ছবিতে দেখা সেই গোলাপী মুক্তোর মালা। হুবহু সেই একই রকম সবুজ মুক্তোর লকেট। এতই ঝকঝকে জেল্লাদার যে এটাকে দেখে আসল মাল বলেই মনে হয়।

গয়নার বাক্সের মধ্যে মুক্তোর মালাটাকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে সৃজনকাকা প্রশ্ন করলেন, এটা নকল বুঝলেন কী করে?

মৃন্ময়ীদেবী বললেন, ঠিক কীভাবে বুঝলাম সেটা হয়তো আপনাকে পুরোপুরি বুঝিয়ে বলতে পারব না। তবে আসল মুক্তোর মালাটাকে তো এত বছর ধরে দেখে এসেছি, তাই তার সঙ্গে এর যে বেশ খানিকটা তফাৎ আছে বুঝতে পারি।

গম্ভীর গলায় সৃজনকাকা বললেন, আচ্ছা, আসল মালাটা তো বেশ পুরনো, আর এই নকল মালাটা হলো নতুন, তাই নতুন ও পুরনো জিনিসের মধ্যে যে তফাৎ, সেই তফাৎটুকু তো থাকবেই। কী বলেন মৃন্ময়ীদেবী?

হ্যাঁ, সেটা তো আছেই। তবে বোঝা যায়, এই নতুন মালাটাকে অনেক মেহনত করে পুরনো চেহারা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। অবশ্য আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া মুশকিল।

কথা বলতে বলতে আমরা আবার ফিরে এলাম ড্রয়িংরুমে। মৃন্ময়ীদেবী চলে গেলেন বাড়ির অন্দরের দিকে। সোফায় আয়েশ করে বসে সৃজনকাকা জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা, মালা চুরির ব্যাপারে কাউকে কি সন্দেহ হয় আপনার?

এদিক-ওদিক তাকিয়ে গলার স্বর একটু নামিয়ে বলেন মহিমবাবু, দেখুন মিঃ বসু, আমার তো সন্দেহ হয় বিকাশকে মানে আমার জামাইকে।

কেন?

ইদানিং ওর আর্থিক অবস্থা মোটেই ভালো যাচ্ছে না। তাছাড়া শুনেছি 'গোলাপী মুক্তোর রহস্য' নামে কী একটা টিভি সিরিয়াল নাকি করছে। হয়তো সেজন্যই—

একটু হেসে সৃজনকাকা বলেন, টিভি সিরিয়ালের জন্য শ্বশুরবাড়ির জিনিস জামাই চুরি করবে কেন? সেরকম দরকার হলে সে তো চেয়েই নিতে পারে। চাইলে কি আপনি তাকে দেবেন না?

হ্যাঁ হ্যাঁ, দেব না কেন! নিশ্চয়ই দেব।

প্রসঙ্গ এড়িয়ে সৃজনকাকা বলেন, আচ্ছা মহিমবাবু, এই সিন্দুকের চাবি কার কাছে থাকে?

আমার কাছেই থাকে, তবে আমার স্ত্রীর কাছেও একটা ডুপ্লিকেট চাবি আছে।

তার মানে, কেউ ইচ্ছে করলে আপনার স্ত্রীর ডুপ্লিকেট চাবি নিয়েও আসল মালাটা সরিয়ে নকল মালা ঢুকিয়ে রাখতে পারে।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন।

নিজের ছোট ডায়েরিটা বের করে তাতে কিসব লিখে সৃজনকাকা বললেন, আচ্ছা মহিমবাবু, এবার আমি আপনার স্ত্রী ও ছোট ছেলের সঙ্গে একটু আলাদাভাবে কথা বলতে চাই।

ঠিক আছে, খবর পাঠাচ্ছি।

মহিমবাবুর ম্যানেজার দত্তবাবু প্রথমে ডেকে নিয়ে এলেন ছোট ছেলে সুপ্রকাশকে। এ বাড়ির তিনতলায় থাকে। বয়স বাইশ-তেইশ।

সুপ্রকাশ ঘরে ঢুকে সোফায় বসলে সৃজনকাকার ইশারায় মহিমবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সৃজনকাকা বললেন, আচ্ছা সুপ্রকাশবাবু, আপনি তো জানেন, আপনাদের বাড়ি থেকে পারিবারিক মুক্তোর মালাটা চুরি হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, শুনেছি। সুপ্রকাশের কথায় বিরক্তি ঝরে পড়ে।

কার কাছ থেকে শুনলেন?

কাল রাতে বাড়ি ফিরে মায়ের কাছে শুনলাম। বাবার সঙ্গে মায়ের এ নিয়ে বোধহয় একচোট ঝগড়াও হয়ে গেছে।

কে চুরি করেছে বলে সন্দেহ হয় আপনার?

খামোখা কাউকে সন্দেহ করতে যাব কেন? তবে মশাই, আমি চুরি-টুরি করিনি—

আচ্ছা সুপ্রকাশবাবু, কাল কত রাতে আপনি বাড়ি ফিরেছিলেন?

তা রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা হবে।

আপনার ফিরতে কি রোজই এত রাত হয়?

তা মাঝে মাঝে হয়। আসলে বাড়িতে থাকতে আমার ভালো লাগে না। এখানকার পরিবেশটাই অসহ্য। আমি কি এবার যেতে পারি?

ঠিক আছে, যান।

সুপ্রকাশবাবুর পর এলেন মৃন্ময়ীদেবী। সৃজনকাকা জিজ্ঞেস করলেন, মুক্তোর মালা চুরির ব্যাপারে আপনার কাউকে সন্দেহ হয় কি?

মৃন্ময়ীদেবীর ছোট্ট জবাব, না তো।

আপনি কাউকে সন্দেহ করেন না, অথচ মহিমবাবুর সন্দেহ আপনাদের জামাই বিকাশবাবুকে।

একথা শুনে মৃন্ময়ীদেবী হঠাৎ যেন জ্বলে উঠলেন, আমার স্বামী কি একথা বলেছেন আপনাকে?

হ্যাঁ বলেছেন। বিকাশবাবুর আর্থিক অবস্থা নাকি খারাপ, তাই হয়তো—

দেখুন, বিকাশ বড়লোক না হতে পারে, কিন্তু চোর নয়। তাছাড়া ওরা চাইলে আমি তো দময়ন্তীকে এমনিতেই মুক্তোর মালাটা দিয়ে দিতাম।

শুনেছি, বিকাশবাবু 'গোলাপী মুক্তোর রহস্য' নামে একটা টিভি সিরিয়াল করছেন। সেই সিরিয়ালে নাকি এইরকম একটা মুক্তোর মালার ওপর ভিত্তি করে গল্প বানানো হয়েছে।

হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। আর সেই গল্পটা আমারই লেখা।

আশ্চর্য! আপনি গল্প লেখেন নাকি?

না না, আমি লেখিকা নই। তবে এই মুক্তোর মালাটা আমাদের পরিবারে প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে আছে। বেশ কিছু অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে এই মালাকে ঘিরে। সেসব ঘটনাগুলির ওপর ভিত্তি করে একটা গল্প লিখেছিলাম আমি। বিকাশ সেইসব ঘটনাগুলি নিয়ে এই সিরিয়ালটা তৈরি করছে।

শুনেছি, ঐ সিরিয়ালে নাকি এই মুক্তোর মালাটা ব্যবহার করা হয়েছে—

না না, সেকথা সত্যি নয়। তবে ছবির জন্য এই মালার মতোই আর একটা নকল মালা ওরা তৈরি করে নেয়।

আচ্ছা, নকল মালা তৈরির জন্য বিকাশবাবু কি আসল মুক্তোর মালাটাকে দিনকয়েকের জন্য চেয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন?

না। শুধু একদিন ওদের ফোটোগ্রাফার এসে মালাটার চার-পঁচটা ছবি তুলে নিয়ে গিয়েছিল। সে সময় আমার স্বামী কী একটা কাজে যেন কলকাতার বাইরে গিয়েছিলেন।

ছবি তোলার ব্যাপারটা কি মহিমবাবু জানেন?

না, জানেন না। আমিই বলিনি। কারণ উনি তো বিকাশকে মোটেই পছন্দ করেন না।

ধন্যবাদ মৃন্ময়ীদেবী, আপাতত আমার আর কিছু জানার নেই।

মৃন্ময়ীদেবী বেরিয়ে গেলে ঘরে ঢুকলেন মহিমবাবু। মৃদু হেসে বললেন, মালাচুরির রহস্য কীরকম এগোচ্ছে, তা একটু জানতে পারি কি?

আপাতত অন্ধকারেই আছি। আমি এগোলে আপনিও জানতে পারবেন বৈকি। আচ্ছা, আপনার ম্যানেজার দত্তবাবু কতদিন কাজ করছেন?

তা প্রায় বছর কুড়ি। আর খুব বিশ্বাসের সঙ্গেই—

তার মানে, মালা চুরির ব্যাপারে ওঁকে আপনি সন্দেহ করেন না।

না, সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই।

উনি কি এ বাড়িতেই থাকেন?

প্রথমদিকে কিছুদিন ছিল বটে। তবে এখন থাকে ঢাকুরিয়ায়, এক ভাইপোর বাড়িতে।

ঠিক আছে। আজ তাহলে চলি। পরশু বিকেলে আবার আসব।

(তিন)

মহিম চৌধুরীর বাড়ি থেকে যখন আমরা বেরোলাম, তখন প্রায় দুপুর বারোটা। এই তিন ঘণ্টায় মুক্তোচুরির রহস্য যেন আরো রহস্যময় হয়ে উঠল। কে চুরি করল? বড় ছেলের প্রশ্ন ওঠে না। তিনি তো এখন আমেরিকায়। ছোট ছেলে সুপ্রকাশ? সে তো অ্যাংরি ইয়ংম্যান। এসব চুরির মধ্যে আছে বলে মনে হয় না। বিকাশবাবু? সব দিক বিচার করলে ওঁর ওপরেই সন্দেহ পড়ে। এরপর আসে ম্যানেজার দত্তবাবু ও বাড়ির অন্যান্য লোকজন। এদেরও সন্দেহভাজনের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যায় না।

ট্যাক্সির খোঁজে হাঁটতে হাঁটতে সৃজনকাকা বললেন, তুই বাড়ি ফিরে যা। আমি মহিমবাবুর জামাই বিকাশ চ্যাটার্জীর সঙ্গে একবার দেখা করতে যাব।

কাকার কথায় ভীষণ আপত্তি জানিয়ে বললাম, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। কিন্তু তুমি কি ওঁর ঠিকানা জানো?

হ্যাঁ, মৃন্ময়ীদেবীর কাছ থেকে ওর বাড়ির ঠিকানা ও ফোন নম্বর নিয়ে নিয়েছি।

বিকাশবাবুর বাড়িতে ফোন করে জানা গেল, উনি ও ওঁর স্ত্রী—কেউই বাড়ি নেই। প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের একটা বাড়িতে শূটিং করছেন। বাড়ির ঠিকানাও পাওয়া গেল। সেখানে একটা ট্যাক্সি নিয়ে পৌঁছে গেলাম আধঘণ্টার মধ্যে।

বিরাট বাগানওলা বাড়ি। আগেকার দিনে জমিদারবাড়ি যেমন হতো। গেটে পাহারা। কাকার কাছে লালবাজারের পুলিশ কমিশনারের দেওয়া আইডেনটিটি কার্ড ছিল। সেই কার্ডের জোরে আমরা বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম।

একটু দূরেই শূটিং স্পট। তবে লাঞ্চব্রেক চলছিল বলে শূটিং বন্ধ। একটি ছেলে আমাদের দুজনকে পৌঁছে দিল পরিচালক বিকাশ চ্যাটার্জীর কাছে। বিকাশ চ্যাটার্জীর বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। খুবই বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। কাকা নিজের পরিচয় দিয়ে মুক্তোর মালা চুরির কথা বললেন সংক্ষেপে।

চুরির কথা শুনে বিকাশবাবু তো অবাক। কই, আমি তো কিছু জানি না। হয়তো দময়ন্তী জানে।

দময়ন্তী কাছেই ছিলেন। বিকাশবাবু হাত তুলে ইশারা করতেই এসে হাজির। তিনি সিরিয়ালের নায়িকা। খুব সুন্দরী। সারা মুখে, চোখের পাতায় রঙ করা। দেখে কেমন গা শিরশির করছিল।

দময়ন্তীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বিকাশবাবু বললেন, শোনো দময়ন্তী, তোমাদের বাড়ির মুক্তোর মালা নাকি চুরি গেছে। তুমি কিছু জানো নাকি?

হ্যাঁ আজ সকালেই শুনেছি। বলে দময়ন্তী ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন আমাদের দিকে। তারপর বললেন, আর তাই বোধহয় আপনারা এসেছেন বিকাশকে গ্রেপ্তার করতে, তাই না? বুঝেছি, বাবাই আপনাদের পাঠিয়েছেন এখানে।

শান্ত গলায় বললেন সৃজনকাকা, না না, দময়ন্তীদেবী, আপনি অনর্থক রেগে যাচ্ছেন আমাদের ওপর। আমরা এখানে বিকাশবাবুকে গ্রেপ্তার করতে আসিনি, এসেছি কে সত্যিই চুরি করেছে, সে কথাটা জানতে। আর, সেটা পারব যদি আপনারা একটু সাহায্য করেন, তবেই।

কাকার কথায় এবার যেন একটু ঠাণ্ডা হলেন দময়ন্তীদেবী। বললেন, ঠিক আছে, কী জানতে চান বলুন।

আসল মালার মতো যে নকল মালাটা আপনারা তৈরি করিয়েছেন, সেটা একটু দেখতে চাই।

রুমাল দিয়ে মুখ মুছে বিকাশবাবু বললেন, এ আর এমন কি ব্যাপার। এক্ষুণি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের।

একটি কমবয়েসী ছেলেকে চেঁচিয়ে ডাকলেন বিকাশবাবু, এই নান্টু, সুব্রতবাবুকে বলো তো মুক্তোর মালার বাক্সটা নিয়ে যেন এক্ষুণি এখানে চলে আসেন।

ছেলেটা দৌড়ে চলে গেল।

খানিকক্ষণ পরে এক ভদ্রলোক এলেন। হাতে একটা গয়নার বাক্স। বিকাশবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন, ইনি সুব্রত পাহাড়ী। আমাদের ইউনিটের প্রোডাকশন ম্যানেজার। আর ইনি সৃজন বসু। ডিটেকটিভ।

ডিটেকটিভ শুনে একটু যেন সমীহের চোখে ভদ্রলোক তাকালেন আমাদের দিকে। বিকাশবাবু বললেন, সুব্রতবাবু, গয়নার বাক্সটা খুলে মুক্তোর মালাটা একবার মিঃ বসুকে দেখিয়ে দিন তো।

বিব্রত গলায় সুব্রতবাবু বললেন, কিন্তু গয়নার বাক্সের চাবিটা তো খুঁজে পাচ্ছি না। যে চাবির গোছার সঙ্গে চাবিটা ছিল, তার মধ্যে বাকি সব কটা চাবিই আছে, শুধু ঐ চাবিটাই নেই।

আশ্চর্য! একটা চাবি চুরি হয়ে গেল, আর আপনি সেটা বুঝতেই পারলেন না। হোপলেস!

দময়ন্তীও খুব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন সুব্রতবাবুর দিকে। ধীরে ধীরে মেজাজটাকে একটু শান্ত করে কিছু যেন মনে করবার চেষ্টা করলেন বিকাশবাবু। তারপর বললেন, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। দময়ন্তী, তোমার কাছে একটা ডুপ্লিকেট চাবি ছিল না?

ও হ্যাঁ। দেখতে হবে—ভ্যানিটি ব্যাগ হাতড়ে ডুপ্লিকেট চাবিটা পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত। চাবি দিয়ে গয়নার বাক্স খুলে দেখা গেল, নকল মুক্তোর মালা উধাও, বদলে রয়েছে খুব সাধারণ একটা পুঁতির মালা।

আমি বললাম, খুব রসিক চোর দেখছি। দু-নম্বরী মালা চুরি করে তিন-নম্বরী মালা রেখে দিয়েছে—

আমার কথায় ক্ষণিকের জন্য চুরির কথা ভুলে হেসে উঠল সবাই। বিকাশবাবু খুবই বিব্রত গলায় বললেন, দেখুন সৃজনবাবু, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এর মধ্যে ছিল কেবল একটা নকল মুক্তোর মালা। এমন কিছু দামী নয়, অথচ সেটা কে চুরি করল, কেনই বা করল। গত পরশুই তো এই মালাটা পরে দময়ন্তী অভিনয় করল। কি দময়ন্তী, পরশুদিনই তো—

দময়ন্তী বললেন, হ্যাঁ, বিকাশ ঠিকই বলেছে। পরশুদিন সন্ধ্যে ছ'টা পর্যন্ত এটা পরেই তো অভিনয় করেছি—

সৃজনকাকা বললেন, আচ্ছা দময়ন্তীদেবী, অভিনয় শেষ হওয়ার পর মালাটা কোথায় রাখলেন—

দময়ন্তী কিছুক্ষণ মনে করার চেষ্টা করলেন, তারপর বললেন, শেষ দৃশ্যে ছিল, আমি মালাটা গলা থেকে খুলে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রাখলাম, আর তারপরই—

আমি বললাম কাট। আর সেদিনের মতো শূটিং শেষ, বিকাশবাবু বললেন।

তারপর মালাটার কী হলো? সেটা কি ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারেই পড়ে রইল নাকি আবার গয়নার বাক্সে ঢোকানো হলো বিকাশবাবু, গম্ভীর গলায় বললেন সৃজনকাকা।

দময়ন্তী বললেন, শূটিং চলবার সময় আমি এই ড্রেসিং টেবিলটাই ব্যবহার করি। কালও করেছি। তখন তো মালাটা ড্রয়ারে ছিল না।

কিন্তু সেটা কোথায় গেল, তার হদিস তো সুব্রতবাবুর রাখা উচিত, সুব্রতবাবুর দিকে আড়চোখে তাকালেন সৃজনকাকা।

অস্বস্তি-মেশানো গলায় সুব্রতবাবু বললেন, আমার সেদিন শরীর খারাপ লাগছিল বলে তাড়াতাড়ি

চলে গেলাম। তবে যাবার আগে গোপালকে সবকিছু ভালো করে বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছিলাম।

গোপাল, গোপাল কোথায়? ওকে এক্ষুণি ডাকো।

সুব্রতবাবু বললেন, গোপাল আজ আসেনি। গতকালও আসেনি। এখন বুঝতে পারছি, চুরি করেছে গোপাল।

বিকাশবাবু রেগেমেগে বললেন, সে না হয় করেছে। কিন্তু আপনারও তো উচিত ছিল পরের দিন এসে মালার খোঁজ নেওয়া।

নিলেও লাভ হতো না বিকাশবাবু। কারণ ওই ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার থেকে পরশুই চুরি যায় মালাটা। সৃজনকাকা বলেন।

বিকাশবাবু করুণ গলায় বলেন, কোথাও একটা গভীর ষড়যন্ত্র আছে, যাতে আমি ঝামেলায় পড়ি, অপদস্থ হই।

শান্ত গলায় সৃজনকাকা বললেন, হতে পারে। তবে এই মুহূর্তে কিন্তু সমস্ত ঘটনাগুলি আপনার বিরুদ্ধেই আঙুল তুলছে। আপনার শ্বশুরেরও বিশ্বাস, ঐ মুক্তোর মালা বিক্রি করেই আপনি এই সিরিয়াল তৈরি করছেন।

কি বলছেন আপনি? এই সিরিয়ালের প্রযোজক মহামায়া টেলিফ্রেম, যার মালিক গগন বারিককে টাকার কুমীর বললেও কম বলা হয়। আর আমি এই সিরিয়ালের পরিচালক মাত্র, প্রতি সিরিয়াল অনুযায়ী টাকা পাই। ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন বিকাশবাবু।

আপনাদের সেই প্রযোজককে তো দেখলাম না।

কাকার কথার উত্তরে বিকাশবাবু বললেন, উনি খুবই ব্যস্ত মানুষ। সব সময় আসেন না এখানে।

গগন বারিকের বাড়ির ঠিকানা ও ফোন নম্বর নিয়ে আমরা বেরোলাম। বাংলো বাড়ির প্রধান ফটক পর্যন্ত আমাদের এগিয়ে দেন বিকাশবাবু ও দময়ন্তী দুজনেই।

(চার)

রাস্তায় বেরিয়ে ট্যাক্সিতে উঠতে যাচ্ছি, একটা বাচ্চা ছেলে সৃজনকাকার হাতে একটা ছোট খাম দিয়েই পালিয়ে গেল।

খামটা আমার হাতে দিয়ে কাকা বললেন, দেখ তো বাদল, কী লিখেছে শয়তানটা—

একটানে খামের মুখটা ছিঁড়ে ফেলে ভেতরের চিঠিটা বের করলাম। ছোট্ট চিঠি। তাতে লেখা—

সৃজনবাবু সাবধান
বাড়ি গিয়ে ভাত খান।

লেখাটা পড়ে সৃজনকাকা হেসে ফেললেন, লোকটা তো ঠিক কথাই মনে করিয়ে দিয়েছে। সারাদিনে আমাদের ভাত খাওয়াই হয়নি। চল, একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে খেয়ে নেওয়া যাক।

পথে লেকের কাছে একটা চীনা রেস্তোরাঁয় পেটপুরে অনেক কিছু খেয়ে বাড়ি ফিরলাম আমরা।

পরের দিন সৃজনকাকা সারাদিন বহু জায়গায় ঘুরেছেন। এক ফাঁকে গগন বারিকের সঙ্গেও মোলাকাৎ করে এসেছেন। ভদ্রলোক আসলে একজন বড় প্রোমোটার। মহামায়া টেলিফ্রেম তৈরি করেছেন মায়ের স্মৃতিতে।

রাতে সৃজনকাকা ফোন করলেন মহিম চৌধুরীকে। কুশল বিনিময়ের পর মহিম চৌধুরী প্রশ্ন করলেন, মুক্তোর মালা সম্পর্কে কিছু হদিস করতে পারলেন?

না, এখনো পারিনি। একটু সময় লাগবে। কাল সন্ধ্যেবেলা যদি আপনার বাড়িতে সান্ধ্য-আড্ডা জমান তো ভালো হয়। সেখানে কিছু মানুষকে প্রশ্ন করে রহস্যভেদের চেষ্টা করতে পারি।

আমার কোনো আপত্তি নেই। কাকে কাকে ডাকব বলুন?

আপনার জামাই ও মেয়ে, প্রোডাকশন ম্যানেজার সুব্রত, আপনার ম্যানেজার দত্তবাবু ও গগন বারিক—এই ক'জনকে তো ডাকতেই হবে।

হঠাৎ গগন বারিককে কেন?

ভদ্রলোক 'গোলাপী মুক্তোর রহস্য' সিরিয়ালের প্রযোজক ও বিকাশের ওপরওয়ালা, তাই ওঁর থাকা ভালো। তাছাড়া শূটিংয়ের জায়গা থেকেই সেই নকল মালাটাকে চুরি করে ঢোকানো হয়েছে আপনার সিন্দুকে।

তাই নাকি! ঠিক আছে, আপনি যেমন বললেন, তেমনই করব। আর হ্যাঁ, আমার ছোট ছেলে সুপ্রকাশ কাল দিল্লী যাচ্ছে। ওর কি থাকার দরকার আছে?

না না, ওই অ্যাংরি ইয়ংম্যান আমার সন্দেহের তালিকায় নেই। ফোন ছেড়ে দিলেন সৃজনকাকা।

(পাঁচ)

পরের দিনও সৃজনকাকার বিশ্রাম নেই। সারা দুপুর টো টো করে ঘুরে বেড়ালেন। লালবাজার, নিউ আলিপুর থানা-টানায় ঘুরে ফিরলেন বিকেলে। তারপর সন্ধ্যেবেলায় আমরা দুজন হাজির হলাম চৌধুরী ভিলায়। আমাদের সঙ্গে ছিলেন আর এক ভদ্রলোক। অর্জুন সামন্ত। লালবাজারে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনার। কাকার বন্ধু। তবে উনি গিয়েছিলেন সাধারণ পোশাকে।

মহিম চৌধুরীর ড্রয়িংরুমে সোফাসেট সরিয়ে পাতা হয়েছে বড় সাদা ফরাস। মাঝে মাঝে কয়েকটা তাকিয়াও রাখা হয়েছে। তাতে বসেছেন অভ্যাগত মানুষরা। মাঝখানে বসেছেন মহিম চৌধুরী, পাশে মৃন্ময়ীদেবী। বিকাশবাবু ও দময়ন্তীদেবীও এসে গেছেন। ওঁদের মুখ থমথমে। দত্তবাবু ও সুব্রতবাবুও একপাশে বসেছেন। মহিমবাবুর পাশে আর এক ভদ্রলোক বসেছেন। বেঁটেখাটো মোটাসোটা চেহারা। কাকা ফিসফিস করে বললেন, উনিই গগন বারিক।

আমাদের দেখে ফরাস ছেড়ে উঠে এলেন মহিমবাবু। সঙ্গে গগন বারিক। সৃজনকাকা অর্জুন সামন্তর সঙ্গে মহিমবাবু ও গগন বারিকের পরিচয় করিয়ে দিলেন। মনে হলো, পরিচয় পেয়ে দুজনেই খুব সমীহ দেখালেন অর্জুন সামন্তকে।

আজকের এই সভার জন্য চা-জলখাবারের বন্দোবস্ত করেছিলেন মহিমবাবু। সভার কাজ শুরু হলে সৃজনকাকা বলতে শুরু করলেন, আপনারা সবাই জানেন, মহিম চৌধুরীর সিন্দুক থেকে আসল গোলাপী মুক্তোর মালা সরিয়ে কে যেন নকল মুক্তোর মালা রেখে দিয়েছিল। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার, 'গোলাপী মুক্তোর রহস্য' সিরিয়ালের শূটিং স্পটে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার থেকে ঠিক একই সময়ে চুরি যায় একই চেহারার একটা নকল মুক্তোর মালা। নকল মুক্তোর মালা হলে কি হবে, তার জেল্লাও আসলের চেয়ে কম নয়। বুঝতে কোনো অসুবিধে নেই ঐ নকল মুক্তোর মালাটাই আসলের বদলে রেখে দেওয়া হয়েছে ঐ সিন্দুকে। কিন্তু কে বদলালো? কেনই বা বদলালো? প্রথমেই সন্দেহ পড়ে বিকাশবাবুর ওপর। ওঁর শূটিং লোকেশন থেকেই নকল মালাটা চুরি যায়। উনি এ বাড়ির জামাই। তাই আসল মালা পালটে সিন্দুকে নকল মালা রেখে দেওয়া খুবই সহজ। কিন্তু মৃন্ময়ীদেবী আমাকে বলেছেন,ঐ মালাটা উনি এমনিই দিতে চেয়েছিলেন দময়ন্তীকে। শুনেছি, বিকাশবাবুই নাকি এতে সবচেয়ে বেশি আপত্তি করেছিলেন। তাই যে মালা তিনি নিজে নিতে অস্বীকার করেছেন, সে মালা তিনি চুরি করাবেন কেন?

এবার তাহলে সন্দেহের তালিকায় আসে সুব্রতবাবু। প্রোডাকশন ম্যানেজার হিসেবে ওই নকল মুক্তোর মালার কাস্টোডিয়ান ছিলেন উনিই। সুব্রতবাবু বলেছিলেন, নকল মালা চুরির দিন উনি নাকি আগে ছুটি নিয়ে চলে যান। গোপালকে বলে যান মালাটা তুলে রাখতে। গোপাল মালাটা ঠিকমতোই তুলে রাখে। তবে সেটাকে সে আলমারিতে না রেখে পৌঁছে দেয় সুব্রতবাবুর বাড়ি। তারপর গোপালকে কিছু টাকা দিয়ে বলা হয় দেশের বাড়ি গিয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে। আর সেই রাতেই সুব্রতবাবু মালাটা পৌঁছে দেন মহিমবাবুর কাছে। বদলে মহিমবাবু—

সৃজনকাকাকে থামিয়ে দিয়ে গগন বারিক বলে ওঠেন, মিঃ বসু, এসব গালগল্প শোনাতেই কি এখানে ডেকেছেন আমাকে ?

গম্ভীরমুখে সৃজনকাকা বলেন, এটা যে গালগল্প নয়, সেটা আপনিও জানেন, আমিও জানি।

বাগনানে দেশের বাড়ি থেকে গোপালকে ডেকে আনা হয়েছে। প্রয়োজনে ওর মুখ থেকেই ঘটনাটা শুনতে পাবেন।

গোপালের মুখের কথাতেই সব প্রমাণ হয়ে যাবে নাকি! ব্যঙ্গের গলায় বলে ওঠেন গগন বারিক।

গোপালের কথা আপাতত থাক। কিন্তু গগনবাবু, আপনি কি অস্বীকার করতে পারেন, আপনি আপনার প্রোমোটারি ব্যবসার একজন অংশীদার করে নিয়েছেন মহিমবাবুকে?

মহিমবাবু ও গগনবাবু দুজনেই চুপ করে বসে থাকেন। সৃজনকাকা বলে চলেন, আর এর বদলে মহিমবাবুকে বাধ্য করেছেন ঐ গোলাপী মুক্তোর মালাটা দিতে। আর তাই এইরকম নকল চুরির প্ল্যান ফেঁদেছেন বিকাশবাবুকে দায়ী করে। কারণ মৃন্ময়ীদেবী কিছুতেই মালাটা হাতছাড়া করতে চান না।

দেখুন, আপনার ওসব গাঁজাখুরি গল্প আমাকে শোনাবেন না। আমি চললাম—বলে গগনবাবু উঠে পড়লেন ফরাস ছেড়ে।

এতক্ষণ অর্জুন সামন্ত চুপ করে ছিলেন, এবার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন, না গগনবাবু, এভাবে আপনি চলে যেতে পারেন না। যদি চলে যাবার চেষ্টা করেন তবে আপনাকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হবো।

আপনি কী করে গ্রেপ্তার করবেন আমাকে? মালা চুরির ব্যাপারে কোনো কেস তো লেখানো হয়নি থানায়।

তির্যক হেসে সৃজনকাকা বলে ওঠেন, আপনার ধারণা ভুল গগনবাবু। মহিমবাবু থানায় কেসটা লেখাতে চাননি, কারণ উনি নিজেই এ চুরির সঙ্গে জড়িত। উনি আমাকেও ডাকতে চাননি, কিন্তু মৃন্ময়ীদেবীর জোরাজুরিতে ডাকতে বাধ্য হন। আমার কথায় মৃন্ময়ীদেবী থানায় অভিযোগ করেন। অবশ্য সে অভিযোগপত্র থানায় নিয়ে যাই আমিই।

অর্জুন সামন্তর ইশারায় কোত্থেকে হাজির হন দু-তিনজন কনস্টেবল ও নিউ আলিপুর থানার ও.সি. হীরক দাস। উনি বলেন, গগনবাবু ও মহিমবাবু আপনাদের দুজনকেই মুক্তোর মালা চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার করছি। আপনাদের থানায় যেতে হবে।

গগন বারিক ক্ষুব্ধ গলায় বলে ওঠেন, অনেক শিক্ষা হয়েছে মশাই, আর নয়। অর্জুনবাবু, আমায় গ্রেপ্তার করবেন না। চৌধুরীবাড়ির মুক্তোর মালা আমি ফেরত দিয়ে দিচ্ছি। এখনই।

হ্যাঁ, সেটা করতে পারি, যদি মৃন্ময়ীদেবী তাঁর অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেন, তবেই—

মৃন্ময়ীদেবীর মুখে হাসি ফুটে ওঠে। বলেন, ঠিক আছে, মালা যখন ফেরত পাচ্ছি, তখন আমার অভিযোগ তুলে নিতে আপত্তি নেই।

ততক্ষণে সিল্কের পাঞ্জাবির তলায় গেঞ্জির গোপন পকেট থেকে সেই আসল মুক্তোর মালাটা বের করে ফেলেছেন গগনবাবু। আমরা সবাই সেই অপরূপ গোলাপী মুক্তোর মালার দিকে তাকিয়ে রইলাম অবাক হয়ে।

[ভাদ্র ১৪০৭]

কাকতাড়ুয়া

সুধীন্দ্র সরকার

রাতে হোমটাস্ক শেষ করে জানলা দিয়ে বাইরে বাগানে চোখ পড়তেই, কাকতাড়ুয়াকে দেখতে পেল পিনাক।

কাকতাড়ুয়া হাওয়ায় দুলছিল। কালো ভুষো মাখানো হাঁড়ি-মুখে চুনে আঁকা চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছিল চাঁদের আলোতে। কাকতাড়ুয়ার গায়ে চাপানো নীল ডোরাকাটা শার্টটা পতপত করে উড়ছিল বাতাসে। চাঁদের আলো লুকোচুরি খেলছিল গাছের পাতার ফাঁকে।

কাকতাড়ুয়াটা আজ সকালেই তৈরি করেছিল পিনাক। ওদের বাগানে বড্ড পাখির উৎপাত। পাকা ফলগুলো ঠুকরে ঠুকরে পাখিরা নষ্ট করত। তাই কাকতাড়ুয়া একটা তৈরি না করলেই চলছিল না। ওদের সবসময়ের কাজের লোক হরির ছেঁড়া শার্টটা বাবার কথামতো কাকতাড়ুয়ার গায়ে চাপিয়ে দিয়েছিল। বাবা অবশ্য হরির ছেঁড়া শার্টের বদলে একজোড়া নতুন শার্ট আজই অফিসফেরত কিনে এনেছিলেন।

নতুন শার্টের প্যাকেটটা বুকে জাপটে ধরে হরি পিনাককে বলেছিল, 'কাকতাড়ুয়ার জন্যে দুটো জামা পেলুম।' খুশিতে লাফাতে গিয়ে হরি পড়ে যাচ্ছিল। ওর ডান পা-টা খোঁড়া। একটু টেনে টেনে হাঁটত। নতুন জামার আনন্দে খোঁড়া পায়ের কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিল তখন।

পিনাক জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি ক'দিন আর জামা পর যে, নতুন জামা পেয়ে লাফাচ্ছ?'

'তা বটে খোকাবাবু।' পান চিবানো হলদে দাগ ধরা দাঁত বের করে হরি হেসেছিল, 'নইলে কী আর একটা জামা দু'বছর টেঁকে? তবে দেশে যাওয়ার সময় জামা দুটো কাজে দেবে।'

'আবার কবে যাচ্ছ দেশে? বছর তো ঘুরে এল।'

'সামনের মাসে যাব ভাবছি?' হরি ডান পায়ের আঙুলগুলোতে ভর দিয়ে লেংচে লেংচে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল।

সিঁড়ির নিচের ঘরটাতে হরি থাকে। ওর বয়স প্রায় পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই। পিনাকের জন্মের আগে থেকেই ও বাড়িতে কাজ করতে এসেছিল। ছোটবেলা থেকে পিনাককে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে। এখন স্কুলে দিয়ে আসে, নিয়ে আসে। তাছাড়া অন্যায় আবদার মেটানো তো আছেই।

বইপত্তর গুছিয়ে পিনাক খাবার ঘরে গেল। হরি ডাইনিং টেবিলে বসেছিল।

পিনাককে হেলতে-দুলতে আসতে দেখেই হরি রেগে-মেগে বলল, 'তোমার জন্য কী সারারাত খাবার নিয়ে বসে থাকতে হবে নাকি? মা-বাবু কখন খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েছেন।'

'আমার হোমটাস্ক শেষ করতে হবে না!' পিনাক চেয়ারে বসতে বসতে বলল, 'সবে তো রাত দশটা!'

হরি গজগজ করছিল, 'এখনও আমার কত কাজ বাকি!'

হিঃ হিঃ করে হেসে পিনাক বলল, 'এখন আবার কী কাজ? এত রাতে?'

'তুমি তার কী বুঝবে?'

'খুব বুঝি।'

'কী বোঝ?' হরির চোখে-মুখে কৌতূহল।

'বলব কেন?' পিনাক আড়চোখে হরির দিকে একবার তাকিয়ে তাড়াতাড়ি খেতে লাগল।

পিনাক জানে হরির কোন কোন কাজ এখন বাকি। রাতে বাড়ির সব কাজ মিটে যাওয়ার পর ও স্নান করবে। তরপর খাওয়ার পাট চুকিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে খিল তুলে টাকা গুনতে বসবে। একই টাকা হরি রোজই কেন গোনে, পিনাক কিছুতেই বুঝতে পারে না। ও কী বাড়ির লোককে সন্দেহ করে?

পিনাক ভেবেছিল, হরিকে দুম করে বলে দেয় টাকা গোনার বাতিকের কথা। কিন্তু, বলতে পারল না। ও যদি অন্য কিছু ভাবে?

মাস-মাইনে বাবদ হরি যে টাকা পায়, তার প্রায় সবটাই সঞ্চয় করে রাখে। ন মাসে-ছ মাসে দেশে যাওয়ার সময় সেই টাকা ও নিয়ে যায়। দেশের বাড়িতে ওর বিধবা বোন আর বিবাহযোগ্যা এক বোনঝি আছে। ওর টাকাতেই বোনের সংসার চলে। তবে ভুলেও কোনোদিন মানি অর্ডার করে না। পাছে টাকা খোওয়া যায়।

টাকাগুলো হরি কোথায় রাখে, পিনাক জানে। টাকা ওর টিনের বাক্সে রাখে না। রাখে দেওয়ালে টাঙানো ওর ছেঁড়া শার্টের ঝুলপকেটে। হরির ধারণা, চোর এলে বাক্স-প্যাঁটরাই ঘাঁটবে, ছেঁড়া জামায় হাত দেবে না।

রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে শার্টের ঝুলপকেট থেকে টাকার বান্ডিলটা বের করে হরি গুনতে বসে। রাবার ব্যান্ডে টাকাগুলো জড়ানো থাকে। ঘুমোনোর সময় টাকার বান্ডিলটা মাথার বালিশের নিচে রেখে ঘুমোয়। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে টাকাগুলো ফের গুনে শার্টের ঝুলপকেটে রেখে ঘর থেকে বেরোয়।

খাওয়া শেষ করে পিনাক দোতলায় শোবার ঘরের দিকে পা বাড়াল। হরি এঁটো বাসন জড়ো করে ঢুকল বাথরুমে। ঘরে কিছুক্ষণ পায়চারি করল পিনাক। জানলা দিয়ে বাগানের দিকে তাকাল।

কাকতাড়ুয়াটা স্থিরভাবে দাঁড়িয়েছিল। হরির ঘরের জানলা দিয়ে বাল্বের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল বাগানে।

আকাশে ঘন কালো মেঘ। একটু আগে দেখা চাঁদটা হারিয়ে গেছে মেঘের আড়ালে। বাতাসের কোনো নামগন্ধ নেই। কেমন যেন গুমোট ভাব।

জানলার শিক ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল পিনাক। তারপর লম্বা একটা শ্বাস টেনে ঘরের বাইরে এল। বারান্দা দিয়ে নিচে উঁকি মেরে দেখল, হরির ঘরের দরজা বন্ধ। কিন্তু ভেতরে আলো জ্বলছিল। হরি নিশ্চয়ই এখন টাকা গুনছে। মুচকি হাসল পিনাক। গুটি গুটি পায়ে ফিরে এলো নিজের ঘরে। নাইট ল্যাম্পের নীল আলোটা জ্বেলে ঢুকল মশারির ভেতরে।

বিছানায় শুয়ে পিনাক ভাবছিল হরির কথা। ওর সব ভাল, শুধু টাকা গোনার বাতিকটাই যা খারাপ। বাবার মুখে শুনেছে, ওর আবার একটা বিদঘুটে অসুখ আছে। ও নাকি 'স্লিপ ওয়াকিং' করে। অর্থাৎ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাঁটে। অসুখটার নাম 'সোমনামবুলিজ্‌ম'। তবে পিনাক কোনো দিন ওকে 'স্লিপ-ওয়াক' করতে দেখেনি।

কড়কড় করে মেঘ ডেকে উঠল। বৃষ্টি পড়তে শুরু করল চড়চড় করে। পিনাকের চোখ জড়িয়ে এল ঘুমে।

কাকভোরে হইচই শুনে ঘুম ভেঙে গেল পিনাকের। হরির ঘর থেকেই শব্দটা ভেসে আসছিল। বাবা-মায়ের কথার সঙ্গে কানে এল হরির কান্না। ও ধড়মড় করে উঠে বসল বিছানায়।

হরি কাঁদতে কাঁদতে বলছিল, 'এ আমার কী সব্বোনাশ হলো বাবু? এতগুলো টাকা কে চুরি করল?'

পিনাক মশারি ছেড়ে লাফ দিয়ে বেরুল। ব্যাপার কী? এই সাত সকালে টাকা চুরির কথা কী বলছে হরি। ওর সব টাকা কী চুরি হয়ে গিয়েছে?

'কত টাকা ছিল?' কানে এল বাবার গলা।

'সাতশো পঁয়ত্রিশ।' হরি জবাব দিল।

'টাকাগুলো আমায় দিসনি কেন? ব্যাঙ্কে রেখে দিতাম।'

'ব্যাঙ্কে মাঝে মাঝে ডাকাত পড়ে শুনেছি। তাই ব্যাঙ্কে টাকা রাখতে আমার ভয় লাগে।' হরি কাঁদছিল।

'বোকা কোথাকার!' বাবা বললেন।

'সামনের মাসে বোনঝির বিয়ে। কত কষ্ট করে টাকাগুলো জমিয়েছিলুম।' হরি হাউ হাউ করে কাঁদছিল।

পিনাক দৌড়ে ঘর থেকে বেরুল। তরতর করে নামতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে।

হরির ঘরের ভেতরে মা-বাবা দুজনেই দাঁড়িয়েছিলেন। দুজনেরই চোখে-মুখে উত্তেজনার চিহ্ন। হরি মাথায় হাত দিয়ে বসে কাঁদছিল। পিনাক ঘরে ঢুকতেই হরি ওর দিকে একপলক তাকিয়ে ফের মাথা নিচু করল। হরির চুল উস্‌কো-খুস্‌কো। দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্তের মতো।

পিনাক দুম করে প্রশ্ন করল, 'কাল রাতেও তো টাকাগুলো কাছে ছিল?'

'হ্যাঁ।' মাথা নাড়ল হরি।

'রোজকারের মতো বালিশের নিচে রেখেই ঘুমিয়েছিলে?'

পিনাকের কথা শুনে হরি ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে রইল।

মা-বাবাও অবাক চোখে পিনাককে লক্ষ্য করলেন।

বাবা ভুরু কুঁচকে পিনাককে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এত সব জানলে কোত্থেকে?'

'জানি।' পিনাক গম্ভীর স্বরে বলল, 'এটা হরিদার অনেক দিনের অভ্যেস।'

'আশ্চর্য!' মার চোখে-মুখে কৌতূহল।

বাবা হরিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'পিনাক যা বলছে সত্যি?'

'হুঁ।' হরি ঘাড় নাড়ল।

'যত্নের ধন পিঁপড়েয় খায়।' বাবা বললেন, 'তোর মাথার নিচে থেকে টাকাগুলো চুরি হলো, তুই টের পেলি না?'

মা জিজ্ঞেস করলেন, 'কাল দরজা খুলে শুয়েছিলি কেন?'

'দরজা খোলা ছিল!' পিনাক একটু অবাকই হলো। বলল, 'কিন্তু, হরিদা তো রাতে দরজা বন্ধ করে শুয়েছিল। আমি নিজে দেখেছি।'

'ওর চিৎকার শুনে আমরা যখন এখানে এলাম, তখন তো দরজা খোলাই ছিল।' মা বেশ জোরের সঙ্গে বললেন।

'ঠিকই।' বাবা সমর্থন করলেন মায়ের কথাকে, 'ঘণ্টাখানেক আগে বাথরুমে গিয়েছিলাম। দেখলাম দরজা খোলা, হরি বেঘোরে ঘুমুচ্ছে। আমি ইচ্ছে করেই ওকে ডাকিনি। কিছুক্ষণ পরেই ওর চিৎকার-চেঁচামেচি কানে এল।'

হরি কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে আমতা আমতা করল, 'আমি তো দরজা বন্ধ করেই শুয়েছিলুম।'

পিনাক এগিয়ে গেল হরির পাশে, 'কখন জানতে পারলে টাকা নেই?'

'ঘুম থেকে উঠে বালিশের নিচে হাত দিয়ে দেখি—' কথা শেষ না করে হরি চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

'কাঁদছ কেন?' শাসনের সুরে পিনাক বলল, 'মনে করে দেখ, অন্য কোথাও রেখেছ কিনা?'

কান্না বেড়ে গেল হরির, 'আমার কী হবে বাবু! বোনঝির বিয়ের সব ঠিক।'

'সে দেখা যাবেখন।' বাবা সান্ত্বনা দিলেন।

'টাকা দেশে মানি অর্ডার করে দিসনি তো?' মায়ের চোখ-মুখ কঠিন।

'বিশ্বাস করুন মা। ওসব কিস্যু করিনি।' মায়ের পা জড়িয়ে ধরল হরি, 'রোজের মতো কালও বালিশের নিচে টাকাগুলো রেখেছিলুম।'

'তাহলে বাগানের পাঁচিল টপকে নিশ্চয়ই ঘরে চোর ঢুকেছিল।' মায়ের বিরক্তিপূর্ণ স্বর, 'যেমন দরজা খুলে ঘুমিয়েছিলি?'

পরিস্থিতি সামাল দিতে বাবা বললেন, 'হরি, তুই রান্নাঘরে যা। তোর টাকার ব্যবস্থা আমি করব।'

হরি কাঁদছিল।

পিনাক বাবাকে জিজ্ঞেস করল, 'বাবা, হরিদাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'জিজ্ঞেস করে আর কী হবে?' ঠোঁট ওল্টালেন বাবা, 'টাকা কী আর ফেরত পাবে?'

'বোধহয় পাবে।' পিনাকের কথা শুনে ঘরসুদ্ধ সবাই চমকে উঠল।

বাবা ধমকে উঠলেন, 'জ্যেঠামি না করে টাকাগুলো বের করে দাও তাহলে!'

পিনাক খোলা জানলার দিকে চোখ রেখে বলল, 'দেখি চেষ্টা করে।'

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল পিনাক। একটু আগে হরি যখন কাঁদতে কাঁদতে মায়ের পা জড়িয়ে ধরেছিল, তখন পিনাক দেখেছিল হরির পায়ের পাতাতে শুকনো কাদা লেগে। ব্যাপারটা আশ্চর্য লেগেছিল পিনাকের। হরির মতো শুচিবাইগ্রস্ত লোক তো পায়ে কাদা নিয়ে ঘুমুবে না! তাছাড়া কাল রাতেও রোজকারের মতো ও স্নান করে শুয়েছিল। তবে কী হরি রাতে বৃষ্টির পরে ঘর থেকে বেরিয়েছিল? সদর দরজায় তালাচাবি। তাহলে কী ও বাগানে গিয়েছিল? বাগানের পাঁচিলের ওপাশে ওর জন্য কী কেউ অপেক্ষা করছিল? যার হাতে ও টাকাটা সবার অলক্ষ্যে পাচার করে দিয়েছে! কিন্তু, কাদামাখা পা, ধুয়ে শুল না কেন? তাছাড়া ওর মতো বিশ্বাসী লোক কী এমন দুষ্কর্ম করার দুঃসাহস দেখাবে? এত বছর এ বাড়িতে কাজ করছে ও। কেমন যেন খটকা লাগল পিনাকের।

পিনাক হরিকে বড়দের মতো গলা করে জিজ্ঞেস করল, 'কাল রাতে বৃষ্টির পরে কোথায় গিয়েছিলে?'

'কোথাও না তো!' হরি যেন আকাশ থেকে পড়ল, 'চানটান করে যখন ঘরে ঢুকলুম, তখনই তো বৃষ্টি শুরু হলো। খানিক পরেই ঘুমিয়ে পড়েছি। কখন বৃষ্টি থেমেছে, তাও জানি না।'

'সত্যি কোথাও যাওনি?'

'বলছি তো না।'

'তাহলে তোমার পায়ে কাদা লাগল কোত্থেকে?'

'কাদা?' নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল হরি, 'কিন্তু, আমি তো কোথাও যাইনি।'

'হুম!' চোখ দুটো বন্ধ করল পিনাক।

'তাহলে চোর এসে তোর পায়ে কাদা লেপ্টে টাকা চুরি করেছে?' মা উত্তেজিত হয়ে পড়লেন, 'তুই নিশ্চয়ই অন্য কোথাও টাকা পাচার করেছিস!'

হরি লুটিয়ে পড়ল বাবার পায়ে, 'দিব্যি করে বলছি বাবু, কাউকে টাকা দিইনি!'

পিনাক হরিকে টেনে তুলল, 'টাকা কাউকে দাওনি ঠিকই। কিন্তু, মাঝরাতে বৃষ্টির পরে নিশ্চয়ই ঘর থেকে বেরিয়েছিলে!'

হরি হাঁ করে তাকিয়ে রইল পিনাকের মুখের দিকে।

পিনাক ঘরের চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। হরির টিনের বাক্স, ঘরের তাক, এদিক-সেদিক তন্ন তন্ন করে খুঁজে ও পা বাড়াল বাইরে।

হরির ঘরের দরজা পেরোলেই ছোট্ট করডির। করিডর পেরিয়ে ফলের বাগান। পিনাক নিচু হয়ে দেখল, করিডরে অনেকগুলো কাদা পায়ের ছাপ। শুকনো পায়ের ছাপগুলো বাগান থেকে হরির ঘরের দিকেই গিয়েছে। বাঁ পায়ের ছাপগুলো সম্পূর্ণ, ডান পায়েরগুলো শুধু আঙুলের। ছাপগুলো যে হরিরই পায়ের, সে বিষয়ে পিনাক ষোল আনা নিশ্চিত। হরির ডান পা খোঁড়া। ডান পায়ের আঙুলগুলোই শুধু মাটিতে পড়ে ওর।

পায়ের ছাপ অনুসরণ করে বাগানে পা রাখতেই পিনাকের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। হরি যে রাতে বৃষ্টির পরে বাগানে গিয়েছিল, তার চিহ্ন এখনও রয়েছে বাগানের ভিজে মাটির বুকে। অথচ হরি বলল যে, ঘর থেকেই বেরোয়নি।

হরির পায়ের ছাপগুলো বাগানের কাকতাড়ুয়া অব্দি গিয়ে আবার ফিরে এসেছে বাড়ির ভেতরে।

পিনাক এগিয়ে গেল কাকতাড়ুয়ার কাছে। কাকতাড়ুয়ার বাঁ কাঁধটা ঝুঁকেছিল মাটির দিকে। কাকতাড়ুয়ার গায়ে চাপানো শার্টের বাঁ দিকের ঝুলপকেটটা ফোলা ফোলা।

চকিতে পিনাক কাকতাড়ুয়ার শার্টের বাঁ পকেটে হাত ঢোকাল। ওর হাতে ঠেকল রাবার ব্যান্ড জড়ানো হরির টাকার বান্ডিল।

চিৎকার করে উঠল পিনাক, 'পেয়েছি! পেয়েছি!'

পিনাকের চিৎকার কানে যেতেই, বাবা-মা দুজনেই বাগানে ছুটে এলেন। পেছনে লেংচাতে লেংচাতে হরি।

পিনাক কাকতাড়ুয়ার শার্টের পকেট থেকে টাকার বান্ডিলটা বের করে হরির হাতে দিয়ে বলল, 'কাকতাড়ুয়ার জন্য দুটো নতুন জামা পেয়েছিলে, এবারে টাকাগুলোও ফেরত পেলে। ভাগ্যিস্ ছেঁড়া জামাটা কাকতাড়ুয়াকে দিয়েছিলে!'

টাকা ফেরত পেয়ে হরি হতভম্ব। মা চোখদুটো বড় বড় করে বললেন, 'দেখছ কাণ্ড! টাকা সমেতই জামাটা কাকতাড়ুয়াকে দিয়েছে?'

'তা কেন?' পিনাক হাসল, 'টাকাগুলো কাল রাতেও হরিদার কাছে ছিল। আর কাকতাড়ুয়াকে জামা পরানো হয়েছিল কাল দুপুরে।'

বাবার স্বরে বিস্ময়, 'তাহলে কাকতাড়ুয়ার জামার পকেটে টাকাগুলো রাখল কে?'

'যার টাকা সে নিজেই রেখেছে।' পিনাক হরির দিকে তাকাল, 'তবে জানে না কখন রেখেছে। হরিদা তখন ঘুমের মধ্যে ছিল।'

হরি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল পিনাকের দিকে।

'তার মানে?' ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল বাবার, 'রাতে হরি ঘুমের মধ্যে বাগানে গিয়েছিল?' বাবা বিড়বিড় করে বললেন, 'ওর অসুখটা ফের বাড়ল নাকি?'

'নিশ্চয়ই।' চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল পিনাকের, 'মাঝরাতে ঘুমের মধ্যে টাকার বান্ডিলটা নিয়ে হরিদা দরজা খুলে বাগানে গিয়েছিল। কাকতাড়ুয়ার গায়ে পরানো ছিল ওরই ছেঁড়া জামাটা। রোজকার অভ্যেসমতো সেই জামার পকেটে টাকার বান্ডিলটা রেখে ফের ঘরে এসে শুয়ে পড়েছিল। ওর ঘর থেকে কাকতাড়ুয়াকে স্পষ্ট দেখা যায়। ও ভেবেছিল, ঘরের দেওয়ালে টাঙানো জামার পকেটেই টাকা রাখছে। পুরো ঘটনাটাই ঘটেছিল ঘুমের মধ্যে।'

'এক্সেলেন্ট!' পিনাকের পিঠ চাপড়ালেন বাবা। ওঁর চোখ দুটো চকচক করছিল।

পিনাক বিজ্ঞের মতো বলল, 'তবে কাল রাতে বৃষ্টি না হলে অবশ্য অন্যরকম ভাবতে হতো আমাকে।' বাবার হাত ধরল পিনাক। অনুনয়ের সুরে জিজ্ঞেস করল, 'বাবা, স্লিপ ওয়াকিং কী সারে না? হরিদাকে কোনো সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে গেলে হয় না?'

বাবা পিনাকের পিঠে হাত রাখলেন, 'অফিসফেরত আজই ডাঃ মজুমদারের সঙ্গে কথা বলব। হরিকে কিওর করতেই হবে।'

[মাঘ ১৩৯৯]

তপোবনে রহস্যভেদ

রমেশ দাস

হরিদ্বারে একদিন কাটিয়েই ঋজুরা হৃষিকেশ চলে এলো। এবারেই প্রথম নয়। এর আগেও ফুলের উপত্যকা নন্দনকাননে যাবার সময় ওরা হরিদ্বার হৃষিকেশ হয়ে গিয়েছিল। হরিদ্বারের কোলাহল এবং পর্যটকের ভিড়ের জন্য একদিনের বেশি থাকতে ইচ্ছা করে না। ঋজুদের সকলেই একটু নির্জনতা পছন্দ করে আর পাহাড়ী নিসর্গ ওদের বেশি টানে। সেই দিক থেকে চিন্তা করে ঋজুর বাবা মিঃ চৌধুরী হৃষিকেশেই এক সপ্তাহ কাটাবেন ঠিক করে এসেছেন। হোটেলটিও ছিমছাম, সুন্দর, নিকটেই গঙ্গা। বারান্দায় দাঁড়ালে জলের শব্দ শোনা যায়। এপারে লছমন মন্দির, ওপারে টিহরী মঞ্জিল, গীতাভবন ইত্যাদি দেখা যায়। ওপারে পৌড়ী গাড়োয়ালের ধ্যানমগ্ন পাহাড়ের শ্যামলিমা হাল্কা কুয়াশাচ্ছন্ন। এপারে উত্তরে টিহরী গাড়োয়াল। ওদের হোটেলটা অবশ্য দেরাদুন জেলার মধ্যে অবস্থিত। হৃষিকেশের লছমনঝুলার কাছে পাশাপাশি তিনটি পার্বত্য জেলার সহাবস্থান ঋজুকে বেশ কৌতূহলী করে তোলে। বেড়াতে এসেছে ওরা চারজন। ও আর বাবা ছাড়া আছে মা এবং ছোটভাই ঋভু। বাবা বলেছিলেন, এবারে আর কোথাও নয়। চাকরিতে যা দৌড়ঝাঁপ করতে হয়, এখানে কয়েকদিন বিশ্রাম করে শরীরটা চাঙ্গা করে যাব। ওদের ভালও লাগছিল বেশ। পায়ে হেঁটেই সব ঘোরা যায়। একদিন রামঝুলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ গঙ্গা দেখেছিল ঋজু। দেখে দেখে আশ মেটে না। কখনো স্কেচখাতা-পেন্সিল নিয়ে বসে যায়। ছবি আঁকে।

সেদিন হোটেলে ফিরতেই মিঃ চৌধুরীকে এসে বেয়ারা একটা চিঠি দিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করে জানা গেল চিঠিটি হোটেলের লেটার বক্সে কে ছেড়ে গিয়েছে। চিঠিটা হাতে নিয়ে মিঃ চৌধুরী একটু আশ্চর্য হলেন। হ্যাঁ, খামের ওপর গোটা গোটা ইংরেজি অক্ষরে তাঁরই নাম। নিঃসন্দেহ হয়ে খামটি ছিঁড়লেন—

শ্রীযুক্ত চৌধুরী,

একবার উত্তরকাশী চলে আসুন। সম্ভব হলে কাল সকালের বাসেই। হৃষিকেশ বা হরিদ্বার থেকে যে সব বাস গঙ্গোত্রী যাচ্ছে, সব বাসই উত্তরকাশী হয়ে যায়। ছয়-সাত ঘণ্টা লাগবে। সকলকে নিয়েই আসুন। আমি ৩০৩ নম্বর ঘরে আছি। রাস্তার ওপরেই হোটেল বিজয়াতে। সাক্ষাতেই কারণ জানতে পারবেন। চলে আসুন। ভাল লাগবে।

ইতি—

আপনার 'সুহৃদ'

চিঠিটি পড়ে মিঃ চৌধুরী ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। ঋজুর মা ছোটভাই ঋভুকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। তার মধ্যেই বললেন, কি হলো? মিঃ চৌধুরী চিঠিটা দিলেন তাঁর হাতে। পড়ে এক মিনিটের জন্য শ্রীমতী চৌধুরীর মুখ চিন্তাচ্ছন্ন দেখাল। তিনি স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। মিঃ চৌধুরী বললেন, চলো যাওয়া যাক। একবার দেখেই আসা যাক না রহস্যটা কি? ঋজু এতক্ষণ স্কেচ করা ছবিগুলিতে রঙ করছিল, উত্তরকাশী যাওয়ার কথায় আনন্দে লাফিয়ে উঠল।

সকাল ছ'টায় ছাড়ল গঙ্গোত্রীগামী বাস। গঙ্গার ধার দিয়ে রাস্তা। কিছুদূর গিয়েই সোজা রাস্তা ছেড়ে বাসটা বাঁহাতি ঘুরে উপরের রাস্তা ধরল। ওরা সকলে বাসের কেবিনে বসার জায়গা পাওয়ায় পথের

দৃশ্যাবলী পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল। মিঃ চৌধুরী ঋজুর দিকে চেয়ে বললেন, নিচের সোজা রাস্তাটি রুদ্রপ্রয়োগ হয়ে কেদার-বদ্রীর দিকে গিয়েছে। ঋজু সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে বিজ্ঞের মতো জানায় তার মনে আছে। একটু পরেই এল নরেন্দ্রনগর। এখানে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্রদের জন্য রয়েছে একটি পলিটেকনিক। রাস্তা থেকেই দেখা গেল মেন বিল্ডিং এবং ছাত্রাবাস। আরও পেরিয়ে চাম্বা। ঋজু বলল, দুধ ও মধুর উপত্যকা বাবা?

কে বলল তোমায়?

বুবাই মামা। বলল ঋজু।

এ চাম্বা সে চাম্বা নয়। সে হিমাচল প্রদেশের চাম্বা। রাভী বা ইরাবতী নদীর ধারে চমরী গাইয়ের দেশ। মনে হয় যেন স্বর্গ। ইস, বুবাইটা যদি আজ থাকতো আমাদের সঙ্গে।

এখান থেকে একটি রাস্তা গিয়েছে ধালোটী হয়ে পাহাড়ের রানী মুসৌরিতে। ওরা টিহরীতে এসে জলখাবার খেল। জেলাসদর। তারপর বাস এল ধরাসু। এখান থেকে একটি রাস্তা চলে গিয়েছে বাঁদিকে হনুমান চটী পর্যন্ত। যমুনোত্রীগামী যাত্রীদের বাস ওই দিকে পাড়ি দিচ্ছে। দুপুর পার করে ওদের বাস এল উত্তরকাশী। ওই তো সামনেই হোটেল বিজয়া। মিঃ চৌধুরী হোটেলের অভ্যর্থনা কক্ষে গিয়ে ব্যবস্থাপকের কাছে ৩০৩ নং ঘরের মালিকের খোঁজ করলেন। ভদ্রলোক আকাশ থেকে পড়লেন, ৩০৩ নং ঘর তো গত এক হপ্তা থেকে ফাঁকা পড়ে আছে। মিঃ চৌধুরী একবার ঋজুর মার দিকে তাকিয়েই ভদ্রলোককে জানালেন, আচ্ছা বেশ, আমাদের তবে ওই ৩০৩ নং ঘরটিই দিন।

বেশ সুন্দর ও বর্ধিষ্ণু শহর উত্তরকাশী। উত্তরকাশী জেলার সদর-শহর। ঘরের জানালা দিয়েই তার অপার সৌন্দর্য কিছুটা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। মিঃ চৌধুরী বললেন, বেশ ঝামেলায় পড়া গেল তো? কে কি উদ্দেশ্যে আমাদের এখানে টেনে আনল?

যাই বলো আমার কিন্তু জায়গাটা বেশ ভালো লেগেছে। ঋজুর মা বললেন, ঋভুকে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে। ঋজু বলল, আমরা কিন্তু সব ঘুরে দেখব বাবা। এই দেখ গাইড বুক। হরিদ্বার থেকে কিনেছি। এতে সব আছে উত্তরকাশী সম্পর্কে।

বিকালে ওরা গেল বিশ্বনাথ মন্দির দর্শনে। কাশী মানেই বাবা বিশ্বনাথের স্থান। আর যে বরুণা ও অসি নদী মিলে বারাণসী সেই নদী এখানেও আছে। বারাণসীর মতো অত মন্দির না থাকলেও উত্তরের বারাণসী বা উত্তরকাশীতেও আছে আরও কয়েকটি মন্দির। সবই হেঁটে দেখা যায়। সন্ধ্যায় ঝোলা পুলের ওপর দাঁড়িয়ে গঙ্গার কলধ্বনি শুনে কেটে যায়।

পরদিন সকালে একটা মারুতি ভাড়া করে ওরা ঘুরে এল নেহরু ইনস্টিটিউট অব মাউন্টেনিয়ারিং। একটি পলিটেকনিকও রয়েছে এই পথে। পর্বতারোহণের নানা সরঞ্জামের প্রদর্শনী বা মিউজিয়াম রয়েছে। এখানে পর্বতারোহণের ছোট-বড় কয়েকটি পাঠও দেওয়া হয় হাতে-কলমে। ঋজুর ভাল লেগে গেল জায়গাটা। এমনকি ছোট্ট ঋভুও মার কোলে কোলে ঘুরে শোকেসে রাখা নানা অভিযানের ছবি ও সাজ-সরঞ্জাম দেখতে লাগল।

নেমে আসার সময় বাবা একটা রাস্তা দেখিয়ে বললেন, এ রাস্তা গিয়েছে চৌরঙ্গী খাল। অসি নদীর পাড় দিয়ে ধাপচাষের হলুদ-সবুজ ধানক্ষেত নিচে রেখে চিড়-পাইন জঙ্গল ছেড়ে মেঘের রাজ্যে রাজ্যে বাস চলে যায় চৌরঙ্গী খাল, ধান্তোরী হয়ে লম্বগাঁও। চৌরঙ্গী খাল যেতে সময় নেয় দু'ঘণ্টা। সেখানে নেমে পাহাড়ের মাথায় তিন কি.মি. চড়াই ও জঙ্গল ভেদ করে যেতে হয় নচিকেতা তাল। তাল মানে লেক বা সরোবর। জঙ্গলে যেমন বন্য জন্তু তেমনি পথ হারানোর সমূহ সম্ভাবনা। তাই সঙ্গে পথপ্রদর্শক নেওয়া আবশ্যক। তবে উত্তরকাশী থেকে সকালে রওনা দিয়ে দিনে দিনে ফিরে আসা যায়। আর একটি তাল আছে। তার নাম ডডি তাল। দু'তিন দিনের হাঁটা পথ উত্তরকাশী থেকে। তবে বাসে গঙ্গোরী পর্যন্ত কিছুটা পথ এবং জীপে সিমলি পর্যন্ত যাওয়া যায়। এখন আগাগোড়া জীপ চলে কিনা জানা নেই। তবে ওখানে বন-বিশ্রামাগারে রাত কাটাতে হয়। ডডি তালেও বন-বিশ্রামাগার আছে। বিভাগীয় বন-

আধিকারিকের দপ্তর থেকে ব্যবস্থাদি করে রাখতে হয়। গঙ্গোরী থেকে ৩২ কি.মি. দূরত্বে ডডি তাল। মালবাহক ও পথপ্রদর্শক নিতে হয় সঙ্গে। শুনতে শুনতে ঋজু ভাবে বড় হয়ে সেও একদিন ডডি তাল পদযাত্রা করবে, দেখবে নচিকেতা তালও।

হোটেলে ফিরতেই ম্যানেজারবাবু বললেন, আপনাদের একটা ফোন এসেছিল একটু আগে। গঙ্গোত্রী থেকে।

গঙ্গোত্রী থেকে? কার ফোন, কি বলল?

নাম বললেন E-বাবু।

E-বাবু!

হ্যাঁ, আপনারই নাকি আত্মীয় না শুভাকাঙক্ষী। বলল, উত্তরকাশীতে বিশেষ কারণে তার থাকা সম্ভব হয়নি। গঙ্গোত্রী চলে যেতে হয় জরুরী প্রয়োজনে। আপনাদের অতি অবশ্য সকালে লোকাল বাসে গঙ্গোত্রী যেতে বলেছে। আর হ্যাঁ, গঙ্গোশ্রী লজে উনি উঠেছেন।

ঘরে এসে ছোট মতো একটা সভা হয়ে গেল, কে এই E-বাবু! কেনই বা এরকম করছে? শেষে স্থির হলো এতদূর যখন আসা হয়েছে তখন যাওয়াই যাক গঙ্গোত্রী। গঙ্গামায়ের মন্দির দর্শন তো হবে। আর যেখানে বলুক সে রহস্যময় E-বাবু, আর কোথাও যাওয়া নয়। মিঃ চৌধুরী আবার আক্ষেপ করলেন, ইস, বুবাইটা যদি সঙ্গে আসতো তাহলে আমাদের এতটা চিন্তা করতে হতো না। 'E' দিয়ে পরিচিতদের মধ্যে কারো নামের আদ্যক্ষর কিনা ভাবতে লাগলেন।

বাস চলছে। পথের দৃশ্যাবলী ভারী সুন্দর মনলোভা। একে একে গঙ্গোরী, মালা, ভাটোয়ারী, গাংনানী, হরশিল ছাড়িয়ে বাস এল লঙ্কা। হরশিলে একটি হেলিপ্যাড রয়েছে দেখা গেল। লঙ্কায় গঙ্গার ওপর সেতু। ওপারে ভৈরবঘাটী। বাবা বললেন, আগে সেতু ছিল না। তখন যাত্রীদের বাস থেকে নেমে বোঝা মাথায়-পিঠে নিয়ে পায়ে চলা পুল পার হয়ে ওপারে গিয়ে নতুন করে বাস ধরতে হতো। যাই হোক এই শেষের কয়েক কি.মি. পথ ভীষণ বিপজ্জনক। বাস একবার বিপদ ঘটালে কারো রক্ষা নেই। বহু নিচ দিয়ে খরস্রোতা নদী বয়ে যাচ্ছে। দুপুরের আগেই পৌঁছানো গেল গঙ্গোত্রী।

গঙ্গা মায়ের মন্দিরের কাছাকাছি গঙ্গোশ্রী লজ। কিন্তু সেখানে গিয়ে পরিচিত কাউকে পাওয়া গেল না। হোটেলের কর্মচারী এবং আবাসিকরাও কেউ তেমন হদিস দিতে পারলেন না। তবে হোটেলের একটি স্যুইট খালি থাকায় এবং পছন্দ হয়ে যাওয়ায় মালপত্র নামিয়ে ওরা দখল নিল। ঋজু এক লাফে চলে গেল গঙ্গার পুলের ওপর। ওখানে দাঁড়িয়ে উজ্জ্বল নদীর রূপ দেখতে লাগল।

সন্ধ্যায় মন্দিরে আরতি দেখা হলো। কত রকমারি জিনিসের দোকান। বাড়ির জন্য, আত্মীয়দের জন্য জিনিস কিনতে লাগলেন ঋজুর মা ঋতাদেবী। জটাজূটধারী গেরুয়া বসন পরিহিত ত্রিশূলধারী এক সন্ন্যাসীর দর্শন পাওয়া গেল। ঋজুদেহ—তাতে ছাইভস্ম মাখা। কিন্তু কী সৌমকান্তি! সন্ন্যাসী স্থির চোখে তাদের দিকে তাকিয়েছিলেন। শেষে এই তাকানো অস্বস্তিকর পর্যায়ে চলে এল। তাড়াতাড়ি ওরা ফিরে এল লজে। রাতে শোবার আগে ঘরের জানালা ভাল করে বন্ধ করতে গিয়ে ঋতাদেবী দেখলেন গঙ্গার বহমান স্রোতের পাড়ে দাঁড়িয়ে চাঁদের ম্লান আলো মেখে সেই ত্রিশূল হাতে জটাজূটধারী স্থিরভাবে এদিকেই তাকিয়ে। তিনি আস্তে আস্তে জানালা বন্ধ করে দিলেন।

পরদিন সকালে ঋতাদেবীর কান্নাকাটিতে মিঃ চৌধুরীর ঘুম ভেঙে গেল। ঋজুকে পাওয়া যাচ্ছে না। সকালে সে-ই আগে উঠত। তারপর ঋতাদেবী। তিনি উঠে দেখেন ঋজু নেই। না শোবার ঘরে, না বসার ঘরে। স্নানাগার, শৌচাগার সব খুঁজে বারান্দায় দেখে কোথাও না পেয়ে তিনি ঘাবড়ে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে তুলে দিলেন মিঃ চৌধুরীকে। মিঃ চৌধুরী আশ্বস্ত করে বললেন, ভয় নেই, কোথায় যাবে আবার! নতুন জায়গা ভাল লেগেছে, হয়তো দেখ গঙ্গার পুলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তারপর ড্রেসিং টেবিলের ওপর একটা কাগজের চিরকুট ছাইদানি চাপা আছে দেখে বললেন, আরে ওটা কি? ঋতাদেবী এতক্ষণ খেয়াল করেননি মাথার ঠিক না থাকায়। তিনি চিরকুটটা এগিয়ে দিলেন।

ঋককে নিয়ে চললাম গোমুখ। আপনারাও আসুন ঘোড়াতে। দেখা হবে। পুলিশকে জানাবেন না—E-বাবু।

ঋক ঋজুরেই নাম। মিঃ চৌধুরী হতবাক হয়ে গেলেন। ঋতাদেবী ভেঙে পড়লেন কান্নায়। হঠাৎ তাঁর চোখের সামনে সেই সন্ন্যাসীর ছবি ভেসে উঠল। হায় হায়, তখন যদি তিনি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারতেন! তিনি স্বামীকে বললেন সেকথা। মিঃ চৌধুরী একটু ভাবলেন। হৃষিকেশের হোটেলের চিঠিটা খুলে দেখলেন দুটি চিঠিই এক অপরিচিত হাতের লেখা। ইতিমধ্যে কান্নার শব্দে ঋভুর ঘুম ভেঙে গিয়েছে। সেও দাদা কৈ? দাদা? দাদা কৈ বলে যাচ্ছে একভাবে।

লজের ম্যানেজার তখনও আসেননি বা ছিলেন না। জনে জনে কর্মচারীদের জিজ্ঞেস করলেন মিঃ চৌধুরী। কেউ জানে না বা খেয়াল করেনি। আবাসিকরাও তখনও কেউ ওঠেনি বা দরজা খোলেনি। শেষে একটি ছেলে ঋজুর বয়সী হবে, সে বলল, এক সুন্দর প্যান্ট-শার্ট পরা বাবুর সঙ্গে যেতে দেখেছে। ২০-২৫ বছর বয়স হবে লোকটির। ঋজু তার হাত ধরে কলকল করে কথা বলতে বলতে লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছিল। পরিচিত কোনো লোক হবে ভেবে সে সন্দেহ করেনি।

মিঃ চৌধুরী একবার পুলিশে খবর দিয়ে এলেন। জানিয়ে এলেন আজই এখুনি তাঁরা রওনা দিচ্ছেন গোমুখের উদ্দেশে ছেলের খোঁজে। সংক্ষেপে ঘটনা উল্লেখ করে একটি অভিযোগ দায়ের করে জানিয়ে এলেন—ঘন নীল সোয়েটার পরা কোনো ফুটফুটে ছেলেকে কোনো সন্ন্যাসী বা ভদ্রলোকের সঙ্গে যেতে দেখলে আটকাবেন।

সামনের একটি ঘোড়াতে ঋতাদেবী একা এবং পিছনের ঘোড়াতে ঋভুকে বাগিয়ে ধরে স্বয়ং মিঃ চৌধুরী। ভারাক্রান্ত মন। আজ দলে তাঁরা তিনজন। ঋজু নেই। কোনোদিন যে এমন হবে ভাবা যায়নি। সমস্ত মালপত্র লজের ক্লোক রুমে গচ্ছিত রেখে এসেছেন। প্রায় দশ কিমির মতো চড়াই পাহাড়ী পথে এলো চিড়বাসা। প্রচুর চিড়-পাইনের জঙ্গল তাই হয়তো এমন নাম জায়গার। পাশ দিয়ে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে অবিরাম। এ গঙ্গা আর সেই বঙ্গের গঙ্গা নয়। শীর্ণকায়া, খরস্রোতা, পাহাড়ী নদী নুড়ি পাথর গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ঘটনার আকস্মিকতায় খেতে ভুলে গিয়েছিলেন তাঁরা। দৃশ্যাবলীই বা কার দেখার মন আছে! তবু অনেক লোককে একসঙ্গে চটীর হোটেলে মধ্যাহ্নাহার করতে দেখে নামলেন তাঁরা। কিছু অন্তত মুখে দেওয়া দরকার। ঋভু অনেক্ষণ না খেয়ে আছে। ঋতাদেবী প্রায় কিছুই খেলেন না। তবে ঋভুকে খাওয়ালেন। অনেকক্ষণ পর মায়ের কোল পেয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল। আবার ঘোড়ায় ওঠা। পথে একটা ভঙ্গুর পাহাড় পড়েছিল। অনবরত পাথর গড়িয়ে নিচে নামছে। খুব সাবধানে পার হতে হয়েছিল।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ ভুজবাসা এল। ভুর্জগাছের কিছু কিছু দেখা যায়। একসময়ে এই গাছের ছাল লেখার কাগজ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ছুরি দিয়ে একটা চওড়া ছাল কেটে নিলে স্তরে স্তরে অনেক কাগজের মতো উঠে আসে। অনেকটা খাদির কাপড়ের মতো রঙ বা দেখতে। এখানে লালবাবা নামে এক সাধুর আশ্রম। বহুদিন ধরে উনি গোমুখ যাত্রীদের সেবাযত্ন করে আসছেন। থাকার ঘর ও আহার পাওয়া যায় সেখানে। রাতটুকু ভুজবাসাতেই বিশ্রাম করতে হবে। কিন্তু সাধুসন্তদের সংস্পর্শে থাকতে চান না ঋতাদেবী। তাই বাধ্য হয়ে আর একটু এগিয়ে গিয়ে গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের লজে উঠলেন। ছিমছাম ব্যবস্থা। রাতে খুব শীত। অক্সিজেনের স্বল্পতা হেতু শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট। তাছাড়া ছেলের চিন্তায় কি ঘুম হয় বাবা-মার! বারবার ঋজুর মুখটা মনে পড়ছে। সারাদিনের ক্লান্তি ও শোকে ঋতাদেবী ঋভুকে বুকে জড়িয়ে ঘুমে নিমগ্ন। আস্তে আস্তে বাইরে আসেন মিঃ চৌধুরী। গঙ্গার ছলছল শব্দ শোনা যাচ্ছে। উপরে নক্ষত্রখচিত আকাশ বর্ণময়। নক্ষত্রের এত ঔজ্জ্বল্য কলকাতার আকাশে দেখা যায় না। সামনে বরফের শৃঙ্গ। প্রান্তরে লালনীল রঙিন তাঁবু পড়েছে অভিযাত্রীদের। কনকনে হাড়কাঁপানো বাতাসে দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি লাগা থামতে চায় না। আবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন মিঃ চৌধুরী।

সকাল হতেই দরজায় 'নক' হতে লাগল। চিঠি। বেয়ারা জানাল এই মাত্র একজন মালবাহক দিয়ে

গেল। ঋজুর কথা এখানের কাউকে জানাননি মিঃ চৌধুরী। ইচ্ছে করেনি। শুধু সতর্ক দৃষ্টিতে নজর রাখছিলেন লজের প্রতিটি ঘরে, অলিন্দে, বারান্দায়, চত্বরে বা খাবার ঘরে। আবার কি লিখল E-বাবু? দেখা যাক—

বাবা,

গোমুখ থেকে তপোবন এস কিন্তু।

—ঋক

পুঃ মাকে, ঋভুকে গোমুখ দেখে ফিরে গিয়ে লজে বিশ্রাম নিতে বলো। তপোবনের পথ খুব দুর্গম।

চিঠিটা ঋজুর হাতে লেখা। মিঃ চৌধুরী ওটা ঋতাদেবীকে দেখালেন। ঋজুর হাতের লেখা দেখে তিনি এতক্ষণে যেন অনেকটা ভরসা পেলেন। তবে তপোবন যাবার জন্য তিনি জেদ ধরে বসলেন। মিঃ চৌধুরী প্রমাদ গনলেন। স্ত্রী এবং এতটুকু বাচ্চাকে নিয়ে তপোবনের দুর্গম পথে তিনি কিভাবে এগোবেন! হিমবাহের অজস্র গহ্বর সেখানে। একেবারে মৃত্যুফাঁদ। শেষে লজের ম্যানেজারের সাহায্যে দুজন বিশ্বস্ত মালবাহক এবং পথপ্রদর্শক পাওয়া গেল। তারা ছোট্ট ঋভুকে আর তার মাকে তপোবন নিয়ে যেতে পারবে। ঋতাদেবী আজ চলাফেরার সুবিধার্থে চুড়িদার কুর্তা পরেছেন। মন তাঁর বিষণ্ণ হলেও কঠিন। অনেকটা সামলে নিয়েছেন নিজেকে।

ভুজবাসা থেকে গোমুখ তিন কি.মি.। এটুকু পথ হেঁটেই যাবেন। গঙ্গোত্রী থেকে মোট ১৯ কি.মি. দূরে গোমুখ। ঋভুকে কোলে নিয়েছে গাড়োয়ালী একটি ছেলে। সামনে শিবলিঙ্গ শৃঙ্গ। তার পিছনে লেগে আছে পার্বতী শৃঙ্গ, দেখাল পথপ্রদর্শক গাড়োয়ালী যুবক। দুটি শৃঙ্গই অনিন্দ্যসুন্দর তুষারাচ্ছাদিত।

ওই দেখুন স্যার গোমুখ। গাড়োয়ালী যুবকটি বলে। মিঃ চৌধুরী ও ঋতাদেবী অপার বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন সেই পরমাশ্চর্যের দিকে। গরুর মুখাকৃতি পাথরের বিকট হাঁ-মুখ থেকে অনাদি কাল ধরে নিঃসৃত হয়ে আসছে এই হিমশীতল জলরাশি। পাথরের গায়ে পুরু সবুজাভ বরফের আচ্ছাদন। ঋভু ফ্যালফ্যাল করে সে দৃশ্য দেখতে দেখতে সব ভুলে গেল।

এবার তপোবনের পথ। চড়াই। অজস্র রঙিন নুড়ি পাথর ছড়ানো। পা সাবধানে ফেলতে হয়। চার কি.মি. গিয়ে তপোবন। কিন্তু সেখানে গিয়ে যদি বিফল হতে হয়? আর ভাবা যায় না। ঈশ্বরের নাম নেন ওঁরা। মন বলছে ঋজু ওখানে থাকবে। তার হাতের চিঠি এখনও রাখা আছে কাছে। বেশ কষ্ট হচ্ছে উঠতে। গলা শুকিয়ে আসছে। কষ্ট হচ্ছে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে। পথপ্রদর্শকরা ওঁদের ধীরে ধীরে সাবধানে নিয়ে যাচ্ছে। হাত ধরে পার করে দিচ্ছে 'ক্রীভাস' নামে মৃত্যুফাঁদগুলি। নিচে একটা পাথর ফেলে দেখিয়ে দিল কত নিচে শব্দ হতে হতে মিলিয়ে গেল পাথরটি। ঋতাদেবী আঁতকে উঠলেন। হিম ঠাণ্ডা বেরিয়ে আসছে ফাটলের মুখ থেকে। অনেক ফাটল নাকি তুষার ঝড়ে পাথর ও আলগা নুড়িতে ঢেকে যায়। ওপর ওপর দেখা যায় না। এরা লাঠি ঠুকে ঠুকে পথ চিনে এগিয়ে নিয়ে যায়। ঋভুকে সাবধানে ধরে রাখতে বলেন বারবার ঋতাদেবী।

কষ্টেরও শেষ হয় এক সময়। সামনে এক খোলা প্রান্তর। হলুদ-সবুজ তৃণভূমি। গাইড চিনিয়ে দিয়ে বলে, এসে গেছে তপোবন। এক সন্ন্যাসিনী সামনে দাঁড়িয়ে। দক্ষিণ ভারতীয়া মাতাজী। মিঃ চৌধুরী তাঁকে প্রশ্ন করতেই দূরে আঙুল তুলে দেখান। ওঁরা ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে পড়েন। মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে বরফগলা জলধারা। এর নাম অমরগঙ্গা। দূরে গুহায় এক সন্ন্যাসীকে দেখা যায়। কিন্তু ঋজু কই?

সন্ন্যাসীর নাম সিমলাই বাবা। খুব তেজী সন্ন্যাসী। তিনি ইশারায় ওঁদের ডাকলেন। মনে আশার সঞ্চার হলো। তাঁর গুহায় প্রবেশ করার সময় দেখা গেল এক অপূর্ব সুন্দরী সন্ন্যাসিনী। এলোকেশী, দীর্ঘাঙ্গিনী, উন্নতনাসা এবং শ্বেতাঙ্গিনী। সস্নেহে কোলে নিয়ে যাকে দুধপান করাচ্ছেন সে ঋজু।

ঋজু! বাবা! সোনা আমার! ঋতাদেবী পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দাদা! দাদা! বলে উঠল ঋভু। কিন্তু ঋজুর মুখে মিটি মিটি দুষ্টুমি ভরা হাসি। কৈ সে তো ঝাঁপিয়ে পড়ল না মা-বাবার বুকে। যেন কোনো বিপদই ছিল না! আছে পরম নিশ্চিন্তে। ওনারা সন্ন্যাসিনী এবং সিমলাইবাবার মুখের দিকে

তাকাল। তাঁরাও স্মিত হাসছিলেন। ইশারায় দেখিয়ে দিলেন গুহার অভ্যন্তরে আরেকটি কক্ষ। এটাই অতিথি নিবাস। সেখানে কম্বল মুড়ি দিয়ে এক ব্যক্তি নাক ডাকাচ্ছে। চৌধুরী সাহেব সপাটে কম্বল সরিয়ে দিয়েই বিস্ফারিত উচ্চারণে বললেন, শু-ভো-জি-ৎ!

কে বুবাই! তুই....তুই....ঋতাদেবীর কথা আটকে যায়।

বুবাই মামা! বুবাই মামা! ঋভু হাততালি দিয়ে ওঠে আনন্দে।

হ্যাঁ, হৃষিকেশেই তো শেকড় গেড়ে বসেছিলেন। আমি পরিকল্পনা করে না আনলে তো আসতেনই না। শুনুন, ঋজু কিন্তু সন্ন্যাসীর বেশেও আমাকে ধরে ফেলেছিল গঙ্গোত্রীতে। অদ্ভুত সক্রিয় ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। আশীর্বাদ করি ও অনেকদূর যাবে। তখনই ওকে পরিকল্পনা জানাই এবং সকালে আমার চিরকুট রেখে চলে আসতে বলি। ভুজবাসায় আমরা কিন্তু লালবাবার আশ্রমে থাকি আপনাদের পর্যবেক্ষণ করে। আর পত্রপ্রেরক তো অচেনা কেউ নয়। 'বুবাই'-কে উল্টো করে লিখলেই 'ইবাবু'। চিঠিগুলো বাঁ হাতে লেখা। স্যুট পরা শুভজিৎ বুট পরতে পরতে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ দেখতে বলে ঝোলায়। তার মধ্যে একটা ফোল্ডিং ত্রিশূলও আছে।

[পৌষ ১৪০৮]

দস্যু এল দ্বীপে

শুভমানস ঘোষ

এইমাত্র একটা লঞ্চ এসে ভিড়ল পোর্টব্লেয়ারের ফিশারিজ জেটিতে। অনেকে নামল। তাদের মধ্যে একজনের দিকে চুম্বকের মতন চোখ আটকে গেল তাতানের। লোকটা মাথায় খুবই লম্বা। চেহারাটা প্যাঁকাটির মতন। একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে তাতান চেপে ধরল গৌতমের কাঁধ। দেখতে দেখতে তার মুখ থেকে নেমে যাচ্ছিল সমস্ত রক্ত।

কী হলো রে? গৌতম বন্ধুকে দেখল।

লোকটা হনহন করে এদিকে এগিয়ে আসছে। তার পাশে আর একটা লোক। এই লোকটা কিন্তু তাগড়া চেহারার, মাথায় খুব উঁচু না হলেও চোখ দুটো জ্বলজ্বলে। হঠাৎ তার নজর আটকে গেল তাতানের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। তাতানের গলা শুকিয়ে গেল। ঠোঁট দুটো থিরথির করে কাঁপতে আরম্ভ করল।

দাঁড়ালি কেন? লম্বা লোকটি ঠেলা দিল মোটকাকে।

'দাঁড়া দাঁড়া', বলে মোটকা জেটি থেকে নেমেই সটান এগিয়ে গেল তাতানের দিকে। তার ভুরু গুটিয়ে গেছে। কটমট করে তাতানকে দেখতে দেখতে বলল, কী নাম রে তোর?

একেবারে তুই? তাতানের সমস্ত ভয় উধাও হয়ে গেল। দিল ঝেঁঝে লোকটাকে, আমার নাম দিয়ে কী হবে তোমার? বলব না।

বলবি না? তাগড়ার চোখে আগুন ধরে গেল। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, আমাদের দিকে ও ভাবে তাকাচ্ছিলি কেন?

গৌতম হঠাৎ বন্ধুকে আগলে দাঁড়িয়ে পড়ল, বেশ করেছে তাকিয়েছে। যান তো এখান থেকে। যতসব উটকো ঝামেলা।

গৌতম এ বছর তাতানের সঙ্গে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। পড়াশোনায় সে তেমন না হলেও চেহারাতে খুবই মজবুত। রোজ ব্যায়াম করে। সাহসও সাংঘাতিক। দরকার পড়লে এক কথায় যার তার সঙ্গে লড়ে যেতে পারে। তাই শংকরমামার সঙ্গে আন্দামানে আসার আগে তাতান তার অনেক বন্ধুর মধ্যে এই গৌতমকেই বেছে নিয়েছিল।

গৌতমের ধাতানিতে কাজ হলো। কয়েক সেকেন্ড আগুনে চোখে গৌতমের দিকে চেয়ে থেকে লোকটা আস্তে আস্তে চোখ নামিয়ে ফেলল। তার পর লম্বা চেহারার লোকটাকে 'চলে আয়' বলে সুড়সুড় করে চলে গেল। তবে যেতে যেতে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিল।

এক নম্বরের বাজে লোক। তখনও রাগে গজগজ করছিল গৌতম, স্মাগলার-টাগলার হবে।

তাতান চাপা গলায় বলল, স্মাগলার নয় রে গৌতম, ব্যাঙ্ক ডাকাত। লুটের টাকা নিয়ে পালিয়ে এসেছে এখানে। আমাদের জাহাজে করেই মনে হয়।

আন্দামানে আসার তিনদিন আগের কথা। আহিরীটোলায় শংকরমামার ডেরায় গিয়েছিল তাতান। শংকরমামা তাতানের দূরসম্পর্কের মামা। ওর আসল বাড়ি উত্তরবঙ্গের কোচবিহারে। শংকরমামা মূকাভিনেতা। সেদিন দুপুরে শংকরমামার মেসের বিছানায় শুয়ে আন্দামানের ওপর একটা বই পড়ছিল

তাতান। বেশ মন লেগে গিয়েছিল পড়ায়। আন্দামানের আদিম অধিবাসী জারোয়াদের নিয়ে অনেক কথা ছিল বইটায়। নর্থ আন্দামানের কয়েকটা দ্বীপে বাস করে তারা। যেমন হিংস্র তেমনি অসভ্য। সভ্য মানুষদের দু'চোখে দেখতে পারে না। দ্বীপের কাছাকাছি কেউ গেলে তার আর রক্ষা নেই। বিষাক্ত তীর দিয়ে গেঁথে দেবে। বইটা পড়তে পড়তে তাতানের ইচ্ছে হচ্ছিল আন্দামানে তো যাচ্ছেই, যে ভাবে হোক নিজের চোখে দেখে আসবে জারোয়াদের।

এই পর্যন্ত পড়েছে, তার পরেই গোলমালের শব্দ শুনে বই ফেলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে তার তো চক্ষুস্থির। মেসের ঠিক উল্টোদিকে একটা ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কের গেটের সামনে দু'হাতে রিভলবার ধরে দাঁড়িয়ে একজন খুব লম্বা লোক চেঁচিয়ে বলছে, এগোবেন না, এগোবেন না, চালিয়ে দেব।

তাতান দেখেই বুঝতে পারল, ব্যাঙ্ক ডাকাতি হচ্ছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের চেল্লমেল্লি শুনে আশপাশ থেকে ছুটে এসেছিল অনেক লোক। দূরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে তারা। রিভলবারের সামনে এগোতে সাহস পাচ্ছে না। কয়েক মিনিট কাটল। ব্যাঙ্কের ভেতর থেকে পলিথিনের একটা ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে এল আরও দুজন ডাকাত। তার পরেই ঘটে গেল একটা ভীষণ কাণ্ড। প্রচণ্ড শব্দে বোমা পড়ল একটা। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল চারপাশ। তারই ভেতর মোটরবাইক স্টার্ট করে নিমিষে অদৃশ্য হয়ে গেল ডাকাতরা।

ঠিক বলছিস? ওই লোকগুলোই? গৌতম চেঁচিয়ে উঠল।

হ্যাঁ, ভুল হতেই পারে না। তাতান জোর দিয়ে বলল, ওই ঢ্যাঙাটাকেই দেখেছিলাম ব্যাঙ্কের সামনে রিভলবার নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু...

কিন্তু? উত্তেজনায় যেন ফেটে পড়বে গৌতম।

তাতানের ভুরু কুঁচকে গেল, হ্যাঁ এইবার মনে পড়েছে, যেন জাহাজে দেখেছিলাম এদের। ঠিক চিনতে পারিনি। নির্ঘাত ছদ্মবেশে ছিল।

গৌতমের চোখেও দপ করে আলো জ্বলে উঠল, ঠিক তো। ওই লম্বাটার হাইটের একজন প্যাসেঞ্জার ছিল বটে জাহাজে। হ্যাঁ ঠিক। বলতে বলতে সে খপ করে তাতানের হাত চেপে ধরল, চল তো আমার সঙ্গে।

কোথায়?

ফলো করব ওদের। কুইক!

দুই বন্ধুর বেড়ানো মাথায় উঠল। এমন সুন্দর বিকেল, এমন চমৎকার সমুদ্র, সমুদ্রের মধ্যে ডুবে যাওয়া সূর্যের শোভা পরের দিনের জন্য তুলে রেখে তারা রাস্তায় নেমে এল। রাস্তায় এলোমেলো ভাবে অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করেও লাভ হলো না। লোক দুটো যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

শংকরমামা বলল, খবর্দার তাতান, ব্যাঙ্ক ডাকাত-ফাকাত নিয়ে মাথা ঘামাবি না একদম। ওরা যা করছে করুক, আমাদের কী? কালই অগ্রগামী ক্লাবের ফাংশান।

শংকরমামার এই একটা ব্যাপার একেবারে পছন্দ হয় না তাতানের। বড় গা-আলগা ভাব। ঝামেলা থেকে সব সময় শত হস্ত দূরে। তবে মানুষটা ভাল। ছেলেবেলা থেকেই নাটকের শখ শংকরমামার। বড় হয়ে নামকরা অভিনেতা হবে এই রকমেরই ইচ্ছে ছিল তার। কিন্তু গোলমাল পাকিয়ে ফেললেন যোগেশবাবু। ইনি বিশ্ববিখ্যাত এক মূকাভিনেতা। কলকাতায় বেড়াতে এসে তাঁর একটা শো দেখে মাথা ঘুরে গেল শংকরমামার। জীবনের লক্ষ্য বদলে ফেলে ভর্তি হয়ে গেল যোগেশবাবুর মাইম কোর্সে। ইদানিং অবশ্য শংকরমামার একটু-আধটু নাম হয়েছে। টিভিতে একটা প্রোগ্রামও করে ফেলেছে। সম্প্রতি অন্ধ্রপ্রদেশে বিশ্বহাস্য সম্মেলনে গিয়ে পেপারে ভাল কভারেজ পেয়েছে। আন্দামানে এই প্রোগ্রামের আমন্ত্রণ তারই দৌলতে। শংকরমামা নিজের পরিচিতি জানিয়ে যে লিটারেচারটা ছেপে এনেছে তাতে তাতানকে মিউজিক ডিরেকটর আর গৌতমকে ম্যানেজার বানিয়ে দিয়েছে। অগ্রগামী ক্লাব তিনজনেরই যাতায়াতের ভাড়া দিচ্ছে।

এখানে আসার পর কয়েকদিন কেটে গেছে। এর মধ্যে পোর্টব্লেয়ারের আশেপাশে বেশ কয়েকটা প্রোগ্রাম করে ফেলেছে ওরা। তাতে দারুণ পাবলিসিটি হয়ে গেছে ওদের। নর্থ আন্দামানের বিভিন্ন দ্বীপ থেকেও প্রোগ্রাম করার আমন্ত্রণ এসে পৌঁছচ্ছে তাদের কাছে। অবশ্য এতটা প্রচার হওয়ার অন্য একটা কারণ হলো এখানকার রেডিওতে শংকরমামার একটা ইন্টারভিউ। শংকরমামার প্রচারের সুযোগ নিয়ে আন্দামানের অগ্রগামী ক্লাব ঠিক করেছে রীতিমতন টিকিট কেটে অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে তারা। পোর্টব্লেয়ারের সেরা হলে আগামীকাল বিকেলে অনুষ্ঠানটা হবে বলে মোটামুটি ঠিক ছিল। কিন্তু এর মধ্যে ঘটে গেল আর একটা ঘটনা। আজ বিকেলে ডাকাত গুলোর সঙ্গে দেখা হওয়ার কিছুক্ষণ আগের ঘটনা। গৌতমকে নিয়ে তাতান বেড়াতে বেরোচ্ছিল। হঠাৎ দেখে গটগট করতে করতে হাজির এক যুবক। সাদা রঙের পুরোদস্তুর ইউনিফর্ম যুবকটির গায়ে। ব্যাজ দেখে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না, মিলিটারি নেভির লোক। এখানে একজন 'কলাকার' থাকে, সে তার সঙ্গে 'বাতচিত' করতে এসেছে। কলাকারকে দিয়ে সামনের রোববার পোর্টব্লেয়ারে প্রোগ্রাম করানোর জন্য কথাবার্তা 'পাক্কি' করতে তাকে ফাটানো হয়েছে।

নেভির প্রোগ্রাম বলে কথা। দক্ষিণা মন্দ হবে না। কাল অগ্রগামীর ফাংশন। তার দু'দিন পরেই রোববার। অসুবিধে নেই। শংকরমামা এক কথায় রাজী হয়ে গেল। ঠিক হলো, শনিবার দুপুরে এসে যুবকটি কিছু অ্যাডভান্স দিয়ে যাবে।

তার পরে দুই বন্ধু বেড়াতে গিয়ে এই কাণ্ড। একেবারে মুখোমুখি ব্যাঙ্ক লুঠেরাদের। ফিরে এসে দুই বন্ধুতে তাই নিয়ে জোর শলা-পরামর্শ হচ্ছিল। গৌতম বলছিল, ডাকাতগুলোকে পুলিশে ধরিয়ে দিলে হয় না?

তাতান বলছিল, পুলিশে ধরবে কেন ওদের? কী প্রমাণ আছে ওরা ডাকাত?

কেন তুই? তুই তো দেখেছিস সব।

কী রে কীসের গুজুর গুজুর হচ্ছে?

ওরা চমকে উঠে তাকিয়ে দেখেছিল শংকরমামা। শংকরমামা চেপে ধরতেই গৌতম সব বলে দিয়েছিল। সমস্ত শুনে শংকরমামা তো খাপ্পা। ওরা এ সব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে কেন, এ সব করতে গিয়ে ভালমন্দ যদি কিছু হয়ে যায়, ওদের বাড়িতে সে কী কৈফিয়ত দেবে—এই সব বলে খানিকক্ষণ গজর গজর করে শংকরমামা সোজা জানিয়ে দিল, তারা যদি এক্ষুণি এসব মাথা থেকে ঝেড়ে না ফেলে তা হলে এই শেষ। আর জীবনে তাদের নিয়ে কোথাও যাবে না সে।

দুই বন্ধু জব্দ হয়ে গেল একেবারে। তারা চুপিচুপি যে প্ল্যান ভাঁজছিল সব ভেস্তে গেল।

অগ্রগামী ক্লাব তাতানদের থাকার জন্য ক্লাবঘরটা ছেড়ে দিয়েছিল। ঘরটা একটা মস্ত টিলার একেবারে মাথার ওপর। নিচে পিকচার পোস্টারের ছবির মতন সমুদ্র।

দেখতে-দেখতে রাতটা কেটে গেল। অগ্রগামী ক্লাবের অনুষ্ঠান সন্ধ্যে ছটায়। চারটে নাগাদ ওরা বেরিয়ে পড়ল। হলে পৌঁছে একবার স্টেজ রিহার্সাল দিয়ে নেবে। কিন্তু হলের কাছাকাছি আসতেই চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল তাতানের। টিকিটের জন্য প্রকাণ্ড লাইন পড়ে গেছে। সারা পোর্টব্লেয়ারের লোক যেন ঝেঁটিয়ে পড়েছে এখানে। দেখেশুনে শংকরমামা এমন উৎসাহ পেয়ে গেল, প্রথম থেকে অনুষ্ঠান এমন জমিয়ে দিল যে ভাবা যায় না।

ইন্টারভ্যালের সময় গৌতমের দেখা পেল তাতান। কেমন যেন উত্তেজিত লাগছিল গৌতমকে। উয়িংসের পাশে বসে বিলিতি মিউজিকের টেপ চালানোর দায়িত্ব দিল তাতানের। তার তালে তালে শংকরমামা স্টেজে দাঁড়িয়ে শরীরের ম্যাজিক দেখিয়ে থাকে। ক্লাবের একটা ছেলেকে দায়িত্বে রেখে তাতান তাড়াতাড়ি উঠে এল গৌতমের কাছে, কী ব্যাপার রে তোর?

গৌতম ঝুঁকে পড়ল, ডাকাতগুলো এসেছে রে।

ডাকাত? ক'জন?

দুজন। হোঁৎকাটা আর একটা নতুন চিড়িয়া।

তাতান নিজেকে সামলাতে পারল না। গ্রিনরুমের দরজা দিয়ে ঘুরে পৌঁছে গেল হলের ভেতর। কিন্তু সারা হল তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ডাকাতদের দেখা পেল না ওরা। বাইরে বেরিয়ে থাকবে এই ভেবে গৌতমকে নিয়ে হল থেকে বেরিয়ে কয়েক পা হাঁটতেই পড়বি তো পড় একেবারে ডাকাতদের মুখে। ডাকাত দুটো একটু দূরে একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল। ওদের দেখে গুটিগুটি এগিয়ে এল।

নতুন ডাকাতটার থলথলে চেহারা। তবে মুখচোখ দেখে মনে হয়, ভালই বুদ্ধি ধরে। ব্যাঙ্ক ডাকাতির সময় সম্ভবত এ দলে ছিল না। তাতানের দিকে চেয়ে সে ফিক করে হেসে ফেলল। বলল, সাবাশ! ফাটাফাটি হচ্ছে তোমাদের প্রোগ্রাম। এসো হাত মেলাও ব্রাদার।

তাতান হাত মেলানোর দিকে গেল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে লোকটাকে। নতুন চিড়িয়াই বটে। ভাবতে ভাবতে তাকে আগলে দাঁড়িয়ে পড়ল গৌতম। লোকটার দিকে চেয়ে রুক্ষস্বরে বলল, ব্যাপার কী বলুন তো? কী চান আপনারা?

লোকটার দাঁত বেরিয়েই আছে। বলল, আরে সেটা তো আমাদেরও প্রশ্ন। বলে হোঁৎকাকে দেখিয়ে আরও বলল, এ আমার বন্ধু। দেখলে মস্তানগুণ্ডা বলে মনে হলেও আসলে খুব ভাল ছেলে। শুনলাম, ক'দিন আগে জেটিঘাটে তোমাদের সঙ্গে এর ঝামেলা হয়েছিল। সত্যি করে বলো তো, আসল ব্যাপারটা কী।

সত্যি বেজায় চালাক লোকটা। কেমন খেলাতে খেলাতে ঠিক লাইনে নিয়ে চলে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি বুদ্ধি করে তাতানও পাল্টা একটা চাল দিল, কী হয়েছিল সেটা তো আমরাও জানতে চাইছি। আপনি যেমন বললেন, আমরাও খুব ভাল ছেলে। আমার বন্ধুটার অবশ্য একটু মাথা গরম আছে। কিন্তু ওর মতোও ছেলে হয় না।

দপ করে আগুন ধরে গেল লোকটার চোখে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, বাড়ি কোথায় তোমাদের? কলকাতায় থাকো তো? কলকাতার কোথায়?

কলকাতা? তাতান জেনেশুনে হাঁদা সেজে গেল টপ করে, কলকাতার কথা বললেন কেন? আপনারা কলকাতায় থাকেন বুঝি? এখানে বেড়াতে এসেছেন?

গৌতম হাত নাড়াল, আরে যান তো, খালি কিচমিচ করে যাচ্ছে তখন থেকে। আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।

ফস করে লোকটার আসল চেহারা বেরিয়ে পড়ল। দাঁতে দাঁত ঘষছে। হিসহিস করে বলল, শোন একটা কথা সাফ সাফ বলে দিই তোদের, আমাদের ব্যাপারে একদম নাক গলাবি না। এ তোদের কলকাতা নয় মনে রাখিস। বেশি বাড়াবাড়ি করলে মেরে লাশ ভাসিয়ে দেব সমুদ্রে।

তার পরে যে ঘটনা ঘটল তার জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। 'তবে রে' বলে বিশাল চিৎকার পেড়ে আচমকা গৌতম ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার ওপর। তার গলা টিপে ধরে বলতে থাকল, ডাকাতি করে এসে আবার আমাদের ওপর গরম নেওয়া হচ্ছে? আজ তোকে মেরেই ফেলব।

হোঁৎকা এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। সঙ্গীকে বাঁচাতে সে এবার ঝাঁপিয়ে পড়ল গৌতমের ওপর। অগত্যা তাতানকেও হাত লাগাতে হলো। চোখকান বুজে সে বসিয়ে দিল এক ঘুষি হোঁৎকার মুখে। তাতেই আঁক করে হোঁৎকা ছিটকে গেল দূরে। পরক্ষণে ক্ষেপা মোষের মতন টলতে টলতে দৌড়ে এল তার দিকে। তাতান আঁতকে উঠল। সর্বনাশ, ওর হাতে চকচক করছে কী যেন!

ডাকাত! ডাকাত! তাতান চেঁচিয়ে উঠল।

হুলুস্থুল পড়ে গেল। তাতানের গলা পেয়ে হল থেকে পিলপিল করে বেরিয়ে এল দর্শকের দল। কোথায় ডাকাত জানতে চাইছিল তারা। তাতান আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ধপাস করে বসে পড়ল। যতই তার বড় হয়ে গোয়েন্দা হওয়ার ইচ্ছে থাক না কেন, লড়াই-মারপিট এখনও তার ঠিক আসে না।

ওদিকে তখনও ঘোর ঝুটোপুটি লড়াই চলছে গৌতমের সঙ্গে থলথলের। কিন্তু দর্শকরা তাদের দিকে এগোতেই হঠাৎ সাংঘাতিক এক ঝটকা দিয়ে লোকটা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দিল দৌড়। তার দেখাদেখি হোঁৎকাও ছুটল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তারা কোথায় যে মিলিয়ে গেল ধরাই গেল না। ওই রকম থলথলে চেহারা নিয়ে যে কোনও লোক এভাবে ছুটতে পারে ভাবাই যায় না। তবে কি এই লোকটাও ডাকাতির সময় দলে ছিল? তাতান মনে করার চেষ্টা করল আর একবার।

ফাংশানের ঘটনার পর গোটা পোর্টব্লেয়ারে হইহই পড়ে গেছে। ক্লাবের কর্মকর্তাদের সব শুনে তো মাথায় হাত। নমো নমো করে বাকি অনুষ্ঠানটা শেষ করে শংকরমামা বসে গিয়েছিল তাদের সঙ্গে যুক্তি করতে। এখানকার মানুষরা বড় শান্তিপূর্ণ। ঝামেলা-হুজ্জোত পছন্দ করে না মোটে। কী করা যায় তা নিয়ে কিছুতে একমত হতে পারছিল না তারা। পুলিশে খবর দিতেও ভয় পাচ্ছিল। অনেক মাথা-টাথা ঘামিয়ে শেষে ঠিক হলো, শংকরমামাদের নির্জন ক্লাবঘরে থাকা ঠিক হবে না। তাদের জন্য নতুন আস্তানা ঠিক করা হবে। জঙ্গলিঘাটের কাছে আছে ব্রিজ হোটেল। সেখানেই তাদের থাকার ব্যবস্থা হলো। কাল বিকেলে চেন্নাইয়ের জাহাজ ছাড়বে একটা। তাতে ফিরে যেতে হবে ওদের।

কিন্তু নেভির প্রোগ্রাম? তাতান মনে করিয়ে দিয়েছিল শংকরমামাকে।

শুনে ভীষণ চটে গেল শংকরমামা, আর নেভি করে কাজ নেই। এখন ভালয় ভালয় ঘরের ছেলে ঘরে ফিরলে বাঁচি।

রাগ হওয়াই স্বাভাবিক শংকরমামার। ওর ইচ্ছে ছিল আরও দিন পনেরো থাকবে। নর্থ আন্দামানের বিভিন্ন দ্বীপ থেকে প্রোগ্রামের জন্য তাকে ইনভাইট করা হয়েছে। সেগুলো সারবে। তারপর ফেরার পথে নিকোবর। প্রোগ্রাম পেলে ভাল, নইলে স্রেফ ঘোরা। কিন্তু ভেস্তে গেল সব। তাতান ভেবেছিল এর জন্য শংকরমামার কাছে মুখ শুনতে হবে তাদের। কিন্তু অবাক কাণ্ড, শংকরমামা একবারও তাদের চোখ গোল করল না। বরং রাত আটটা নাগাদ অনুষ্ঠান শেষ হতে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে ক্লাবের কর্মকর্তারা চলে যেতেই শংকরমামা অন্যরকম হয়ে গেল। তার তাড়ায় রাতবিরেতে ছুটতে হলো থানায়।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ কেন্দ্রশাসিত এলাকা। তাই এখানকার পুলিশের ইউনিফর্ম অন্যরকম। থানার অফিসার মাদ্রাজী। গম্ভীর মুখে সমস্ত শুনে শংকরমামার দিকে চেয়ে প্রশ্ন ছুড়লেন, ডাকাতগুলোর চেহারার বর্ণনা দিতে পারবেন?

শংকরমামার ঝটতি উত্তর, পারব। একটা কাগজ আর পেনসিল দিন। এঁকে দেখিয়ে দিচ্ছি।

এটাও শংকরমামার একটা গুণ। চমৎকার ছবি আঁকে। কিন্তু ডাকাতগুলোকে সে তো দেখেনি। আঁকবে কী করে? ভাবতে ভাবতে তার দিকেই ঘাড় ঘুরে গেল শংকরমামার, পোট্রেট পার্লে পদ্ধতি কাকে বলে জানিস তাতান?

না তো।

তুই ডাকাতগুলোর বর্ণনা দিয়ে যাবি, আমি ছবি আঁকব। একেই পোট্রেট পার্লে বলে।

মিনিট দশের মধ্যে ছবি এঁকে ফেলল শংকরমামা। পর পর তিনটে মানুষের মুখ। যদিও স্কেচ, তবু ডাকাত তিনটেকে ধরতে এগুলিই যথেষ্ট। পুলিশ অফিসার বিরক্ত হচ্ছিলেন। ছবি দেখে মুখখানা তাঁর আরও বদখত হয়ে উঠল। রাগের গলায় জানালেন তিনি ম্যাজিশিয়ান নন যে এগুলো দেখেই ডাকাতগুলোকে পাকড়াও করে ফেলবেন। তা ছাড়া ক্রাইমটা তাঁর এলাকায় হয়নি। তাই এই বাচ্চাদের কথা মতন তিনি বুনো হাঁসের পেছনে ছুটতে রাজী নন।

অদ্ভুত। শংকরমামা না বলে পারল না, এইবার বুঝতে পারছি এত জায়গা থাকতে ডাকাতগুলো আন্দামানে আসতে গেল কেন। নে চল তাতান, এখানে মিছিমিছি এলাম।

শংকরমামা উঠে পড়ল। চোখ সরু করে তাকে দেখতে দেখতে অফিসার বললেন, অবশ্য আপনারা যদি নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন তার জন্য সঙ্গে না হয় সিকিউরিটি দিয়ে দিচ্ছি।

ধন্যবাদ। শংকরমামার মুখে রাগের স্পষ্ট দাগ, এটুকু উপকার না-ই বা করলেন। বাই!

থানা থেকে বেরোতে রাত দশটা হয়ে গেল। ফেরার পথে ট্যাক্সি পাওয়া গেল না। অগত্যা হাঁটা ধরতে হলো। পিচ বাঁধানো অসমতল পথ ধরে নতুন আস্তানায় ফিরছিল ওরা। নির্জন পথঘাট। দু'পাশের দোকানগুলো অনেকক্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তার একধারে পাথরের দেওয়াল, অন্যপাশে খাড়াই ঢাল সোজা নেমে গেছে সমুদ্রে। তাতানের বেশ ভয় ভয় করছিল। শংকরমামার ওপর রাগ হচ্ছিল। সন্ধ্যের অতবড় কাণ্ডটার পর এই রাতে না বেরোলেই চলছিল না? শংকরমামার মতিগতি বোঝা মুশকিল। প্রথমে তো ঝুটঝামেলা বলে উড়িয়ে দিচ্ছিল সব। রেগেই অস্থির। আর এখন এমন তেড়েফুঁড়ে উঠেছে যেন একাই খালি হাতে কাবু করে ফেলবে ডাকাতদের। কে জানে শিল্পীমাত্রেই এমন হয় কিনা।

ওদিকে গৌতমটাও হয়েছে তেমনি। সমানে তাল দিয়ে যাচ্ছে শংকরমামাকে। ডাকাত পিটিয়ে সাহস বেড়ে গেছে ওর। কথায় কথায় বলছিল, তারাও কলকাতার ছেলে। সহজে ছাড়বে না।

তাতান না বলে পারল না, এই রাতে কিন্তু বেরোনো ঠিক হয়নি শংকরমামা। ওদের সঙ্গে আর্মস আছে। অ্যাটাক করলে?

শংকরমামা হা হা করে হেসে উঠল, দূর বোকা, আমরা এখন তিন তিনজন, অ্যাটাক করলেই হলো? তাছাড়া আজকের ঘটনার পর ওদের মনেও ভয় ধরে গেছে। নিজেদের পিঠ...

হঠাৎ গৌতম চেঁচিয়ে উঠল, শংকরমামা গাড়ি!

'কই' বলে পেছন ফিরে তাকিয়ে গা ঠাণ্ডা হয়ে গেল তাতানের। আলো-টালো নিবিয়ে গোঁ গোঁ করে তাদের দিকে ধেয়ে আসছে একটা ট্যাক্সি। ঘাড়ে এসে পড়ল বলে। শংকরমামা 'লাফিয়ে পড়' বলে তাতান আর গৌতমকে ধাক্কা দিয়ে নিজেও ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। বাঁদিকে সমুদ্র পর্যন্ত নেমে যাওয়া পাহাড়ি ঢাল। একেবারে খাড়াই নয়, এই রক্ষে। প্রচুর গাছপালা-ঝোপঝাড়। গড়িয়ে পড়তে পড়তে তার একটা ধরে কোনওরকমে নিজেকে সামলাল তাতান। ততক্ষণে তার পা ছড়ে-টড়ে একশা। সেই অবস্থায় অনেক কষ্টে নিচে নেমে দেখে এখান থেকেও সমুদ্র বেশ কয়েক হাত।

তাতান সমুদ্রতীর ধরে দৌড়তে আরম্ভ করল। কোথায় যাচ্ছে জানে না। শংকরমামা কোথায়, গৌতমই বা কোথায় কে জানে!

কিছুক্ষণ এলোমোলা দৌড়াদৌড়ি করে মাথা ঠাণ্ডা হতে অন্ধকারে পথ চিনে তাতান যখন হোটেলে এসে পৌঁছল তখন অনেক রাত। এতক্ষণে হোটেলের গেট বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু এই মুহূর্তে লোকের জটলা গেটের সামনে। তাদের মধ্যে গৌতমও ছিল। তাকে দেখে ছুটে এল, এসেছিস তাতান? কিন্তু শংকরমামা? শংকরমামা কোথায় রে?

শংকরমামা ফিরল পরের দিন ভোরে। কিম্ভূতকিমাকার চেহারা হয়েছে। পা ফুলে ঢোল। পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ার সময় পায়ে চোট লেগেছে। ঘরের ছেলে এখন ভালয় ভালয় ঘরে ফিরতে পারলেই বাঁচে।

মন-মেজাজ খারাপ তাতানের। না দেখা হলো নর্থ আন্দামান, না দেখা হলো লিটিল আন্দামান, না নিকোবর। আজ তাদের ফিরে যেতে হচ্ছে। ভাগ্যিস একফাঁকে গৌতমের সঙ্গে রস আইল্যান্ড, মাউন্ট হ্যারিয়েট আর কার্বাইনস্কোপটা দেখে নিয়েছিল, নইলে তা-ও হতো না। সকালে গৌতমের সঙ্গে তার একচোট হয়ে গেছে এই নিয়ে। কেন সে পাকামো করে ডাকাতগুলোকে ঘাঁটাতে গেল? ওদের সঙ্গে মারপিট না করলে হচ্ছিল না? ওদিকে শংকরমামা ডাকাতের কথা দূরে থাক, মূকাভিনয়ের কথাও আর মুখে আনছে না। তাতান নেভির প্রোগ্রামের কথা মনে করিয়ে দিতে শুধু বলেছিল, গোলি মারো নেভি। অনেক হয়েছে। আর নয়।

জাহাজ ছাড়ল বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। ডাকাতদের জন্য কি না কে জানে, আগ্রগামী ক্লাবের মাত্র খান তিন সদস্য হাজির ছিল জাহাজঘাটায়। 'আবার আসবেন' বলে শুকনো মুখে বিদায় নিয়ে চলে গেল তাড়াতাড়ি। জাহাজ ছাড়া পর্যন্ত দাঁড়াল না। যতই হোক মেনল্যান্ডের ডাকাত বলে কথা। ভারতের মূল ভূখণ্ডকে তারা মেনল্যান্ড বলে।

এই জাহাজটা লঝ্ঝড়ে। আসার সময় যে জাহাজে এসেছিল, সেটার মতন এয়ারকন্ডিশন্ড তো নয়ই, আকারেও ছোট। ঘুপচি ঘুপচি ডেক। বসার জায়গাও নেই। কিছুক্ষণের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠল তাতান। গৌতমেরও ভাল লাগছিল না। বলল, এটা জাহাজ, না গুদামঘর? সাতজন্মেও রং লাগানো হয় না।

জাহাজে পা দেওয়ার পর থেকে শংকরমামার মেজাজ ফিরে গেছে। হাসতে হাসতে বলল, যা কাণ্ড বাধিয়েছিলি, ফেরা হতো কি না সন্দেহ, আবার বলে রং!

তাতান ক্ষুব্ধ গলায় বলল, এত রাগ হচ্ছে তোমার ওপর! তোমার জন্য কিছুই দেখা হলো না।

দেখিসনি? তিন তিনটে ডাকাত।

তা ঠিক। কোথায় লাগে আন্দামানের জারোয়া!

হঠাৎ শংকরমামার গলার স্বর বদলে গেল, আরে দ্যাখ দ্যাখ।

কী গো?

শংকরমামার দেখাদেখি ওরা তাকাতেই দেখতে পেল একটা লোককে। রোগা গড়ন। একগাল দাড়ি। একা রেলিংয়ে ঝুঁকে ভারি মনোযোগ দিয়ে সমুদ্র দেখছে। কিছুক্ষণ হলো জাহাজ ছেড়েছে। ধীরে ধীরে নেমে আসছে অন্ধকার। তার মধ্যে খুব পরিষ্কারভাবে চোখে পড়ছিল পোর্টব্লেয়ার বন্দরের আলো।

গোলমালটা বুঝতে পারছিস? শংকরমামা ফিসফিস করে উঠল, লোকটার দাড়িটা...

দাড়িতে আবার কী দেখলে?

ওই দাড়িটা ফল্‌স।

যাহ্!

আমি সিওর। আমরা নাটক করা লোক, দাড়ির আসল-নকল বুঝতে পারব না?

শংকরমামার কথা ফুরোতে না ফুরোতে হঠাৎ লোকটার মুখ ঘুরে গেল এদিকে। সঙ্গে সঙ্গে জোঁকের মুখে নুন পড়ল যেন। সুট করে লোকটা সরে গেল সামনে থেকে।

তাতানের গলা শুকিয়ে গেল। সর্বনাশ, ডাকাতগুলো এই জাহাজেই উঠেছে। সেই আগের মতন ছদ্মবেশে কোনও সন্দেহ নেই। চারদিন ধরে জাহাজ চলবে। ওদের সঙ্গে নির্ঘাত আর্মস আছে। মেরে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিলে কে আটকাবে?

ব্যায়াম করা ছেলে গৌতমেরও ভয় ধরে গেল, ডাকাতগুলো সব জেনে গেছে। এবার আর আমাদের ছাড়বে না।

কেউ কোনও কথা বলল না। চুপচাপ কেটে গেল পাঁচ মিনিট। তার পর শংকরমামাই ব্যস্তভাবে বলে উঠল, এখানে থাকাটা রিস্কি। চল, নিচে বাঙ্কে যাই।

তাড়াতাড়ি ওরা জাহাজের খোলের ভেতরে ঢুকে পড়ল। কিন্তু তা-ও কি রক্ষে আছে? এই জাহাজে বোধহয় লোকজন বিশেষ যায় না। সারি সারি বাঙ্ক ফাঁকা পড়ে আছে। ওরা যেদিকে আছে সেখানে তো একটা লোককেও ধারেকাছে দেখা যাচ্ছিল না। ডাকাতদের হামলা করার অপেক্ষা। বাঙ্কে উঠে একটা চাদর টেনে শুয়ে পড়ল তাতান।

শংকরমামা গজগজ করে উঠল, কী রকম ওয়ার্থলেস এখানকার পুলিশ!

গৌতমের গলা কাঁপছিল, জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে। কী যে হবে এখন!

দশ মিনিট কেটে গেল। তার পর যে কাণ্ড ঘটতে শুরু করল তা ওরা কল্পনাও করেনি। হঠাৎ হইচই পড়ে গেল সারা জাহাজে। সকলে দৌড়চ্ছে ডেকে। কী ব্যাপার? ইচ্ছে হচ্ছিল না, তবু প্রাণের ভয়ে দৌড়ল এরাও।

বাইরে গিয়ে দেখে অদ্ভুত ব্যাপার। জাহাজ দাঁড়িয়ে পড়েছে। খানিক দূরে সমুদ্রে দাঁড়িয়ে দুলছে একটা মটরলঞ্চ। তার মাথায় লাল আলো দপদপ করছে। সার্চলাইটের তীব্র আলোয় দিন হয়ে গেছে নিচেটা। জাহাজ থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে দড়ির মই।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে দড়ি বেয়ে জাহাজে উঠে এল চার-পাঁচজন লোক। পুরোদস্তুর ইউনিফর্ম পরা।

তাদের মধ্যে পুলিশি পোশাকের একজনকেও দেখা যাচ্ছিল। জাহাজের ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে ছিলেন লোয়ার ডেকে। জাহাজে উঠেই তারা গটগট করে তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে ভারী গলায় বলল, উই ওয়ন্ট মিস্টার শংকর ঘোষ অ্যান্ড হিজ পার্টি। কোথায় তারা?

ক্যাপ্টেন জানতে চাইলেন, তারা কারা?

উত্তরে পুলিশের লোকটি ইংরেজিতেই জানাল, তারা আপনার জাহাজের প্যাসেঞ্জার। ভায়া চেন্নাই কলকাতায় ফিরছে।

আর বুঝতে বাকি ছিল না কিছু। এরা নেভির লোক। অনুষ্ঠান না করে শংকরমামা চলে যাচ্ছে, যেভাবেই হোক খবর পেয়ে লঞ্চ নিয়ে ধাওয়া করে এসেছে এখানে।

শংকরমামা এগিয়ে গেল সামনে, এই যে আমরা এখানে।

অবাক কাণ্ড, শংকরমামাকে দেখে বিরক্ত হওয়া দূরে থাক, হাতে যেন চাঁদ পেয়েছে এমন ভাব ফুটে উঠল সকলের মুখে। এদের মধ্যে নেভির সেই যুবকটিও ছিল। সে এগিয়ে এসে কাঁচুমাচু মুখে শংকরমামাকে বলল, আপনি চলে যাচ্ছেন কেন? বলুন, আপনার কী অসুবিধে।

শংকরমামা চোস্ত হিন্দিতে বলল, তার একটা গুরুতর কারণ আছে। যাই হোক, আপনারা খবর পেলেন কী করে শেষ পর্যন্ত? জাহাজের প্যাসেঞ্জার লিস্টে তো আমাদের আসল নাম ছিল না।

যুবকটি জানাল যে সে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তবে জানতে পেরেছে। জাহাজ ছেড়ে যাওয়ার পর ক্লাবের এক কর্মকর্তার কাছ থেকে তারা আসল ঘটনা জানতে পারে। বলতে বলতে যুবকটি হঠাৎ শংকরমামার হাত চেপে ধরল, মিস্টার ঘোষ, কাইন্ডলি ব্যাক করুন আমাদের সঙ্গে। কালকের প্রোগ্রাম ফাইনালাইজ হয়ে গেছে। বিভিন্ন আইল্যান্ড থেকে অফিসারেরা সপরিবারে পৌঁছে গেছেন অনেকে। আজ সকালে রেডিওতে ব্রডকাস্টও হয়ে গেছে। আপনারা ফেরার ব্যাপারে চিন্তা করবেন না। দরকার পড়লে স্পেশাল ব্যবস্থা করা যাবে। না করবেন না প্লিজ।

শংকরমামা হেসে ফেলল, না করে কোন আহাম্মক? তবে একটা শর্ত আছে। এই জাহাজে আমাদের কয়েকজন বন্ধুও যাচ্ছে। তাদের একটা পাকা ব্যবস্থা করে যেতে হবে আপনাদের।

পোর্টব্লেয়ারে পৌঁছতে আরও ঘণ্টাখানেক। শংকরমামা জাহাজ থেকে সেই যে হাসতে আরম্ভ করেছে, মুখ আর বন্ধ করছে না। হাসতে হাসতে তাতানকে বলল, কী রে তাতান, কী বুঝছিস এবার?

তাতানও না হেসে পারল না, জোর বাঁচান বেঁচেছি। ডাকাতগুলোর কথা ভাবছি। হাত কামড়াবে সে উপায়ও নেই তাদের। হাত-পা দুটোই বাঁধা।

গৌতম বলল, দুটো ধরা পড়ল, অন্যটা কোথায় গেল বলো তো?

শংকরমামা বলল, সে যারা ভাবার তারাই ভাববে। দশদিন পরে চেন্নাই ঘুরে জাহাজ যখন খিদিরপুরে ঢুকবে তখন আমাদের বন্ধুরা যা একখানা সম্বর্ধনা পাবে না গ্রান্ড! ওটা যাতে ফসকে না যায় তার জন্য জাহাজের ক্যাপ্টেনের ওপর ভরসা না করে এখান থেকেও কয়েকটা জরুরি ফোন লাগিয়ে দিলে কেমন হয়?

ফোন? কাকে? গৌতম জিজ্ঞেস করল।

শংকরমামার হয়ে উত্তরটা দিল তাতান, কাকে আবার? পুলিশ কমিশনার অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, লালবাজারকে। ঠিক কিনা শংকরমামা?

শংকরমামা হা হা করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে ঘাড় নেড়ে বলল, ভাবছি কাল নেভির ফাংশনে ডাকাতের ওপর একটা স্কেচ করব। নাম হবে, দস্যু এল দ্বীপে।

সকলে হেসে উঠল।

[ভাদ্র ১৪০৮]

ছেঁড়া পাতার রহস্য

অপূর্ব দত্ত

প্রত্যেক রবিবার সকালবেলা এই সময়টায় শান্তনুদা যা করে থাকে আজও তাই করছে। আলুর দম দিয়ে ফুলকো লুচি খেতে খেতে সারা সপ্তাহের কাগজের ওয়ার্ড জাম্বল সলভ করা ওর একটা নেশা।

ব্যাট হাতে খেলতে যাচ্ছিল পল্টু। টেলিফোনটা বেজে উঠতেই ব্যাটটা দেয়ালে হেলান দিয়ে রেখে শান্তনুদার দিকে একবার তাকিয়ে বলে উঠল, 'নাও ধর গিয়ে। দ্যাখো আবার কোন সিংঘানিয়া না হিঙ্গোরানি ফোন করল।'

'তুই ধর।' কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বলল শান্তনুদা। তারপর পল্টুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই উঠে গিয়ে রিসিভারটা ধরল।

তিন মিনিটের মধ্যে পাঁচটা 'হ্যাঁ' আর দুটো 'না' ছাড়া আর মাত্র দুটো কথাই শান্তনুদার মুখ থেকে শোনা গেল। এক, 'কত বড় ডায়েরি?' আর 'আধ ঘণ্টার মধ্যে?' শেষ কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে পল্টু সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল আজ আর খেলতে যাবে না। বেশ জমাটি একটা রহস্যের আঁচ পেয়ে চুপচাপ ব্যাটটা নিয়ে শ্যাডো-প্র্যাকটিস করতে শুরু করে দিল।

আধ ঘণ্টার মধ্যে লাল মারুতি থেকে যিনি নামলেন তাঁর বয়স ছত্রিশের বেশি বলে আন্দাজ করা শক্ত। ফুট ছয়েক লম্বা, প্যান্টশার্ট পরা, চোখা নাক আর দাড়ি-গোঁফ কামানো ফর্সা মুখ।

'নমস্কার, আপনিই....'

'শান্তনু মজুমদার। আপনি নিশ্চয় হিমানীশ ঠাকুর? বলুন কী ভাবে আপনার উপকার করতে পারি।'

'উপকার—মানে আমার সমস্যাটা যদি আগে বলে নিই তা হলে...কিন্তু ব্যাপারটা একটু প্রাইভেটলি...'

'স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন ওর সামনে। আমার ভাই। অ্যাসিস্ট্যান্টও বটে।'

'ধন্যবাদ। সমস্যাটা হলো একটা ফোলিও ব্যাগ নিয়ে। মানে আমারই ব্যাগ। গতকাল সকালবেলা ব্যাঙ্কের লকারে গিয়েছিলাম। ধর্মতলা থেকে আসার সময় ব্যাগটা হারিয়ে যায়। বোধহয় বাসেই ফেলে এসেছিলাম। লোকাল থানায় একটা ডায়েরিও করেছিলাম। আজ সকালে দেখি এক ভদ্রলোক, আমার অপরিচিত, ব্যাগটা ফেরৎ দিতে এসেছেন।'

'তবে তো সমস্যার সমাধান হয়েই গেল।'

'সমস্যার সিকিভাগও তো এখনও বলিনি স্যার। ভদ্রলোকও ব্যাগটা পেয়েছেন অত্যন্ত রহস্যজনকভাবে।'

'আপনার ঠিকানা পেলেন কোত্থেকে?'

'সেটাই তো রহস্য। ভদ্রলোকের নাম রবীন্দ্রনাথ পূততুণ্ড। থাকেন ৪৮জি, বনমালী নস্কর রোড, কলকাতা-৬০-এ। সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফিরে তিনি জানতে পারলেন যে এক ভদ্রলোক তাঁর কাজের লোকের হাতে ব্যাগটা দিয়ে গেছেন। ব্যাগের ভেতর নাকি রবীন্দ্রনাথ পূততুণ্ডর ভিজিটিং কার্ড ছিল। সেখান থেকেই ভদ্রলোক ঠিকানা সংগ্রহ করেছেন।'

শান্তনুদা কাগজটা একপাশে সরিয়ে রেখে বলল, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান। আস্তে আস্তে বলুন। সব গুলিয়ে যাচ্ছে। মিস্টার পূততুণ্ড আপনার ঠিকানা পেলেন কোত্থেকে?'

'সেও এক অদ্ভুত যোগাযোগ। রবীন্দ্রবাবুর কাজের লোক ভেবেছিল ওটা সত্যি সত্যিই তার মনিবের ব্যাগ। তাই সে সরল বিশ্বাসে ব্যাগটাকে ঘরে তুলে রেখেছিল। তাছাড়া ভদ্রলোকের হাতে ওর মনিবের ভিজিটিং কার্ড দেখে ওর মনে আর কোনো সন্দেহই দেখা দেয়নি। এদিকে ব্যাগের ভেতরে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে আমার ঠিকানা লেখা ভিজিটিং কার্ড দেখে রবীন্দ্রবাবু আমার কাছে চলে আসেন।'

'কী কী ছিল ব্যাগের ভেতর? সব ঠিকঠাক পেয়েছেন তো?'

'অবিশ্বাস্য! কিছু দামী গয়না ছাড়াও হাজার তিনেক ক্যাশ ছিল। সব ঠিকঠাক আছে। নেই শুধু একটা সামান্য তুচ্ছ জিনিস, যেটার জন্য আপনার কাছে আসা। পুলিশকে আমি অবশ্য কাল বিকেলেই জানিয়ে দিয়েছি যে ব্যাগটা পাওয়া গেছে।'

'আপনার তুচ্ছ জিনিসটা কী জানতে পারি মিস্টার ঠাকুর?'

'বলতেও সঙ্কোচ হচ্ছে। আমার ব্যাগের ভেতর একটা পকেট ডায়েরি থাকে। তার শেষ পাতাটা মানে ৩১ ডিসেম্বরের পাতাটা শুধু অদৃশ্য। আমার মনে হচ্ছে ওটার মধ্যে একটা রহস্যের গন্ধ লেগে আছে। আমি অবশ্য পুলিশকে এ ব্যাপারটা বলিনি। আপনি যদি এই ছেঁড়া পাতার রহস্য সমাধান করতে পারেন তাহলে খুবই কৃতজ্ঞ থাকব। আপনার যথাযোগ্য পারিশ্রমিক....'

'কিন্তু পকেট ডায়েরির একটা সাদা পাতার জন্য আপনি এতটা আপসেট হচ্ছেন কেন আমি বুঝতে পারছি না, মিস্টার ঠাকুর।'

'না, একেবারে সাদা পাতা নয়। শেষ পাতাটায় আমার বাবার এক বন্ধুর ঠিকানা লেখা ছিল। খুব জরুরী, অথচ আমার মনেও নেই। তাছাড়া এই ব্যাগ ফেরৎ পাওয়ার রহস্যটাও সমাধান করা দরকার। আপনি প্লিজ চেষ্টা করে দেখুন। আমার বিশ্বাস আপনিই পারবেন।'

'কথা দিতে পারছি না। আপনার ঠিকানাটা রেখে যান। পরে যোগাযোগ করবেন। বাই দা ওয়ে, মিস্টার পূততুণ্ডর কাছে যে ভদ্রলোক আপনার ব্যাগটা দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর ঠিকানাটা আছে আপনার কাছে?'

'সরি মিস্টার মজুমদার, ওটা নোট করতে একদম ভুলে গেছি।'

'ঠিক আছে, অসুবিধা নেই।'

'আমি তাহলে আজ আসি। ঠিকানা রেখে গেলাম। প্রয়োজনে ফোন করবেন।'

ভদ্রলোক চলে যেতেই পল্টু বিড়বিড় করে টেবিলে রাখা ভিজিটিং কার্ডটা পড়ে ফেলল—

HIMANISH THAKORE, M.A. LLB.
(Tax Consultant)
314-C, Kedar Nath Mullick Lane
Calcutta-700060, Phone-77-8068

৪৮-জি, বনমালী নস্কর রোড, কলকাতা-৬০। বাড়ি খুঁজে বার করতে কোনো অসুবিধা হলো না। একতলা বাড়ির গেটের পাশেই কাঠের নেমপ্লেট লেখা—

RABINDRANATH PUTATUNDA, B. Mus.
INSTRUCTOR, SOUTH CALCUTTA MUSIC CENTRE

রোববারের সকাল। বাড়িতে পেতে অসুবিধা হলো না। বয়স পঞ্চাশের নিচে। ব্যাচিলর। বাড়িতে দ্বিতীয় লোক বলতে কর্মচারী দিলীপ। বিশ্বাসী, বহুদিন কাজ করছে।

প্রাথমিক পরিচয়ের পর শান্তনুদা বলল, 'দেখুন মিস্টার পূততুণ্ড, সম্পূর্ণ অপরিচিত কোনো

লোকের দামী গয়না, টাকা সমেত ব্যাগ যিনি ফেরৎ দিয়ে আসতে পারেন তাঁর সম্বন্ধে বেশি জানতে চাওয়াটা শোভন নয়। এখন প্রশ্ন হলো, আর একজনের ব্যাগ আপনার মনে করে যিনি দিয়ে গেলেন তিনি কে?'

'সম্ভবত একজন বিজনেসম্যান। আমার কাজের লোকের কাছে তিনি একটা কার্ড দিয়ে গেছেন। দাঁড়ান দেখাচ্ছি।'

পূততুণ্ডমশাই কার্ডটা এনে শান্তনুদাকে দিলেন। তাতে লেখা—

GIRIRAJ KOTHARE
(Exporter and Importer)
272, Chetla Road, Calcutta-27

শান্তনুদার হাত থেকে কার্ডটা নিয়ে এপিঠ-ওপিঠ ভাল করে দেখে পল্টু ফিসফিস করে বলল, 'কোনো ফোন নম্বর নেই। বিজনেসম্যান যখন ফোন নম্বর থাকাটাই স্বাভাবিক।' শান্তনুদা একটু মুচকি হেসে কার্ডটা ওর হাত থেকে নিয়ে বলল, 'ভদ্রলোককে চেনেন নাকি?'

'চেনা তো দূরের কথা, কোনোদিন নামই শুনিনি।'

'আচ্ছা মিস্টার পূততুণ্ড, একটা ব্যাগের মধ্যে দুজন লোকের ভিজিটিং কার্ড থাকাটা আপনার কাছে অস্বাভাবিক বলে মনে হয়নি? তা ছাড়া যদি কেউ ব্যাগটা কুড়িয়েই পেয়ে থাকে তবে হয় সে পুলিশে জমা দেবে, না হয় উপযুক্ত প্রমাণের বিনিময়ে সঠিক মালিককে ফেরৎ দেবে। এটাই স্বাভাবিক নয় কি? আপনার কী মনে হয়?'

'দেখুন, আমি গানবাজনা নিয়ে থাকি। অত কিছু তলিয়ে দেখিনি কখনও।'

'আচ্ছা, হিমানীশ ঠাকুর ভদ্রলোককে আপনার কেমন মনে হলো?'

'পাঁচ মিনিটের পরিচয়ে যতটা বোঝা যায় তাতে তো ভাল বলেই মনে হলো। তাছাড়া শিক্ষিত লোক, নিশ্চয় জেনুইন।'

'আপনাকে একটা কথা বলে দেওয়াই ভাল মিস্টার পূততুণ্ড। হিমানীশ ঠাকুরের ব্যাগ থেকে একটা জিনিস খোওয়া গিয়েছে বলে উনি জানিয়েছেন এবং সেটা উদ্ধার করার দায়িত্ব দিয়েছেন আমার ওপর। জিনিসটা হলো ওঁর ব্যাগের ভেতর যে পকেট ডায়েরিটা ছিল তার শেষ অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বরের পাতাটা কেউ ছিঁড়ে নিয়েছে। এ ব্যাপারে যদি আপনি কিছু সাহায্য করতে পারেন ভাল হয়। আমার ঠিকানা আর ফোন নম্বর দিয়ে গেলাম। প্রয়োজন হলে বিরক্ত করব। আচ্ছা আসছি।'

রাস্তায় বেরিয়ে পল্টু জিজ্ঞেস করল, 'গিরিরাজ কোঠারির বাড়িতে কি এখনই যাবে, না বিকেলে?'

'বিকেলে। তুই বরং একটা অটো নিয়ে বাড়ি চলে যা। আমি যাচ্ছি আধ ঘণ্টার মধ্যে।'

২৭২ নম্বর চেতলা রোডে যাঁকে পাওয়া গেল, তাঁর পদবী না বলে দিলে অবাঙালি ভাবার কোনো কারণ নেই। প্রদীপকুমার কেডিয়া একশোয় একশো ভাগ বাঙালি। তিন-চার পুরুষ এখানেই আছেন। ওঁর কাছ থেকে গিরিরাজ কোঠারি সম্বন্ধে যেটুকু জানা গেল তা হচ্ছে দুজনেই রাজস্থানের ঝুনঝুনু জেলার লোক। বংশপরম্পরায় ছাপা শাড়ির এক্সপোর্ট বিজনেস। দুই পরিবারের মধ্যে বহুদিনের বন্ধুত্ব। কথার ফাঁকে ফাঁকে শান্তনুদা ঘরটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। তিন কামরার ফ্ল্যাট। একতলায়। সুন্দর ছিমছাম সাজানো ড্রইংরুম। এককোণে একটা পুরানো আমলের লোহার সিন্দুক। টেবিলে একটা ফটোস্ট্যান্ডের দিকে আঙুল দেখিয়ে শান্তনুদা জিজ্ঞেস করল, 'আপনার সঙ্গে ঐ ভদ্রলোকটি কে মিস্টার কেডিয়া?'

'আরে ঐ তো গিরিরাজ। আমরা দুজনে জিগরি দোস্ত ছিলাম।'

'ছিলাম মানে? এখন তিনি কোথায়?'

'বছর দুয়েক আগে একটা মোটর অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে। খুব অ্যাডভেঞ্চার পছন্দ করত। নিজে গাড়ি চালিয়ে দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়ি আসার পথে খাদে পড়ে যায়। খবর পেয়ে কলকাতা থেকে গিয়ে দেখি গোটা শরীরটা তালগোল পাকিয়ে গেছে। মাথাটা থেঁতলে গিয়ে কিছু চেনার উপায় নেই। কেবলমাত্র পোশাক আর জুতোর সাহায্যে শনাক্ত করেছিলাম। গাড়ির নম্বরপ্লেটটাও অবশ্য হেল্‌প্‌ করেছিল।'

'আপনাদের মধ্যে রিলেশন কেমন ছিল জানতে পারি কি?'

'বরাবরই ভীষণ কর্ডিয়াল ছিল। তবে শেষের দিকে দেখতাম ও আর আমাকে আগের মতো ট্রাস্ট করতে পারছিল না। আমরা বিজনেস পার্টনার ছিলাম। কিন্তু একদিন আমি বুঝতে পারলাম ও আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছে।'

'এই সিন্দুকটা কি আপনার বাবার?'

'না, এটা আমাদের ফার্মের সম্পত্তি ছিল। গিরিরাজ মারা যাওয়ার পর ওটা আর খোলা হয়নি। সেই থেকে পড়ে আছে।'

'কারণ?'

পল্টু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সিন্দুকটা দেখছিল। কেডিয়া নিস্পৃহভাবে বলতে লাগল, 'ওটাতে একটা কম্বিনেশন লক আছে। কম্বিনেশন নম্বরটা আমাদের দুজনের কাছেই নোট করে রাখা ছিল। গিরিরাজ মারা যাওয়ার কয়েক দিন আগে আমার নম্বরটা হারিয়ে যায়। আর গিরিরাজের নম্বরটা থাকত ওর মানিব্যাগে। এমনই দুর্ভাগ্য যে ওর ডেডবডি থেকে মানিব্যাগটাও রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে গিয়েছিল।'

'আচ্ছা, এই সিন্দুকটার মধ্যে কী আছে? এটা কি কোনোদিন খোলা হবে না?'

'জানেন তো আমরা মাড়োয়ারি ফ্যামিলির ছেলে। ওটার মধ্যে কিছু মূল্যবান জুয়েলারি আর প্রপার্টির দলিল আছে। গিরিরাজ মারা যাওয়ার পর আমি কোর্টের শরণাপন্ন হয়েছিলাম। কোর্টের রায় অনুযায়ী মারা যাওয়ার দু' বছরের মধ্যে ওর কোনো উত্তরাধিকারী যদি ক্লেম না করে তবে আমি ওটা ভেঙে খুলতে পারি। আগামীকাল ৩১ ডিসেম্বর রাত বারোটায় দু' বছর পূর্ণ হচ্ছে।'

'সবশেষে আর একটা প্রশ্ন করব, কিছু মনে করবেন না।'

'না না, মনে করার কি আছে। তদন্তের খাতিরে...'

'আপনি হিমানীশ ঠাকুর বা রবীন্দ্রনাথ পূততুণ্ড বলে কাউকে চেনেন?'

'প্রথমজনের নামই শুনিনি। দ্বিতীয়জনের নামটা শোনা শোনা। কী করে বলুন তো? গানের আর্টিস্ট কি?'

'এগজ্যাক্টলি। চেনেন নাকি?'

'মাস ছয়েক আগে একটা মিউজিক কনফারেন্সে আলাপ হয়েছিল। তারপর অবশ্য দু-একবার দেখা হয়েছিল। তবে গত দু-তিন মাসের মধ্যে আর হয়নি। খুব ভাল লোক।'

'আচ্ছা, আজ তাহলে উঠি মিস্টার কেডিয়া। আপনাকে একটা কথা বলা খুব জরুরী বলে মনে হচ্ছে। একটু সাবধানে থাকবেন। মনে হচ্ছে আপনার কোনো বিপদ হতে পারে।'

'আপনি মশাই অন্তর্যামী নাকি? একেবারে আমার মনের কথাটা বলে ফেললেন। কয়েক মাস ধরে বুঝতে পারছি কেউ আমাকে দিনরাত ছায়ার মতো অনুসরণ করছে। আমি কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না।'

'নির্ভয়ে থাকুন। সেরকম কোনো ক্ষতি হবে না।'

ট্যাক্সিতে পল্টু জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে পূততুণ্ড ডায়েরির পাতাটা ছিঁড়ে নিয়ে গয়না-টাকা সমেত ব্যাগ ফেরৎ দিয়ে নিজের সততা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে এবং নিজেকে

নির্দোষ এস্টাব্লিশ করে গিরিরাজ কোঠারির ওপর সব দোষ চাপানোর চেষ্টা করেছে। আমার মনে হয় গিরিরাজ কোঠারির নামে ভিজিটিং কার্ড ছাপিয়ে পূততুণ্ড সবাইকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছে।'

'তোর বিশ্লেষণ কারেক্ট। তবে সব অনুমানের সত্যতাই নির্ভর করছে হিমানীশের ডায়েরির শেষ পাতায় কী ছিল তার ওপর। আমার মনে হয় এটাই রহস্যের কেন্দ্রবিন্দু এবং আমি হান্ড্রেড পারসেন্ট নিশ্চিত যে ব্যাগ পাওয়া এবং ফেরৎ দেওয়ার ব্যাপারে পূততুণ্ড সম্পূর্ণ সত্যি কথা বলেনি। কিন্তু কেন?'

রাত্তিরে খাবার সময় পল্টু জিজ্ঞেস করল, 'এবারে নিউ ইয়ার্স ইভ সেলিব্রেশন হচ্ছে না তাহলে?'

'কেন? না হওয়ার কারণ?'

'কারণ তুমি এই কেসটার ব্যাপারে এতটাই অ্যাবসর্বড হয়ে আছ যে অন্য কিছু ভাবতে পারছ না।'

'ঠিক আছে, এখন শুয়ে পড়। আমার কিছু পড়াশোনা আছে। কাল সকালে কথা হবে। গুড নাইট।'

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে শান্তনুদার কথামতো নটার মধ্যে সবাইকে নেমন্তন্ন করা হয়ে গেল টেলিফোনে। লোকাল থানার ও. সি. মিস্টার রক্ষিত, সাব-ইনস্পেক্টর মিস্টার বিশ্বাস এবং আরও কিছু গণ্যমান্য লোক ছাড়াও মিস্টার কেডিয়া এবং মিস্টার পূততুণ্ডকেও আসতে বলা হলো। কেবল হিমানীশ ঠাকুর জানালেন যে উনি আসতে পারবেন না, কারণ আজই রাজধানী এক্সপ্রেসে ওঁকে দিল্লি যেতে হবে। বিকেল চারটেয় ট্রেন। আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন।

ড্রইংরুমের মাঝখানে বিশাল টেবিল। চারপাশে চেয়ার। নটার আগেই প্রায় সবাই এসে গেছেন কেবল কেডিয়া আর পূততুণ্ড ছাড়া। সাড়ে নটায় মিস্টার পূততুণ্ড এসেই দেরির জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, 'মিস্টার কেডিয়ার বাড়ির দিক থেকে আসছিলাম সন্ধ্যের সময়, দেখলাম বাইরের দরজায় তালা দেওয়া। হয়তো কোথাও গেছেন।'

টেলিফোনটা বাজতেই শান্তনুদা রিসিভার তুলল। মিনিটখানেক কথার ফাঁকে শুধু একটা বাক্যই সবাই শুনতে পেল, 'ঠিক আছে, আপনি বাড়ি ফিরে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই চলে আসুন। সাবধানে আসবেন। কোনো অসুবিধা হলে ফোন করবেন।'

পনের মিনিটের মধ্যে আবার যে ফোনটা এলো সেটা অ্যাটেন্ড করার পর রিসিভারটা রেখে শান্তনুদা মিস্টার রক্ষিতের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে। যেটা আশঙ্কা করেছিলাম তাই হলো। প্রদীপ কেডিয়া সন্ধ্যের সময় ঘণ্টা দুয়েকের জন্য সল্টলেকে ওঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেই সময়ের মধ্যে পেছনের দরজা ভেঙে কেউ বাড়িতে ঢুকে সিন্দুক খুলে সর্বস্ব নিয়ে গেছে। সবথেকে আশ্চর্যের ব্যাপার, সিন্দুকটা অক্ষত আছে। অর্থাৎ কেউ ওটাকে খুলে জিনিসগুলো হাতিয়ে নিয়ে গেছে। আরো একটা ব্যাপার ঘটেছে। একটা পকেট ডায়েরির ৩১ ডিসেম্বরের পাতা পাওয়া গেছে সিন্দুকের ভেতরে।'

ঘরের মধ্যে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। পূততুণ্ডকে বেশ চঞ্চল এবং নার্ভাস লাগছিল। মিস্টার রক্ষিতের সঙ্গে একান্তে কিছু কথা বলার পর শান্তনুদা সকলকে শুনিয়েই বলল, 'আপনি এঁদের সবাইকে নিয়ে এক্ষুণি কেডিয়ার বাড়িতে চলে যান। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে আসছি।' শান্তনুদা টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাতে ঘোরাতে মিস্টার রক্ষিতের জিপ স্টার্ট নিয়ে নিল।

প্রদীপ কেডিয়ার ড্রইংরুমে বসে কথা হচ্ছিল চা খেতে খেতে। সিন্দুক এবং ডায়েরির পাতা খুঁটিয়ে দেখার পর শান্তনুদা চেয়ারে বসে বলল, 'মিস্টার কেডিয়ার সঙ্গে প্রথম দিন কথা বলেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে সমস্ত রহস্যের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে এই সিন্দুক যেটা ৩১ ডিসেম্বর রাত বারোটার পর প্রদীপবাবুর অধিকারে চলে যাবে।'

সবাই একটু নড়েচড়ে বসল। শান্তনুদা আবার শুরু করল, 'মিস্টার পূততুণ্ড শিল্পী মানুষ। ভীষণ ধর্মভীরু। তাই উনি যখন আমাকে গিরিরাজ কোঠারির কার্ডটা দেখালেন তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম উনি কোনো তথ্য গোপন করার চেষ্টা করছেন এবং সেটা ভয়ে। আচ্ছা মিস্টার পূততুণ্ড, গিরিরাজ কোঠারিকে আপনি কোনোদিন দেখেননি। স্বভাবতই ওঁর নামটা আপনার অজানা থাকতেই পারে। কিন্তু ২৭২ নম্বর চেতলা রোডের ঠিকানাটা যে আপনার ভীষণ চেনা এবং ওখানে আপনি একাধিকবার গেছেন প্রদীপবাবুকে গান শোনাতে সেটা আপনি আমার কাছে গোপন করেছেন। দ্বিতীয়ত, হিমানীশ ঠাকুরের পকেট ডায়েরির শেষ পাতায় একটা ঠিকানা দেখে সেটা টুকে রেখেছিলেন এই ভেবে যে ওটা কোঠারি অ্যান্ড কেডিয়ার বন্ধ সিন্দুক খোলার ব্যাপারে হেল্‌পফুল হলেও হতে পারে।'

প্রচণ্ড বিস্ময়ে সবাই পূততুণ্ডর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। উনি কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন। থামিয়ে দিয়ে শান্তনুদা বলল, 'দাঁড়ান, আমি শেষ করিনি। ৩১ ডিসেম্বর মধ্যরাত্রের পরে যে সিন্দুকটা পুরোপুরি প্রদীপবাবুর মালিকানায় চলে যাবে সেটা আপনিও জানতেন। কিন্তু তালার কম্বিনেশন নম্বরটা আপনার জানা ছিল না। তা সত্ত্বেও আপনি আজ সন্ধ্যেবেলায় একটা ভুল খবর পাঠিয়ে কেডিয়াকে বাড়ি থেকে সরিয়ে দিয়ে সিন্দুক খোলার চেষ্টা করার কথা ভেবেছিলেন। অ্যাম আই কারেক্ট, মিস্টার পূততুণ্ড?'

পূততুণ্ড কোনো কথা না বলে মাথা নিচু করে বসে রইলেন। বাইরে একটা গাড়ির শব্দ হতেই শান্তনুদা উঠে বারান্দায় গেল। সবাইকে হতচকিত করে দিয়ে দুজন ভদ্রলোকের সঙ্গে ঘরে ঢুকলেন হিমানীশ ঠাকুর। শান্তনুদা বলল, 'কী মিস্টার ঠাকুর, দিল্লি যাওয়া ক্যান্সেল করলেন নাকি? অন্য কোথাও প্রোগ্রাম ছিল?' তারপর ওঁর উত্তর শোনার অপেক্ষা না করেই বলল, 'আপনারা শুনে হয়তো অবাক হবেন, হিমানীশবাবুও এই সিন্দুক-রহস্যের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন। আসলে সিন্দুকের খবরটা উনিও জানতেন এবং প্রদীপ কেডিয়াকে ফাঁকি দিয়ে সিন্দুকের সম্পত্তি হস্তগত করতে চেয়েছিলেন। কারণ, যেভাবেই হোক কম্বিনেশন নম্বরটা ওঁর জানা ছিল।'

হিমানীশ ঠাকুর উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আপনি এসব কী বলছেন মিস্টার মজুমদার? আমার ডায়েরির শেষ পাতাটা হারিয়ে যাওয়ার জন্য আপনাকে তদন্ত করতে বলেছিলাম, কারণ ওটা আমার কাছে অত্যন্ত...'

'জরুরী ছিল?'

'নিশ্চয়। আমার ব্যাগটা যে হারিয়ে যাবে এবং ফেরৎ পাওয়ার পর ডায়েরির শেষ পাতাটা যে কেউ ছিঁড়ে নেবে সেটা আমি ভাবিনি।'

'আপনার বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারছি না মিস্টার হিমানীশ ঠাকুর ওরফে গিরিরাজ কোঠারি।'

সকলের চোখ চকচক করে উঠল। একটা গুঞ্জন শোনা গেল।

'আপনাদের অনেকের হয়তো মনে আছে দু' বছর আগে অর্থাৎ ১ জানুয়ারি ১৯৯১, সমস্ত দৈনিক কাগজে একটা চাঞ্চল্যকর খবর ছিল যে কলকাতার এক মর্গ থেকে একটা মৃতদেহ চুরি গেছে। এখনও তার কিনারা হয়নি। যদি বলি গিরিরাজ কোঠারি মারা যাননি, মর্গ থেকে চুরি করা মৃতদেহের গায়ে গিরিরাজের পোশাক পরিয়ে মুখটা থেঁতলে বিকৃত করে দিয়ে গাড়িতে আগুন ধরিয়ে লোকচক্ষে গিরিরাজকে মৃত সাব্যস্ত করে দিয়ে 'কেডিয়া অ্যান্ড কোঠারি'র সমস্ত সম্পত্তি হাত করতে চেয়েছিলেন, তাহলে কি আপনি অস্বীকার করবেন মিস্টার ঠাকুর?'

'আপনার এসব অলীক কল্পনাপ্রসূত কথার কোনো উত্তর আমি দেব না। কী প্রমাণ আছে আমার বিরুদ্ধে?'

'অযথা উত্তেজিত হবেন না, মিস্টার কোঠারি। গত দু' বছরে আপনার সমস্ত কাজকর্মের একটা ছক যদি আমি এঁকে ফেলি এবং সেটাকে প্রজেক্টরে প্রজেক্ট করি তাহলে ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়ায়—

'প্রদীপ কেডিয়ার সঙ্গে বুদ্ধিতে আপনি কোনোদিনই পেরে উঠতেন না। তাই চেয়েছিলেন 'কেডিয়া

অ্যান্ড কোঠারি' ফার্মের সমস্ত সম্পত্তি ছলে-বলে-কৌশলে হস্তগত করবেন। নকল অ্যাকসিডেন্টে গিরিরাজ কোঠারিকে লোকসমক্ষে মৃত প্রমাণিত করার পর প্লাস্টিক সার্জারির সাহায্যে মুখের চেহারা পাল্টে নাম নিলেন হিমানীশ ঠাকুর। তারপর এখানে এসে ফ্ল্যাট কিনলেন। আপনারা খেয়াল করলে বুঝতে পারতেন যে গিরিরাজ এবং হিমানীশ দুটো নাম সমার্থক। গিরিরাজ কোঠারির ভিজিটিং কার্ডে কোঠারি বানান ছিল KOTHARE। আর আপনার ভিজিটিং কার্ডে ঠাকুর বানান ছিল THAKORE। শুধু লেটারগুলো উল্টেপাল্টে দিলেই এটা সম্ভব হয়। সিন্দুকের তালার কম্বিনেশনটাও চমৎকারভাবে লিখে রেখেছিলেন ডায়েরির শেষ পাতায় পিন কোডের মধ্যে। আসলে পিন কোড নম্বরটাই হচ্ছে কম্বিনেশন নম্বর। আপনার উপস্থিতি যে প্রদীপ কেডিয়া আঁচ করতে পেরেছেন সেটা আপনি জানতে পেরেছিলেন। তাই নিজেকে সন্দেহমুক্ত রাখার জন্য মিস্টার পূততুণ্ডর ঘাড়ে ডায়েরির পাতাটা চুরি করার দায় চাপাবার চেষ্টা করেছিলেন।

'আপনার পরিকল্পনা ছিল ৩১ ডিসেম্বরের আগেই সিন্দুক খুলে সব সম্পত্তি হাতিয়ে নিয়ে রাতের প্লেনে দেশের বাইরে চলে যাবেন। সেইমতো আজ সন্ধ্যেবেলায় যখন প্রদীপবাবু বাড়িতে ছিলেন না তখন সিন্দুক থেকে মালপত্র বার করে সেখানে ডায়েরির ছেঁড়া পাতাটা রেখে যান যাতে পুলিশ মনে করে যে লোক ব্যাগটা আপনাকে ফেরৎ দিয়েছে সে-ই পাতাটা ডায়েরি থেকে ছিঁড়ে নিয়েছে। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ পূততুণ্ডর ওপর সন্দেহ হওয়াটা আশ্চর্য নয়। একটু আগে প্রদীপ কেডিয়া যখন আমাকে খবর দিলেন যে উনি বাড়ি এসে দেখেছেন সিন্দুক খোলা তখনই আমি মিস্টার রক্ষিতকে এখানে পাঠিয়ে দিই আর এয়ারপোর্টে ফোন করে দিই আপনাকে গ্রেফতার করে এখানে নিয়ে আসার জন্য। আপনি যে দুবাই যাওয়ার জন্য আজকেই প্লেনের টিকিট বুক করেছেন, এয়ার ইন্ডিয়ার অফিস থেকে আমি আগেই জেনে নিয়েছি। সরি মিস্টার কোঠারি।'

প্রদীপ কেডিয়া বিনীতভাবে বললেন, 'ঠিক আছে মিস্টার মজুমদার। ফার্মের ফিফটি পারসেন্ট পার্টনার হিসেবে অর্ধেক তো ওর পাওনা ছিলই। বাকি অর্ধেকও আমি ওর নামে ট্রান্সফার করে দেব। আমি ডিসিশন নিয়েছি আর বিজনেস করব না। বাব্বাঃ, এতদিনে ভারমুক্ত হলাম।'

'এখনও হননি মিস্টার কেডিয়া,' চায়ের কাপটা টেবিলে রেখে শান্তনুদা বলল, 'আপনার তুখোড় বুদ্ধি দুটো জায়গায় আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এক ঃ নিজের সিন্দুকের কম্বিনেশন নম্বর কারোর কাছ থেকে হারিয়ে যাবে বা স্মৃতিতে থাকবে না এটা কারোর কাছেই বিশ্বাসযোগ্য নয়, গোয়েন্দা বা পুলিশের কাছে তো নয়ই। দুই ঃ গিরিরাজ যে মরেনি এবং হিমানীশই যে গিরিরাজ সেটা আপনি বুঝতে পেরেছিলেন হিমানীশের আচরণ, গলার আওয়াজ এবং বিশেষ করে কথা বলার সময় ওঁর বাঁ হাতের আংটি নিয়ে নাড়াচাড়া করার মুদ্রাদোষ থেকে। অথচ আপনি আমাকে বলেছিলেন আপনি হিমানীশ ঠাকুরের নামই শোনেননি। তারপর আপনি যখন বললেন কেউ আপনাকে ছায়ার মতো দিনরাত্তির অনুসরণ করছে তখন আর আমার অঙ্কটা মেলাতে দেরি লাগেনি।'

প্রদীপ কেডিয়াকে খুব নার্ভাস লাগছিল। বিমর্ষভাবে বললেন, 'ইউ আর ভেরি কারেক্ট মিস্টার মজুমদার। তবে আমি তো আমার শেয়ার স্যাক্রিফাইস করলাম গিরিরাজের ফেভারে। লেট হিম এনজয়।'

'বেশি চালাক সাজার চেষ্টা করবেন না মিস্টার কেডিয়া,' শান্তনুদার এরকম তেজী কণ্ঠস্বর পল্টু বেশি শোনেনি। ইস্পাত-কঠিন গলায় শান্তনুদা বলে চলেছে, 'মিস্টার কোঠারি, সিন্দুকের ভেতর থেকে যা পেয়েছেন সেগুলো ডাস্টবিনে ফেলে দিন। কোনো মূল্য নেই ওগুলোর। সব জাল। আপনি সিন্দুক খোলার দু' ঘণ্টা আগেই যিনি সিন্দুক খুলে মালপত্র বার করে সল্টলেকের ফ্ল্যাটে রেখে এসেছেন তিনি আর কেউ নন—মহামান্য প্রদীপকুমার কেডিয়া।'

'ইউ স্কাউন্ড্রেল', বলে গিরিরাজ চেয়ার ছেড়ে কেডিয়ার দিকে উঠে আসতেই মিস্টার রক্ষিতের নির্দেশে সাদা পোশাকের পুলিশ তাদের কর্তব্য পালন করল।

শান্তনুদা পল্টুর পিঠে হাত রেখে বলল, 'চল, খাবারগুলো বোধহয় ঠাণ্ডা হয়ে গেল।'

পল্টু হতচকিত হয়ে ঘোর-লাগা অবস্থায় জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার পূততুণ্ডর বাড়িতে গিরিরাজ কোঠারির কার্ড নিয়ে হিমানীশ ঠাকুরের ব্যাগটা তাহলে কে পৌঁছে দিয়েছিল?'

'গিরিরাজ কোঠারি ওরফে হিমানীশ ঠাকুর।'

[পৌষ ১৪০২]

নরসিংজীর কাতান

ধ্রুবজ্যোতি রায়চৌধুরী

য়্যাঁ, জলজ্যান্ত লোকটা একেবারে কর্পূরের মতো উবে গেল সবার সামনে!

দমদম এয়ারপোর্টে ডিটেকটিভ অয়স্কান্ত আর তাঁর দুই ছেলে—বাবলা আর বাপিকে নিয়ে কড়া নজর রাখছিলেন। বাবলা আর বাপি—বয়েস একজনের সতেরো, আর একজনের আঠারো, বাবার সঙ্গে থেকে থেকে গোয়েন্দাগিরিতে দিব্যি হাত পাকিয়ে ফেলেছে। আজ তাদের এয়ারপোর্টে হাজির থাকার কারণ, পাতিয়ালার ধনী ব্যবসায়ী, বলতে গেলে কুবেরপতি, নরসিংজী টোকিও থেকে কলকাতায় আসছেন। বড়োলোকদের বিপদ সর্বত্র। নরসিংজীরও শত্রুর অভাব নেই। তিনি যাতে নিরাপদে কলকাতায় পৌঁছতে পারেন, তার জন্যেই এই কড়া পাহারা। আবার, কলকাতাতেও যাতে বিপদে না পড়েন, তার জন্যেও সরকারি ব্যবস্থা করা হয়েছে। কয়েকদিন আগে, নরসিংজীর সেক্রেটারি জহর সিং কলকাতায় এসে নিরাপত্তার সব বন্দোবস্ত পাকা করে রেখেছেন।

ঠিক সামনেই নরসিংজী দমদমে এসে পৌঁছলেন। সঙ্গে তাঁর আর একজন সেক্রেটারি ঃ অমরজিৎ সিং। ছিমছাম হালকা চেহারা। সিং হলেও নরসিং, জহর কিংবা অমরজিতের বিশাল বিশাল দাড়ি-গোঁফের কোনো বালাই নেই।

নরসিংজী যে প্লেনে এসেছিলেন, সেই প্লেনের পেটের ভেতরে, ইংরিজিতে যাকে বলে কার্গো হ্যাচ, ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী দুর্দান্ত এক জাপানী গাড়ি। জাপানী হলেও গাড়িটা কিন্তু বেশ লম্বা-চওড়া। শোনা যায়, নরসিংজী আলাদাভাবে, অর্ডার দিয়ে গাড়িটা বানিয়ে নিয়েছেন। কালো একটা বেড়ালের মতোই চমৎকার সেই গাড়িটা যেন লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলো। অয়স্কান্তর তদারকিতে নরসিংজী ও তাঁর দুই সঙ্গী গাড়িটিতে চেপে বসতেই গাড়িটা সাঁ করে বেরিয়ে গেল তীরের মতো। পেছনে পুলিশের গাড়ি, মাঝামাঝি ফাঁকা জায়গাটায় বাবলা আর বাপি একটা মোটরবাইকে চড়ে গাড়িটা অনুসরণ করে চললো।

পথে কোনো ঝামেলায় পড়তে হলো না, কিন্তু হোটেলে এসে পৌঁছতেই সবার চক্ষুস্থির। গাড়ির পেছনের সিটে অমরজিৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে আর নরসিংজী অদৃশ্য!

খবরটা ছড়িয়ে যেতে বেশি দেরি হলো না। যে শুনলো তারই তাক লেগে গেল। বাবলা আর বাপি অয়স্কান্তকে জিজ্ঞেস করলো, 'অমরজিতের কী হয়েছে?' অয়স্কান্ত অমরজিতের চোখের পাতা দুটো ভালো করে দেখে উত্তর দিলেন, 'মনে হচ্ছে ওষুধ খাইয়ে অজ্ঞান করে দেওয়া হয়েছে। ঘুমিয়ে উঠলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।' অমরজিৎকে হোটেলের ডাক্তারবাবুর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

গাড়িতে যারা ছিল তারা কেউ বলতে পারলো না, নরসিংজী এভাবে গায়েব হলেন কী করে। গাড়িটাকে তো রাস্তায় একবারও থামানো হয়নি যে কেউ আচমকা নরসিংজীকে চুরি করে নিয়ে যাবে!

বাবলা আর বাপিও বেশ তাজ্জব হয়ে গেল। কলকাতায় এসে পৌঁছবার আধঘণ্টার মধ্যে একটা লোক গাড়ির ভেতর থেকে নিরুদ্দেশ—এ নিয়ে তাদের বাবাকে বেশ মুশকিলে পড়তে হবে, কেননা

নজর রাখার ভার তাঁর ওপরই ছিল পুরোপুরি। হঠাৎ বাবলার নজরে পড়লো রিসেপশন ডেসকের দিকে। লোকটাকে তারা এয়ারপোর্টে দেখেছে। এক মুখ দাড়িতে মুখ ঢাকা থাকলেও, চোখে কেমন যেন একটা ভয় ভয় ভাব। ওরা দু'জন সঙ্গে সঙ্গে লোকটাকে পাকড়াও করলো, 'আপনাকে আমরা এয়ারপোর্টে দেখলাম, না?'

লোকটা তাড়াতাড়ি জবাব দিল, 'হ্যাঁ—হ্যাঁ। আমি ওখানে মাল বেচতে গিয়েছিলাম।'

'মাল বেচতে? এয়ারপোর্টে?' হকচকিয়ে গেল দুই ভাই।

'একটা রাজপুত 'কাতান', আঠারো শতাব্দীর কাজ—নরসিংজী এইসব কেনেন-টেনেন। তাই ভাবলাম। আমার কাছে আরও আছে, দেখবেন?'

লোকটা কথা বলতে বলতেই তার স্যুটকেসটা খুলে ফেললো। ভেতরে একগাদা নানা ধরনের শৌখিন খাপে মোড়া চকচকে ফলাওলা ছুরি। লোকটি একটি কার্ড এগিয়ে দিল, 'আমার পেশাই হলো ঐতিহাসিক ছুরি বিক্রি করা, কিন্তু এবারে আর নরসিংজীকে ধরতে পারলাম না।' স্যুটকেস বন্ধ করে লোকটি এবার হোটেলের মধ্যে, সম্ভবত তার কামরায় চলে গেল। কার্ডে লেখা নামটি পড়লো ওরা, 'রশীদ খান'। রশীদের চালচলন বেশ সন্দেহজনক। নজর রাখতে হবে।

দুই ভাই এবার অন্তর্ধান রহস্য সম্বন্ধে ভাবতে বসলো। হঠাৎ শার্লক হোমসের ভঙ্গিতে বাবলা বললো, 'এলিমেন্টারি—ওয়াটসন! রাস্তার কোথাও যখন গাড়িটা থামেনি, তাহলে গাড়ির মধ্যেই নরসিংজী লুকিয়ে ছিলেন। গাড়িটার মধ্যে নিশ্চয়ই লুকিয়ে থাকার জায়গা আছে।'

বাপি বললো, 'তাহলে গাড়িটা চেক করা যাক। মাস্টার কী তো আমাদের সঙ্গেই আছে।'

হোটেলের গ্যারেজেই গাড়িটা ছিল। খুঁজে পেতে অসুবিধে হলো না। চমৎকার গাড়িটা, কিন্তু নানা দিক দিয়ে দেখেও কোনো লুকোনো জায়গা খুঁজে পাওয়া গেল না। হঠাৎ বাপি লক্ষ্য করলো, ড্রাইভারের সিটের পেছনে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা পার হয়ে, মেঝের সঙ্গে লাগানো পুরু একটা কুশনের ওপর পার্টিশান দিয়ে ব্যাক সিট আলাদা করা। মাঝখানে একটা চকচকে বোতাম। বাবলা বোতামটা টিপতেই মেঝের সঙ্গে লাগানো কুশনটা কাঁচের পার্টিশানটার ওপরে উঠতে লাগলো আস্তে আস্তে! কুশনটা আস্তে আস্তে ছাদ অবধি পৌঁছে গেল, আর ড্রাইভারের পেছনের সিটে যে খালি আর ফাঁকা জায়গাটা দেখা গেল তাতে একটি লোক অনায়াসেই লুকিয়ে থাকতে পারে! তাহলে কি এই জায়গাটায় কেউ লুকিয়ে ছিল? ইনজেকশন বা গ্যাস দিয়ে অমরজিৎ ও নরসিংজীকে অজ্ঞান করে—নরসিংজীকে এখানে লুকিয়ে রেখে, এবং নিজেও লুকিয়ে থেকে, যে কেউ তো নরসিংজীকে পাচার করে দিতে পারে? এই জায়গায় ছোট-খাটো একজন ও বড়ো মাপের একজন লোক অনায়াসেই ধরে যেতে পারে।

বাবলা আর বাপি এবার এলো জহর সিং-এর কাছে। জহর লুকোনো কমপার্টমেন্টের কথা শুনে বিশেষ অবাক হলেন না, বললেন, 'ওটা নরসিংজী স্পেশালি বানিয়েছেন যাতে চট করে কেউ যেন তাঁকে দেখে না ফেলেন, সেই জন্যে।'

'আপনি তো এটা আমাদের আগে বলেননি?'

'বলিনি, কেননা প্রথমে ভেবেছিলাম নরসিংজী ওখানে লুকিয়ে আছেন, কিন্তু খুলে দেখি নরসিংজী ওখানে নেই! আর, অমরজিতের অজ্ঞান হওয়ার ব্যাপারটাও আমাদের বড়ো গোলমেলে মনে হয়েছে।'

'কিডন্যাপার-ও ওই কমপার্টমেন্টে লুকিয়ে থাকতে পারতো।'

জহর কি জবাব দেবেন ভেবে পেলেন না। নাক চুলকোতে লাগলেন। হঠাৎ রশীদ খানের কথাটা মনে পড়ে গেল ওদের। কয়েক ঘণ্টা পরেই ওরা এলো ওদের চেনা একটি দোকানে। দোকানটিতে নানা ধরনের পুরোনো অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি হয়। রশীদের নাম বলতেই দোকানদার চিনতে পারলেন।

'ও হ্যাঁ, রশীদ আজ ফোন করেছিল একটা আঠারো শতাব্দীর ছোট 'কাতান'-ছোরা বিক্রি করবে বলে। এই সব জিনিসই অবশ্য রশীদ বেচে।'

রশীদ সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু ওরা জানতে চাইলো না। নরসিংজী এই ধরনের ছুরি-ছোরা কেনেন, এই খবরটি ওরা অবশ্য পেয়ে গেল। বাড়িতে এসে তারা বাবার কাছে শুনলো, রশীদ খানের 'কাতান'টি হোটেল থেকে চুরি গেছে! অয়স্কান্ত আরও বললেন, 'নরসিংজী 'কাতান'টি কিনবেন বলে বছর খানেক আগে রশীদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন—কলকাতায় নাকি 'কাতান'টি কেনার কথা ছিল তাঁর।' দুই ভাই এবার ধাঁধায় পড়লো। সমস্ত ব্যাপারটা কেমন যেন তালগোল পাকানো।

ওরা এবার রশীদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে বেরোলো। হোটেলের রাস্তাটার কাছাকাছি আসতেই, পেছন থেকে একটা পায়ের আওয়াজ শুনে ফিরে তাকালো। দেখতে পেলো গুণ্ডাশ্রেণীর একটি লোককে। লোকটি হঠাৎ, ক্যারাটে মারার ভঙ্গিতে ওদের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লো—বাপির মাথায় এমন জোরালো এক ঘা দিল যে সে দশ হাত দূরে ছিটকে পড়লো, আর বাবলার তলপেটে হাতের চেটো দিয়ে এমন এক খোঁচা দিল যে বাবলা একেবারে টলে পড়লো রাস্তার ওপর!

প্রথমেই অবশ্য বাপি গা ঝাড়া দিয়ে উঠলো। বাবলা আপশোস করলো, 'লোকটাকে ধরতে পারলে আমরা ঠিক নরসিংজীকে খুঁজে পেতাম।' যাক, এখন আর কিছু করার নেই। তবে, লোকটা পাক্কা গুণ্ডা! নিশ্চয়ই ওকে কেউ ভাড়া খাটাচ্ছে।

রশীদের সঙ্গে দেখা হতে রশীদ খুব খুশি হলো। সে চুরির সব বৃত্তান্ত জানিয়ে বললো, 'একটু আগে চোরটা আমাকে ফোন করেছিল!'

'য়্যাঁ!'

'হ্যাঁ, বললো দশ হাজার টাকা দিলে কাতানটা আমাকে ফেরত দেবে।'

'আপনি কী জবাব দিলেন?'

'কী আর জবাব দেবো? রাজী হয়ে গেলাম—নরসিংজীকে ওয়াদা করেছিলাম—'

'আপনাদের এই লেনদেনটা কোথায় হবে?'

'কার্জন পার্কে। মাঝরাতে। এসপ্ল্যানেড ঈস্ট-এর গেটে। পুলিশে খবর দিলে আমাকে মেরে ফেলবে বলেছে। তাই আপনাদের—মানে আপনারা তো পুলিশ নন—'

রশীদ কি চাইছে বুঝতে দুই ভায়ের দেরি হলো না। বাড়িতে এসে ওরা শুনলো সেই গুণ্ডাটা তাদের বাবার সহকারী দেবেনকাকুকেও নাকি অ্যাটাক করেছিল। মারার কায়দা ভাবভঙ্গি—হুবহু এক!

কার্জন পার্কে রশীদ নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে একটি লোক দৌড়ে আসছে দেখে, বাপি আর বাবলাও ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো। লোকটি তাদের দেখেই একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে চম্পট দিল একটা দাঁড়ানো মোটর সাইকেলের দিকে। তাকে ধরা গেল না, সে বাইকে স্টার্ট দিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাবলার চোখ পড়লো ঘাসের ওপর ঃ ঝকঝকে একটা রুপুলি ছোরা, বাঁটটা মুক্তো বসানো! রশীদ চেঁচিয়ে উঠলো, 'এই সেই কাতান!'

বাপি আর বাবলা অবাক হয়ে কাতানটা দেখছে, এমন সময় এক পুলিশ অফিসার এলেন সেখানে। কড়া গলায় বললেন ঃ 'তোমাদের থানায় যেতে হবে আমার সঙ্গে।'

'কেন?'

'থানায় গেলেই জানতে পারবে।'

ওরা আর কী করে। অগত্যা থানায় গেল। থানায় ওদের চেনা বড়োবাবু তো অবাক। 'য়্যাঁ—তোমরা!'

বড়োবাবু বললেন ঃ 'আমরা একটু আগে খবর—মানে নিজের-নাম-না বলে একজন ফোনে জানিয়েছিল কার্জন পার্ক ঈস্টে দু'জন অল্পবয়েসী ছেলে রশীদ খানের চোরাই কাতান নিয়ে ঘোরাফেরা করছে—কিন্তু ওই দু'জন যে তোমরা আমি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি। যাক, এসেছো ভালোই হয়েছে—নরসিংজীর ব্যাপারে এক ভদ্রলোক পাতিয়ালা থেকে এসেছেন, দাঁড়াও ওঁকে ডেকে পাঠাই।'

মিনিট পনেরো পরেই এক গাঁট্টাগোট্টা পাঞ্জাবী ভদ্রলোক এলেন। পরনে সাহেবী পোশাক। তিনি

এসেই বললেন ঃ 'তোমরা যে মামলাটা হাতে নিয়েছো—আমি শুনেছি। তিন দিন আগে যে নরসিংজী নিখোঁজ হয়েছেন, তিনি আসলে নকল নরসিংজী!'

ওরা তো কথা শুনে থ। ভদ্রলোক, নাম উধম সিং, আরও বললেন ঃ 'এই কাতানটি দিয়েই প্রমাণ হবে উনি নকল! কাল সকাল দশটায় সব প্রমাণ হয়ে যাবে।'

পরের দিন সকাল দশটায় উধম সিং নিজের পরিচয় দিলেন নরসিংজীর ব্যবসার একজন অংশীদার হিসাবে। তারপর বললেন, 'যতো নষ্টের গোড়া ওই জহর সিং! আসল নরসিংকে গুম করে ওরা নকল নরসিংকে হাজির করেছে—পাছে এই নকল নরসিং ধরা পড়ে সেই জন্যে তারা নকলটাকেও সরিয়ে ফেলেছে! এসবের উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, নরসিং-এর টাকাকড়ি গাপ করে নেওয়া।'

জহর সিং কিছু একটা বলতে যাবেন, এমন সময় দেখা গেল এয়ারপোর্টে দেখা সেই আসল অথবা নকল নরসিংজী থানায় ঢুকছেন! তিনি সবাইকে নমস্কার জানিয়ে উধমকে বললেন ঃ 'তুমি নাকি আমাকে জাল নরসিং বলে প্রমাণ করতে চাইছো?'

'আলবাৎ!' উধম গোঁফে তা দিলেন ঃ 'এই কাতানটি সব প্রমাণ করে দেবে। এটা চারশো বছর ধরে তোমার পরিবারে আছে, এটা নিশ্চয়ই জানো, এই কাতানটার হাতলে একটা লুকনো গর্ত আছে—যার মধ্যে তোমার বংশ-তালিকা আছে—'

'জানি। আর ওই লুকনো গর্তটা খোলার কায়দা একমাত্র আমিই জানি—'

'ঠিক। খুলে দেখাও—তাহলেই প্রমাণ হয়ে যাবে তুমি আসল না জাল!'

নরসিং কাতানটি তুলে নিলেন মৃদু হেসে। তারপরই বিব্রত, অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। লুকনো গর্তের কোনো হদিস পেলেন না। আস্তে আস্তে কাতানটি রেখে দিয়ে বললেন ঃ 'এটা নকল কাতান!'

'ঠিক তোমার মতোই!' টিটকিরি দিলেন উধম সিং।

হঠাৎ বাবলা বলে উঠলো ঃ 'উধম সিংজী—আপনি কাল অবধি সময় দিন কাতানটা আসল না নকল খুঁজে বের করার জন্যে।'

বড়োবাবুও বাবলার কথায় সায় দিলেন ঃ 'হক্ কথা। লোক নকল হলে, কাতানও তো নকল হতে পারে। কাজেই কাল অবধি সময় চাই।'

উধম সিং আর কি করেন। তিনি অগত্যা রাজী হলেন। একটু বিরক্তভাবে বললেন, 'কাল অবধি—তারপর নয়। আমি এই নকল নরসিং-কে জেলে পাঠাবো।'

'নকল' নরসিংজী বাবলা আর বাপির সঙ্গে থানা থেকে বেরিয়ে এলেন। পথে নরসিংজী বললেন ঃ 'আমি কলকাতায় এসেছিলাম রশীদের কাছ থেকে কাতানটা কিনতে। কেননা, আমার মিউজিয়ম থেকে কয়েক বছর আগে ওটা চুরি যায়। রশীদ এই সব জিনিস কেনা-বেচা করে। সে কাতানটা চোরেদের কাছ থেকে কেনে।...এ ছাড়া আমার কোম্পানিটা আমার কাছ থেকে হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে কেউ। যার জন্যে আমি লুকিয়ে থাকি। এয়ারপোর্টের র‍্যাম্প থেকে বেরুবার সময়েই আমি গাড়ির লুকনো কমপার্টমেন্টের মধ্যে নেমে যাই। ড্রাইভার অবশ্য সাহায্য করেছিল। অমরজিৎ যখন অন্যদিকে তাকিয়েছিল তখনই আমি ওকে ইনজেকশন দিয়ে অজ্ঞান করে দিয়েছিলাম। তারপর, আমি শহরে এসে লুকিয়ে থাকি। ড্রাইভার অবশ্য জানতো আমি কোথায় থাকবো।...রশীদের কাছ থেকে উধম আসল কাতানটা চুরি করে, নকলটা দিয়েছে, যাতে আমাকে জাল প্রমাণ করা যায়।'

এইসব কথা বলতে বলতে ওরা এগোচ্ছে। নরসিংজীকে হোটেলে নামিয়ে ফেরার পথে সহসা দু'ভাই দেখলো, সেই গুণ্ডাটা একটা মোটরবাইক চেপে কোথায় যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বাবলা ওদের ট্যাকসিওলাকে বললো বাইকটাকে অনুসরণ করার জন্যে।

বাইকের পিছু নিল ওদের ট্যাক্সি। একসময় শহরের সীমা পেরিয়ে গেল ওরা। আরো কিছুদূর যাবার পর একটা ভাঙ্গাচোরা বাড়ির কাছে বাইকটা থামলো। ট্যাক্সি দূরে দাঁড় করিয়ে ওরা চুপচাপ লক্ষ্য করতে লাগলো। তারপর ভাঙা পাঁচিল ডিঙিয়ে গুণ্ডাটা ভেতরে ঢুকতে ওরাও সেই পথে

এগোলো। দেখলো একটা কুয়োর ধারে গুণ্ডাটা কি যেন করছে। একটু পরে গুণ্ডাটা চলে যেতেই ওরা পায়ে পায়ে কুয়োর কাছে এলো। নিচু হয়ে দেখলো কাতানটা কুয়োর মধ্যে চকচক করছে।

বাপি বললো, 'এটাই বোধ হয় আসল কাতান।'

বাবলা জবাব দিলো, 'আসল-নকল বোঝা বড়ো শক্ত। হয়তো এক ডজন নকল কাতান ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে!'

নরসিংজীকে খবরটা দিতে ওরা হোটেলে এলো। ওরা কিছু বলার আগেই নরসিংজী উত্তেজিতভাবে বললেন, 'অমরজিতের সঙ্গে কাতান-চোরেরা যোগাযোগ করেছে। লাখ টাকা পেলে আসল কাতানটা দিতে পারে। আমি হ্যাঁ-না কিছু বলিনি, তোমাদের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করবো বলে—'

বাবলা জানালো, 'আপনি বরং অমরজিতের প্রস্তাবে রাজী হন—'

নরসিংজী অবাক হয়ে তাকালেন, 'কী বলছো তোমরা, আমি চোরকে বিশ্বাস করবো?'

'তার আগে আমি আপনাকে একটা জিনিস দেখাবো। তাহলেই বুঝতে পারবেন অমরজিৎ কে—'

বাকিটা আর বাবলা ভেঙে বললো না।

কুয়ার কাছে একটা ঝোপের আড়ালে ওরা তিনজন লুকিয়ে বসে রইলো। কালো রঙের একটা গাড়ি থেকে অমরজিৎ নেমে এলো। ওর হাতে একটা দড়ির সিঁড়ি। দড়ির সিঁড়িটা কুয়ার এ-পাশের একটা দেওয়ালের সঙ্গে সে শক্ত করে বাঁধলো, তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল কুয়ার নিচে। একটু পরেই সে কাতানটা হাতে উঠে এলো!

ব্যস, নরসিংজীকে আর আটকায় কার সাধ্য! তিনি দৌড়ে গেলেন অমরজিতের দিকে, 'ব্যাটা ছুঁচো! চোর—!'

অমরজিৎ ততক্ষণে গাড়ির কাছে পৌঁছে গেছে। আর গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে উধম সিং আর সেই গুণ্ডাটা। তারপরই শুরু হয়ে গেল কিল চড় ঘুঁষির এক ম্যারাথন প্রতিযোগিতা। আর সবচেয়ে তাক লাগিয়ে দিলেন নরসিংজী—তিনি ঠিক নাচিয়েদের কায়দায় যেন হাওয়ার সঙ্গে ভাসতে ভাসতে এক একটা ক্যারাটে চপ মারতে লাগলেন ওদের! আর, চপ খেয়ে বেচারাদের অবস্থা কাহিল।

তিন মূর্তিমান ধরাশায়ী হতেই একদঙ্গল পুলিশ এসে ঘিরে ধরলো ওদের। ক্লিক ক্লিক করে তিন জোড়া হাতকড়া পরিয়ে দেওয়া হলো অপরাধীদের। নরসিংজী বিশুদ্ধ পাঞ্জাবী ভাষায় ওদের যে কী বলে বকতে লাগলেন, তার বাংলা অনুবাদ দুঃসাধ্য ব্যাপার। বড়োবাবু বাপি-বাবলাকে উচ্ছ্বসিত ভাষায় অভিনন্দন জানিয়ে নরসিংজীকে বললেন, 'একদম বাপকা বেটা! ওদের বাবাও নাম্বার ওয়ান ডিটেকটিভ!'

যতো নষ্টের গোড়া হলো অমরজিৎ—নরসিংজীর ভাইপো। সে অনেকদিন ধরে মতলব করছিল কী করে কাকার ব্যবসা হাত করা যায়। রশীদের কাছ থেকে কাতানটা চুরি করে, নকলটা সে বানিয়ে রেখেছিল—যাতে করে কাকা 'জাল' প্রতিপন্ন হন। নকল কাতানটায় লুকোনো কোনো গর্তই ছিল না। উধম আর একটা গুণ্ডাকে পাতিয়ালা থেকে ও-ই আনায়। নকল কাতানটা কায়দা করে বাপি আর বাবলাকে দিয়ে কাজ হাসিল করবার তালে ছিল, হয়তো সফল হতো যদি বাপি-বাবলা আসল কাতানটার হদিস না পেত! শুধু তাই নয়, নরসিংজীকে আসল কাতান দেওয়ার লোভ দেখিয়ে আরও এক লাখ টাকা আদায়ের ফন্দি ছিল ওদের।

নরসিংজী কৃতজ্ঞভাবে তাকালেন বাপি আর বাবলার দিকে, তারপর কাতানটার মুক্তো-বাঁধানো হাতলের আঁকি-বুঁকি নকশার এক জায়গায় আঙুল দিয়ে চাপ দিতেই হাতলটা দু'ভাগ হয়ে গেল....

[অগ্রহায়ণ ১৩৯৪]

একের ভিতর তিন

বাপ্পাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

কে মা-মণি? ফোনের ওপিঠে স্থানীয় থানার ও.সি. যাদুগোপাল মল্লিকের গলা—একটা ব্যাপারে এই বুড়ো কাকাটাকে একটু সাহায্য করবে?

সাতসকালেই এই ফোন পেয়ে কিঞ্চিৎ বিরক্ত ললিতা মন্তব্য করে—কেন কাকাবাবু, দলাই-মলাইয়ে কাজ হচ্ছে না বুঝি?

ফোনের ওপিঠে আধ হাত জিভ কেটে যাদুগোপালবাবু বলেন—ছিঃ মা, বুড়ো কাকাটার কথার কথাকে কি এভাবে নিতে আছে?

মাত্র ক'দিন আগেই এই যাদুগোপালবাবু বুক ফুলিয়ে ললিতা ওরফে ললিকে জোর দিয়ে বলেছিলেন—পুলিশী তদন্ত তোমাদের মেয়েলী বুদ্ধির কাজ নয়। থানায় গিয়ে বাস্তুঘুঘুগুলোকে আচ্ছাসে দলাই-মলাই না দিলে কোনো কথাই বেরোবে না।

ললি মনে মনে একটু হেসে নিয়ে বললেন—ঠিক আছে, চলে আসুন।

ললিতা ভট্টাচার্য স্থানীয় একটা স্কুলের সায়েন্সের টীচার। যেমন তার বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান তেমনি তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। ললিতার সুযোগ্য সহকারী রন্টু ঐ স্কুলেরই ক্লাস এইটের ছাত্র। বয়স বছর তেরো। রন্টুর ইচ্ছে সে জেমস বন্ড হবে।

আধঘণ্টা পরেই দেখা গেল ললিতার সামনের সোফাতে বসে জলযোগ সারতে সারতে যাদুগোপালবাবু বলছেন—এই তো, তোমাদের পাড়ারই ঘটনা। প্রফেসর সেন কাল রাতে স্রেফ বন্ধ ঘরের মধ্যে খুন হয়ে গিয়েছেন।

ললি ভুরু কুঁচকে বলে—প্রফেসর শৈলেশ সেন, যিনি প্রাগ্ না বন্ কোথায় অনেক দিন গবেষণা করছিলেন। তিনি খুন হয়েছেন! এখানে! এই পাড়ার মধ্যে! কই, আমরা তো কিছুই জানি না!

জানবে, জানবে, ধীরে সুস্থে যাদুগোপালবাবু বলতে থাকেন—আমিও তো সেখান থেকেই আসছি। বুঝলে কিনা মা, বাড়ির প্রতিটি লোককে জেরা করেছি, কিন্তু মাথামুণ্ডু কিছুই ধরতে পারিনি। এখন ভাবছি হয় ঐ ঘরের মেঝেটা খুঁড়ে দেখব কোথাও গুপ্ত পথ আছে কিনা, আর নয়তো ও-বাড়ির সব ক'টাকে ধরে চালান করে দেব। তা তোমার কি মত?

ললি গম্ভীরভাবে বলে—আমি ঘটনাটা ভাল করে শুনতে চাই।

ও হো.....তাই তো। পুরোটা তো তোমাকে বলাই হয়নি, বলে যাদুগোপালবাবু সংক্ষেপে জানান—নিশ্চয়ই জান যে প্রত্নতত্ত্বের অধ্যাপক শৈলেশ সেন বিপত্নীক ছিলেন। ছেলেপিলেও ছিল না। থাকবার মধ্যে বুড়ি মা। আর কাজের লোক বলতে বেয়ারা সৈজু, ঝি সরলা আর দারোয়ান কুঁয়ার সিং। গবেষণা ইত্যাদির জন্য প্রফেসরকে বহু জায়গায় ঘুরতে হতো। তাই উনি ওঁর এক ছাত্র পুণ্ডরীককে ওঁর বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করতে বলেন।

ললি বলে—হ্যাঁ, আমার সঙ্গে শেষ যে বার দেখা হয় তখন উনি বলেছিলেন, উনি নাকি অস্ট্রেলিয়ার ব্ল্যাক ফেলোজদের উপর গবেষণা করছেন। যাই হোক, তারপর বলুন।

যাদুগোপালবাবু বলতে থাকেন—গত পরশুদিন সকালবেলা শৈলেশবাবু ফিরে এলেন। তাঁর সঙ্গে

ছিলেন এক ইউরোপীয়ান ভদ্রলোক। অবশ্য ঐদিনই দুপুরের ট্রেনে ঐ ইউরোপীয়ানটি চলে যান।

ললিতা জিজ্ঞেস করে—দুপুর ক'টার ট্রেনে জানতে পেরেছেন?

হ্যাঁ, বাড়ির লোক বলেছে দুপুর দুটোর ট্রেনে। যাই হোক, গতকাল সকালে বহুদিন বাদে কাশীর আশ্রম থেকে সেন বাড়িতে আসেন কুলগুরু কেদারনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ। জটাজূটধারী সন্ন্যাসী। তিনি আসতে বাড়িতে তো হুলুস্থুল পড়ে যায়। বিশেষত সেন সাহেবের মা কুলগুরুকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সেদিনই আবার সন্ধ্যার সময় এক চীনা ভদ্রলোক শৈলেশবাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। কিন্তু সেন সাহেব নাকি সাফ জানিয়ে দেন, দেখা হবে না। পুণ্ডরীকবাবুকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, ভদ্রলোকের নাম মিঃ ওয়াং। মিঃ ওয়াং বেরিয়ে যাবার একটু বাদেই বাইরে গুলির আওয়াজ শুনে সকলে ছুটে যায়। শৈলেশবাবু তখন আউট-হাউসে ছিলেন। সে ঘরে দুটো ফ্রেঞ্চ উইন্ডো। তার একটা ভেঙে ভেতরে ঢোকেন গুরুদেব কেদারনাথ। তিনি তখন নদীতে স্নান সেরে ফিরছিলেন। সকলে ঘরে ঢুকে দেখে শৈলেশবাবু মৃত। গুলি তাঁর মাথার ডান পাশে লেগেছে। ঘরটা পুরোপুরি বন্ধ। আততায়ী বাইরে থেকে না ভেতর থেকে গুলি করেছে তা বোঝা যাচ্ছে না।

ললি কোলের উপর দু'হাত জড় করে গম্ভীরভাবে সব শুনছিল। বলল—আজকে বিকেলের দিকে আমি রন্টুকে নিয়ে ও-বাড়িতে যাব। সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ না করলে ব্যাপারটা ঠিক পরিষ্কার হচ্ছে না।

বিকেলবেলা স্কুলফেরত রন্টু ললিদির সঙ্গে গিয়ে হাজির হলো সেনবাড়িতে। প্রায় দশ-বারো কাঠা জমি নিয়ে বিশাল বাড়ি দাঁড়িয়ে। বাড়ির চারধারে কাঁটাতারের বেড়া। তারপর ছোট ছোট ঝোপ। বোঝাই যাচ্ছে কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে বা গেটের মধ্যে দিয়ে দারোয়ানের চোখ এড়িয়ে বাইরের কারোর পক্ষে ভেতরে ঢোকা অসম্ভব। গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকেই ডান দিকে একটা ঘর। তার দুটো ফ্রেঞ্চ উইন্ডো—অর্থাৎ গরাদবিহীন কাচের জানালা। একটা গেটের দিকে সদর রাস্তার মুখোমুখি। এবং অন্যটা বাড়ির প্রবেশ পথের দিকে। এই প্রবেশ পথ ধরে একটু এগিয়ে গেলেই সম্পূর্ণ বাড়িটা চোখে পড়ে। দরজা দিয়ে ঢুকে প্রথমেই একটি হল। ঐ হলঘরটিই ডাইনিংরুম হিসেবে ব্যবহার হয়। হলঘরের মধ্যে দিয়েই অন্যান্য ঘরে যাওয়া যায়। এ-বাড়ির ড্রইংরুম বা বৈঠকখানা বলতে বাইরের ওই আউট-হাউসটাই। ঐ ঘরেই প্রফেসর সেনের অজস্র বই ও কিটরিও সাজানো। বাইরের কোনো লোক এলে তিনি ঐখানেই দেখা করতেন।

ললিকে সব ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন পুণ্ডরীকবাবু। তাঁকেই ললি জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা পুণ্ডরীকবাবু, গতকাল সন্ধ্যায় মিঃ ওয়াং নামে কোনো এক চীনা ভদ্রলোক নাকি অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা করতে আসেন?

হ্যাঁ, তিনি স্লিপে তাঁর ঐ নামই লিখে স্যারের কাছে পাঠান। কিন্তু স্যার স্লিপের উপর স্পষ্ট লিখে দেন—Sorry, busy.

স্লিপে কী প্রয়োজনের কথা লেখা ছিল সেটা খেয়াল করেছিলেন কি?

হ্যাঁ, লিখেছিলেন কি একটা। কিন্তু ভদ্রলোকের হাতের লেখা ঠিক পড়তে পারিনি।

ললি জিজ্ঞেস করে—স্লিপটা পেয়ে অধ্যাপক কি উত্তেজিত হয়েছিলেন?

তখন ঠিক না বুঝলেও এখন যেন মনে হচ্ছে উনি চিন্তিতভাবে বেশ কিছুক্ষণ নামটা লক্ষ্য করেছিলেন।

ডাইনিংরুমে টেবিল ঘিরে বসেছিল ললি, রন্টু, পুণ্ডরীক রায় এবং যাদুগোপালবাবু। একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল সরলা, সৈজু এবং দারোয়ান কুঁয়ার সিং।

ললি আবার প্রশ্ন করল—স্লিপ ফেরত আসায় মিঃ ওয়াং কি চলে গেলেন?

পুণ্ডরীকবাবু বললেন—হ্যাঁ। তারপর আমি এসে এই টেবিলে বসি। এই সময় আমি সরলাদির

কাছে এক গ্লাস খাবার জল চাই। সরলাদি আমাকে এক গ্লাস অরেঞ্জ জুস দেয়। সকাল থেকেই আমার মাথাটা ধরেছিল, ভাবলাম এই সঙ্গে একটা অ্যাসপ্রো—

পুণ্ডরীকবাবুকে বাধা দিয়ে ললি বলল—গত পরশু প্রফেসর সেন নাকি তাঁর সঙ্গে এক ইউরোপীয়ানকে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি ইউরোপের কোন অঞ্চলের জানেন কি?

পুণ্ডরীকবাবু বললেন—ও হ্যাঁ, স্যার ভদ্রলোকের নাম বলেছিলেন মিঃ ফ্রাঙ্কোপুলস্। ভদ্রলোককে দেখে মনে হয়েছিল তিনি দক্ষিণ ইউরোপের লোক। মাথার চুল কুচকুচে কালো। তবে মিঃ ফ্রাঙ্কোপুলস্ দুপুরের ট্রেনেই ফিরে যান।

ললি এবার যাদুগোপালবাবুকে বলে, আমি সরলাদি, সৈজু এবং কুঁয়ার সিং-এর সঙ্গে একটু আলাদাভাবে কথা বলতে চাই। বুঝতেই পারছেন সবার সামনে সকলে মন খুলে কথা বলতে পারে না।

যাদুগোপালবাবু বলেন, বেশ তো মা, তুমি ওদের আলাদা আলাদা ডেকে যা জিজ্ঞেস করবার কর। চলুন পুণ্ডরীকবাবু, আমরা গুরুদেবের ঘরে যাই। মাসীমাকেও বোধহয় ওখানেই পাব।

পুণ্ডরীক বলেন—তাই চলুন।

এদিকে সরলা ললিকে জানাল যে, সে সাতটার সময় চায়ের কাপ-ডিশ ধুচ্ছিল, এমন সময় চীনাম্যানকে বিদায় করে এসে পুণ্ডরীক দাদাবাবু তার কাছে জল চান। সে অরেঞ্জ জুস দেয়।

ললি বলে—কেন, বাড়ির সকলে জল খায় না?

সরলা উত্তর দেয়—এতদিন তো তাই জানতাম। সেন সাহেবও তো গত পরশু বিদেশ থেকে ঘুরে এসে জল খেলেন। হঠাৎ সেদিনই রাত থেকে কী খেয়াল যে হলো, কেবল কোকো কিংবা অরেঞ্জ জুস। তা আমি ভাবলাম, পুণ্ডরীক দাদাবাবুও বোধহয় অরেঞ্জ জুস খাবেন। খানিকক্ষণ পর পুণ্ডরীক দাদাবাবু বেরিয়ে যেতে এলেন গুরুদেব। তখন সাড়ে সাতটা হবে। গুরুদেব তো রোজ বিকেলে কাছাকাছি নদীতে চান করতে যান। তা উনি এ ঘরে ঢুকেই বললেন—ইস্! পায়ে কী কাদা! বলে বাইরের কলঘরে পা ধুতে গেলেন। তারপরেই হঠাৎ গুলির শব্দ। আমরা সবাই আউট-হাউসের দিকে দৌড়ে গেলাম। গুরুদেব তখন জানালা বন্ধ দেখে আধলা ইট দিয়ে শার্সি ভেঙে ভেতরে ঢুকছেন। তারপর দেখি আমাদের সাহেব ভেতরে...সরলা মুখে আঁচল চেপে কান্না আটকায়।

হঠাৎ দরজার কাছ থেকে সাঁৎ করে একটা ছায়া সরে যেতে দেখে ললিদি চেঁচিয়ে ওঠে—কে ওখানে?

সৈজু সাড়া দিয়ে বলল—আজ্ঞে, গুরুদেবের খাবার সময় হয়েছে। একটু তাড়াতাড়ি আমায় ছাড়লে ভাল হয়।

সৈজুকে জেরা করে বিশেষ কিছুই জানা গেল না। আর দারোয়ান কুঁয়ার সিং তো শুধু একটা কথাই জানে—রাম ভরোসা। ললিদি তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি গতকাল সাতটার সময় একজন চীনাম্যানকে বেরোতে দেখেছ? জবাবে কুঁয়ার সিং প্রথমে বলল—জী হাঁ। তারপরই বলল—মালুম নেহি এবং সবশেষে বলল—রাম ভরোসা।

দারোয়ান বিদায় নিতে রন্টু বলল—লোকটা কিন্তু রীতিমতো সন্দেহজনক, ললিদি।

ললিদি চাপা গলায় মন্তব্য করল—একটা ধার্মিক লোককে সত্য কথা চেপে রাখতে কী কষ্টটাই না পেতে হয়।

ললির জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হয়ে গেছে। ওরা দুজনে এবার গুরুদেবের ঘরে গেল।

এই ঘরটা বাড়ির পিছন দিকে। ললি আর রন্টু দেখে যাদুগোপালবাবু ও পুণ্ডরীকবাবু গুরুদেবের সামনে বসে কি এক গভীর আলোচনায় মগ্ন। গুরুদেবের বয়স ষাটের কাছাকাছি। দাড়িতে ও চুলে তাঁর আসল পরিচয় পাওয়াই ভার। ওখানে কিছুক্ষণ বসেই ললি ও অন্য সকলে উঠে আসে। শৈলেশবাবুর মা নাকি নিজে সামনে বসে গুরুদেবকে খাওয়াবেন। ছেলের শোকে ভেঙে পড়লেও

তিনি গুরুকে নিয়ে কিছুটা ব্যস্ত রয়েছেন। উঠে আসবার সময় হাত জোড় করে ললি গুরুদেবকে প্রণাম জানিয়ে বলল—আমার ইচ্ছা, এ বছর বিশ্বনাথধামে যাবার। আপনার আশ্রমের ঠিকানাটা.....

গুরুদেব বললেন—আমি ঠিকানা দিই না। সময়ে তোকে টেনে নেব।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় ললি বলল—ব্রাউন বিনিথ দা ব্ল্যাক। আর এত ঐতিহাসিক বইপত্র কেন ওঁর ঘরে? কোথায় যেন এ মুখ দেখেছি! পুলিশ রেকর্ডটা দেখতে হবে।

এবার সবাই এসে জড় হলো আউট-হাউসে। জোরে জোরে শ্বাস টেনে ললি বলল—ফরাসী সেন্টের গন্ধ।

পুণ্ডরীকবাবু বললেন—হ্যাঁ, স্যার ফরাসী সেন্ট ব্যবহার করতেন।

ঘরটি বই আর কিউরিও দিয়ে সুন্দর করে সাজানো। ঘরের মাঝখানে একটা সেগুন কাঠের টেবিল আর একটা রিভলবিং চেয়ার। এই চেয়ারে বসা অবস্থায় শৈলেশ সেন খুন হন। সেগুন কাঠের টেবিলের ওপর মিশরীয় দেবতার পাথরের মূর্তি। মূর্তির চোখ দুটো লাল চুনীর। রন্টুর মনে হলো চোখ দুটো ধক্‌ধক্ করে জ্বলছে।

যাদুগোপালবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কী বুঝছ মা ললি?

সে কথার উত্তর না দিয়ে ললি পুণ্ডরীকবাবুকে জিজ্ঞেস করল, ধরুন আপনার ভীষণ জলতেষ্টা পেয়েছে। আপনাকে দু'গ্লাস জল দেওয়া হলো। দুটোর একটা আপনার একেবারে কাছে, অপরটা দূরে। আপনি কি দূরের গ্লাসটা নিয়ে এসে জল খাবেন?

পুণ্ডরীকবাবু অবাক হয়ে বললেন—যদি দুটো গ্লাসের জলই সমান পরিষ্কার হয় তবে—

কাছেরটাই বেছে নেবেন তো? ললিই উত্তরটা দিয়ে দিল।

হঠাৎ খুকখুক করে কাশির শব্দে সকলে তাকায় সৈজুর দিকে। সৈজু বলল—গলাটা খুব খুসখুস করছিল। সৈজুর কথা শুনে রন্টুর প্রচণ্ড রাগ হলো। ললিদির প্রতি কারুর সামান্যতম কটাক্ষও সে সহ্য করতে নারাজ। কিন্তু পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে সে সামলে নেয়।

ললির কিন্তু এসব কোনোদিকেই লক্ষ্য নেই। গভীর আগ্রহে সে ভাঙা জানালার কাচগুলি সাজিয়ে রাখছিল ঘরের মধ্যের একটা শেলফ্-এর ওপর। রন্টুও ললিদিকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। মোটামুটি সব কাচ তুলে রাখবার পর ললি বলল—কাকাবাবু, আজকে একজন কনেস্টবলকে এ ঘরে পাহারায় রাখবেন। কাল বা পরশু আমি লোক নিয়ে এসে কাচগুলো জুড়ব। তাহলেই পাওয়া যাবে খুনীকে ধরার সূত্র।

তারপর পুণ্ডরীকবাবুকে ললি বলল—আপনি একটু নজর রাখবেন যাতে এগুলিতে কেউ হাত না দেয়।

ফেরবার সময় রন্টু চুপিচুপি বলে—আচ্ছা ললিদি, তুমি কি সত্যিই ওগুলো জুড়ে বুলেটের ছিদ্র বার করতে পারবে?

ললি কি যেন চিন্তা করছিল। হেসে বলল—দূর, তাই কি কেউ পারে নাকি?

রন্টু অবাক হয়ে বলল—তাহলে?

ললি বলল—ওটা আসলে একটা ফাঁদ।

পরের দিনটা ললির কাটল ভীষণ ব্যস্ততায়।

রাত বারোটা। আকাশ জুড়ে মেঘের ঘনঘটা আর অকাল বর্ষণ। ললির নির্দেশমতো কালো প্যান্ট-শার্ট পরেছিল রন্টু। ললির পরনেও কালো প্যান্ট-শার্ট। হাতে একটা পেন্সিল টর্চ। ললি তার ৩২ বোরের রিভলবারটাও সঙ্গে নিয়েছে।

বাড়ির গেটে অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল একটা জিপ। ইঞ্জিন স্টার্ট করানো ছিল। ওরা উঠে বসতেই জিপটা চলতে শুরু করল। জিপে ওদের মুখোমুখি বসেছিলেন যাদুগোপালবাবু। গলা নামিয়ে তিনি বললেন—বুঝলে মা-মণি। আমি তৈরি হয়েই এসেছি। তুমি যে টোপে ফেলেছ, তাতে খুনীকে আসতেই হবে আজ রাতে কাচগুলি সরাতে।

এক সময়ে জিপ এসে দাঁড়ায় শৈলেশ সেনের বাড়ির একটু দূরে। সন্তর্পণে গেট টপকে ওরা কম্পাউন্ডে প্রবেশ করে। আউট-হাউসের ভাঙা জানালা ডিঙিয়ে সেই অভিশপ্ত ঘরে পোজিশন নেয়।

নিঃশব্দে কেটে যায় বহুক্ষণ। দূরের কোনো ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত দুটো বাজল। বাইরে হঠাৎ খুট করে কিসের শব্দ! রন্টুর মনে হলো জানালা গলে কে এসে পড়ল ঘরের মধ্যে। তারপরই একটা প্রবল ধস্তাধস্তির আওয়াজ আর 'রন্টু' 'রন্টু' বলে যাদুগোপালবাবুর চিৎকার। অন্ধকারেই আন্দাজ করে রন্টু লাফ দিল। একটা শরীরের সঙ্গে জড়াজড়ি হতে রন্টু বুঝল, লোকটা অসম্ভব বলশালী। একটা ঝটকা মেরে ছায়ামূর্তি রন্টুর বুকের ওপর চেপে বসল। রন্টুর মনে হলো তার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

হঠাৎ ঘরের আলোটা জ্বলে উঠল আর ললির গলা শোনা গেল—ওকে ছেড়ে মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও সৈজু। বিমূঢ় সৈজু ধীরে ধীরে হাত তুলে উঠে দাঁড়ায়। ওদিকে বাঁশির শব্দে বাড়ি ঘিরে থাকা পুলিশবাহিনী ছুটে আসে। সৈজুকে অ্যারেস্ট করা হয়।

ডাইনিংরুমে আজ আরও কয়েকটি অতিরিক্ত মুখ। শৈলেশ সেনের মা, গুরুদেব ও বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী। একপাশে বন্দী সৈজু।

ললি বলতে শুরু করে। এক ইটালীয়ান ভদ্রলোককে খুন করার অপরাধে এ-বাড়ির বেয়ারা সৈজুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল বিকেলে প্রথম যখন আমি সৈজুকে জেরা করতে ডাকি তখনই সৈজুর বাঁ গালে কাটা দাগটা দেখে মনে হলো, কোথায় যেন ওকে দেখেছি। দেখলাম আমার সন্দেহই ঠিক। এক জেলখাটা দাগী আসামী রামু ওরফে মহম্মদ ইউনুস ওরফে সৈজু এখানে বেয়ারার কাজ নিয়েছে।

পুণ্ডরীকবাবু অসহিষ্ণুভাবে বাধা দিয়ে বলেন—কিন্তু খুন তো হয়েছেন প্রফেসর সেন। এর মধ্যে আবার ইটালীয়ান ভদ্রলোক—

না। ললির দৃঢ় কণ্ঠ পুণ্ডরীকবাবুকে থামিয়ে দিল। ঘরের অন্য সকলেও চমকে তাকায় ললির দিকে।

ললি বলতে থাকে—যাঁকে দেখে আপনারা মৃত শৈলেশ সেন বলে ভুল করেছিলেন, তিনি কিন্তু আসলে একজন ইটালীয়ান, নাম জিওলিতি। এই দেখুন তাঁর ভিসা আর পাসপোর্ট। আমার সন্দেহ হয় প্রফেসর সেনের সঙ্গে আসা ইউরোপীয় ভদ্রলোকের কথা শুনে, যিনি ওঁর সঙ্গে এসেই আবার চলে যান। খোঁজ নিয়ে দেখলাম, ঐদিন স্টেশনে ঐরকম চেহারার কেউই যাননি। আর কুঁয়ার সিংকে জেরা করতে জানলাম যে, এই ঘোর গ্রীষ্মেও দুপুরবেলা সাহেব নাকি কলারওয়ালা গ্রেট কোট আর টপ হ্যাট পরেছিলেন। বুঝলাম, সাহেবটি ধারেকাছেই কোথাও আস্তানা গেড়েছেন। আমাদের ছোট্ট বসতিতে ঐরকম চেহারার লোকের পক্ষে নিজেকে লুকিয়ে রাখা শক্ত। খুঁজতে গিয়ে পেয়েও গেলাম শহরের প্রান্তে একটেরে একখানি ঘর, যে ঘরে ঐরকম চেহারার একজনকে দেখা গেছে। সেই ঘর গোপনে সার্চ করে পেলাম একটি পাসপোর্ট যাতে জিওলিতির ছবি আছে। আর পেলাম কিছু দেশী-বিদেশী পোশাক-আশাক যার মধ্যে গ্রেট কোটটাও রয়েছে। আমার মনের মধ্যে একটা সন্দেহের কাঁটা প্রথম থেকেই খচখচ করছিল। বিদেশ থেকে ফেরার পর বিকেল থেকে প্রফেসর সেন জল খাওয়া বন্ধ করলেন কেন? কোকো বা অরেঞ্জ জুস-এ কি তেষ্টা মেটে? এবার জিওলিতির ছবিতে গোঁফ লাগিয়ে চশমা পরিয়ে আর চুলটা উল্টে দিতেই পেয়ে গেলাম প্রফেসর সেনকে। এ ছাড়া দারোয়ানের ঘর থেকে কাকাবাবু পেয়েছেন চামড়া টানটান করবার একটা লোশন ও চীনা স্টাইলে তৈরি একপ্রস্থ জামাকাপড়। ঐ জামাকাপড়গুলো প্রফেসর শৈলেশ সেনকে পরাতেই এক চীনা ভদ্রলোকের চেহারার আদল ফুটে উঠল। তারপর শৈলেশ সেনের মাথায় জটা আর মুখে গোঁফদাড়ি লাগাতেই পেলাম শ্রীকেদারনাথ সিদ্ধান্তবাগীশকে।

ঘরে যেন বজ্রপাত হয়ে গেল। সকলেই হতভম্ব, নিশ্চুপ। ললিদি বলতে থাকে—তাহলে দেখা

যাচ্ছে মিঃ ওয়াং আদৌ এ-বাড়ির বাইরে যাননি। কেদারনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ বাইরে থেকে ঘুরে এসে দারোয়ানের ঘরে ঢুকে পোশাক পাল্টে হন মিঃ ওয়াং। বাড়ির মধ্যে এসে স্লিপ পাঠান শৈলেশ সেনবেশী জিওলিতিকে। তারপর আবার বেরিয়ে যাবার ভান করে দারোয়ানের ঘরে ঢুকে পোশাক পাল্টে হন কেদারনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ। এদিকে তাঁর শেখানো মতো সৈজু তাঁরই রিভলবার নিয়ে তৈরি ছিল বাগানে। গুরুদেব বাড়িতে ঢুকেই বেরোলেন বাইরের কলে কাদা-পা ধোওয়ার জন্য। এই বেরোনোই ছিল গেটের কাছে লুকিয়ে থাকা সৈজুর কাছে সঙ্কেত। সে বাইরের দিকের ফ্রেঞ্চ উইন্ডো দিয়ে গুলি করল শৈলেশ সেনরূপী জিওলিতিকে। গুলির শব্দ শুনে গুরুদেব অর্থাৎ শৈলেশ সেন ছুটে গেলেন বাগানে। আধলা ইট দিয়ে ভাঙলেন সেই জানালাটা, যেটার মধ্যে দিয়ে গুলি করা হয়েছিল জিওলিতিকে। এজন্যই সকলের মনে ধোঁকা লাগে।

পুণ্ডরীকবাবু এই সময় বলে উঠলেন—কিন্তু আপনি কেন সন্দেহটা করলেন?

ললি বলে—আপনার বোধহয় মনে আছে আমি দু'গ্লাস জলের উদাহরণ দিয়েছিলাম। লোকে প্রয়োজনের সময় কাছের জিনিসটাই বেছে নেয়। সুতরাং বাড়ির সামনের জানালার কাচ ভাঙাই কেদারনাথের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। তা না করে ঘুরে গিয়ে কেন দূরের জানালাটা ভাঙলেন। আজ দুপুরে সৈজুর ঘরে তল্লাশি চালিয়ে একটি রিভলবার পাওয়া গেছে যার লাইসেন্স ছিল প্রফেসর সেনের নামে। ঐ রিভলবারের গুলিতেই যে জিওলিতির মৃত্যু হয়েছে সেটা আমরা সরকারীভাবে জানতে পারব রাসায়নিক পরীক্ষার পর।

ললি এর পর কেদারনাথকে লক্ষ্য করে বলে, শৈলেশবাবু, আপনার মেকআপ কিন্তু মাঠে মারা গেছে কুচকুচে কালো চুলের সঙ্গে খয়েরী দাড়ির জন্যে। তাছাড়া গুরুদেব সেজে বসেও ইতিহাসের বইগুলো সঙ্গে রাখা ঠিক হয়নি। কিন্তু কেন এ পথে গেলেন? কেন খুন করালেন জিওলিতিকে? কেনই বা সাজলেন মিঃ ওয়াং বা কেদারনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ?

প্রফেসর শৈলেশ সেন তখন তাঁর পরচুল ও নকল গোঁফদাড়ি খুলে ফেলেছিলেন। তিনি বললেন, কিউরিও সংগ্রহ করাটা আমার নেশা বলতে পারেন। একবার ইউরোপে কিউরিও সংগ্রহ করতে গিয়ে আমি এক দুষ্টচক্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি। প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারিনি। যখন বুঝলাম তখন আমার মান-সম্মান বিপন্ন। সেই সময় আমাকে সাহায্য করেছিল জিওলিতি। কিন্তু কিছুদিন পর থেকে সেই আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে থাকে। তখন বুঝলাম জিওলিতির আসল লক্ষ্য আমার এই কিউরিওগুলো। ওর হাত থেকে যখন মুক্তির উপায় খুঁজছি সেই সময় হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করলাম ওর সঙ্গে আমার চেহারার অদ্ভুত সাদৃশ্য। দক্ষিণ ইউরোপের লোক জিওলিতির গায়ের রঙও প্রায় আমার মতো। ওকে বোঝালাম, একটি চৈনিক সংস্থাও আমার পিছনে ঘুরছে আমার এই কিউরিওগুলোর জন্য। ও যদি কয়েক দিন আমার ছদ্মবেশে থাকে তাহলে আমি নিশ্চিন্তে আমার রিসার্চের কাজ শেষ করে নিয়েই ওগুলো তার হাতে তুলে দেব। এ সুযোগ জিওলিতি ছাড়েনি। কাজেই ও রয়ে গেল আমার জায়গায় আর আমি জিওলিতি সেজে বাড়ি ছাড়লাম। পরদিন ফিরে এলাম গুরুদেব সেজে। গুরুদেব যে দেহরক্ষা করেছেন ছ'মাস আগে মা সেটা জানতেন না।

ললি বলল, কিন্তু আপনি মিঃ ওয়াং সাজলেন কেন?

প্রফেসর সেন বললেন, ওটা জিওলিতিকে বোঝাবার জন্য যে সত্যিই একটা চৈনিক সংস্থা আমার পিছনে লেগেছে। কিন্তু কি দরকার ছিল আপনার আমাকে খুঁজে বার করবার! পৃথিবীতে জিওলিতির মতো মানুষের বেঁচে থাকাটা কি খুব দরকার?

ললি বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল, আমি দুঃখিত প্রফেসর। আইনের চোখে আপনার সঙ্গে জিওলিতির কোনোই তফাৎ নেই।

এবার যাদুগোপালবাবু বললেন, হত্যার ষড়যন্ত্র এবং প্রমাণ লোপের চেষ্টার অভিযোগে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হলো প্রফেসর।

রহস্যময় বন্ধু

সঞ্জীব সিংহ

এত তাড়াতাড়ি ওর ইচ্ছেটা ফলে যাবে ভাবতেই পারেনি শমি। গতরাতেই সিনোলচু লজে কম্বলমুড়ি দিয়ে শুয়ে শুয়ে ও বিক্রমদাকে বলছিল, 'ইস্, গ্যাংটকে চার-চারটে দিন কেটে গেল, কোনো অ্যাডভেঞ্চারই হলো না!'

জবাবে টেবিলল্যাম্পের সুইচটা অফ করে আলো নিভিয়ে শুতে শুতে বিক্রমদা বলেছিলেন, 'ভাগ্যিস হয়নি! হলে আমি চুপচাপ কম্বলমুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতাম! ছুটি কাটাতে এসে গুণ্ডা-বদমাশদের পেছনে দৌড়োদৌড়ি করব? পাগল নাকি!'

শমির পাশে শুয়ে টিটো ফুট কেটেছিল, 'ঠিক বলেছেন বিক্রমদা। এই শমিটার আবার গোলমালের মধ্যে না পড়লে পেটের ভাত হজম হয় না!'

বিক্রমদা হেসে উঠেছিলেন। রেগে গিয়েছিল শমি।

শমি, বিক্রমদার সঙ্গে এবার গ্যাংটকে বেড়াতে এসেছে টিটো। শমির সঙ্গে মিত্র ইনস্টিটিউশনে ক্লাস নাইনে পড়ে। শমিদের ক্লাসের ফার্স্টবয় হলে হবে কী, টিটো কিন্তু ভয়ানক ভীতু। স্বভাবে ঠিক শমির উল্টো। যদিও দু'জনের গলায় গলায় বন্ধুত্ব দেখার মতো।

গ্যাংটকে যত থাকছে ততই ভাল লাগছে শমির। ভারি রহস্যময়, নির্জন জায়গা। হঠাৎ হঠাৎ কুয়াশায় চারদিক ছেয়ে যায়। বৃষ্টি নামে। মনে হয় অনেকক্ষণ এরকমই চলবে বোধহয়। কিন্তু অবাক কাণ্ড! প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার রোদ ঝলমল করে ওঠে। নীল আকাশ, দূরের বরফঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখে তখন কে বলবে যে একটু আগেই চারদিক অন্ধকার হয়ে বৃষ্টি নেমেছিল!

কলকাতার মতো এখানে এসেও ভোরবেলা শমি বেরিয়ে পড়ে বিক্রমদার সঙ্গে। টিটো অবশ্য বেরোতে চায় না। ওদের বেরোনোর সময় কুয়াশা আর মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে থাকে নিচের গ্যাংটক শহর। দূরের পাহাড়গুলো আবছা নীল। কোথাও কোনো শব্দ নেই। শমির মনে হয় ওরা আর এই পৃথিবীতে নেই। অন্য কোথাও চলে এসেছে!

আজ সকালেই একপশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর ঠাণ্ডা হাওয়াটা যেন হুল ফোটাচ্ছে।

বাইরে বেরিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বিক্রমদা বললেন, 'আজ ওয়েদারটা ভোগাবে মনে হচ্ছে, বুঝলি? বেশিদূর যাওয়া যাবে না।'

ওরা ধরল এনচি মনাস্ট্রির পথ। সিনোলচু লজ থেকে বেরিয়ে পাহাড় পেঁচিয়ে রাস্তাটা উঠেছে। এদিকটা সবসময় নির্জন। ভোরবেলায় হাতে গোনা দু'-একটা লোক দেখা যায়!

ক'দিন ধরেই মনে প্রশ্নটা ঘুরছিল। হাঁটতে হাঁটতে শমি জিজ্ঞেস করল, 'এখানে সবসময় বৃষ্টি হয় কেন বলো তো? অনেক উঁচু বলে?'

বিক্রমদা বললেন, 'উচ্চতা একটা কারণ তো বটেই। তবে আসল কারণ হলো, সিকিমের অনেকটা জায়গা মৌসুমী বায়ুর গতিপথের মধ্যে পড়ে। যার ফলে এখানকার বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতও অনেক বেশি।'

শমি বলল, 'এত গাছপালা কি এই জন্যই?'

বিক্রমদা বললেন, 'এগজ্যাক্টলি। সিকিমে এতরকমের অর্কিড পাওয়া যায় যে জায়গাটা বটানিস্টদের....' বিক্রমদার কথা শেষ হলো না। তার আগেই বিক্রমদা এক হ্যাঁচকা টানে শমিকে রাস্তার একধারে সরিয়ে নিলেন। উল্টোদিকের পাহাড়ী পথের বাঁক থেকে বিপজ্জনক গতিতে বেরিয়ে এসেছে একটা লাল মারুতি। নিমেষে গাড়িটা আরেকটা বাঁক নিয়ে উধাও হয়ে গেল।

দাঁতে দাঁত চেপে বিক্রমদা বলে উঠলেন, 'রাস্‌কেল!' শমির বুকে কেউ যেন সজোরে হাতুড়ি পিটছে। ও শুধু কোনোরকমে বলতে পারল, 'কী হলো ব্যাপারটা?'

বিক্রমদা শমির জ্যাকেট থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর লাগেনি তো? জোরে না টানলে একেবারে পিষে যেতিস।'

শমি বলল, 'গাড়িটা তো এখানকারই হবে। নম্বরটা দেখতে পেলে...', শমি থেমে গেল। কারণ, বিক্রমদার মুখ গম্ভীর। আরও গম্ভীরস্বরে বিক্রমদা বললেন, 'সেটাই তো আশ্চর্যের। গাড়িটার কোনো নাম্বারপ্লেটই নেই!'

শমি বলল, 'আমি কিন্তু একঝলক ড্রাইভারকে দেখেছি।'

বিক্রমদা বললেন, 'আমিও দেখেছি! গাড়ি চালাচ্ছিল একজন তিব্বতী লামা! অবশ্য লোকটা সত্যি লামা কিনা জানার উপায় নেই। তবে পোশাকটা ওরকমই পরেছিল।'

'কিন্তু লোকটা ওরকম ভয়ংকর স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছে কেন? মনে হচ্ছে যেন কেউ ওকে তাড়া করেছে!' শমির গলায় অবাক ভাবটা তখনও কাটেনি।

বিক্রমদা বললেন, 'উল্টোটাও হতে পারে। চল একটু এগিয়ে দেখা যাক।'

শমিও তো এটাই চাইছিল। এজন্যই ওর বিক্রমদাকে এত ভাল লাগে। অন্য কেউ হলে নির্ঘাৎ ঘাবড়ে গিয়ে ফেরার রাস্তা দেখত। কিন্তু বিক্রমদা কোনো পরিস্থিতিতেই ঘাবড়ান না। শেষ দেখে ছাড়েন। আসলে বিক্রমদা একসময় আর্মিতে ক্যাপ্টেন ছিলেন। শমি জানে, কম্যান্ডো ট্রেনিং বিক্রমদাকে এমন শক্ত ধাতুতে তৈরি করে দিয়েছে।

বিক্রমদার কথাই সত্যিই হয়ে গেল। বাঁকটা ঘুরতে বোঝা গেল কেন গাড়িটা অমন ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছিল।

একদিকে খাদ। অন্যদিকে খাড়াই পাহাড়। নানারঙের অর্কিডে ছেয়ে রয়েছে। খাদের দিকে একজন উপুড় হয়ে রয়েছে। ঠিক শুয়ে নয়। কিছু একটা বুকে আঁকড়ে হুমড়ি খেয়ে থাকলে যেমন ভঙ্গি হয়, অনেকটা সেরকম।

'অ্যাকসিডেন্ট!' শমি চেঁচিয়ে উঠল।

'তাই তো মনে হচ্ছে।' বলার আগেই বিক্রমদা ছুটতে শুরু করলেন।

না, ভদ্রলোকের কিছু হয়নি। ওদের পায়ের শব্দে ঐ অবস্থাতেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন। লালচে দুটো চোখে আতঙ্ক। এখানকারই লোক। যদিও দেখলেই বোঝা যায় বেশ অবস্থাপন্ন। দামী ফারের কোট। বিদেশি মাফলার, টুপি। শৌখিন ছড়িটা একপাশে।

এবার শমিদের অবাক হওয়ার পালা। ভদ্রলোকের কোলের কাছে পড়ে আছে একটা বাদামী রঙের লোমশ স্পিৎজ কুকুর। কুকুরটার গলার কাছে বড়সড় ক্ষতচিহ্ন। সেখান থেকে রক্ত বেরিয়ে রাস্তা ভিজিয়ে দিয়েছে।

বিক্রমদা জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করলেন। ভদ্রলোক ওদের দেখেই উত্তেজিত হয়ে কীসব বলতে শুরু করেছেন। শমি দেখল, বলতে বলতেই হাউহাউ করে কাঁদছেন আর চোখ মুছছেন ভদ্রলোক।

বিক্রমদা নরম করে বললেন, 'হিন্দি অর ইংলিশ প্লিজ।' তারপর শমির দিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে বললেন, 'পোষা কুকুর মারা যাওয়ায় বেচারা খুব মুষড়ে পড়েছে। স্বাভাবিক।'

এবার ভাঙা ভাঙা হিন্দি, ইংরিজি মিশিয়ে ভদ্রলোক যা বললেন তাতে শমিরা একেবারে তাজ্জব বনে গেল।

কুকুরটা গাড়িতে চাপা পড়েনি। ওরা দু'জন হাঁটছিল রাস্তার ধার দিয়েই। কুকুরটার চেন ছিল ওঁর হাতে। এই সময় উল্টোদিক থেকে মারুতিটা এগিয়ে আসে। না, খুব স্পীডে মোটেই ছিল না গাড়িটা। আসছিল আস্তে আস্তেই। কিন্তু ভদ্রলোক আর কুকুরটাকে দেখে গাড়িটা একেবারে থেমে যায়। গাড়ি চালাচ্ছিল একজন লামা। ভদ্রলোক ভেবেছিলেন হয়তো রাস্তা বা কোনো ঠিকানা জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু তার বদলে জানলার কাচ নামিয়ে লামাটি পিস্তল বের করে!

'পিস্তল?' বিক্রমদার অবাক প্রশ্নের উত্তরে ভদ্রলোক উত্তেজিত গলায় বললেন, 'ইয়েস, দ্যাট ইজ ইট!'

কিন্তু বিপদের গন্ধ পেয়েই ট্রেইনড স্পিৎজ লাফ দিয়ে কামড়ে ধরে লামাটির হাত। আর তাতেই গুলি ছুটে গিয়ে সোজা কুকুরটার গলা ফুঁড়ে দেয়। কথা শেষ করে লোকটি অবাক চোখ মুছতে লাগলেন।

বিক্রমদা অবাক। বিড়বিড় করে বললেন, 'স্ট্রেঞ্জ! বৌদ্ধ লামারা তো খুবই শান্ত, নিরীহ হয়ে থাকে। আপনার অন্য কোনো শত্রু নেই তো?'

বিক্রমদার প্রশ্নের জবাবে লাল লাল চোখ দুটো হাতের চেটো দিয়ে মুছে নিয়ে ভদ্রলোক ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'অনেক শত্রু আছে, অনেক। আমি প্রিন্স নামগিয়েল। এখানকার রাজবাড়ির ছেলে। কত লোকের যে লোভ রয়েছে আমার সম্পত্তির ওপর! তবে মার্ডার অ্যাটেম্পট এই প্রথম!'

বিক্রমদা বললেন, 'এবার থেকে আপনাকে আরও সাবধানে থাকতে হবে। পুলিসকে জানান। সিকিউরিটি নিন। এভাবে একা একা ঘুরে বেড়ানো ঠিক নয়।'

রাজকুমার নামগিয়েল মাথা নাড়লেন, 'আমার পার্সোনাল সিকিউরিটি আছে। কিন্তু কখনও সেভাবে দরকার হয়নি। বাট ফ্রম নাউ অন....এনিওয়ে, জেন্টলমেন আপনাদের কী বলে যে ধন্যবাদ জানাব! আমার বাড়ি সামনেই। কিছু মনে না করলে একটু যদি চা খেয়ে যান। আমি জানি বাঙালিরা চায়ের খুব ভক্ত।'

বিক্রমদা হাসলেন, 'মনে করার কী আছে? সো কাইন্ড অফ ইউ!'

আর কেউ না জানলেও শমি জানে, বিক্রমদা যেচে নিমন্ত্রণ নেবার লোক নন। আসল ঘটনাটা হলো, বিক্রমদা কেসটাতে ইন্টারেস্ট পেয়ে গেছেন। রহস্যের গন্ধ পেয়েছে শমিও। কুয়াশাঢাকা ভোরে ওর পাশে হাঁটছে একজন সত্যি রাজকুমার! যে রাজকুমারকে একটু আগেই কিনা খুনের চেষ্টা হয়েছে। ইস, টিটোটা যা মিস করল না!

পরে টিটো সে কথাটাই বলল। ওকে বারবার কপাল চাপড়াতে দেখে শেষ পর্যন্ত বিক্রমদা হেসে বললেন, 'এত আপসোস করার কিছু নেই। আর একটু পরেই রাজবাড়ি থেকে একজন আসবেন। দুধের স্বাদ অন্তত ঘোলে মিটবে তোর!'

টিটো একটু লজ্জা পেয়ে গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে আসবে রে? রাজকুমার?'

শমি বলল, 'উঁহু, রাজকুমার নামগিয়েলের সেক্রেটারি। ভদ্রলোক বাঙালি। বরানগরের ছেলে, সুগত ঘোষ। বিক্রমদাকে নামে চিনে ফেলেছে। কথা বলতে চায়।'

'কী কথা?'

শমি কাঁধ ঝাঁকাল, 'কী করে বলব? তবে এই খুনের চেষ্টার ব্যাপারেই বোধহয়। জানতেই পারবি বিকেলবেলা।'

বিকেলবেলা নয়, সেক্রেটারি ভদ্রলোক এলেন ওদের লাঞ্চ শেষ হবার আধঘণ্টা পরেই। হাঁটতে হাঁটতে এতটা পথ উঠে এসেছেন। এই ঠাণ্ডাতেও কপালে ঘাম জমে গেছে। চুলটুল উস্কোখুস্কো। দেখলেই মনে হয় ভদ্রলোক বেশ দুশ্চিন্তায় রয়েছেন।

এসেই শমিকে বললেন, 'এক গ্লাস জল খাওয়াও দেখি ভাই।'

বিক্রমদা বললেন, 'জল দেওয়ার পর এক কাপ গরম কফি পাঠিয়ে দিতে বলিস।'

ভদ্রলোক এতক্ষণে একটু হাসলেন। বললেন, 'থ্যাঙ্ক য়্যু।'

বিক্রমদাও হাসলেন, 'এবার বলুন সুগতবাবু, আপনার কী বলার আছে। সকালের ডামাডোলে তো কিছু শোনাই হয়নি।'

সুগত জল খেয়ে শুরু করলেন, 'এখানে সেক্রেটারির চাকরি নিয়ে আসি বছর পাঁচেক হয়েছে। প্রথমদিকে ভেবেছিলাম নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে কষ্ট হবে। কিন্তু খুব একটা অসুবিধে হয়নি। রাজকুমার নামগিয়েল বেশ ভাল ব্যবহার করতেন। কাজও বিশেষ ছিল না। রানীমা তো সেই অ্যাকসিডেন্টের পর থেকেই একপ্রকার অথর্ব। কানে বিশেষ শুনতে পান না। চোখেও দেখতে পান না।'

'কোন অ্যাকসিডেন্ট?'

বিক্রমদার প্রশ্নের জবাবে সুগত বললেন, 'বছর দশেক আগের ঘটনা। শিকারে বেরিয়ে জিপসুদ্ধু রাজা গড়িয়ে খাদে পড়ে যান।'

বিক্রমদা অবাক, 'এটা জানতাম না তো। জিপে আর কে ছিল?'

'রাজকুমার নামগিয়েল আর তাঁর এক বন্ধু। আশ্চর্যজনকভাবে রক্ষা পান নামগিয়েল। রাজার মৃতদেহ দিন দশেক পরে উদ্ধার হয়। তিস্তায় ভাসতে ভাসতে অনেকদূর চলে গিয়েছিল।'

'সেই বন্ধু?'

সুগত মাথা নাড়লেন, 'নাঃ, বন্ধুর ডেডবডি পাওয়াই যায়নি। রাজকুমারেরও মুখের একটা দিক ভেঙেচুরে বিকৃত হয়ে যায়। প্লাস্টিক সার্জারি করতে হয় পরে। যতদূর জানি বুকের পাঁজরও ভেঙে গিয়েছিল। যাই হোক, ঘটনাটা সবাই ভুলে গিয়েছিল। তবে রিসেন্টলি....' থেমে গিয়ে সুগত দম নিলেন।

'হ্যাঁ, রিসেন্টলি....কী হয়েছে?' ধারালো দৃষ্টি বিক্রমদার চোখে।

সুগত বললেন, 'রিসেন্টলি আমি টিবেটান ইনস্টিটিউটে পুরনো কাগজপত্র ঘাঁঠিতে গিয়ে সেই বছর দশেক আগের ঘটনাটা সম্পর্কে অনেক ডিটেল জানতে পারি। একটা ইনফরমেশান আমাকে বেশ অবাক করে দেয়।'

'কী সেটা?' বিক্রমদা ঝুঁকে বসেছেন।

'রাজকুমার নামগিয়েলের সেই বন্ধুকে নাকি অনেকটা রাজকুমারের মতোই দেখতে ছিল!'

টিটো মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'হাইলি ইন্টারেস্টিং!'

বিক্রমদা হেসে ফেললেন। বললেন, 'কেন একথা বললেন টিটোবাবু? কেসটা তোমার কেন ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে?'

শমি কিন্তু বেশ বিরক্ত হলো। টিটোকে মাঝেমধ্যে বড় বেশি পাত্তা দেয় বিক্রমদা। ওর সব কথায় এত কান দেওয়ার কী আছে?

টিটো অবশ্য একটুও ঘাবড়ায়নি। বলল, 'আমার ধারণা এই লোকটা আসল রাজকুমার নয়। এ হচ্ছে রাজকুমার নামগিয়েলের সেই বজ্জাত বন্ধুটা। রাজা আর রাজকুমারকে মেরে নামটাম ভাঁড়িয়ে ব্যাটা সম্পত্তি ভোগ করছে।'

বিক্রমদা কিন্তু হাসলেন না। গম্ভীর হয়ে বললেন, 'অ্যানলিলিসটায় অনেকগুলো দুর্বল দিক রয়েছে। তবুও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এনিওয়ে, সুগতবাবু তারপর বলুন।'

সুগত বললেন, 'কৌতূহলী হয়ে আমি রানীমার সঙ্গে দু'-একদিন কথা বলার চেষ্টা করি। নামগিয়েল সেটা জানতে পেরে আমাকে হুমকি দেয়। কী আর করব? চাকরি চলে যাবার ভয়ে আমি খোঁজখবর

বন্ধ করে দিই। কিন্তু কয়েকদিন আগে নামচেবাজারে এক তিব্বতী লামাকে দেখে আমি ভূত দেখার মতো চমকে উঠি। রাজকুমারের সঙ্গে লোকটার এত মিল যে আপনি না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। মজার ব্যাপার হলো মোটামুটি ঐ সময় থেকে রাজকুমার নামগিয়েলকেও খুব বিচলিত থাকতে দেখছি। তারপর আজকের ভোরের ঘটনাটা খুব সিগনিফিকান্ট বলে মনে হয়। শুনলাম, একজন লামা এসে মারার চেষ্টা করেছে রাজকুমারকে!'

বিক্রমদা উঠে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন। বাইরেটা ঝাপসা হয়ে আছে। নিচের গ্যাংটক শহর থেকে কুয়াশা উঠে আসছে। ওপরের মেঘের সঙ্গে মিশে গিয়ে সবকিছুর ওপর একটা রহস্যময় পর্দা ফেলে দিচ্ছে।

বিক্রমদা ঘুরে সুগতর পিঠে হাত রেখে বললেন, 'রাজবাড়ির সমস্যায় আপনার না জড়ানোই ভাল সুগতবাবু। চোখ-কান শুধু খোলা রাখবেন। অযথা কৌতূহল দেখানোর দরকার কী?'

সুগত যেন একটু হতাশ হলেন। সেরকম মুখ করে বললেন, 'এই নামগিয়েলের মধ্যে অনেক গণ্ডগোল রয়েছে। একটু চেপে ধরলে কিন্তু প্রচুর গোপন তথ্য বেরোবে।'

বিক্রমদা হাসলেন, 'সব রাজপরিবারের ইতিহাসেই এরকম অনেক গোপন তথ্য থাকে। সিকিমের ইতিহাসে সপ্তদশ শতাব্দীতে সত্যিই নামগিয়েল নামে এক রাজকুমার ছিল, জানেন তো? তার পরিণতিটা অবশ্য খুব দুঃখের।'

সুগতর মুখ দেখে বোঝা গেল ঘটনাটা প্রথম শুনলেন।

বিক্রমদা বলে চললেন, 'রাজ-সিংহাসনের লোভে সেই নামগিয়েলের বড়বোন ওঙ্গসু চক্রান্ত করেছিলেন। ওঙ্গসুর নির্দেশে রাজবৈদ্য অসুস্থ নামগিয়েলের হাতের শিরা কেটে তাকে মেরে দিয়েছিল। এর ফলে সেনাবিদ্রোহ হয়। ওঙ্গসু আর রাজবৈদ্যকে ফাঁসি দেয় বিদ্রোহী সেনারা।'

বিক্রমদা থামতেই শমি আর টিটো একসঙ্গে বলে ওঠে, 'তারপর?'

বিক্রমদা বললেন, 'নামগিয়েলের নাবালক পুত্রকে তখন রাজা করা হয়। কিন্তু লাভ হয়নি। সেই ছেলে বড় হয়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে লামা হয়ে যায়!'

টিটো বলে উঠল, 'ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি!'

বিক্রমদা হেসে ফেললেন, 'না, এখনই জোর দিয়ে ওভাবে বলা যাচ্ছে না। আন্দাজে বলা উচিতও নয়। তবে এই নামগিয়েলকে ঘিরে যে বড়সড় একটা রহস্য দানা বেঁধেছে—সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আর সেজন্যই, এখান থেকে পাকাপাকিভাবে বিদেশে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ভালই করেছেন ভদ্রলোক।'

সুগতবাবু উঠে পড়লেন। যাবার সময় শমি, টিটোকে বলে গেলেন, 'কাল বিকেলে কী করছ? পারলে চলে এসো। টিবেটান ইনস্টিটিউটে নিয়ে গিয়ে প্রাচীন পুঁথি, থাঙ্কা দেখাব।'

সুগতবাবু চলে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেরোলেন বিক্রমদা। বলে গেলেন, 'যাই, ফেরার টিকিটটা কনফার্ম করার জন্য একটা তাগাদা মেরে আসি।'

বিক্রমদা টিকিটের কথা বললেও শমি কিন্তু জানত যে এই ব্যাপারে খোঁজখবর নেবার জন্যই বেরোচ্ছে বিক্রমদা। ওর ধারণা সত্যি হয়ে গেল পরদিন ভোরবেলাতেই।

এখনও সেকথা ভাবলে শমির গায়ে কাঁটা দেয়। গ্যাংটকে বেড়াতে গিয়ে ও অ্যাডভেঞ্চার চেয়েছিল। কিন্তু এরকম ভয়ংকর অভিজ্ঞতা হবে কে ভেবেছিল?

ভোরবেলা ঘুম থেকে ডেকে তুললেন বিক্রমদা। বললেন, 'চটপট রেডি হয়ে নে। এখনই বেরোতে হবে।'

বিছানা থেকে নামতে নামতে ঘুমচোখে শমি বলল, 'কেন? কোথায় যাবে?'

বিক্রমদা প্রচণ্ড গম্ভীর। বললেন, 'একজন লামার মৃতদেহ পাওয়া গেছে পালজোর স্টেডিয়ামের

পাশের খাদে। দ্যাখ যদি চিনতে পারিস। মারুতি চালাচ্ছিল যে লোকটা তাকে মনে আছে তো?'

শমির ঘুম কেটে গেছে। মাথা চুলকে বলল, 'একটু, একটু।'

বিক্রমদা বললেন, 'ওতেই চলবে।'

টিটো আর এবার মিস করতে রাজী নয়। ও উঠে পড়ল শমির সঙ্গে।

পাহাড় কেটে তৈরি স্টেডিয়ামের একদিকে গ্যালারি। নিচে একটা ধাপ পেরোলেই খাদ। আরও নিচে থাক থাক নেমে গেছে বাড়িঘর, রাস্তা। এখান থেকে তিস্তাকে মনে হয় সরু রুপোলি একটা ফিতে।

দূর থেকেই ওরা দেখল বেশ ভিড় জমে গেছে। কিন্তু কাছে যাওয়ার পর ওদের জন্য একটা বড় চমক অপেক্ষা করছিল।

শুকিয়ে যাওয়া রক্তের মধ্যে পড়ে থাকা লোকটাকে দেখেই শমি বলে উঠল, 'আরে, এ তো সেই মারুতির ড্রাইভার। আমাকে আর একটু হলেই চাপা দিত!'

টিটো ফিসফিস করে বলল, 'সেই নিখোঁজ রাজকুমার! যে লামা হয়ে গিয়েছিল?'

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন পুলিস ইন্সপেক্টর বেরিয়ে এসেছেন। এখানকার পুলিস হালকা নীল পোশাক পরে।

ভদ্রলোক এগিয়ে বিক্রমদার সঙ্গে হাত মেলালেন। বললেন, 'হ্যালো, ক্যাপ্টেন। গুড মর্নিং।'

হাত ঝাঁকিয়ে বিক্রমদা বললেন, 'গুড মর্নিং ইন্সপেক্টর প্রধান।'

ইন্সপেক্টর বললেন, 'তাহলে আপনার আশঙ্কাটাই সত্যি হয়ে গেল। ক্যাপ্টেন মুখার্জি।'

বিক্রমদা হতাশ গলায় মাথা নেড়ে বললেন, 'শুধু একটাই ভুল হয়ে গেল আর একটু অ্যালার্ট থাকলে একে এভাবে মরতে হতো না। আপনারা হাতেনাতেই ধরে ফেলতে পারতেন।'

বিক্রমদারা যে নিজেদের মধ্যে কী কথা বলছে শমির মাথায় কিছুই ঢুকছে না। কে এই লোকটা? লামার ছদ্মবেশে কেনই বা রাজকুমারকে মারতে গিয়েছিল?

এইসময় একজন কনস্টেবল একটা ডাঁটিভাঙা চশমা কুড়িয়ে নিয়ে এল।

'স্যার, এটা ঝোপের মধ্যে পাওয়া গেছে।'

বিক্রমদা চশমাটা হাতে নিয়ে শিস দিয়ে উঠলেন। মৃত লোকটা উপুড় হয়ে পড়েছিল। চিৎ করা হয়েছে। বিক্রমদা চশমাটা লোকটার মুখের ওপর রাখতেই শমি আর টিটো একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে এ যে সুগতবাবু!'

বিক্রমদা বললেন, 'এই চশমাটা না থাকলে সুগতকে চেনাই যেত না। লামার ছদ্মবেশটা দারুণ নিয়েছিলেন ভদ্রলোক।'

টিটো বলল, 'কিন্তু ভদ্রলোক এত নিচে পড়লেন কী করে? কেউ ঠেলে দিয়েছিল?'

বিক্রমদা ওপর দিকে চেয়ে বললেন, 'উঁহু, এটা একেবারে জেনুইন দুর্ঘটনা। ওপরের বৃষ্টিভেজা গ্যালারি থেকে একেবারে পা পিছলে সোজা হাজার ফিট নিচে!'

টিটো বলল, 'ইস! কী প্যাথেটিক ব্যাপার!'

কিন্তু শমি তখন হাজার ভেবেও কোনও কূলকিনারা পাচ্ছে না। সুগতবাবু লামার ছদ্মবেশ ধরে হঠাৎ কেন খুন করতে গিয়েছিলেন রাজকুমারকে? এখানে গ্যালারির ওপরে উঠেই বা কী করছিলেন ভদ্রলোক?

জিজ্ঞেস করতে বিক্রমদা হাসলেন, 'সেটা জানতে গেলে আমাদের যেতে হবে রাজকুমার নামগিয়েলের কাছে।'

ইন্সপেক্টর প্রধান বললেন, 'সেই ভাল ক্যাপ্টেন মুখার্জি। আপনিও চলুন। গোড়া থেকে গোটা ব্যাপারটা আপনিই বলতে পারবেন।'

বিক্রমদা ছোট্ট নিঃশ্বাস চেপে বললেন, 'আমি বললে হবে না ইন্সপেক্টর। নামগিয়েলকেই মুখ খুলতে হবে। নইলে দশ বছর আগের দুর্ঘটনার সঙ্গে এই অদ্ভুত রহস্যময় ঘটনার যোগাযোগ ব্যাখ্যা করা যাবে না।'

রাজকুমার নামগিয়েলকে অবশ্য খুঁজতে হলো না। রাজবাড়িতে ঢোকার মুখেই তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য মুখ। ওদের দেখে এগিয়ে এলেন। ইন্সপেক্টর প্রধানের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'অ্যারেস্ট মিঃ ইন্সপেক্টর। দু'জন লোকের প্রাণ গেল আমারই দোষে।'

ইন্সপেক্টর প্রধানকে হতভম্ব দেখাচ্ছে। কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। বিক্রমদা এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'দোষ আপনার হয়তো রয়েছে ঠিকই। তবে তার জন্য আপনাকে অ্যারেস্ট করা যায় না। চিয়ার আপ। এত ভেঙে পড়ার মতো কিছু হয়নি।'

নামগিয়েল বললেন, 'আপনি কতটা জানেন? আমার বাবার মৃত্যুর জন্যও আমিই দায়ী। তারপর সুগতও কাল শেষরাতে আমার সামনেই পা পিছলে পড়ে গেল। বিশ্বাস করুন ক্যাপ্টেন মুখার্জি, আমি বুঝতেই পারিনি সুগত আমাকে ব্ল্যাকমেল করছে আমার মৃত বন্ধুর পরিচয়ে। কিন্তু এতটা মর্মান্তিক পরিণতি আমি আশা করিনি।'

বিক্রমদা বললেন, 'আমি গোড়া থেকে পুলিসকে বললে হয়তো এতটা বাড়াবাড়ি হতো না।'

নামগিয়েল বললেন, 'জানাজানি হওয়ার ভয়েই কাউকে বলিনি। ও যখন যা টাকা চেয়েছে দিয়ে দিয়েছি। ঘটনাটা গোড়া থেকেই বলি। আমার বাবার ছিল খুব শিকারের ঝোঁক। জিপে যাচ্ছিলাম আমরা তিনজন। বন্ধু গাড়ি চালাচ্ছিল। ও ভালই চালাত। বাবা বন্দুক, টোটাভর্তি বাক্স নিয়ে বসেছিলেন পেছনের সীটে। আমি সামনে বন্ধুর পাশে। হঠাৎ কী দুর্বুদ্ধি চাগল। গাড়ি চালাতে চাইলাম। অল্পস্বল্প জানতাম। বন্ধু প্রথমে রাজী হয়নি।'

বিক্রমদা বললেন, 'বাকিটা আমি বলছি। দুর্ঘটনাটা যে আপনার হাত দিয়েই হয়েছিল সেকথাটা কাউকে বলতে পারেননি লজ্জায়। হয়তো ভয়ও কাজ করেছিল। ভেবেছিলেন, আপনার বাবার মৃত্যুর জন্য আপনাকেই লোকজন দায়ী করবে। কী ঠিক বলছি তো?'

নামগিয়েল মাথা নাড়লেন।

বিক্রমদা বললেন, 'এইসময় আপনার সেক্রেটারির চাকরি নিয়ে আসে সুগত। চালাক-চতুর ছেলে, আপনার দুর্বল জায়গাটা বুঝে নিয়ে রটিয়ে দেয় যে আপনার সেই বন্ধু এখনও বেঁচে আছে। রয়েছে এক মনাস্ট্রিতে, লামা হয়ে! এবং পরে আপনারই বন্ধু সেজে সব ফাঁস করে দেওয়ার হুমকি দেয় ফোনে। ও ধরেই নিয়েছিল যে এতদিনের ব্যবধানে আপনি আপনার বন্ধুর গলার স্বর ভুলে গেছেন। এবং ওর ধারণাই ঠিক। আপনি সেই টেলিফোনের হুমকি শুনেই টাকা রেখে আসতেন নির্দিষ্ট স্থানে।'

সবাই চুপ। বিক্রমদা বলে চললেন, 'গতকাল ভোরে আপনাকে যেভাবে অ্যাটাক করা হয় তার ধরন দেখেই আমার প্রথম সন্দেহ জাগে। আসলে সুগত বুঝে গিয়েছিল যে আর বেশিদিন এভাবে ব্ল্যাকমেল করা যাবে না। কারণ রানীমার বয়স হয়েছে। রানীমা মারা গেলে আপনার কাউকে ভয় পাওয়ার কিছু থাকবে না। তাই নির্জনতার সুযোগ নিয়ে শেষবারের মতো একটা ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছিল সুগত লামার ছদ্মবেশ নিয়ে। আপনার কুকুরের মৃত্যুটা একটা দুর্ঘটনা। সুগত আপনাকে প্রাণে মারতে চায়নি। কুকুরটা আচমকা লাফিয়ে ওঠায় গুলি ছুটে যায়। গতকাল সকালে আপনার বাড়িতে ওকে দেখেই বেশ অবাক হয়েছিলাম। সম্ভবত তাড়াতাড়িতে মেকাপ তুলতে গিয়ে ওর গালে তখনও রং লেগেছিল। কিন্তু তখন এতটা মাথায় আসেনি। তবে লোকটা যে অসম্ভব ধূর্ত সেটা বুঝেছিলাম।

'তারপর ওকে দুপুরে আমার ওখানে ডাকি। ও যেভাবে আপনার ওপর নানারকম সন্দেহ আরোপের চেষ্টা করে তাতেই সন্দেহটা আরও দৃঢ় হয়। সেজন্যই ওর জন্য একটা ফাঁদ পাতি। ওকে শুনিয়ে বলি যে আপনি এখানকার সব সম্পত্তি বিক্রি করে বিদেশে চলে যাচ্ছেন। ও টোপটা গিলে নেয় এবং ফিরে গিয়ে ঘণ্টাখানেক বাদে আপনাকে ফোনে জানায় যে শেষবারের মতো পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে দিলে 'আপনার বন্ধু' চলে যাবে। টাকাটা ও রাখতে বলে পালজোর স্টেডিয়ামের গ্যালারির একেবারে ওপরে, শেষরাতে। ইতিমধ্যে আমি মিঃ প্রধানের সঙ্গে দেখা করে আপনার ফোন ট্যাপ করার ব্যবস্থা করে ফেলেছিলাম।

'তারপরের ঘটনা তো আপনারা সবাই জানেন।' বিক্রমদা বড় নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন, 'পুলিস স্টেডিয়াম ঘিরে ফেলেছিল রাতের অন্ধকারে। পালাতে গিয়ে সুগতবাবু সোজা নিচে! ব্যাড লাক!'

রাজকুমার নামগিয়েল এগিয়ে এসে বিক্রমদার হাত ধরে ফেললেন, 'আপনাকে যে কী বলে কৃতজ্ঞতা জানাব! ভাগ্যিস আপনার সঙ্গে গতকাল ভোরে দেখা হয়েছিল।'

বিক্রমদা হাসলেন। বললেন, 'সত্যি কথাটা যত অপ্রিয় হোক, শুরুতেই বলে দিলে কিন্তু এত সমস্যা দেখা দেয় না। তাই না?'

[কার্তিক ১৪০২]

প্রেতপিশাচের অভিশাপ

অসিত মৈত্র

সিতাংশুর সঙ্গে অনেক রোমাঞ্চকর অভিযানে আমি সক্রিয় অংশ নিয়েছি, তবে মিশরের মমি রহস্যের সঙ্গে অন্য কারুর তুলনা চলে না। সেই রহস্যের সমাধান সূত্রের অন্বেষণে, কলকাতার কলকোলাহল ছেড়ে সুদূর মিশরে ছুটে যেতে হয়েছিল আমাদের। প্রাচীন সম্রাট মেনহেরার শবাগার আবিষ্কারকে কেন্দ্র করে মৃত্যুর যে ধারাবাহিকতা বয়ে যায়, সকলে তাকে অশুভ আত্মার অভিশাপ বলেই ধরে নিয়েছিল। কিন্তু সিতাংশু? তাহলে একবারে গোড়া থেকেই সমস্তটা শুরু করা যাক.....

প্রাচীন মিশরের সম্রাট তুতাম-আমেনের শবাগার আবিষ্কার করে লর্ড কর্নারভন রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে উঠলেন। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দুজন ভারতীয় ডক্টর দীপঙ্কর বিশ্বাস ও রমেশ যোশীও মিশরের মরুভূমিতে প্রাচীন মমির অনুসন্ধান শুরু করে দিলেন। তার ফলেই কায়রোর কাছে সম্রাট মেনহেররার সমাধিমন্দির আবিষ্কৃত হলো। মেনহেররা ছিলেন অষ্টম শতাব্দীর অবক্ষয়িত যুগের সম্রাট। সমাজজীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তখন পুরোদস্তুর ঘুণ ধরেছে। অত্যাচার আর অনাচারে ছেয়ে গেছে সারা মিশর। সে যুগের ইতিহাস সম্পর্কে এতদিন বিশেষ কিছু জানা যায়নি। তাই ঐতিহাসিক দিক থেকে এই ঘটনার গুরুত্ব অনেক বেশি। কাগজে কাগজে এই অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে লাগল।

এই আবিষ্কারের দু-চারদিনের মধ্যে ডক্টর দীপঙ্কর বিশ্বাস মারা গেলেন। ডাক্তাররা রায় দিলেন, মৃত্যুর কারণ করোনারি। তবে সাংবাদিকরা চিত্তাকর্ষক গল্পের খোরাক পেলে সহজে ছেড়ে কথা বলে না। মিশরের অনেক প্রাচীন মমির নামের সঙ্গে যে সমস্ত অভিশাপের কিংবদন্তী যুক্ত হয়ে আছে কোনো কোনো পত্রিকায় সেই সমস্ত কাহিনীও প্রকাশ পেতে শুরু করল।

দীপঙ্কর বিশ্বাসের মৃত্যুর দিন পনেরো বাদে রমেশ যোশীও তাঁকে অনুসরণ করলেন। কোনো অজ্ঞাত কারণে নাকি তাঁর দেহের রক্ত বিষিয়ে গিয়েছিল। হপ্তাখানেক বাদে যোশীর এক ভাইকে আমেদাবাদে তার নিজের ফ্ল্যাটে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেল। এরপরে সাংবাদিকদের আর ধরে রাখা গেল না। এতদিন ধরে যেটা নেহাৎই কুসংস্কার বলে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা চলছিল, তাই এখন ফুলে ফুলে পল্লবিত হয়ে প্রকাশ্যে নিজের আসন দখল করে নিল। সম্রাট মেনহেররার রক্তলোলুপ বিদেহী আত্মার কিংবদন্তীমূলক যতগুলো গল্প প্রচলিত ছিল সে সমস্তই এখন জনসাধারণের আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াল।

এই সময়ে সিতাংশু একদিন শ্রীমতী বিশ্বাসের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেল। বিশ্ববিখ্যাত আর্কিওলজিস্টের বিধবা স্ত্রী পত্রে জানিয়েছেন, সিতাংশু যদি একবার সুবিধেমতো তাঁর সঙ্গে দেখা করে তবে তিনি সবিশেষ বাধিত হবেন। রহস্যাভেদী হিসেবে সিতাংশুর নাম তাঁর সুপরিচিত। তিনি যে বর্তমানে ফার্ন রোডে তাঁর স্বামীর বাড়িতেই থাকেন, সে কথাটাও জানাতে ভোলেননি। বলা বাহুল্য আমিও সিতাংশুর সঙ্গী হলাম।

ফার্ন রোডে যখন আমরা শ্রীমতী বিশ্বাসের বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম তখন বেলা প্রায় দশটা। ফোনে আগে থেকেই খবর দেওয়া ছিল। বেয়ারা এসে পথ দেখিয়ে দুজনকে ভেতরে নিয়ে গেল। স্বয়ং গৃহকর্ত্রী

আমাদের জন্যে বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছিলেন। কালোপেড়ে শাড়ি পরে একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে তিনি বসেছিলেন। চোখেমুখে গভীর অবসাদ আর হতাশার ছাপ। আমাদের দেখে মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে সোজা হয়ে উঠে বসলেন।

—সত্যিই যে আপনারা এসে হাজির হবেন.....আমার মতো সামান্য একজনের জন্যে এতখানি কষ্টস্বীকার করবেন, তা আমি ভাবতে পারিনি। এরজন্যে আমি কৃতজ্ঞ।

হাত নেড়ে বাধা দিল সিতাংশু—কৃতজ্ঞতা কেন বলছেন? আপনার কাজে লাগতে পারলে খুশি হব। নিশ্চয় কোনো গুরুতর পরামর্শের জন্যেই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?

—হ্যাঁ। শ্রীমতী বিশ্বাস কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন—আপনি যে রহস্যভেদী তা জানি। কাগজে আপনার অনেক কাহিনীই পড়েছি। তবে শুধু সে কারণেই আপনাকে ডেকে পাঠাইনি। আপনার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটা মৌলিকতা আছে আর আপনার কর্মক্ষেত্রও বিশ্বব্যাপী, সে কারণেই.....অল্প থামলেন তিনি, তারপর ব্যাকুল দৃষ্টিতে সিতাংশুর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন-মিঃ মুখার্জী, আপনি কি অলৌকিকে বিশ্বাসী?

এ প্রশ্নের জবাব দিতে সিতাংশুর একটু দেরি হলো। মনে হলো নিজেকে সে যাচাই করে দেখে নেবার চেষ্টা করছে।

—দেখুন, আপনার এ প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া সম্ভব নয়। ভেবে দেখুন, এর মধ্যে ব্যক্তিগত মতামতের যথেষ্ট ভূমিকা আছে। তাই নয় কী? সম্ভবত ডক্টর বিশ্বাসের আকস্মিক মৃত্যুর প্রসঙ্গেই আপনি একথা জিজ্ঞেস করছেন?

—হ্যাঁ, সেই বিষয়েই। অকপটে স্বীকার করলেন ভদ্রমহিলা।

—আপনি কি আমাকে দিয়ে এই মৃত্যুর ব্যাপারে তদন্ত করাতে চাইছেন? শ্রীমতী বিশ্বাসের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করল সিতাংশু।

—মিঃ মুখার্জী, পরপর তিনটে মৃত্যু ঘটেছে এবং প্রত্যেকটিরই নিজস্ব কারণ আছে। কিন্তু এই তিনটি ঘটনাকে যদি অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যায় তবে তাদের মধ্যে কি কোনো যোগসূত্র আবিষ্কার করা যায় না? মন কি সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে না? সম্রাট মেনহেররার অভিশপ্ত সমাধিমন্দির আবিষ্কৃত হবার একমাসের মধ্যেই পরপর তিনটে মৃত্যু, মৃত ব্যক্তিরা প্রত্যেকেই এই আবিষ্কারের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে জড়িত। হয়তো এটা মিথ্যে কুসংস্কার। কিংবা হয়তো সত্যিই সুদূর অতীতের এক ভয়ঙ্কর অভিশাপ, শতাব্দীর আঙ্গিনা দিয়ে পায়ে পায়ে এতটা পথ পার হয়ে এসেছে, আধুনিক বিজ্ঞান তাই ওই মৃত্যুর কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। বাস্তব ঘটনাকে তো আর অস্বীকার করা যায় না। পরপর তিন তিনটে মৃত্যু! কে বলতে পার এখানেই এর সমাপ্তি ঘটবে কিনা! শেষের দিকে শ্রীমতী বিশ্বাসের কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে উঠল।

—কার জন্যে আপনি এত ভয় পাচ্ছেন?

—আমার ছেলে জয়ন্তর জন্যে। যখন আমার স্বামীর মৃত্যুসংবাদ এসে পৌঁছল তখন আমি অসুস্থ। আমার ছেলে সেই সময় সবেমাত্র কেমব্রিজ ইউনিভারসিটি থেকে পাঠ শেষ করে দেশে ফিরেছে। ও নিজে গিয়ে পিতার মৃতদেহ কলকাতায় নিয়ে এল। কিন্তু শ্রাদ্ধশান্তি মিটিয়েই মিশরের উদ্দেশে রওনা হয়ে পড়ল। আমার হাজার অনুরোধ-উপরোধ কিছুই কানে তুলল না। পিতার আরব্ধ কাজ ও শেষ করবেই। পুরাতত্ত্ব হচ্ছে ওরও প্রিয় বিষয়। আপনি আমাকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন নির্বোধ ভাবতে পারেন? কিন্তু সত্যিই মিঃ মুখার্জী, আমি ভীষণ ভয় পাচ্ছি। সারা দিনরাত এই একটি মাত্র চিন্তাই আমাকে পাগল করে তুলছে। এক মুহূর্তের জন্যেও নিশ্চিন্ত থাকতে পারছি না। যদি সম্রাট মেনহেররার রক্তলোলুপ বিদেহী আত্মার পিপাসা এখনও না মিটে থাকে? এখনও যদি তার রক্ততৃষ্ণা জেগে থাকে? আমি হয়তো খুবই নির্বোধের মতো কথা বলছি.....

—না না, আপনার এতটা অস্বস্তি বোধ করার কোনো কারণ নেই, মিসেস বিশ্বাস। আমি নিজেও অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসী। এর প্রভাব যে কত গভীর.....কত ব্যাপক.....

স্তব্ধ বিস্ময়ে সিতাংশুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এই মুহূর্তে নিজের কান দুটোকেও যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছি না। অথচ ওর ভাবভঙ্গিতে ঠাট্টা-তামাশার লেশমাত্র নেই। শান্ত সংযত ধীরস্থির সিতাংশু ঠিক সেই আগের মতোই আছে।

—তাহলে আপনার বক্তব্যের মূল বিষয়, আমি শ্রীমান জয়ন্তকে এই ধরনের কোনো বিপদ-আপদের হাত থেকে রক্ষা করি? কথা দিলাম, আমি তাকে সুস্থ এবং নিরাপদ রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করব।

—কিন্তু.....কিন্তু আমি সাধারণ বিপদ-আপদের কথা বলছি না। যদি সত্যিই তেমন কোনো অশুভ শক্তির প্রভাব কোথাও থেকে থাকে?

—দেখুন মিসেস বিশ্বাস, সিতাংশুর কণ্ঠস্বরে ঘন গাম্ভীর্য—মধ্যযুগে এই জাতীয় অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করতে নানারকম মন্ত্রতন্ত্রের প্রচলন ছিল। মনে হয় বর্তমান কালের মানুষদের চাইতে এসব বিষয়ে তাদের জ্ঞান ছিল অনেক বেশি গভীর। যাক, এবার কাজের কথায় আসা যাক, যার সাহায্যে আমি অন্তত একটা পথের সন্ধান খুঁজে পেতে পারি। যতদূর শুনেছি ডক্টর বিশ্বাস বরাবর মিশরের প্রাচীন ইতিহাস নিয়েই গবেষণা করে গেছেন। তাই নয় কি?

—হ্যাঁ, ছাত্রজীবন থেকেই তিনি এই বিষয় নিয়ে মেতে উঠেছিলেন। প্রাচীন মিশরের ইতিহাস তাঁকে এক অপার্থিব আনন্দলোকে টেনে নিয়ে যেত। এ বিষয়ে তাঁর জ্ঞানও ছিল অগাধ।

—কিন্তু মিঃ যোশী? তিনি তো নেহাৎ শখের খাতিরেই আপনার স্বামীর সঙ্গী হয়েছিলেন বলে কাগজে পড়েছিলাম।

—হ্যাঁ, তাই। তিনি হচ্ছেন একজন কোটিপতি। যে কোনো ব্যাপারে একবার খেয়াল চাপলে হয়, চোখ বুজে টাকা খরচ করতে কোনোরকম দ্বিধা করতেন না। আমার স্বামী মিঃ যোশীকে এ বিষয়ে আগ্রহী করে তোলেন এবং মূলত তাঁর টাকাতেই এই ব্যয়বহুল অভিযান শুরু হয়েছিল।

—আর তাঁর ভাই? যে ভদ্রলোক নিজের ফ্ল্যাটে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন, তাঁর সম্পর্কে কিছু জানেন? তাঁর মতিগতি কী রকম ছিল? তিনিও কি প্রথম থেকে এই অভিযানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?

—না, আমার তো মনে হয় না। কাগজে ভদ্রলোকের মৃত্যুসংবাদ পাঠ করেই আমি তাঁর অস্তিত্বের কথা প্রথম জানতে পারি। আমরা বিশ্বাস, দুই ভাইয়ের মধ্যে ভাল সম্পর্ক ছিল না। কারণ মিঃ যোশীকে কোনোদিন তাঁর কোনো আত্মীয়স্বজনের নাম উল্লেখ করতে শোনা যায়নি। তাহলে আমার স্বামীর কাছ থেকে আমি সে কথা জানতে পারতাম।

—এই অভিযানে আর কে কে আপনার স্বামীর সঙ্গে ছিলেন?

—ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের জনৈক উচ্চপদস্থ অফিসার মিঃ বিশ্বনাথন। এ ছাড়া ব্রিটিশ মিউজিয়ামের একজন কর্মচারী। সঞ্জয় ভাটিয়া নামে অল্পবয়সী এক যুবক সেক্রেটারী হিসেবে সঙ্গে ছিলেন। আর ছিলেন ডাক্তার অগস্তি। ডাক্তার অগস্তি প্রথম জীবনে বহুদিন মিশরে ছিলেন। মিশর সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতার সুবাদেই তাঁকে দলভুক্ত করা হয়েছিল। আমাদের অনেক দিনের পুরনো বিশ্বস্ত চাকর হাসানও বরাবর আমার স্বামীর সঙ্গে থাকত। হাসান আদতে মিশরেরই অধিবাসী। আমার স্বামী অনেক খুঁজেপেতে তাকে যোগাড় করেছিলেন।

—সঞ্জয় ভাটিয়া সম্পর্কে কিছু জানেন? ভদ্রলোক সেক্রেটারী পদে বহাল হলেন কোন সূত্রে?

—এই অভিযানের প্রাক্কালে একজন সেক্রেটারী চাই বলে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। যাঁরা আবেদন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে থেকে দেখেশুনে এই ভদ্রলোককে নিযুক্ত করা হয়। বয়স বেশি নয়। সাতাশ-আঠাশের মধ্যেই। খুবই হাসিখুশি আর আমুদে স্বভাবের। কাজেকর্মেও খুব চটপটে।

—ধন্যবাদ, মিসেস বিশ্বাস।

—আর কিছু জানার থাকলে স্বচ্ছন্দে প্রশ্ন করতে পারেন।

—আপাতত আমার আর কিছু জানার নেই। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন। আমার দিক থেকে চেষ্টার কোনো ত্রুটি হবে না।

শেষের কথাগুলো অবশ্য খুব বেশি আশাপ্রদ নয়। শ্রীমতী বিশ্বাসের মুখের ভঙ্গিতেও তা টের পাওয়া গেল।

সিতাংশু যে অলৌকিকে বিশ্বাসী সেটা জীবনে এই প্রথম শুনলাম। ফেরার পথে এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে অল্পবিস্তর কথাবার্তাও হলো। কিন্তু দেখলাম ও অতিমাত্রায় সিরিয়াস।

—না না অজয়, সব ব্যাপারই অমন হাল্কাভাবে উড়িয়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। আমাদের জ্ঞানের চৌহদ্দি আর কতটুকু! প্রায় সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই তার বাইরে পড়ে আছে। অথচ এই সামান্য জ্ঞানের পুঁজি নিয়েই মানুষ নিজেকে মস্ত পণ্ডিত ভেবে বসে থাকে।

ওর সঙ্গে তর্ক করে সময় নষ্ট করা বোকামি। তাই প্রসঙ্গ পাল্টে বললাম—তুমি যে ভদ্রমহিলাকে কথা দিয়ে এলে, কিন্তু কোথা থেকে কাজ শুরু করবে সে দিকটা একবার ভেবে দেখেছো?

হেঁয়ালি ভরা দৃষ্টিতে সিতাংশু আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল—ঠিক ঠিক, তুমি একেবারে আসল জায়গায় ঘা দিয়েছো। কোথা থেকে শুরু করব সেটা যথেষ্ট চিন্তার ব্যাপার। রহস্যভেদের গোড়ার কথাই তাই। শুরুটা ঠিকমতো ধরতে পারলে পরিণতির দিকে সহজে অগ্রসর হওয়া যায়। তা না হলে বুনো হাঁসের পেছনে অযথা ঘুরে বেড়ানোই সার হবে। তবে এখন আমাদের প্রথম করণীয় হচ্ছে রমেশ যোশীর ভাইয়ের মৃত্যুর পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করা।

।। ২।।

সিতাংশুর বাবা সুধাংশুশেখর ছিলেন ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার। তাঁর সাহায্যে এই বিবরণ সংগ্রহ করা খুব বেশি কষ্টসাধ্য হলো না। আমেদাবাদ পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে তিনি আমাদের প্রয়োজনীয় খবরাখবর এনে দিলেন। ভদ্রলেক রমেশ যোশীর বৈমাত্রেয় ভাই উদয় যোশী। খুব ছেলেবেলায় রমেশ যোশীর মা মারা যান। রমেশই তাঁর একমাত্র সন্তান। স্ত্রীর অকালমৃত্যুর পর রমেশের বাবা অনেক বছর বিপত্নীক অবস্থায় দিন কাটান। অবশেষে প্রায় প্রৌঢ় বয়সে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। কিন্তু এই ভদ্রমহিলা রমেশকে তেমন সুনজরে দেখতেন না। সুযোগ পেলেই তাঁকে পীড়ন করতেন। অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে রমেশ একদিন বাড়ি ছেড়ে চলে যান। তারপর শুধুমাত্র নিজের চেষ্টায় ব্যবসা শুরু করে ক্রমে ক্রমে প্রচুর অর্থের মালিক হয়ে ওঠেন।

এদিকে রমেশের গৃহত্যাগের পর তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই উদয়ের জন্ম হয়। কিন্তু সে বরাবরই উড়নচণ্ডী স্বভাবের। মায়ের অন্ধ স্নেহই তার প্রধান কারণ। প্রথম যৌবনে পা দিতে না দিতেই সে কুসংসর্গে জড়িয়ে পড়ে। ফলে পৈতৃক সম্পত্তি যা পেয়েছিল দু'দিনেই তা নিঃশেষ হয়ে যায়। এই সময় এক তহবিল তছরুপের মামলায় জড়িয়ে পড়ে তার মাস দুয়েকের জেল হয়ে যায়। জেল থেকে খালাস পাবার পর সে আর আমেদাবাদে ফিরে আসেনি। ইতিমধ্যে তার মা গত হয়েছেন। বাবা মারা গিয়েছিলেন অনেকদিন আগে। তখনও পর্যন্ত সামান্য যা বিষয়সম্পত্তি অবশিষ্ট ছিল সে সমস্ত বিক্রি করে দিয়ে উদয় ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগল!

এইভাবে বছর আষ্টেক বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ানোর পর হঠাৎ একদিন তাকে আবার আমেদাবাদের পথে দেখা গেল। তখন তার প্রায় কপর্দকহীন অবস্থা। বন্ধু-বান্ধবদের কাছে চেয়েচিন্তে কোনোরকমে কয়েকটা দিন কাটল। কিন্তু এভাবে আর কতদিনই বা চলতে পারে। অবশেষে সকলে মিলে চাঁদা তুলে উদয়কে তার দাদার কাছে মিশরে পাঠিয়ে দিল। রমেশ যোশী তখন মিশরেই ছিলেন। অনেক আশা নিয়ে উদয় তার দাদার সঙ্গে দেখা করতে গেল, কিন্তু তার সে আশা সফল হয়নি। কিছুদিন বাদে দাদার নামে যাচ্ছেতাই গালাগাল দিতে দিতে আবার আমেদাবাদেই ফিরে এল সে। তার দাদা নাকি হাজার বছরের পুরনো কঙ্কালের পেছনে লাখ লাখ টাকা খরচ করে, কিন্তু তার একমাত্র ভাই মরলো না বাঁচলো সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। আমেদাবাদে ফিরে আসার পর পুরনো পাওনাদারদের জ্বালায় উদয় একবারে দিশেহারা হয়ে পড়ল। তার বন্ধুরাও তাকে আর তেমন পাত্তা দিত না। কোনোদিকে কোনো উপায় না দেখতে পেয়ে সে অগত্যা গলায় দড়ি দিয়ে সকল জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান ঘটায়। মৃত্যুর প্রাক্কালে একটা

চিঠিও সে লিখে রেখে গিয়েছিল। সে চিঠির ভাষাও কেমন অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে। মনে হয় শেষ সময় উদয় তার মানসিক ভারসাম্য একেবারে হারিয়ে ফেলেছিল। চিঠিতে সে নিজেকে একজন কুষ্ঠরোগী বলে উল্লেখ করেছে। তার মতো লোকের পক্ষে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই নাকি অনেক শ্রেয়।

আমি নিজে এই মিশর রহস্যের একটা থিওরি খাড়া করলাম। ব্যাপারটা এমন হলেও হতে পারে। ধরা যাক, উদয় তার বৈমাত্রেয় ভাইকে খুন করার জন্যে বিষপ্রয়োগ করেছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময় ডক্টর বিশ্বাসের মৃত্যু হয়। হতবুদ্ধি হয়ে উদয় তড়িঘড়ি আমেদাবাদে ফিরে এল। ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার দাদার মৃত্যুসংবাদও তার কাছে এসে পৌছল। সে যে কী করে এসেছে এবারে সেটা তার মগজে ঢুকল। তারপর থেকেই বেচারা মনে মনে বিমর্ষ হয়ে পড়ল এবং শেষকালে অনুশোচনার জ্বালা সইতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিল।

সিতাংশুকে আমার থিওরিটা ব্যাখ্যা করে বোঝালাম। ও-ও বেশ মন দিয়ে সমস্তটা শুনে গেল।

—সত্যিই তোমার চিন্তাধারার তুলনা মেলা ভার! এমনকি এটা সত্যিও হতে পারে। কিন্তু অজয়, একটা কথা তুমি দেখছি বেমালুম ভুলে মেরে দিয়েছ। তোমার কাহিনীতে সম্রাট মেনহেররার ভয়ঙ্কর অভিশাপের প্রভাবটাই উহ্য থেকে গেল।

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লাম—তুমিও তাহলে ওইসব উদ্ভট ভুতুড়ে গল্পে বিশ্বাস কর?

—আগে তো মিশর থেকে ঘুরে আসি। এসব প্রশ্ন তারপরে বিচার বিবেচনা করে দেখা যাবে।

।। ৩।।

হপ্তাখানেক পরের কথা। আমাদের পায়ের নিচে সোনা রঙের বালুরাশি, দু-চোখের দৃষ্টি জুড়ে দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমি। ক্রুদ্ধ সূর্যদেব মাথার ওপর অনর্গল অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করে চলেছেন। সিতাংশুর চেহারার যা হাল হয়েছে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ধুলোতে বালিতে গরমে বেচারা একবারে বিপর্যস্ত। এই ক'দিনে ও বোধহয় হাজার বার 'হায় ভগবান' বলে বিধাতার কাছে আক্ষেপ জানিয়েছে।

আমরা প্রথমে আলেকজান্দ্রিয়ায় এসে নেমেছিলাম। সেখান থেকে গাড়ি ধরে কায়রোয় হাজির হয়েছিলাম। তারপর সোজা প্যারামাউন্ট হোটেলে।

মিশরের রুক্ষ সৌন্দর্য আমার দু'চোখ ভরিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতির এমন রূপ জীবনে কখনও দেখিনি। তবে সিতাংশুকে ততটা বিমোহিত বলে বোধ হচ্ছে না। কোটপ্যান্ট পরে ও সারাক্ষণ যেমন ফিটফাট হয়ে থাকে এখনও তাই আছে। বাড়তির মধ্যে শুধু একটা ধুলো ঝাড়া ব্রাশ সর্বদা হাতে করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই একটি মাত্র অস্ত্রের সাহায্যেই ও যেন সংখ্যাহীন অদৃশ্য বালুকণার বিরুদ্ধে সারাক্ষণ একা একা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। মুখে-চোখেও ম্লান কালিমা ব্যাপ্ত হয়ে আছে।

—একবার আমার বুট জোড়ার দিকে তাকিয়ে দেখ! সিতাংশুর গলায় করুণ অভিযোগের সুর—চৌরঙ্গীর সেরা দোকান থেকে সবচেয়ে বেশি দাম দিয়ে নরম চামড়ার এই জুতো আমি কিনেছিলাম। আজ কী হাল হয়েছে তার!

—দূরে স্ফিংক্স-এর ওই বিরাট আধা সিংহী আধা মানবী প্রস্তরমূর্তিটার দিকে একবার চোখ তুলে তাকাও। সিতাংশুকে উৎসাহ দেবার জন্যে বললাম—পথশ্রমের সমস্ত কষ্ট দূর হয়ে যাবে। এখান থেকেই আমি ওকে ঘিরে যে রহস্য তার আভাস পাচ্ছি।

সিতাংশু বিরস দৃষ্টিতে সেই দিকে ফিরে তাকাল।—ওই বদখত পাথরটার মধ্যে এত কাব্যের গন্ধ কোথায় পেলে? ওর কণ্ঠে বেশ একটা ঝাঁঝের সুর ফুটে উঠল।

এবার আমারও রাগ চড়ে গেল। বললাম—জীবনভোর কেবল খুনে বদমাইশদের পেছন পেছন ঘুরে বেড়ালে, তুমি আবার সৌন্দর্যের মর্ম বুঝবে কি করে?

সিতাংশু সে কথার কোনো জবাব দিল না। একই রকম বিরক্তি ভরা দৃষ্টিতে সারি সারি পিরামিডের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বকে চলল—অবশ্য এদের মধ্যে যে একটা সুনির্দিষ্ট জ্যামিতিক আকৃতি আছে, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। প্রাচীনকালোর এইসব ইঞ্জিনীয়ারদের কারিগরি বিদ্যার প্রশংসা

করতেই হয়। কিন্তু জমিটা উঁচুনিচু হওয়ার ফলে পুরো জিনিসটাকেই খুব দৃষ্টিকটু করে তুলেছে। আবার এই পামগাছগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখ, এদের বিন্যাসপদ্ধতির মধ্যে সুচিন্তিত সংহতির একান্তই অভাব। এলোমেলো খাপছাড়াভাবে এখানে-ওখানে গজিয়ে উঠেছে।

সিতাংশুর ক্লান্তিকর হা-হুতাশ থামিয়ে দেবার জন্যে বললাম—চল, এবার প্রকৃত গন্তব্যস্থলের দিকে যাত্রা করা যাক। রথ প্রস্তুত।

হোটেল প্যারামাউন্ট থেকে বাকি পথটা উটের পিঠে যাব। উটগুলোও যথোচিত ভদ্রতা সহকারে আমাদের অপেক্ষায় তপ্ত বালির ওপর উপুড় হয়ে বসে আছে। ক'জন স্থানীয় বালক তাদের পরিচর্যায় ব্যস্ত।

এতক্ষণ সিতাংশু তবু কোনোরকমে নিজেকে সংযত করে রেখেছিল, কিন্তু উটের পিঠে ওঠবার পর তাকে আর কোনোমতে ধরে রাখা গেল না। তার উৎকণ্ঠা আর হা-হুতাশ মাঝে মাঝে আতঙ্কিত চিৎকারে পর্যবসিত হলো।

অবশেষে আমরা অভীষ্ট জায়গায় এসে পৌঁছলাম। রোদে পোড়া তামাটে রঙের এক ভদ্রলোক আমাদের দেখে সামনে এগিয়ে এলেন। তাঁর পরনে সাদা প্যান্ট, মাথায় সোলার টুপি।

—আপনারা নিশ্চয় মিঃ মুখার্জী আর মিঃ বোস? আপনাদের তার আমরা যথাসময়েই পেয়েছিলাম। কিন্তু এখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ায় আমাদের কারুর পক্ষে কায়রোয় উপস্থিত থাকা সম্ভব হয়নি।

সিতাংশুর মুখচোখ পলকে বিবর্ণ হয়ে উঠল। কোটের পকেট থেকে সবেমাত্র ধুলো-ঝাড়া ব্রাশটা বার করেছিল, সেটা তার হাতের মধ্যেই ধরা রইল।

—আপনি নিশ্চয় আমাদের কোনো মৃত্যুসংবাদ দিচ্ছেন না?

ভদ্রলোক ম্লান মুখে মাথা নাড়লেন—হ্যাঁ, মৃত্যুই!

আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। শঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম—জয়ন্ত বিশ্বাস কি মারা গেছে?

—না। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কর্মচারী মিঃ ডেভিড উইলিয়াম।

—মৃত্যুর কারণ? সিতাংশুর গলার স্বর ঘন গম্ভীর।

—ধনুষ্টঙ্কার।

হঠাৎই আমার যেন দম বন্ধ হয়ে এল। নিজের চারপাশে এক অশুভ কালো ছায়া দেখতে পেলাম।

সিতাংশুর অবস্থাও ঠিক আমার মতো। পুরনো অভ্যাস বশে মৃদুস্বরে বিড়বিড় করল—কিছুই যে ছাই বুঝে ওঠা যাচ্ছে না! কী সাংঘাতিক ব্যাপার! মিঃ উইলিয়াম যে ধনুষ্টঙ্কারেই মারা গেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই তো? শেষের কথাগুলো আগন্তুক ভদ্রলোককে উদ্দেশ্য করে বলা।

—না, কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। ডাঃ অগস্তির কাছে গেলেই সমস্ত কিছু জানতে পারবেন।

—আপনি তাহলে ডাক্তার নন?

—আমি বিশ্বনাথন।

শ্রীমতী বিশ্বাসের কাছে বিশ্বনাথনের নাম আগেই শুনেছিলাম। ভদ্রলোককে দেখে মাদ্রাজী বলে বোঝা যায় না। দীর্ঘ ঋজু চেহারা। তার মধ্যে একটা কোমল ভাব আছে যা সহজেই মনকে আকৃষ্ট করে।

—আপনারা আমার সঙ্গে আসুন। তিনি আমাদের আহ্বান জানালেন—জুনিয়ার বিশ্বাস আপনাদের জন্যেই ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছে।

বিশ্বনাথনকে অনুসরণ করে আমরা একটা বড় তাঁবুর মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম। তিনজন ভদ্রলোক কোনো বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করছিলেন। একজনের বয়স খুবই কম। চব্বিশ-পঁচিশের মধ্যেই।

বিশ্বনাথন সকলের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন—মিঃ মুখার্জী এবং মিঃ বোস।

অল্পবয়স্ক যুবকটি দৌড়ে এসে আমাদের অভিনন্দন জানাবার জন্যে হাত বাড়াল। ছেলেটির উচ্ছ্বাসপ্রবণতা ওর মায়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। চেহারাটা এখনও আর দুজন সঙ্গীর মতো ততটা

রোদে-পোড়া হয়নি, কিন্তু দু'চোখে গভীর হতাশার ছাপ। সারা মুখ উৎকণ্ঠায় পাণ্ডুর। তার ফলেই বয়সটা যেন অনেকখানি বেড়ে গেছে মনে হচ্ছে। জয়ন্ত বিশ্বাস যে মানসিক দিক থেকে খুবই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে সেটা বুঝে নিতে কোনো অসুবিধে হয় না।

বিশ্বনাথনের মাধ্যমে অপর দুই ভদ্রলোকের সঙ্গেও আমাদের পরিচয় হলো। একজন ডাক্তার অগস্তি। বয়স আন্দাজ চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হবে। মাথার চুলগুলো সামান্য কোঁকড়ানো। অন্যজন সাতাশ-আঠাশ বছরের যুবক, সেক্রেটারী মিঃ ভাটিয়া।

।। ৪।।

কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা চালাবার পর মিঃ বিশ্বনাথন ও মিঃ ভাটিয়া তখনকার মতো বিদায় নিলেন। তাঁবুর মধ্যে কেবল আমরা চারজন। আমি, সিতাংশু, জয়ন্ত এবং ডাক্তার অগস্তি।

—আপনি আমায় যে কোনো প্রশ্ন করুন, মিঃ মুখার্জী। ম্লান মুখে জয়ন্ত বলল—দুর্ঘটনার ধারাবাহিকতায় আমরা সকলেই ভীষণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি। সমগ্র কাণ্ডকারখানা এতই অবিশ্বাস্য.....

তার কথায় সুরে ভয় পাওয়া, ভেঙে পড়া ভাব। লক্ষ্য করে দেখলাম সিতাংশুর অনুসন্ধানী দৃষ্টি স্থিরভাবে তাকে নিরীক্ষণ করছে।

—তুমি কি এর পরেও এই গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে আগ্রহী?

জয়ন্ত বিশ্বাসের চোখ-মুখ মুহূর্তে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল—হ্যাঁ, নিশ্চয়! কোনো বাধা-বিপত্তিকেই গ্রাহ্য করব না। তা সে অদৃষ্টে যত দুর্ভোগই থাকুক না কেন।

সিতাংশু এবার দ্বিতীয়জনকে প্রশ্ন করল—এ বিষয়ে আপনার কী অভিমত, ডাক্তার অগস্তি?

ভদ্রলোক উত্তর দিতে কিছুটা ইতস্তত করলেন—আমারও ছেড়ে যাবার কোনো ইচ্ছে নেই।

সিতাংশু তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে ঈষৎ ভ্রূ কোঁচকালো। যেন আপন মনে কোনো কিছু চিন্তা করছে। অবশেষে ধীরে ধীরে মুখ তুলল—তাহলে এখন আমাদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে, বর্তমানের এই পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির কথা ঠিকভাবে বিচার-বিবেচনা করে দেখা। আচ্ছা, মিঃ উইলিয়াম কবে মারা গেছেন?

—দু'দিন আগে, গত বুধবারে।

—তাঁর যে ধনুষ্টঙ্কার হয়েছিল, এ ব্যাপারে আপনি কি পুরোপুরি নিশ্চিত?

—অবশ্যই।

—নাক্সভোমিকার বীজ থেকে স্ট্রিকনাইন নামে যে বিষ পাওয়া যায়, এখানে সে রকম কিছু ঘটেনি তো? মানবদেহে দুটোর লক্ষণই কিন্তু অনেকটা একই ধরনের।

—না, মিঃ মুখার্জী। আপনি যা বলতে চাইছেন আমি বুঝতে পারছি। তবে এটা নিশ্চিতভাবেই ধনুষ্টঙ্কার।

—আপনি কি অ্যান্টিসিরাম ইঞ্জেকশন দিয়েছিলেন?

—দিয়েছিলাম—সবরকম ভাবেই চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু.....

—অ্যান্টিসিরাম কি আপনার সঙ্গেই থাকে?

—না। লোক পাঠিয়ে কায়রো থেকে আনাতে হয়েছিল।

—ইতিপূর্বে এখানে কি আর কোনো ধনুষ্টঙ্কারের কেস আপনার হাতে এসেছে?

—না, একটাও না। জোরের সঙ্গে মাথা নাড়লেন ডাক্তার অগস্তি।

—আর একটা প্রশ্ন। মিঃ রমেশ যোশী যে ধনুষ্টঙ্কারে আক্রান্ত হয়ে মারা যাননি, সে বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই তো?

—সন্দেহের লেশমাত্র অবকাশ নেই। দুর্ভাগ্যক্রমে মিঃ যোশীর বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা ছুরিতে কেটে যায়। একটা পেন্সিল কাটতে গিয়েই ঘটনাটা ঘটেছিল। ভদ্রলোক তখন তেমন নজর দেননি। সেখান থেকেই কেমন করে সেপটিক হয়ে যায়। অবশ্য সাধারণ দৃষ্টিতে দুটোই একই রকম বলে মনে হতে পারে।

—তাহলে দেখা যাচ্ছে, মিঃ উইলিয়ামকে নিয়ে আমরা পরপর চারটে মৃত্যুর সম্মুখীন হলাম। এবং প্রত্যেকেরই মৃত্যুর কারণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। একজন হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেলেন। রক্ত বিষাক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে দ্বিতীয়জনের মৃত্যু ঘটল। তৃতীয়জন আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন এবং চতুর্থজনের মৃত্যুর কারণ ধনুষ্টঙ্কার.....

ডাক্তার অগস্তি কথা না বলে নিরাসক্ত ভঙ্গিতে ঘাড় দোলালেন।

—এই চারজনের মৃত্যুর মধ্যে কি কোনো যোগসূত্র আছে বলে মনে করেন?

—আপনার বক্তব্য ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

—আমি বলতে চাই এই চারজন কি এমন কোনো কাজ করেছিলেন, যার ফলে সম্রাট মেনহেররার আত্মা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে পারে?

অগস্তি বড়বড় চোখ তুলে সিতাংশুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন—আপনি কি সত্যিই ভেবেচিন্তে প্রশ্ন করছেন, মিঃ মুখার্জী? মনে হচ্ছে খবরের কাগজের গাঁজাখুরি গল্পকথা আপনার মাথার মধ্যেও বেশ জেঁকে বসেছে!

জয়ন্ত বিশ্বাসও এই সমস্ত গালগল্প সম্পর্কে বিড়বিড় করে কী একটা বিরূপ মন্তব্য করল। সিতাংশুর কিন্তু কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কে কী ভাবল না-ভাবল তাতে যেন তার কিছু যায় আসে না। দু'চোখে আগের মতোই নির্বিকার দৃষ্টি।

—তাহলে ডাক্তার অগস্তি, আপনি এই কিংবদন্তী আদৌ বিশ্বাস করেন না?

—না মশাই, ওসব ভূতপ্রেতে আমার বিশ্বাস নেই। আমি আধুনিক বিজ্ঞানের ছাত্র। প্রত্যক্ষ প্রমাণের বাইরে কোনো কিছুই স্বীকার করি না।

—প্রাচীন মিশরে কি কোনো বিজ্ঞান ছিল না?

নির্দিষ্ট কোনো উত্তরের প্রত্যাশা না করেই স্বগতোক্তির মতো প্রশ্নটা উচ্চারণ করল সিতাংশু। মুখ দেখে মনে হলো ডাক্তার অগস্তি কিঞ্চিৎ হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছেন। সিতাংশু তাঁকে আশ্বস্ত করার জন্যে মৃদু হেসে বলল—না.....না, আমি কোনো উত্তর চাইছি না। আর একটা কথা, এখানে স্থানীয় অধিবাসী যারা কাজ করত এ বিষয়ে তাদের কী ধারণা?

—যেখানে সভ্য মানুষেরাই এতখানি শঙ্কিত হয়ে উঠেছে, সেখানে নিরক্ষর অধিবাসীরাও যে কুসংস্কারকেই আঁকড়ে ধরবে তাতে আর আশ্চর্যের কী আছে! তারা সকলেই বড় বেশি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত তাদের কোনো বিপদ-আপদ দেখা দেয়নি বলেই কোনোরকমে শান্ত হয়ে আছে। একবার কিছু একটা ঘটলেই সঙ্গে সঙ্গে কর্পূরের মতো দল বেঁধে হাওয়া হয়ে যাবে।

—হুঁ, বিষয়টা ভাল করে ভেবে দেখার মতো। মৃদুকণ্ঠে বিড়বিড় করল সিতাংশু।

—আপনি নিশ্চয় এই সমস্ত আজগুবি গল্প বিশ্বাস করেন না? জয়ন্ত বিশ্বাস জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সিতাংশুর দিকে ফিরে তাকাল—আর এ জাতীয় কুসংস্কারকে মনে স্থান দিলে প্রাচীন মিশরের অনেক ঐতিহাসিক তথ্যই আমাদের কাছে চির অজ্ঞাত থেকে যাবে।

সিতাংশু এ প্রশ্নের সোজাসুজি কোনো জবাব দিল না। তার বদলে কোটের পকেট থেকে ছোট সাইজের একটা জরাজীর্ণ বই বার করে সামনের টেবিলের ওপর রাখল। ঘাড় ঝুঁকিয়ে দেখলাম, বইটার নাম 'প্রাচীন মিশরের মন্ত্রতন্ত্র ও গুপ্তবিদ্যা'। বইটা হাতে নিয়ে গম্ভীরভাবে ঘাড় দোলাতে দোলাতে তাঁবু ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গেল সিতাংশু।

ডাক্তার অগস্তি সিতাংশুর চলে যাওয়া পথের দিকে কিছুক্ষণ অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

—ভদ্রলোকের মতলবখানা কী?

এতবার সিতাংশুর মুখ থেকে নানান পরিবেশে এই কথাটা শুনেছি যে অপরের মুখে কথাটা শুনে মনে মনে হাসি পেল। সে ভাব দমন করে বিব্রত কণ্ঠে বললাম—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে মনে হচ্ছে বিদেহী আত্মার অশুভ প্রভাব এড়াবার জন্যে কোনো উপায় অন্বেষণ করছে।

সিতাংশুর খোঁজে তাঁবুর বাইরে বেরুলাম। দেখলাম ও সেক্রেটারী সঞ্জয় ভাটিয়ার সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যস্ত। একটু এগিয়ে যেতেই ভাটিয়ার গলার স্বর শোনা গেল। ভদ্রলোক বলছিলেন—আমি মাত্র দু' মাস হলো এই অভিযানের সঙ্গে যুক্ত আছি। হ্যাঁ, মিঃ যোশীর সম্পর্কে অনেক খবরই আমি জানি।

—তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই উদয় যোশীর বিষয়ে কিছু বলতে পারেন?

—ভদ্রলোককে একদিন মাত্র দেখেছিলাম। এক শনিবার দুপুরবেলা তিনি এখানে এসে হাজির হন। নাম বললেন উদয় যোশী। চেহারাটা মন্দ নয়, তবে শরীরের ওপর যে অনেক অন্যায় অত্যাচার চালিয়েছেন সেটা একবার দেখলেই বোঝা যায়। কেমন যেন পোড় খাওয়া, শুকনো ধরনের। আমার সঙ্গে ইতিপূর্বে ভদ্রলোকের কোনো পরিচয় না থাকলেও ডাক্তার অগস্তি বোধহয় উদয়বাবুকে আগে থেকেই চিনতেন। কিন্তু মিঃ রমেশ যোশী ভদ্রলোকের নাম শুনেই রেগে আগুন হয়ে গেলেন। তাঁকে একরকম তাড়িয়েই দিলেন তাঁবু থেকে। বললেন, তোমাকে তো আমি এক কপর্দকও দেব না, এমন কি আমার মৃত্যুর পরেও তুমি আমার বিষয়-সম্পত্তির ছিটেফোঁটাও যাতে না পাও সে ব্যবস্থাও আমি করে যাব। এই অভিযানের পেছনেই আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি দান করব। এ বিষয়ে একটা পাকা বন্দোবস্ত করে ফেলার জন্যে এখনই ডঃ বিশ্বাসকে আমি ডেকে পাঠাচ্ছি।.....এই ধরনের আরও অনেক গরম গরম কথাবার্তা বললেন। তারপর উদয়বাবু আর বৃথা কালক্ষেপ না করে পত্রপাঠ সেখান থেকে দেশে ফিরে গেলেন।

—ভদ্রলোক কি তখন বেশ সুস্থ শরীরেই ছিলেন?

—মিঃ রমেশ যোশীর কথা বলছেন?

—না, আমি তাঁর ভাই উদয় যোশীর কথা বলছি।

—ভদ্রলোক কথা প্রসঙ্গে একবার তাঁর নিজের কী এক অসুখের কথা বলেছিলেন। তবে সেটা নিশ্চয় তেমন মারাত্মক কিছু নয়। তা হলে আমার মনে থাকত।

—রমেশ যোশী কি কোনো উইল করে গিয়েছিলেন?

—আমি যতদূর জানি, তিনি কোনো উইল রেখে যাননি।

সিতাংশুকে কিছুটা চিন্তান্বিত মনে হলো—মিঃ ভাটিয়া, আপনার নিজের অভিপ্রায়টা কি? আপনিও কি এই অভিযানের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত যুক্ত থেকে যাবেন বলে মনস্থ করেছেন?

—না না, যত শীগগির সম্ভব আমি পাটনায় ফিরে যেতে চাই। পা বাড়িয়ে বসে আছি বলতে পারেন। এখানকার ঝামেলাটুকু মিটিয়ে ফেলতে যা বাকি। মেনহেররার রক্ততৃষার শিকার আমি হতে চাই না। পকেট থেকে রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছলেন ভদ্রলোক।

সিতাংশুর মুখে-চোখে হাসির আভাস পেলাম।

—মনে রাখবেন, মেনহেররার বিষ নিঃশ্বাস সুদূর আমেদাবাদেও গিয়ে পৌঁছেছে!

ভাটিয়া হঠাৎ ভীষণভাবে চমকে উঠলেন। বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে সিতাংশুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন স্থিরভাবে। দু'চোখে ভয়াল আতঙ্কের ছাপ।

—ভদ্রলোক সত্যিই খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। আমার সঙ্গে যেতে যেতে মৃদু গলায় মন্তব্য করল সিতাংশু।

সিতাংশুর মুখের দিকে ফিরে তাকালাম। কিন্তু ওর গোবেচারী হাসির আড়ালে কী রহস্য লুকিয়ে আছে তার কোনো হদিশ খুঁজে পেলাম না।

।।৫।।

জয়ন্ত আমাদের পথ দেখিয়ে মূল সমাধিমন্দিরে নিয়ে গেল। মিঃ বিশ্বনাথনও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। ঐতিহাসিক গবেষণার পক্ষে অমূল্য দ্রব্যগুলি আগেই কায়রোতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট যা পড়ে আছে তার মূল্যও নেহাৎ কম নয়। অষ্টম শতাব্দীর কারুকার্য করা আসবাবপত্রের দিকে তাকিয়ে দেখলে বিস্ময়ে চোখ ভরে ওঠে।

সিতাংশু ঘুরে ঘুরে সবকিছু খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। তবে ওর চোখে কোনো বিস্ময়ের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করলাম না। ভাবভঙ্গি কেমন নিস্পৃহ।

ঘণ্টাখানেক বাদে আমরা আবার আমাদের তাঁবুতে ফিরে এলাম। আমাদের দুজনের জন্যে একটা বড় তাঁবুর ব্যবস্থা করা হয়েছে। নৈশভোজে যোগ দেবার জন্যে হাত-মুখ ধুয়ে আমাদের প্রস্তুত হয়ে নিতে বলল জয়ন্ত। তাঁবুর মধ্যে একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সিতাংশুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছিলাম, এমন সময় পর্দা সরিয়ে কালোরঙের দশাসই চেহারার এক পুরুষ আমাদের সামনে এসে খাঁটি আরবীয় কায়দায় ঘাড় ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানাল।

সিতাংশু তাকে খুঁটিয়ে দেখে নিল—তোমার নাম কি হাসান!

—হ্যাঁ, হুজুর, আমি আগে বড়বাবুকে দেখাশুনা করতাম। এখন তাঁর ছেলের তদারকি করি।

লোকটা আমাদের আরও কাছে সরে এসে গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল—শুনলাম আপনারা জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত ব্যক্তি। ভূতপ্রেত তাড়াবার মন্ত্রতন্ত্র সব আপনাদের জানা আছে। দয়া করে ছোটবাবুকে বুঝিয়ে বলুন, এ জায়গাটা মোটেই ভাল নয়। যত তাড়াতাড়ি এখান থেকে ফিরে যাওয়া যায় ততই ভাল।

তারপর আর কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করে পেছন ফিরে দ্রুত পায়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। দেখে মনে হয় যেন ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল লোকটা।

—সত্যিই বাতাসে একটু অশুভ গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে! হেঁয়ালী ভরা গলায় বিড়বিড় করল সিতাংশু —আমি নিজেও তার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারছি।

।। ৬।।

আমাদের সেদিনের নৈশভোজটা খুব একটা আনন্দপূর্ণ হলো না। একমাত্র মিঃ বিশ্বনাথন কথায় বার্তায় কোনোরকমে আসরটা জমিয়ে রাখার চেষ্টা করলেন। আলোচনাটা চলছিল প্রাচীন মিশরের ঐতিহাসিক উপাদানের প্রসঙ্গ নিয়ে। মিশরীয় দস্যুরা যে কত মূল্যবান ঐতিহাসিক নথিপত্রের ক্ষতিসাধন করে গেছে ডাক্তার অগস্তি সে সম্পর্কে দু-চার কথা বললেন। কথায় কথায় অনিবার্যভাবে অভিশপ্ত মমিদের প্রসঙ্গও এসে পড়ল। সিতাংশুই যেন ইচ্ছে করে টেনে আনল প্রসঙ্গটা। কিন্তু সকলেই দেখলাম বিষয়টা এড়িয়ে যেতে চাইছে। তাই আলোচনাটা আর বেশিদূর এগোলো না।

ভোজনপর্ব সমাধা করে আমরা যখন যে যার নিজের তাঁবুতে ফেরার উপক্রম করছি, জয়ন্ত হঠাৎ সিতাংশুর হাত ধরে একদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাল। আমরাও সকলে সেদিকে ফিরে তাকালাম। আবছা অন্ধকারের মধ্যে একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি সারিসারি তাঁবুর পাশ দিয়ে চকিতে দেখা দিয়েই আবার হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। ছায়ামূর্তির মাথাটা যে অবিকল কুকুরের মতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সমাধিমন্দিরের দেওয়ালের গায়ে এই ধরনের হাতে আঁকা ছবি ইতিপূর্বেই দু-চারটে দেখেছিলাম।

—হায় ভগবান! মৃদু কণ্ঠে ফিসফিস করল সিতাংশু—অ্যামিবাস.....প্রেতলোকের দেবতা!

—কেউ বোধহয় আমাদের সঙ্গে তামাশা করছে! ডাক্তার অগস্তি চাপা কণ্ঠে গর্জন করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

—মিঃ ভাটিয়া, ছায়ামূর্তিটা যেন আপনার তাঁবুর দিকেই গেল না? অসহায় ভঙ্গিতে হাত নাড়ল জয়ন্ত।

—না। সিতাংশু মাথা নেড়ে প্রতিবাদ জানাল—ডাক্তার অগস্তির তাঁবুর দিকে।

ডাক্তার অগস্তি কিছুক্ষণ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে সিতাংশুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বিশ্বনাথনের দিকে ফিরে তাকিয়ে নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করলেন—নিশ্চয় কেউ আমাদের সঙ্গে তামাশা করছে! চলুন, ব্যাটাকে ধরা যাক।

বিশ্বনাথন কী করা উচিত তাই ভাবছেন, কিন্তু অগস্তি আর দাঁড়ালেন না। দৃঢ় পায়ে অন্ধকারের মধ্যে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। এভাবে চুপচাপ ভীরুর মতো দাঁড়িয়ে থাকাটা আমার নিজের কাছে

কেমন কাপুরুষতার পরিচয় বলে মনে হলো। আমিও ডাক্তারকে অনুসরণ করে দৌড়ে গেলাম। সকলে উপস্থিত থাকতে ভদ্রলোক বিপদে পড়বেন, সেটা কোনোমতেই ঘটতে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু সমস্ত অনুসন্ধান বৃথা হলো। ক্ষণপূর্বে দেখা সেই ছায়ামূর্তির কোনো হদিশ খুঁজে পেলাম না। আমাদের চোখের সামনে দিয়েই সেটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। খানিকটা ভারাক্রান্ত মন নিয়েই তাঁবুতে ফিরে এলাম। একটা অস্বাভাবিক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি যেন চারদিক থেকে আমাদের ঘিরে ধরতে চাইছে। অজানা আশঙ্কায় ছমছম করছে বুকের ভেতরটা। কী যে ঘটতে চলেছে ঠিক বুঝে ওঠা যাচ্ছে না।

তাঁবুতে ফিরে এসে দেখি সিতাংশু তার শারীরিক নিরাপত্তার জন্যে ইতিমধ্যে এক কাণ্ড বাধিয়ে বসে আছে। সবটা ওর নিজস্ব পদ্ধতি। হাঁটু গেড়ে বসে তাঁবুর চারপাশে বালির ওপর নানারকম আঁকিবুকি কাটতে শুরু করেছে। ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, পঞ্চভুজ, মাঝে মাঝে পাঁচ-সাত কোণ বিশিষ্ট তারকা চিহ্ন। এই ধরনের আরও অসংখ্য ছবি। সঙ্গে সঙ্গে বিড়বিড় করে মন্ত্র বলে চলেছে এক নাগাড়ে। কী করে অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করা যায় সে সম্পর্কে প্রাচীন পুঁথিপত্রে যে সমস্ত ফলপ্রসূ পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করা আছে তারই নানান ফিরিস্তি।

মিঃ বিশ্বনাথন নিজের অন্তরের রাগকে আর কিছুতে চেপে রাখতে পারলেন না। আমার হাত ধরে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে বেশ উত্তেজিত ভঙ্গিতে বললেন—ভদ্রলোক যে এতটা নির্বোধ সেটা আগে ধারণা করতে পারিনি। অথচ এমন ভাব দেখান যেন সব বিষয়েই অগাধ পাণ্ডিত্য। মধ্য যুগে প্রচলিত মন্ত্র-তন্ত্রের সঙ্গে যে প্রাচীন মিশরের অলৌকিক যাদুবিদ্যা চর্চার অনেক তফাৎ, এই সাধারণ জ্ঞানটুকুও তাঁর নেই।

বিশ্বনাথনকে কোনোরকমে শান্ত করে তাঁবুতে ফিরে এলাম। সিতাংশু তখন খুশির জোয়ারে উপচে উঠছে। চোখে-মুখে প্রশান্তির স্নিগ্ধ আমেজ—আর কোনো ভয় নেই, অজয়। তুমি এখন নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতে পার। আমার খানিকটা গভীর ঘুমের প্রয়োজন। সারাদিনের প্রচণ্ড গরমে মাথাটা ভীষণ ধরে গেছে। শেষবারের কফিটা আনতে কেন যে এত দেরি করছে.....

সিতাংশুর প্রার্থনা শুনেই বোধহয় ধূমায়িত পেয়ালা হাতে হাসান ভেতরে ঢুকল। গরম কফির মধুর সৌরভ আমারও নাকে এসে লাগল। রাতে শোবার আগে এক কাপ কফি পান করা সিতাংশুর বরাবরের অভ্যাস। এর ফলে নাকি ঘুমের মধ্যেও ওর ব্রেন বেশ ভাল কাজ করে। অনেক দুরূহ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান খুঁজে পায়। আমাকেও এক পেয়ালা দেবে কিনা জানতে চাইল হাসান। আমি মানা করে দিলাম। দেশী প্রথায় অভিবাদন জানিয়ে হাসান বিদায় নিল। কফির পাট চুকলে পোশাক পাল্টে শুয়ে পড়ার জন্যে প্রস্তুত হলাম। সারাদিনের ক্লান্তি শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জমা হয়ে আছে। চোখের পাতা দুটোও সীসের মতো ভারী হয়ে উঠেছে। তবু শোবার আগে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম এক ঝলক। রাতের মরুভূমির অদ্ভুত সৌন্দর্য দেখে প্রাণটা পুলকিত হয়ে উঠল। নীল তারার ফুলকি সারা আকাশে ছেয়ে আছে। নিচে দিগন্তবিস্তৃত বালুরাশি।

—কী অপূর্ব দৃশ্য! সিতাংশুকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি—আবার এই রহস্যটার মধ্যেও একটা অভূতপূর্ব মাদকতা জড়িয়ে আছে। অতীত ইতিহাসের স্বপ্নমদির ধূসর গন্ধ ছড়ানো। মরুভূমির এই রুক্ষ বালুরাশির মধ্যেই বিরাট এক সভ্যতার উত্থান-পতন ঘটে গেছে। সমস্ত দৃশ্যটা একবার চোখ বুজে কল্পনা করে দেখ!

সিতাংশুর দিক থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। ঈষৎ বিরক্তির দৃষ্টিতে ফিরে তাকালাম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্পর্কে ওর এই অনীহা আমার কাছে খুবই দৃষ্টিকটু ঠেকে। কিন্তু ব্যাপার দেখে হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল। সিতাংশু সোফার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে আছে। সারা মুখে তীব্র যন্ত্রণার চিহ্ন। ওর পাশেই শূন্য কফির পেয়ালা।

—ডাক্তার অগস্তি! ডাক্তার অগস্তি! তাড়াতাড়ি একবার এদিকে আসুন। আমার গলা দিয়ে একটা আতঙ্কিত চিৎকার বেরিয়ে এল।

হন্তদন্ত হয়ে অগস্তি ছুটে এলেন—কী ব্যাপার?

—আমার বন্ধু হঠাৎ ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বোধহয় মারা যাচ্ছে! ওই কফিটা থেকেই এমন সর্বনাশ ঘটেছে। হাসান.....হাসানই দিয়ে গেল কফিটা। নিশ্চয় কোনো মারাত্মক বিষ মিশিয়ে দিয়েছে পেয়ালার মধ্যে। ও যেন কোনোরকমে পালাতে না পারে।

—তবে ভাগ্য ভাল, কফিটা আমি শেষ পর্যন্ত পান করিনি। কার শীতল কণ্ঠস্বর মধুর মতো কানে এসে বাজলো। দুজনে অবাক চোখে ঘুরে দাঁড়ালাম। চোখ মিটমিট করতে করতে ধীরে ধীরে সোফার ওপর উঠে বসেছে সিতাংশু। ওর ঠোঁটের আগায় সবজান্তার সূক্ষ্ম হাসি।

—না, ওই বিষাক্ত কফি আমি পান করিনি। স্বভাবসুলভ মৃদু গলায় সিতাংশু বলে চলল—আমার বন্ধু অজয় যখন রূপসী রাত্রির মোহিনী মায়ায় বিভোর হয়ে পড়েছিল, সেই সুযোগে গলায় না ঢেলে কফিটা আমি একটা ফ্লাস্কে ঢেলে রেখেছি। কাল সকালে ওটা পরীক্ষার জন্যে কেমিস্টের কাছে পাঠানো হবে।

ডাক্তার অগস্তি হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ার ভঙ্গিতে সিতাংশুর দিকে এগিয়ে এলেন। কিন্তু সিতাংশুর মধ্যে কোনো ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না। এমনটা যে ঘটবে ও যেন আগে থেকেই অনুমান করে রেখেছে। ধীর শান্ত স্বরে বলল—আপনি একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি, কেন মিথ্যে ঝামেলা পাকাবার চেষ্টা করছেন! ইতিমধ্যেই ফ্লাস্কটা আমি নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে রেখেছি। এখন হাজার চেষ্টা করেও কোনো লাভ হবে না, শুধু পরিশ্রমই সার হবে।.....আরে আরে! এ কী করছেন! অজয়, ভদ্রলোককে আটকাও।

সিতাংশুর উৎকণ্ঠাকে ভুল বুঝলাম। ভাবলাম সত্যি সত্যিই ডাক্তার অগস্তি হয়তো সিতাংশুকে আক্রমণ করতে যাচ্ছেন। তাই তাকে বাঁচাবার জন্যে এগিয়ে গেলাম। সেই ফাঁকে ভদ্রলোক দ্রুতপায়ে পিছিয়ে এসে পকেট থেকে একটা সাদা ট্যাবলেট বার করে মুখের মধ্যে পুরে দিলেন। অ্যাসিডের উগ্র গন্ধে তাঁবুটা ভরে উঠল। পরমুহূর্তেই তিনি কাটা কলাগাছের মতো মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

—মেনহেররার আর এক শিকার! তবে এই শেষ। সিতাংশুর গলায় গভীর বিষাদের সুর—বোধহয় এই ভাবে শেষ হওয়াটাই সবচেয়ে ভাল হলো। নিজের হাতে তিন তিনটে খুন করেছেন ভদ্রলোক।

।। ৭।।

—এ সমস্তই তাহলে ডাক্তার অগস্তির কীর্তি? কথা হারিয়ে আমতা আমতা করতে লাগলাম আমি—কিন্তু তুমি যে বলেছিলে কোনো অশুভ শক্তির প্রভাব?

—আমাকে ভুল বুঝো না বন্ধু। মানুষের মনে অশুভ শক্তির ভয়াবহ প্রভাবের কথাই আমি বলতে চেয়েছিলাম। একবার যদি দু-একটা মৃত্যুর পশ্চাতে অশুভ শক্তির প্রভাবের কথা রটিয়ে দেওয়া যায় তাহলেই কেল্লা ফতে। তারপর কোনো লোককে দিনের আলোতে খুন করলেও সাধারণে তার মধ্যে অলৌকিক শক্তির গোপন প্রভাব খুঁজে বেড়াবে। ডক্টর দীপঙ্কর বিশ্বাসের আকস্মিক মৃত্যুর পর মেনহেররার অভিশাপ নিয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় মৃদু গুঞ্জন শুরু হলো। এই ফাঁকে ডাক্তার অগস্তিও হঠাৎ ধনবান হয়ে ওঠার একটা সুযোগ খুঁজে পেলেন। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি দীপঙ্কর বিশ্বাসের মৃত্যুতে বাইরের কেউ বিশেষ লাভবান হচ্ছে না। তবে রমেশ যোশীর কথা আলাদা। ভদ্রলোক অগাধ ঐশ্বর্যের মালিক। তারা ওপর অকৃতদার। আমেদাবাদ পুলিশ উদয় যোশীর যে বৃত্তান্ত আমাদের কাছে পাঠিয়েছিল তার মধ্যে কতকগুলো বিষয় ভাল করে ভেবে দেখার মতো। তার দাদা রমেশ যোশীর সঙ্গে তার সদ্ভাব ছিল না। তাহলে উদয় কোন সাহসে এতটা পথ পাড়ি দিয়ে মিশরে এসে উপস্থিত হয়েছিল? এখানে নিশ্চয় তার বৈমাত্রেয় দাদা ছাড়া এমন কেউ ছিল যার কাছে সে কিছু সাহায্য পাবার আশা রাখত। রমেশ যোশী তাঁর ভাইকে এক কপর্দকও সাহায্য করেননি। তাঁর ভাইয়ের হাতে বাড়তি কোনো টাকাকড়িও ছিল না। তাহলে সে মিশর থেকে দেশে ফিরে যাবার ভাড়া যোগাড় করল কোথা থেকে? মিঃ ভাটিয়ার কাছে জানতে পারলাম ডাক্তার অগস্তির সঙ্গে আগে থেকেই তার কিছুটা আলাপ-পরিচয় ছিল। তখন থেকেই রহস্যটা ফিকে হতে শুরু করল ক্রমে ক্রমে।

—কিন্তু তোমার ব্যাখ্যাটা যেন বড় বেশি কষ্টকল্পিত ! বড় বেশি সামঞ্জস্যহীন!

—এত উতলা হোয়ো না বন্ধু। সিতাংশু হাত নেড়ে আমায় থামিয়ে দিল—হালকা সুরে আমরা এমন অনেক কথাই বলে থাকি অপরে যার সুনির্দিষ্ট অর্থ ধরে নেয়। আবার এর উল্টোটাও ঘটে থাকে। গভীর কথা অনেক সময় হালকা ভাবে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা চলে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয়টাই ঘটেছে। উদয় যোশী তার মৃত্যুকালীন চিঠিতে নিজেকে একজন কুষ্ঠরুগী হিসেবে উল্লেখ করেছিল। কিন্তু কেউই সে কথা বিশ্বাস করেনি। ভেবেছিল, পাগলের প্রলাপ। প্রকৃত সত্য হচ্ছে উদয় মনেপ্রাণে নিজেকে একজন কুষ্ঠরুগী বলে বিশ্বাস করত।

—কেন? বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম আমি।

—এটা হচ্ছে কুটিল মনের চতুর আবিষ্কার। উদয়ের খুব সম্ভবত কোনো চর্মরোগ ছিল। অনেক সময় সামুদ্রিক জল-হাওয়ায় ও জাতীয় চর্মরোগ দেখা যায়। কিন্তু ডাক্তার অগস্তি নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে তাকে এটা কুষ্ঠরোগ বলে বুঝিয়েছিলেন।

অল্প থেমে আবার শুরু করল সিতাংশু—এখানে আসার পর প্রথম দুজনের ওপর আমার সন্দেহ গিয়ে পড়ে। একজন হচ্ছেন মিঃ বিশ্বনাথন, অপরজন ডাক্তার অগস্তি। মিঃ ভাটিয়াকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ রেখেছিলাম। কারণ এই সমস্ত খুনের ফলে তাঁর কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। পরে ভেবে দেখলাম, ডাক্তার অগস্তির পক্ষেই এই ধরনের খুনের সুযোগ সবচেয়ে বেশি এবং সবার চোখের সামনে তিনি এই জাতীয় ঘটনাগুলোকে অন্যভাবে উপস্থিত করতে পারবেন। আরও একটা ব্যাপারে আমার সন্দেহ আরও দৃঢ় হলো। ডাক্তার অগস্তির সঙ্গে উদয় যোশীর পূর্ব পরিচয় ছিল। সে নিশ্চয় ডাক্তারের অনুকূলে কোনো উইল করে গিয়ে থাকবে। ডাক্তারও হঠাৎ বড়লোক হয়ে ওঠার একটা পথ দেখতে পেলেন। কাটা আঙুলে কোনো বিষাক্ত জীবাণু মিশিয়ে দেওয়া তাঁর পক্ষে এমন কিছু দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। রমেশ যোশীর মনোগত অভিপ্রায় যাই থাকুক না কেন, তিনি যে তখনও পর্যন্ত কোনো উইল করেননি সে কথা ডাক্তারের অজ্ঞাত ছিল না। এই অবস্থায় মারা গেলে তাঁর যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি একমাত্র নিকট আত্মীয় উদয় যোশীরই প্রাপ্য হবে। হপ্তাখানেক বাদে উদয় নিজেও আত্মহত্যার পথ বেছে নিল। এর পেছনেও ডাক্তার অগস্তির অদৃশ্য হাত সক্রিয় ছিল। তিনিই মিথ্যে করে উদয়ের মনে কুষ্ঠ রোগের আশঙ্কা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।

এই একটা ব্যাপারে আমি অবশ্য সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ নই। তবে প্রকৃত ঘটনাটা কল্পনা করে নিতে পারি। এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই কল্পনা প্রকৃত সত্য থেকে খুব বেশি বিচ্যুত হবে না। মিঃ উইলিয়াম ছিলেন বিচক্ষণ ব্যক্তি। খুব সম্ভবত তিনি কিছু একটা আঁচ করতে পেরেছিলেন। হয়তো অগস্তির বিরুদ্ধে মারাত্মক কোনো প্রমাণও তাঁর হাতে ছিল। ডাক্তার অগস্তি বোধহয় সেটা টের পেয়েছিলেন। তাই আর দেরি না করে সুকৌশলে পথের কাঁটা সরিয়ে দিলেন। কিংবা অগস্তি হয়তো ভেবেছিলেন উদ্দেশ্যহীন আর একটা খুন করলে সকলের মনে মেনহেররার আতঙ্ক আরও বদ্ধমূল হবে। খুনীদের মানসিক গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে একটা কথা ভাল করে জেনে রাখ, অজয়। কেউ যখন একটা খুন করে সফল হয় তখন তার মনে আরও খুনের বাসনা জেগে ওঠে। এই রক্ততৃষা ক্রমশ বাড়তেই থাকে। সেইজন্যেই আমি জয়ন্ত সম্পর্কে এত বেশি শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম। আমি জানতাম একজন নৃশংস খুনী সারাক্ষণ তার আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই আর এক মুহূর্তও দেরি না করে সুদূর কলকাতা থেকে এত দূরে মিশরের এই মরুভূমিতে ছুটে এসেছি। আজ নৈশভোজের সময় প্রেতলোকের দেবতা অ্যামিবাসের যে ছায়ামূর্তি তোমাদের সামনে উদয় হয়ে আবার হাওয়ায় মিলিয়ে গেল ওটা আসলে হাসানের। আমিই ওকে মুখোশ পরে এই ধরনের অভিনয় করতে নির্দেশ দিয়েছিলাম। ডাক্তার অগস্তির ওপর এর কী প্রতিক্রিয়া ঘটে সেটা লক্ষ্য করাই ছিল আমার মূল অভিপ্রায়। দেখলাম তিনি সহজে ভয় পাবার পাত্র নন। এবং ভূতপ্রেতে আমার অগাধ বিশ্বাস যে নিছক ভানমাত্র তাও তিনি মনে মনে আঁচ করে নিতে পেরেছিলেন। আমি তাঁকে সন্দেহ করছি বুঝতে পেরে পরবর্তী শিকার হিসেবে যে আমাকেই বেছে

নেবেন সেটা অনুমান করে নেওয়া এমন কিছু কষ্টকর ব্যাপার নয়। তাঁকে সে সুযোগ দেবার জন্যে আমি তাঁর সামনেই হাসানকে ডেকে কফির কথা বলে দিলাম এবং তিনিও সঙ্গে সঙ্গে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে এগিয়ে এলেন।

অল্প থেমে সিতাংশু আমার মুখের দিকে তাকাল। তারপর রহস্যময় কণ্ঠে বলল—অসহনীয় উত্তাপ এবং কর্কশ বালুকণার বিরক্তিকর দৌরাত্ম্য সত্ত্বেও আমার মেধা যে বিন্দুমাত্র শিথিল হয়ে পড়েনি, এটা তুমি নিশ্চয় অস্বীকার করতে পারবে না।

সিতাংশুর ধারণা যে কত অভ্রান্ত দু-একদিনের মধ্যেই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল। বছর দু-তিন আগে উদয় যোশী মাতাল অবস্থায় এক অদ্ভুত ধরনের উইল করে। সেই উইলের অবিকল বয়ান হচ্ছে এই ঃ

আমার সোনার সিগারেট কেস (যেটা তুমি একদিন খুবই পছন্দ করেছিলে), তা ছাড়াও পৃথিবীতে যা কিছু রেখে যাব (যা একটা বিরাট অঙ্কের ঋণ ছাড়া বোধহয় আর অন্য কিছু হবে না), সে সমস্তই আমার অবর্তমানে আমার অকৃত্রিম বন্ধু (যে আমাকে একদিন পুরীর সমুদ্রে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিল) ডাক্তার সুন্দরলাল অগস্তিকে দিয়ে যাচ্ছি।

যতদূর সম্ভব ঘটনাটাকে সাধারণের কাছে গোপন রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল। এখনও পর্যন্ত লোকে সম্রাট মেনহেররার নাম শুনলে আতঙ্কে শিউরে ওঠে। সাধারণের বিশ্বাস, সমাধিমন্দির অপবিত্র করার জন্যেই সম্রাটের বিদেহী আত্মা এত বেশি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছিল।

—সবচেয়ে আশ্চর্যের কী জান? সিতাংশু একদিন কথাচ্ছলে আমার কাছে গল্প করেছিল—মিশরীয় ধ্যান-ধারণা কিন্তু কোনো প্রতিহিংসাপরায়ণ আত্মার অস্তিত্বে আদৌ বিশ্বাসী নয়।

[বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে।]

[ভাদ্র ১৩৯৯]

শরীর ছেড়ে বেরিয়ে

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

কমল আসতেই চেঁচিয়ে উঠলো শ্রীকান্ত আর সুকান্ত ঃ কি কমলকাকু, সেই যে আসছি বলে চলে গেলে আর এলে সাত দিন পরে?

কমল একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে বললে, আরে বাবা, বিরাট ঝামেলায় পড়ে গিয়েছিলাম, অনেক কষ্টে সামলেছি, আগে তোদের মাকে বল এক কাপ চা দিতে।

তা না হয় বলছি, কিন্তু তুমি এমন করে উধাও হয়ে গিয়েছিলে কেন? ঐ একজিবিশনে নিয়ে গিয়ে আমাদের আইসক্রিম খাওয়াতে হবে বলে? আমরা কোথায় আশা নিয়ে বসে আছি সেই শনিবার থেকে। সুকান্তের গলায় বেশ অভিমান।

আর আইসক্রিম! আমার নিজের প্রাণ হিম হয়ে যাওয়ার উপক্রম। চা খেয়ে শরীরটাকে আগে চাঙ্গা করি।

শ্রীকান্ত আর সুকান্তর মা চায়ের ফরমাশ আগেই শুনতে পেয়েছিলেন। এই দেওরটির চায়ের নেশার কথা তিনি ভালোভাবেই জানেন। তাঁর নিজের দেওর অবশ্য নয়, দূরসম্পর্কের। কিন্তু সে হয়ে গেছে নিজের দেওরের চেয়েও বেশি। প্রায়ই আসে। আর শ্রীকান্ত আর সুকান্তর যত আব্দার ওরই কাছে। বিয়ে-থা করেনি। কলেজে পড়ায়। হৈচৈ করে কাটিয়ে দেয়।

মা চা নিয়ে এসে বললেন, তোমার আবার কী হলো, কমল? কে তোমার প্রাণ হিম করে দিলে?

চায়ে চুমুক দিয়ে কমল বললে, আর বলবেন না, বৌদি। বিরাট ঝামেলা। রীতিমতো খুন!

খুন? শ্রীকান্ত আর সুকান্ত একসঙ্গে বলে উঠলো।

খুন, মানে প্রায় খুন আর কি। খুন করার চেষ্টা। দুধের মধ্যে বিষ। সেই বিষ শরীরে গিয়ে মৃত্যুও হতে পারত। হয়নি খুব ভাগ্য ভালো। কিন্তু তাতে তো থানা-পুলিশের হাত থেকে রেহাই নেই।

বৌদি বললেন, খুন করার চেষ্টা? কে কাকে খুন করার চেষ্টা করলে?

আরে আমাদের পাশের বাড়ির সত্যপ্রকাশবাবু। বোধহয় বলেছি ওঁর কথা তোমাদের।

সেই ব্যবসাদার?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ফার্নিচারের ব্যবসাদার। অনেক পয়সা।

তা তাঁকে খুন করার চেষ্টা করলে কে? আর তুমি তার মধ্যে জড়িয়ে পড়লে কী করে? বৌদি জানতে চাইলেন।

ইতিমধ্যে বাড়িতে ঢুকলেন শ্রীকান্ত-সুকান্তর বাবা অনির্বাণ। কমলকে দেখে বললেন, কিরে, ক'দিন তোকে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না? তোর ভাইপোরা বলছিল পুলিশে খবর দেবে!

আবার পুলিশ! তা হলে আমি পালাই! বলেই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো কমল।

চেপে ধরে বসিয়ে দিল দুই ভাইপো। বললে, সে কি, খুনের চেষ্টার গল্পটা না-বলেই চলে যাবে নাকি?

বৌদি হাসতে হাসতে বললেন, পুলিশের নাম শুনে এত ভয় পাচ্ছ কেন, কমল? তুমিই খুনের চেষ্টা করেছিলে নাকি ঐ সত্যপ্রকাশবাবুকে?

কমলের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল এবার। বললে, হাসির ব্যাপার নয় বৌদি। খুব সিরিয়াস কেস।

তা তুমি না-বললে কী করে বুঝব, কত সিরিয়াস?

তা হলে শোনো।

কমল বলতে লাগলো ঃ

দিন কয়েক আগে পাড়ায় হৈচৈ। সত্যপ্রকাশবাবুকে খুনের চেষ্টা হয়েছিল। তাঁর দুধের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে সেই দুধ তাঁকে খাওয়ানো হয়েছিল। যেমন-তেমন বিষ নয়, মারাত্মক ধরনের বিষ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেছেন তিনি। প্রথমে বাড়িতে ডাক্তার এসে দেখেন, যন্ত্রণায় প্রায় জ্ঞান হারিয়েছেন সত্যপ্রকাশ। একটা ইনজেকশনও দেন। কিন্তু তাতে কিছু হয় না। তখন নিয়ে যাওয়া হয় কাছাকাছি নার্সিংহোমে। সেখানে দেওয়া হয় ওষুধপত্র। বিষ বার করা হয় পেট থেকে।

প্রাণে বেঁচে যান সত্যপ্রকাশ। কিন্তু তাতে সব ঝামেলা শেষ হয় না। প্রথমে সত্যপ্রকাশের বাড়ির লোক চেয়েছিলেন ব্যাপারটা চেপে দিতে। কিন্তু নার্সিংহোমের ডাক্তার নীলরতন দত্ত বললেন, না, না, তা কি করে হয়। পয়জনিং-এর কেস, এটা পুলিশকে জানাতেই হবে। তা ছাড়া, এমন কাজ কে করলো, সেটাও তো অনুসন্ধান করে দেখা দরকার। আর সেই অনুসন্ধান করতে গিয়েই ঝামেলা।

বৌদি বললেন, তা তুমি এই ঝামেলায় জড়ালে কী করে?

কমল বললে, আরে আসলে সেইটাই তো গল্প। কিন্তু সেটা শুনতে হলে আরও এক কাপ চা খাওয়াতে হবে।

দ্বিতীয় কাপ চা আসতেও অবশ্য দেরি হলো না। কারণ এখন সকলেই সত্যপ্রকাশের কাহিনী শুনতে রীতিমতো আগ্রহী।

একটু সামলে ওঠার পর নার্সিংহোমে ডাক্তারবাবুই প্রথমে জানান ব্যাপারটা সত্যপ্রকাশকে। তাঁর শরীরের মধ্যে যে বিষ চলে গিয়েছিল, মারাত্মক ধরনের বিষ, এই কথাটা শোনার পর কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়েছিলেন সত্যপ্রকাশ। সেটাই স্বাভাবিক। বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ তাঁকে বিষ খাইয়ে মারার চেষ্টা হবে কেন, সেটাই তিনি বুঝতে পারেননি।

তারপর এসেছে পুলিশ। প্রথমে নার্সিংহোমে, তারপর বাড়িতে। ঐ দুধে বিষের কথাই বলেছে। বলেছে প্রাণে বেঁচে যাওয়ার কথাও। তারপর জিজ্ঞেস করেছে, এই ব্যাপারে সত্যপ্রকাশের কি সন্দেহ হয় কাউকে?

আর এই প্রশ্নটা শুনেই নাকি খুব চমকে উঠেছেন সত্যপ্রকাশ। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকেছেন, তারপর বলেছেন, না, না, আমার আর কাকে সন্দেহ হবে, কাউকে সন্দেহ হয় না, কাউকে সন্দেহ হয় না.....

কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন সত্যপ্রকাশ। কী যেন একটা মনে করার চেষ্টা করেছেন, তারপর চুপ করে গেছেন।

পুলিশের কাছেই কমল পরে শুনেছে এসব কথা। ইন্সপেক্টর ঘোষ বলেছিলেন, একটা আঘাত পাবার পর এই ধরনের উত্তেজনা বা নার্ভাসনেস আসা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তিনি তাই ঠিক করেছিলেন পরে আবার কথা বলবেন সত্যপ্রকাশের সঙ্গে।

ইতিমধ্যে ইন্সপেক্টর ঘোষ কথা বলেছেন বাড়ির লোকের সঙ্গে। স্ত্রী মঞ্জুলিকা এই ঘটনায় এতটাই আঘাত পেয়েছিলেন যে তিনি তো প্রথমে কিছু বলতেই পারেননি। পরে যা বলেছেন তার অর্থ, তিনি কাউকে সন্দেহ করবেন কি, তিনি তো ধারণাই করতে পারছেন না তাঁর সংসারে এমন ঘটনা ঘটতে পারে।

যাই হোক, জিজ্ঞাসাবাদ করে ইন্সপেক্টর ঘোষ যা জানতে পারলেন তা হলো এই ঃ

রোজ রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে এক গ্লাস দুধ খাওয়ার অভ্যেস সত্যপ্রকাশের অনেক দিনের। সেই দুধ রেখে যায় তাঁর ভৃত্য ভজনলাল। দুধ গরম করে গ্লাসে ভর্তি করে দেয় রান্নার কাজ করে যে বামুনদিদি সে। আর বাড়িতে আছে সত্যপ্রকাশের দুই ছেলে—নিত্যপ্রকাশ আর জ্যোতিপ্রকাশ।

নিত্যপ্রকাশ বিবাহিত। তার একটি মেয়ে। একজন দারোয়ান বাড়ি পাহারা দেয়। রাতে বাড়ির ভিতরে সে অবশ্য আসে না। তবু বাড়ির লোক বলতে তাকেও ধরতে হয়। এদেরই মধ্যে কেউ অপরাধী। তবে নিত্যপ্রকাশের চার বছরের মেয়েটিকে নিশ্চয়ই সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যায়।

খুনের চেষ্টার কেস, সত্যপ্রকাশের কথা জানাটা খুবই দরকারি। কিন্তু ওঁর কাছে সন্দেহের কথা বললেই তিনি যেন কেমন করে উঠছেন, বলছেন, সন্দেহ ..... সন্দেহ.....না, না, আমার কাউকে সন্দেহ হয় না.....

এদিকে ইন্সপেক্টর ঘোষ পড়েছেন আর এক সমস্যায়। অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে একটা জায়গায় তিনি আটকে গেছেন। আর সেই কথাটা যখন তিনি সত্যপ্রকাশকে বলতে গেলেন তখন হলো উল্টো বিপত্তি। আরও যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন সত্যপ্রকাশ।

গ্লাস.....গ্লাস.....

হ্যাঁ, যে-গ্লাসটায় আপনি দুধ খেতেন।

হ্যাঁ, ওটা অনেক দিনের পুরনো কাঁসার গ্লাস। আমার নাম লেখা ছিল। সেটার কী হয়েছে?

ইন্সপেক্টর ঘোষ বললেন, সেই গ্লাসটা পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ তদন্তের জন্য ওটা খুবই দরকার। কেউ তো কিছু বলতে পারছে না। আপনার পক্ষেও তো আর জানা সম্ভব নয়।

এই কথা শুনে কেমন যেন চমকে উঠেছিলেন সত্যপ্রকাশ। বলেছিলেন, না, না, আমি কী করে জানব, আমি কি করে জানব.....

সুকান্ত এই সময়ে বলে উঠল, তা তো ঠিক কমলকাকু, উনি আর কী করে জানবেন, উনি তো তখন যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলেন, তারপর ওঁকে নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হলো।

কমল বললে, হ্যাঁ, তা ঠিক, কিন্তু.....

এর মধ্যে আর কিন্তু কী আছে কমল? আর তাছাড়া তুমি কী করে জড়িয়ে পড়লে সেটাও তো বলছ না? প্রশ্নটা বৌদির।

কমল একটু থেমে বললে, ঐ কিন্তুর মধ্যেই তো আমি।

কিন্তুর মধ্যে তুমি! এবার সকলেই অবাক।

আর বলেন কেন, বৌদি। কমল বলতে লাগল ঃ সত্যপ্রকাশ একদিন আমায় ডেকে পাঠালেন। ওঁর ছোট ছেলে জ্যোতি আমার বন্ধু। একসঙ্গে পড়তাম। পরে ও বাবার ব্যবসায়ে চলে গেল। তবে আমাদের বন্ধুত্ব আগের মতোই আছে। প্রায়ই ওদের বাড়িতে যাই। সত্যপ্রকাশ মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে গল্পটল্পও করেন। ইদানীং ব্যবসার ভারটা দুই ছেলের ওপরেই আস্তে আস্তে ছেড়ে দিচ্ছেন। হাতে সময় থাকে।

তা তোমায় ডেকে উনি কী বললেন?

আমায় ডেকে সত্যপ্রকাশ একদিন বললেন, কমল, তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরি কথা আছে। আমি ভাবলাম, কী আবার জরুরি কথা রে বাবা? যাই হোক, গেলাম। একটু থেমে উনি বললেন, তুমি তো কলেজে পড়াও, সাইকোলজি না কি যেন। তুমি তো জানো অনেক কিছু। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব। এরকম কি সত্যিই হতে পারে?

কী ব্যাপার বলুন তো, মেসোমশায়? কমল জানতে চেয়েছে।

সত্যপ্রকাশ তখন একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। বলার পর আবার জিজ্ঞেস করেছেন, সত্যিই কি হতে পারে এরকম?

কমল একটু চুপ করে থেকেছে। ভেবেছে। হ্যাঁ, এমন ব্যাপার সে মনস্তত্ত্বের পত্রপত্রিকায় পড়েছে। কোনো কোনো বিখ্যাত লেখকও লিখে গেছেন এই ধরনের অভিজ্ঞতার কথা। কিন্তু এর আগে এমন কোনো মানুষ সে দেখেনি যাঁর এই রকম বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে। তাই সত্যপ্রকাশের কথা শুনে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে সে।

সত্যপ্রকাশ জিজ্ঞেস করেছেন, কমল, এটা কি স্বপ্ন, স্বপ্নের মতো কিছু?

না, মেসোমশায়, এটা ঠিক স্বপ্ন নয়, এর অন্য একটা নাম আছে। কিন্তু আপনি তো সব ব্যাপারটা আমায় বলছেন না। একটু বাদ রাখছেন।

কী বাদ রাখছি, কমল?

ঐ যে একটা নাম বাদ রাখছেন। গ্লাসটা যে নিয়ে গেল তার নাম আপনি বলছেন না। কমল অনুযোগ করলে।

না, না, সে আমি তোমাকেও বলতে পারব না। তা হলে তো ও খুব মুশকিলে পড়বে। তা ছাড়া আমি জানি না কেউ আমার কথা আদৌ বিশ্বাস করবে কিনা। সত্যপ্রকাশ যেন ভরসা পাচ্ছেন না ঠিক।

এদিকে কৌতূহল আর চেপে রাখতে পারছে না শ্রীকান্ত-সুকান্ত, এমন কি তাদের মা-বাবাও। অনির্বাণই বলে উঠলেন, হ্যাঁরে কমল, সত্যপ্রকাশ ঐ অবস্থায় গ্লাসের ব্যাপারটা জানলেন কী করে, ওঁর তো জানার মতো অবস্থা ছিল না তখন?

কমল একটু হেসে বললে, হ্যাঁ, সেটাই তো এখন বলব, সেটাই তো আসল মজা।

সত্যপ্রকাশ কমলকে যে অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন তা এই ঃ

ঘুমের মধ্যে আমি যেন কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলাম। একটু পরে ঘুমটা ভেঙে গেল। শুরু হলো পেটের কাছে যন্ত্রণা। ক্রমশ বাড়ছে সেই যন্ত্রণা। ছটফট করতে শুরু করলাম। আমার স্ত্রী রাতে শোয় পাশের ঘরে নাতনীকে নিয়ে। তাকে যে ডাকব তেমন অবস্থাও আমার নেই। ডাকতে চেষ্টা করছি, কিন্তু গলা দিয়ে যেন স্বর বেরোচ্ছে না। আমার বিছানার কাছে একটা কলিংবেলের সুইচ আছে, কাজের লোককে ডাকার জন্যে। সেটাই বাজাতে চেষ্টা করলাম, পারলাম না। আর তারপরই ঘটলো সেই ব্যাপারটা.....

আমি যেন বেরিয়ে এলাম আমার শরীরটা ছেড়ে। হ্যাঁ, আমার শরীরটা ছেড়ে। যেন দুটো আমি। একটা আমি আমার শরীরটা যেটা বিছানায় শুয়ে আছে। আর একটা আমি খানিকটা ওপর থেকে, যেন শূন্যে ভেসে থেকে আমার ঐ শরীরটাকে দেখতে পাচ্ছি। শুধু আমার শরীর কেন, খাট-বিছানা, ঘরের অন্য সব আসবাবপত্র, এমন কি ঘরের বাইরেও অনেক কিছু, আমার বাড়ির আশপাশ, সবই দেখতে পাচ্ছি আমি.....

একটু পরে দেখি সে এসে ঘরে ঢুকলো। এদিক-ওদিক তাকালো। তারপর পা টিকে টিপে এসে গ্লাসটা হাতে তুলে দেখলো, কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে বেরিয়ে গেল গ্লাসটা হাতে নিয়ে। ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল সিঁড়ি দিয়ে নেমে একতলায়। তারপর দরজা খুলে বাড়ির পিছনে বাগানে.....

ইতিমধ্যে আমার স্ত্রী বোধহয় পাশের ঘর থেকে আমার শরীরের যন্ত্রণা আর ছটফটানির কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছিল। আমার স্ত্রী এসে ঘরে ঢুকলো। আমার অবস্থা দেখে থমকে দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই সামলে নিয়ে ছুটে গেল ছেলেদের কাছে। ডাক্তারকে ফোন করলো ছোট ছেলে। সকলে আমাকে ঘিরে আমার বিছানার চারপাশে। নিজেরা কী সব বলাবলি করছে। আমার সঙ্গে, অর্থাৎ আমার যে-শরীরটা পড়ে আছে বিছানায় তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছে। আমি কিন্তু কিছু শুনতে পাচ্ছি না ঠিক। আমার স্ত্রী শুরু করেছে কান্নাকাটি.....

ডাক্তারবাবু এসে গেলেন। আমার শরীরটা পরীক্ষা করলেন। একটা ইনজেকশন দিলেন। ইনজেকশন দেওয়ার পরেই যে আমি আমার শরীরটা ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম সেই আমি যেন ফিরে এলাম আবার ঐ শরীরের মধ্যে.....!

কমলের মুখে সত্যপ্রকাশের কাহিনী শুনে সকলেই এই চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর অনির্বাণই প্রথম কথা বললেন ঃ কমল, তুই যাই বল, এটা কিন্তু স্বপ্নের মতোই কিছু একটা।

না দাদা, এটা স্বপ্ন নয়। কমল বললে, প্রথমে ধরুন, ঐ যন্ত্রণার মধ্যে স্বপ্ন দেখাটা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, সত্যপ্রকাশবাবু যে বিবরণ দিয়েছেন তা যে ঠিক তা আমি পরে মাসিমা আর ওঁদের ছেলেদের

সঙ্গে কথা বলে জেনেছি। শুধু ঐ গ্লাস নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা সম্পর্কে ওঁরা কিছু বলতে পারেননি, কারণ ওঁরা তখনও সত্যপ্রকাশের ঘরে ঢোকেননি।

স্বপ্ন যদি না হয় তবে এটাকে কী বলবি? অনির্বাণের এই প্রশ্নের উত্তর জানতে আগ্রহী সকলেই।

কমল বললে, দেখুন দাদা, যখন শরীরে একটা জোর আঘাত লাগে, কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, অথবা শরীরে যখন অস্ত্রোপচার হয়—এইসব সময়ে এই ধরনের অভিজ্ঞতা অনেকের হয়েছে বলে শোনা যায়। দাদা, আপনি তো আর্নেস্ট হেমিংওয়ের লেখার খুব ভক্ত ছিলেন একসময়?

ছিলাম কেন, এখনও আছি। হেসে বললেন অনির্বাণ। তারপর ছেলেদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোরা হেমিংওয়ের নাম শুনেছিস?

শ্রীকান্ত বলে উঠলো, কেন শুনব না? সেই বুড়ো আর তিমি মাছের গল্প যিনি লিখেছেন তিনি তো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, কমল বললে, দা ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দা সী। সেই হেমিংওয়েই প্রথম মহাযুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। সেই সময়ে একটা গুলি এসে লাগে তাঁর গায়ে। তখন ওঁর এই রকমই অভিজ্ঞতা হয়েছিল বলে লিখে গেছেন। বলেছেন, তাঁর যেন মনে হয়েছিল, পকেট থেকে যেমন রুমাল বেরিয়ে আসে তেমনই তাঁর আত্মা বা ঐ রকম একটা কিছু যেন তাঁর শরীর থেকে বেরিয়ে এল, ওপরে ভেসে বেড়িয়ে চারপাশটা দেখলো, তারপর আবার ঢুকে গেল শরীরের মধ্যে....

কমল বলতে লাগলো ঃ আর একটা ঘটনার কথা পড়েছিলাম। ডেভিড টেলর বলে এক ভদ্রলোক পূর্ব আফ্রিকায় গিয়ে এক দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন। ডেভিড আর তাঁর বন্ধু যাচ্ছিলেন একটা গাড়িতে করে। উল্টো দিক থেকে আসছিল একটা লরি। লরিটা এসে প্রবল জোরে ধাক্কা মারলো গাড়িটাকে। ছিটকে পড়ে গেলেন ডেভিড। পড়ে যাওয়ার পরই তাঁর মনে হলো, তাঁর শরীরটা পড়ে রয়েছে রাস্তার ধারে, অথচ তিনি যেন ওপর থেকে ভাসতে ভাসতে দেখতে পাচ্ছেন সবকিছু....লরিটা কায়দা করে গাড়িটাকে কাটিয়ে নিয়ে খুব স্পীডে উধাও হয়ে গেল.....ডেভিডের বন্ধু ছুটে এলো তাঁর কাছে, তাঁকে পরীক্ষা করে দেখলো, তারপর হাসপাতালে নিয়ে গেল। বন্ধুটিও পরে একই রকম বিবরণ দিয়েছেন।

অনির্বাণ বললেন, এ তাহলে মায়া অথবা মতিভ্রম জাতীয় কিছু।

বৌদি যোগ করলেন ঃ কমল, আমাদের একটা কথা আছে না, ভয়ে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যাওয়া? একি অনেকটা সেই ধরনের?

কমল হেসে বললে, তা বলতে পারেন, তবে ইংরেজিতে এটাকে বলে আউট অব দা বডি এক্সপিরিয়েন্স। ও-ও-বি-ই। আমিও আগে কারো মুখ থেকে তাঁর নিজের এই রকম অভিজ্ঞতার কথা শুনিনি। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

সেটা কি?

আমি ঠিক করলাম, সত্যপ্রকাশের কথাটা পরখ করে দেখব। ভাবলাম, নিজেই ওঁর বাড়ির বাগানে গিয়ে সেই গ্লাসটাকে খোঁজার চেষ্টা করব। তারপরে মনে হলো, নিজে ঝুঁকি নেওয়ার দরকার নেই, পুলিশকে বলাই ভালো। কিন্তু সত্যপ্রকাশ আমায় বারণ করে দিয়েছিলেন ওঁর সেই অভিজ্ঞতার কথা আমি যেন কাউকে এখন না বলি। তাই ইন্সপেক্টর ঘোষকে আমি শুধু বললাম, আমার খুব সন্দেহ হচ্ছে গ্লাসটা বাগানে কোথাও থাকতে পারে। উনি জানতে চাইলেন, কেন এই সন্দেহ হচ্ছে আমার। আমি বিশদ কিছু না বলে শুধু বললাম, খুঁজেই দেখা যাক না।

সত্যপ্রকাশের বাড়ির লাগোয়া বাগানটা খুব একটা ছোট নয়। শহরতলি এলাকায় পুরনো বাড়ি, বেশ কিছুটা জায়গা আছে। সেই বাগানে খুঁজতে খুঁজতে একটা হাসনুহানা গাছের তলায় মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেল সত্যপ্রকাশের নাম লেখা সেই কাঁসার গ্লাস।

সত্যি? প্রশ্নটা করলেন বৌদি, কিন্তু এটা সবারই প্রশ্ন।

তা হলে তো অপরাধী এবার ধরা পড়বে? জানতে চাইল সুকান্ত।

পড়বে মানে? পুলিশ তো আটক করেছে একজনকে।

আটক করেছে? কাকে?

নিত্যপ্রকাশকে।

নিত্যপ্রকাশকে! সকলেই অবাক। বৌদি বললেন, ছেলে হয়ে বাপকে.....কী ব্যাপার বলো তো কমল?

উত্তর দিলেন অনির্বাণ ঃ ব্যাপার আর কী, সম্পত্তির লোভ হতে পারে। বড়লোকদের ব্যাপার, আমরা ছা-পোষা লোক আর বুঝব কী করে!

কমল বললে, তা হতে পারে। পুলিশের জেরায় সবই বেরিয়ে পড়বে। জোর তদন্ত চলছে।

আচ্ছা কমল, বৌদির আবার প্রশ্ন, সত্যপ্রকাশই বুঝি বলে দিলেন নিত্যপ্রকাশের নাম, মানে সেই রাতে বড় ছেলেই গ্লাসটা নিয়ে গিয়ে বাগানে রেখে দিয়েছিল?

কমল একটু চুপ করে থেকে বললে, না বৌদি, উনি ও ব্যাপারে আর কোনো কথাই বলতে চাইছেন না, শুধু চেয়ে থাকছেন উদাস দৃষ্টিতে।

তাহলে নিত্যপ্রকাশকে পুলিশ আটক করলো কী করে? এবার কৌতূহলী হয়ে ওঠে শ্রীকান্ত।

আঙুলের ছাপ দেখে। গ্লাসে তো নিত্যপ্রকাশের আঙুলের ছাপ থাকার কথা নয়। থাকতে পারে সত্যপ্রকাশের নিজের, ভজনলালের আর সেই বামুনদিদির। সবই এবার জানা যাবে। তবে আমার ঝামেলা আর মিটছে না।

কেন? জানতে চাইলেন অনির্বাণ।

আর বলবেন না দাদা। সত্যপ্রকাশ বলছেন, তিনি সব সম্পত্তি দান করে দেবেন রামকৃষ্ণ মিশনকে, তার ব্যবস্থা করতে।

দান করে দেবেন? কেন রে?

কী জানি কেন! জিজ্ঞেস করলে কী সব শ্লোক আওড়াচ্ছেন.....কা তব কান্তা কস্তে পুত্র.....। বলছেন, কমল, আমার সব মোহ কেটে গেছে, আমি মৃত্যুর স্বাদও পেয়ে গেছি। আমি জানতে চাইলাম, মৃত্যুর স্বাদ আবার কী করে পেলেন? সত্যপ্রকাশ বলছেন, আরে বাবা, মৃত্যু কেমন তা তো আমি দেখতে পেলাম। মৃত্যু হলে আমার শরীরটা বিছানার ওপর তো এই রকমই পড়ে থাকবে, সেই শরীর ঘিরে কান্নাকাটি করবে আত্মীয়স্বজন, এক-আধজন হয়তো মনে মনে খুশিও হবে—যাক, বুড়োটা গেছে, এদিকে আমার আত্মা শরীর ছেড়ে বেরিয়ে এসে হাওয়ায় কিছুক্ষণ ঘুরবে, তারপর মিলিয়ে যাবে.....। সত্যি, আমার আর মৃত্যুভয় নেই কমল, আমার আর মৃত্যুভয় নেই।

একটু থেমে কমল বললে, সত্যপ্রকাশ এইসব কথা বলছেন, আর মাঝে মাঝে বলে উঠছেন, ও-ও-বি-ই, ও-ও-বি-ই.....। কালকেই জ্যোতি জিজ্ঞেস করছিল, হ্যাঁরে বাবা মাঝে মাঝে কী যেন বলছেন ও-ও-বি-ই, তুই জানিস কিছু? আমি তাকে কিছু বলতেও পারছি না। সত্যপ্রকাশের বারণ। মহাফ্যাসাদে পড়ে গেছি।.....ওরে বাবা, অনেক রাত হলো, এবার উঠি। বাস ধরতে হবে।

এই বলে কমল চেয়ার ছেড়ে তাড়াহুড়ো করে উঠতে গিয়ে ধুতির কোঁচা জড়িয়ে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিল প্রায়। অনির্বাণ তাকে ধরে ফেলে বললেন, দেখিস ভাই, পড়ে গিয়ে যেন আবার জোর আঘাত না লাগে, তাহলে তোর আত্মারামও হয়তো খাঁচাছাড়া হয়ে যেতে পারে!

ধুতি সামলে হাসতে হাসতে যাত্রা করলো কমল।

[শারদীয়া ১৩৯৮]

ইছামতীর তীরে

গৌরী দে

শিয়ালদা থেকে বনগাঁর ট্রেন ছাড়তে মাত্র তিন মিনিট বাকি। অপেক্ষা করতে করতে অধৈর্য হয়ে উঠছিল সুজয় আর অমিত। ভেতরে তিনটে সিট আগলে বসে আছে সুজয়। আর অমিত পায়চারি করছে প্ল্যাটফর্মে। আর মাত্র এক মিনিট। অমিত জানলার ধারে এসে বলল—'ট্রেন চলতে শুরু করলেই নেমে আসবে। শৈবাল আর ময়ূখ না এসে পৌঁছলে যাওয়া ক্যানসেল।' তারপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চেঁচিয়ে উঠল, 'ঐ তো ওরা—! যাক বাঁচা গেল।'

ওরা ট্রেনে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেন ছেড়ে দিল। সুজয়ের আগলে রাখা সিটে ওরা বসল। ময়ূখ বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অমিতের দিকে তাকাতেই অমিত শৈবালের দিকে তাকিয়ে বলল—'চিরকাল ঝোলাস তুই। দু'মিনিট আগে বেরোলে কি হয়?'

শৈবাল তার কৃতার্থ করা হাসি হেসে বলল—'আর বলিস্‌নি ভাই—কাল অনেক রাতে ট্যুর থেকে ফিরেছি। সকালে তাই ঘুম ভাঙতে দেরি হয়ে গেল।'

ময়ূখ ওদের মধ্যে বয়সে ছোট। অমিত ওকে টিকিট কাউন্টারের কাছে দাঁড় করিয়ে এসেছিল শৈবালের জন্যে, সুতরাং শৈবালের জন্য যে তার কতটা টেনসান হয়েছিল সেটা দেখাবার জন্যে এই শীতের সকালেও পকেট থেকে রুমাল বার করে কপাল মুখ মুছে একটু অনুযোগের সঙ্গে বলল—'শৈবালদার জন্যে বেড়ানোর আনন্দটাই আমার মাটি হতে যাচ্ছিল। বোঝ অমিতদা আমার অবস্থা! বুঝতে পারছি না, অপেক্ষা করব, না চলে যাব। ট্রেন ছাড়তে মাত্র এক মিনিট, তখন ঠিক করছি চলে যাব, এমন সময় দেখতে পেলাম ওকে।'

শৈবাল গলার কলারটা একটু ঠিক করে মাতব্বরের মতো বলে ওঠে—'আরে রাখ তো! হুঁ! যাচ্ছ তো সব পারমাদান জঙ্গল। বাড়ি থেকে পা বাড়ালেই পৌঁছে যাওয়া যায়। এমন সব ভাব করছো তোমরা, যেন হল্যান্ড না হনলুলু যাচ্ছি।'

সুজয় এতক্ষণ গম্ভীর হয়ে ওদের কথা শুনছিল, বলল—'তা দেড়শ হরিণকে একসঙ্গে এক গভীর জঙ্গলের মধ্যে দেখতে যাচ্ছি এটাও কোনো তুচ্ছ ব্যাপার নয়।'

অমিত চট্ করে ব্যাগ থেকে একগাদা কেক বার করে শৈবালের হাতে প্রথমে দিয়েই বলল—'খেয়ে নে—পরে কথা বলিস।' বাস্তবিকই শৈবাল কি যেন বলতে যাচ্ছিল, একটু হেসে চুপ করে গেল।

হাসিঠাট্টা আর গল্পে কোথা দিয়ে কেটে গেল কটা ঘণ্টা। এক সময় গন্তব্যস্থল এসে গেল। ওরা চারজনে ট্রেন থেকে নেমে ওভারব্রিজ পার হয়ে এপারে এলো যখন, তখন বেলা ১টা।

ভালো একটা হোটেলে খাওয়াদাওয়া আর বিশ্রাম সেরে ওরা যখন পারমাদান হরিণ বনের দিকে যাত্রা করল তখন বিকেল পাঁচটা। ওদের স্কুটার ভ্যানটা বাংলাদেশ বর্ডারের ধার দিয়ে এগিয়ে চলল। ক্রমশ সূর্যদেব অস্তাচলে ঢলে পড়লেন—আর বলা নেই কওয়া নেই, টুক্ করে বন্ধ হয়ে গেল স্কুটার ভ্যানের ইঞ্জিন। অনেক চেষ্টা-চরিত্র করেও তাকে চালু করা গেল না। ওরা অসহায় চোখে তাকালো ড্রাইভারের দিকে, তারপর ঘন গভীর নিস্তব্ধ গা ছমছমে জঙ্গলের দিকে। ড্রাইভার গম্ভীর হয়ে বলল—'আরো আট/নয় মাইল।'

অমিত বলল—'টুরিস্ট লজে হেঁটে পৌঁছতে আরও তিন-চার ঘণ্টা তাহলে বলুন?'

ড্রাইভারটি মাথা নেড়ে বলল—'তা তো লাগবেই। অচেনা রাস্তা। আপনাদের সাবধানে পা ফেলতে হবে তো।'

শৈবাল বলল—'কাছে-পিঠে কোথাও তো বসতির চিহ্ন দেখছি না।' সুজয় বরাবর একটু সিরিয়াস, বলল—'দেরি না করে হাঁটা শুরু করা উচিত।' ময়ূখ শুকনো গলায় বলল—'এরকম জানলে...' কথাটা শেষ হবার আগেই অমিত তাকালো। ময়ূখ ইতস্তত করে বলল—'আমি বলছিলাম, এরকম জানলে হাতিয়ার সঙ্গে নিয়ে আসতুম।'

কথাটা শৈবালের খুব মনঃপূত হলো। বলে উঠল—'তা প্রত্যেকে একটা করে গাছের ডাল ভেঙে লাঠি তৈরি করে সঙ্গে নিলেই তো হয়।'

অমিত গম্ভীর হয়ে বলল—'সকলে নিশ্চয়ই টর্চ এনেছো, সঙ্গে নাও। আর মনে রেখো আমরা জিম্ করবেটের মতো জঙ্গলে এসেছি। পশুহত্যা করতে নয় পশুদের দেখতে।'

স্কুটার ভ্যানওলাকে কিছু দিয়ে ওরা এগিয়ে চলল জঙ্গলের গভীর থেকে গভীরে। ময়ূখ ঠিক অমিতের গা ঘেঁষে চলতে লাগল। শৈবাল আর সুজয় দুজনে দুজনের হাত শক্ত করে চেপে ধরে এগোচ্ছিল। হঠাৎ দূরে খসখস শব্দ। কে বা কারা যেন শুকনো পাতা মাড়িয়ে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে। ওদের গতি প্রায় রুদ্ধ হয় হয় এমন সময় ময়ূখ আর সুজয় দুজনেই প্রায় চেঁচিয়ে উঠল—'ঐ দেখো, একটা আলো দেখা যাচ্ছে। একরাতের জন্যও কি ওরা আমাদের থাকতে দিতে পারবে না?'

ওরা গাড়ির রাস্তা ধরেই এগোচ্ছিল, কিন্তু বিধি বাম। সামনে লেখা 'আন্ডার কনস্ট্রাকশান'। রাস্তাটা যেন হঠাৎই শেষ হয়ে গেল। হতবাক চার বন্ধুর দল ভাবতে লাগল কোন পথে যাবে। অমিত প্রায় আদেশের সুরে বলে ওঠে—'সোজা এগোও আলো লক্ষ্য করে, যা হয় হবে।'

প্রায় আধঘণ্টা হাঁটার পর ওরা একটা বাংলো বাড়ির সামনে এসে হাজির হলো। পাঁচিল ঘেরা বাড়ি, লোহার গেট। বাংলোর ঠিক সামনেই গাড়ির গ্যারেজ। গেটে তালা—অমিত চিৎকার করে উঠল—'কেউ আছেন?'

দু-তিনবার ডাকার পর হ্যারিকেন হাতে বেরিয়ে এলো একটি দোহারা লম্বা মূর্তি। হ্যারিকেনের আলোটা বাড়াতেই দেখা গেল কঠিন মুখের ওপর খোঁচা খোঁচা দাড়ি; কোটরগত স্থির চোখ, পরনে লুঙ্গি আর শার্টের ওপর একটা গরম জামা। ঠাণ্ডা শান্ত গলায় মূর্তিটি বলে—'কাকে চাই।'

অমিত হাত জোড় করে বলল—'রাতের মতো একটু জায়গা চাই, যা টাকা লাগে দেবো।' লোকটি চার বন্ধুর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বলল—'কোথা থেকে আসছেন আপনারা?' সুজয় বলল—'কলকাতা।' লোকটি শৈবালের দিকে তাকালো। বলল—'যাচ্ছিলেন কোথায়?'

'ট্যুরিস্ট লজে।' অত্যন্ত বিরক্তি চেপে শৈবাল কথাটা ছুঁড়ে দিল। বিরক্ত মনে মনে অমিতও হয়েছিল। লোকটা অত্যন্ত অভদ্র। এই ঠাণ্ডায় দাঁড় করিয়ে সমানে জেরা করে চলেছে।

ময়ূখ এতক্ষণ কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোকটার কথা শুনছিল, এখন বিরক্তি চাপতে না পেরে বলল—'অসুবিধে থাকে তো বলে দিন চলে যাই, এদিকে রাতও তো বড়ছে।'

লোকটি একবার কট্‌মট্ করে তাকালো ময়ূখের দিকে তারপর অমিতের দিকে ঘুরে বলল—'ছাতের ওপর কাজ হচ্ছে। চারদিকে বালি-সিমেন্ট ছড়ানো দেখতেই পাচ্ছেন। রাত্তিরে প্রচণ্ড শব্দ হয়। আপনারা থাকবেন কি করে?'

অমিতের কেমন জেদ চেপে গেল। বলল—'আওয়াজটা কোনো ব্যাপার নয়। আপনার আর কোনো আপত্তি আছে?' লোকটি কিছু বলার আগেই শৈবাল বলে ওঠে—'কিন্তু রাত্তিরে তো কোনো মিস্ত্রি কাজ করে না!' শৈবালের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে অমিত পরিষ্কার দেখল লোকটার চোখ দুটো ধূর্ত শ্বাপদের মতো জ্বলে উঠল। বেগতিক বুঝে ও চট্ করে একটা ১০০ টাকার নোট লোকটির হাতে দিয়ে বলে ওঠে—'আর আমাদের কষ্ট দেবেন না দাদা, বিপদে বাঙালী বাঙালীকে না দেখলে দেখবে কে?'

টাকাটা হাতে নিয়ে লোকটি সেই অন্ধকারেই কি লক্ষ্য করল, তারপর একটু নরম হয়ে শার্টের পকেট থেকে গেটের চাবি বার করে খুলে দিল।

আরও কিছু টাকার বিনিময়ে রাতের খাবারে ওদের জুটল শুধু মুড়ি আর চা। রাত তখন প্রায় দশটা। ওরা বাংলো বাড়ির চৌহদ্দিটা ঘুরে দেখতে লাগল। পাশ দিয়ে ইছামতী নদী বয়ে চলেছে। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। বেশ ঠাণ্ডা, বেশিক্ষণ ওরা বাইরে থাকতে পারল না, ফিরে এলো ঘরে।

তক্তপোশগুলোর ওপর একটা করে পাতলা তোশক বালিশ আর কম্বল। লোকটি কখন এসে দিয়ে গেছে। ময়ূখ ঘরের দেওয়ালে লাগানো ইলেকট্রিক সুইচগুলো টিপতে লাগল। কখন যে সেই ভূতুড়ে লোকটা এসে দাঁড়িয়েছে কেউ টের পায়নি। চমকে উঠল লোকটির কথা শুনে।—'জ্বলবে না, লোডশেডিং। আজ রাতে আর আসবে না।' অমিত আবার দেখল লোকটার চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

লোকটি খাবার জল রেখে চলে যেতেই ওরা দরজা বন্ধ করে তক্তপোশের ওপর গুছিয়ে বসে শুরু করল আড্ডা, গান, আবৃত্তি।

বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে গেছে। মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত। ওরা তখন কেউ ঘুমিয়ে, কেউ তন্দ্রাচ্ছন্ন, শুনতে পেল খড়মের খট্ খট্ খট্ শব্দ। কখনও মনে হচ্ছে ছাতে, কখনও পাশের ঘরে, কখনও জানলার ধারে কে যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে। হাঁটছে থেমে থেমে। অমিত আর সুজয় টর্চ নিয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখার চেষ্টা করতেই ময়ূখ আর শৈবাল ওদের টেনে শুইয়ে দিল। ফিসফিস করে শৈবাল বলল—'কি করছিস্ পাগলামো! চুপচাপ রাতটা কাটিয়ে দে।'

সারা রাত ওরা কেউ দু' চোখের পাতা এক করতে পারল না। ভোর হতেই ওদের প্রথম কথা হলো, শব্দটা কিসের! ময়ূখ বলল—'অন্ততঃ মিস্ত্রির নয় সেটা জোর গলায় বলতে পারি।' অমিত বলল—'কি করে?' ময়ূখ দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব দিল—'কাল রাতে কোনো মিস্ত্রিকে আমি ছাতে কাজ করতে দেখিনি, এমনকি—কোথাও তাদের দেখতেও পাইনি।' ওরা সবাই সায় দিল—'ঠিক। আমরাও তো দেখিনি? তবে?'

ঠিক সেই সময় দরজায় টোকা—অমিত দরজা খুলতেই ঘরে ঢুকলো লোকটি। 'চা ব্রেকফাস্ট খেতে গেলে ৫ টাকা করে লাগবে।' অমিত সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল—'কাল রাতে কিসের শব্দ হচ্ছিল?' লোকটি ভ্রু কুঁচকে বিরক্ত কণ্ঠে বলল—'বলেছিলাম তো কাজ হচ্ছে শব্দ হবে।'

সুজয় সঙ্গে সঙ্গে বলে—'কিন্তু মিস্ত্রিকে তো দেখলাম না।' ময়ূখ আবার বলে—'মিস্ত্রিরা আবার রাতে কাজ করে নাকি?'

লোকটির ঘোলাটে চোখে প্রচণ্ড রাগ ফুটে উঠল, বলল—'তবে শুনুন, সত্যি কথা বলি। এই ঘরে ক'দিন আগে একটা খুন হয়েছিল.....'

অমিত হেসে বলল—'ওঃ তবে ভূতের বাড়ি বলুন!' লোকটি উত্তর না দিয়ে চলে যেতেই সুজয় বলে ওঠে—'আমি এসব বিশ্বাস করি না।' বাকি তিনজন মাথা নেড়ে বলে—'আমরাও না।' অমিত হাতের মুঠো দিয়ে বিছানায় আঘাত করে বলে—'রহস্য ভেদ করতেই হবে।' ময়ূখ মাথা নেড়ে বলল—'ঠিক।'

ওরা একেবারে ব্যাগ নিয়েই বেরিয়ে পড়ল ইছামতীর ঘাটের উদ্দেশে। নৌকা করে গেল টুরিস্ট লজ আর ডিয়ার পার্কে। সারাদিন লজে কাটিয়ে ওরা নৌকা করে ফিরে এলো নলডুগরী।

বাসের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে সাবই লক্ষ্য করল বেশ কিছুক্ষণ অমিত চুপচাপ। কি যেন ভাবছে। ওরা চেপে ধরল—'বল কি ভাবছ!' অমিত বলল—'অন্ততঃ ভূতের কথা নয়।' 'ঠিক', বলল ময়ূখ—'তবে শব্দটা কিসের বলে মনে হয়?' সুজয় বলল—'কোনো মেশিন চলার মতো যেন শব্দটা।'

এক ঝটকায় ঘুরে দাঁড়ালো অমিত। বলল—'কারেক্ট। ঠিক এই কথাটাই আমি সারাক্ষণ ভাবছি।' শৈবাল একগাল হেসে বলল—'দুই বুদ্ধিমান। লোডশেডিং-এ মেশিন চলার শব্দ শুনেছে!' ময়ূখ বলল—'মেশিনটা হাত মেশিন তো হতে পারে!' অমিত ময়ূখের পিঠে একটা আদরের চাপড় মেরে বলল—'সাবাস বেটা, জিও।'

সবাই একদৃষ্টে তাকালো অমিতের দিকে। সুজয় বলল—'কি বলতে চাও বল তো?'

অমিত বলল—'আগে বনগাঁ চল তারপর বলব। যদি অবশ্য আমার অনুমান ব্যর্থ না হয়।'

বনগাঁ স্টেশনে নেমে থানার ঠিকানা নিয়ে ওরা বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করল। অমিত অনেকক্ষণ ধরে কি সব আলোচনা করল বড়বাবুর সঙ্গে, তারপরে একগাল হাসি নিয়ে বন্ধুদের বলল—'আর কটা দিন ধৈর্য ধরে থাক, তারপর বলব।'

দিন সাতেক পরে অমিতের আহ্বানে ওরা আবার জমায়েত হলো অমিতের বাড়ি। অমিত সবার সামনে একটা চিঠি খুলল। বলল—'তোরা সব শোন, বড়বাবু কি লিখেছেন।'

প্রিয় অমিতবাবু—

বাংলোবাড়ির গ্যারেজের মধ্যে গভীর জঙ্গলে বেআইনী জাল নোট তৈরির আড্ডার সন্ধান দেবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানানো হচ্ছে। এজন্য আপনার প্রাপ্য পুরস্কারের অর্থ পরে পাঠানো হচ্ছে।

ইতি—
রজতশুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
অফিসার-ইন-চার্জ
বনগাঁ পুলিশ স্টেশন

[আষাঢ় ১৩৯৮]

রহস্যময় হত্যাকাণ্ড

পঙ্কজ দাস

পৃথিবীর অপরাধ ইতিহাসে অজস্র চাঞ্চল্যকর মামলার নজির আছে যেগুলি কাল্পনিক গোয়েন্দাকাহিনীর থেকেও চিত্তাকর্ষক। যেমন ব্রিটেনের পোর্টল্যান্ড গুপ্তচর মামলা। পিটার ও হেলেন ক্রোগার নামে এক দম্পতি পুরনো বইয়ের ডিলার সেজে দিনের পর দিন রাজকীয় নৌবাহিনীর গুপ্ত খবর রুশদের পাচার করতো। অভিনব ছিল তাদের কাজের পদ্ধতি। কখনো তারা খবর পাঠাতো উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন রেডিও ট্রান্সমিটার মারফত, কখনো গুপ্ত ফিল্ম সিগারেট লাইটারের মধ্যে পুরে, আবার কখনো বা খবরাখবর ক্ষুদে ক্ষুদে হরফে লিখে নকল বোতামের টর্চে ঠেসে পাচার করতো।

এই রকম আর একটি চমকপ্রদ মামলা থেকে আমরা জানতে পারি লাল পরচুলা পরা, জোকারের সাজে সজ্জিত লুটেরা দলটির কাহিনী। এরা নব্বই সেকেন্ডের মধ্যে ব্যাঙ্ক থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা লুট করার ক্ষমতা রাখত। শহরের সম্ভ্রান্ত নাগরিক হ্যারী ভিকার্সের কাণ্ডকারখানাও কম রোমাঞ্চকর নয়। চুরির জগতে তাঁকে একচ্ছত্র সম্রাট বলা যায়। দীর্ঘ সময় ধরে ইনি তাঁর অপরাধের কোনোরকম সূত্র না রেখে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে চৌর্যবৃত্তি চালিয়ে গিয়েছিলেন।

তবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বেল্ট পার্কওয়ে মামলা রহস্য বোধহয় এসবের চেয়েও কয়েক ধাপ এগিয়ে। কাহিনীর পটভূমি নিউইয়র্ক শহরের ব্রুকলীন অঞ্চল, সময় ১৯৬৭।

৮ জুলাই-এর সকাল

ঝিরঝিরে একটা ঠাণ্ডা বাতাসের স্রোত বয়ে গেলো। এখন ঠিক সকাল সাড়ে আটটা। নৌকায় চড়ে সীপসেড উপসাগরের দিকে ভেসে যেতে যেতে মাঝবয়েসী লোকটা তার হাতের পয়েন্ট টু টু বোরের থ্রী নট থ্রী এনফিল্ড রাইফেল তুলে নিশানা করে। দেড় কিলোমিটার দূরে দেখা যাচ্ছে ব্রুকলীন শহরের বেল্ট পার্কওয়ের রাস্তা আর রাস্তার উপর দিয়ে তীরবেগে ছুটে চলা গাড়ির সারি। ফোর সাইডট্রিপে চোখ রেখে লোকটা একবার ট্রিগারে চাপ দেয়—ফটাস। নিজের অব্যর্থ নিশানায় খুশি হলো লোকটা, পরমুহূর্তে আরেকবার ট্রিগারে টান দেয় সে।

লেফটেন্যান্ট ভিটো ডি সিয়েরার কথা

অ্যাক্সিলেটার দাবিয়ে জীপের গতি বাড়িয়ে আড়চোখে হাতঘড়ির দিকে তাকালাম, ঠিক সাড়ে আটটা। আর দশ মিনিটের মধ্যে আমার পুলিশ স্টেশনে পৌঁছানোর কথা। সামনে একটা উজ্জ্বল হলুদ রঙের ক্যামারো গাড়ি দেখতে পাচ্ছি। চালকের আসনে অল্পবয়েসী একটি স্বর্ণকেশী মেয়ে। কিন্তু হঠাৎ রাস্তা ছেড়ে ক্রমাগত মেয়েটি ডানদিকে হেলে চালাচ্ছে কেন? সর্বনাশ! রাস্তার পাশে ঝোপে ধাক্কা খেয়ে গাড়িটা এলোমেলো ছুটে চলে যে। নিশ্চয়ই গাড়ির নিয়ন্ত্রক বিগড়ে গেছে। আচমকা একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে গাড়ির ইঞ্জিন থেমে যেতেই বুঝলাম ব্যাপার গুরুতর।

পুলিশে কাজ করি বলেই হয়তো আমার স্নায়ুগুলো দ্রুত কাজ করছিল। তৎক্ষণাৎ আমার জীপ থামিয়ে অকুস্থলে ছুটে এসে দেখি মেয়েটি আসনের উপর এলিয়ে পড়েছে, মাথাটা ঝুঁকে আছে সামনের

দিকে। ওর মাথাটা তুলে ধরলাম। দু' চোখের পাতা খোলা থাকলেও তারা দুটো উঠে গেছে কপালের দিকে। এ অবস্থায় ওর কথা বলার ক্ষমতা থাকতে পারে না। ওর লাইসেন্স বই খুলে দেখলাম মেয়েটির নাম ন্যান্সী ইউয়েন। বয়স সতেরো। কাগজপত্রে কোনোরকম অসুখের উল্লেখ নেই, দেহেও কোনোরকম ক্ষতচিহ্ন নেই। তাহলে?

এমন অবস্থায় একটি কাজই করা যায়। চটজলদি টেলিফোন বুথ থেকে কাছাকাছি কোনি আইল্যান্ডের হাসপাতালে একটা অ্যাম্বুলেন্সের জন্য ফোন করলাম।

লেফটেন্যান্ট জ্যাকবের কথা

আমি লেফটেন্যান্ট বার্নি জ্যাকবস, স্থানীয় ৬১ নং ডিটেকটিভ বাহিনীর প্রধান।

লেফটেন্যান্ট ভিটো সিয়েরা যথাসময়েই ন্যান্সী ইউয়েনকে হাসপাতালে পাঠিয়েছিল। টানা আড়াই ঘণ্টা ধরে ডাক্তাররা ন্যান্সীকে বাঁচিয়ে তোলার প্রচণ্ড চেষ্টা করেছিলেন। ডাক্তারদের সব চেষ্টা বিফল করে সোওয়া এগারোটা নাগাদ ন্যান্সীর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেলো। তার পরেই ডাক্তাররা ওর মাথার বাঁ দিকের চুলের মধ্যে একটা ছোট্ট বুলেটের গর্ত দেখতে পেলেন। ঘন চুল আর ক্ষতচিহ্নে ছিটেফোঁটা রক্তের দাগ না থাকায় ক্ষতটা কারোরই চোখে পড়েনি।

আমাদের দপ্তরে সত্যিকারের হৈচৈটা তখন থেকেই শুরু হলো। এ তো পরিষ্কার খুনের ঘটনা। আমাদের তদন্ত শুরু হয়ে গেছে। আমি আপাততঃ অন্যান্য পুলিশকর্মীদের সঙ্গে ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে আছি। অপেক্ষা করছি দক্ষিণ ব্রুকলীনের প্রধান ডিটেকটিভ অ্যালবার্ট সীডম্যানের জন্য। দুপুরের রোদ ক্রমশঃ তীব্র হচ্ছে। জীবন্ত কিংবদন্তী মিঃ সিডম্যানের দূরবীন-চোখ তুচ্ছাতিতুচ্ছ সূত্র খুঁজে বের করতে পারে আর তা থেকে এর আগে বহু রহস্যময় জটিল মামলার সমাধান করেছেন উনি। ভাবছিলাম এবারও ওঁর আরেকটা চমকপ্রদ রহস্য-সমাধান দেখতে পাবো। এমন সময় মিঃ সীডম্যানের কালো রঙের ফোর্ড গাড়িটা আমার সামনে এসে থামলো। গাড়ির পেছনের সীট থেকে নামলেন আটচল্লিশ বৎসর বয়স্ক অ্যালবার্ট। ওঁর কাঁধ চওড়া, চুলের রং রূপালী, দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁটে দারুণ একরোখা ভাব। সসম্ভ্রমে পুলিশকর্মীরা রাস্তা ছেড়ে দিলো ওঁকে।

অ্যালবার্ট ঠোঁট থেকে চুরুট সরিয়ে বললেন, নিহত মেয়েটির সম্বন্ধে কি জানতে পারলে বার্নি?

এরমধ্যে যা কিছু তথ্য সংগ্রহ করা গিয়েছে সব কিছুই বললাম ওঁকে। ন্যান্সী ইউয়েন তার বাবার কনস্ট্রাকশান ফার্মে কাজ করতো। ব্রুকলীনে সেই ফার্মেই যাচ্ছিল মেয়েটি। প্লামবীচ অতিক্রম করার সময় লেফটেন্যান্ট ডি সিয়েরা যা ঘটতে দেখেছিল তাও বিবৃত করতে ভুল করলাম না। তারপর স্বগতোক্তির মতোই বলে বসলাম, মেয়েটিকে কে গুলি করতে পারে?

অ্যালবার্ট স্পষ্টতই বিরক্ত হলেন, কেউ না। গাড়ি যখন সত্তর কিলোমিটার বেগে চলছে সেই সময় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাইফেল শুটারের পক্ষেও মাথার ঠিক ঐ জায়গাটাতে লক্ষ্য করে গুলি চালানো সম্ভব নয়। ঐ ভাবে মারতে হলে তাকে সমান স্পীডে পাশ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তা করলে ভিটোর নজরে পড়তো সেটা।

একেবারে খাঁটি কথা। আমার ভুল বুঝতে পেরে চুপ করে গেলাম। একজন অভিজ্ঞ গোয়েন্দা অফিসার হিসাবে এদিকটা আমার ভেবে দ্যাখা উচিত ছিল।

সীডম্যানের গাঢ় সবুজ চোখ আমার দিকে ফিরলো, কেউ কি গাড়ির জানলাগুলো বন্ধ করে দিয়েছে?

না স্যার, আমি উত্তর দিলাম, যেরকম ছিল সেই রকম আছে, শুধু পেছনের বাঁ দিকের জানলাটা খোলা।

ভ্রূ কুঁচকে ফের গাড়িটার দিকে তাকালেন অ্যালবার্ট, সব জানলার কাচগুলো যখন অক্ষত রয়েছে তখন ঐ জানলাটাই বুলেট ঢোকার একমাত্র পথ। তাহলে পার্কওয়ের একধার থেকে গাড়িটার পেছন

দিক দিয়েই এসেছে গুলিটা। অথবা রাস্তা থেকে প্রায় দুশো মিটার দূরের সাধারণ স্নানাগার থেকেও গুলি করা হয়ে থাকতে পারে। আর একটা সম্ভাবনার কথা ছেড়ে দিলে চলবে না, উপসাগরের কোনো নৌকা থেকেও গুলিটা আসা সম্ভব।

চুরুটে টান দিলেন অ্যালবার্ট, বুলেটটা খুঁজে পেতে হবে। এত ছোটো জিনিস এই বিরাট জায়গা থেকে খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব জানি, কিন্তু সেটা পাওয়া গেলে ঠিক কোনদিক থেকে গুলি করা হয়েছে তা বোঝা যাবে। একটু থামলেন অ্যালবার্ট, উপসাগরের তীরভূমি আর বালিয়াড়ির মধ্যে বুলেটটা খুঁজে বের করতে এমার্জেন্সী সার্ভিস ইউনিটকে ডাকো।

সারাটা দিন ধরে প্লামবীচের সর্বত্র চিরুনি তল্লাশী চললো। কিন্তু কোনো বুলেটই পাওয়া গেলো না। বাস্তবিকই আমার মনে হচ্ছিলো আমরা একটা অসম্ভব জিনিস পাওয়ার চেষ্টা করছি। এরপর শনি ও রবি এই দু' দিনও পুলিশ বৃথা পরিশ্রম করলো। সরকারী কর্মী হিসাবে আমাদের চেষ্টা করতেই হবে, ফল যাই হোক।

সোমবার সীডম্যানের নির্দেশমতো সেনাবিভাগের অস্ত্র-বিশেষজ্ঞরা মেট্যাল ডিটেক্টর দিয়ে অনুসন্ধান চালালো। কিন্তু চতুর্থ দিনেও এতগুলি মানুষের নিদারুণ পরিশ্রমের একমাত্র প্রাপ্য ব্যর্থতা। পাশে দাঁড়ানো অ্যালবার্টের মুখের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বুঝলাম তাঁর মতো প্রতিভাবান গোয়েন্দাও এই মামলায় বিভ্রান্তি বোধ করছেন।

মঙ্গলবার সকালে ন্যান্সী ইউয়েনের শেষকৃত্য সম্পন্ন হলো। অপরাধী প্রায়ই তার কাজের ফলাফল দেখতে আসে। অপরাধ বিজ্ঞানে উল্লিখিত অপরাধীদের এই মানসিকতা বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। তাই সীডম্যান আমার নেতৃত্বে তিনজন গোয়েন্দাকে সেই অনুষ্ঠানে হাজির থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। একজন নার্ভাস প্রকৃতির যুবক প্রার্থনা শেষ হতেই চলে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে আমি গোয়েন্দাদের সতর্ক করলাম। আধঘণ্টা বাদে ওরা তিনজন ঘুরে এসে আমাকে বললো, ছেলেটা ন্যান্সীর স্কুলের বন্ধু। একটা বেসরকারী অফিসে কাজ করে। দেরি হয়ে যাবার দরুন তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছে।

মঙ্গলবার অফিসে বিশেষ সরকারী গোয়েন্দা সংস্থা এফ বি আই রিপোর্ট পাঠালো বুলেটটা থ্রী নট থ্রী বোরের এনফিল্ড রাইফেল থেকে ছোঁড়া হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ঐ মডেলের লক্ষ লক্ষ রাইফেল ব্রিটেনে তৈরি করা হয়েছিল। তারই কয়েক লক্ষ এখন পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে আছে। পাঁচদিন ধরে আমাদের মতো বেশ কয়েকজন ডিটেকটিভ মারফৎ সীডম্যান সমানে অনুসন্ধান চালালেন। সম্প্রতি থ্রী নট থ্রী বোরের এনফিল্ড রাইফেল বিক্রী করেছে এমন কোনো দোকানদারের সন্ধান পাওয়া গেলো না। ঐ অঞ্চলের সর্বত্র অনুসন্ধান চালিয়েও জানা গেলো না বুলেটটা কোথা থেকে এসেছে। বস্তুতপক্ষে আমাদের তদন্ত একই জায়গায় থেমে রইলো। সরকারের কত টাকা এই একটিমাত্র মামলার পেছনে খরচ হচ্ছে, সে সম্পর্কে দেখলাম সীডম্যান বেশ চিন্তিত।

মঙ্গলবার দিন রাতে আমাদের ডেকে সীডম্যান বললেন, কাল সকাল থেকে আমরা কাজ শুরু করবো। ব্রুকলীনের প্রতিটি বাড়ি খুঁজে দেখবো কার কাছে ঐ এনফিল্ড রাইফেল আছে। যেচে কেউ কিছু বলবে না, কিন্তু যখন কোনো ডিটেকটিভ গিয়ে বলবে আমরা সন্ধান পেয়েছি তখন জট খুলতে সময় লাগবে না।

আমরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম। ব্রুকলীনে ত্রিশ লক্ষ লোকের বাস। শহরের একটা অংশ অনুসন্ধানেই কত সময় যাবে, সমস্ত শহরটা খুঁজতে গেলে তো কথাই নেই। আর সীডম্যান বলছেন কি না ত্রিশ লক্ষ লোকের বাড়িতে অনুসন্ধান চালাতে! সারা জীবনেও তো একাজ শেষ করা যাবে না।

আমি বলতে বাধ্য হলাম, এ যে অসম্ভব স্যার। কোথা থেকে শুরু করবো আমরা?

অফিসে ব্রুকলীন শহরের বিরাট একটা মানচিত্র টাঙানো ছিল। সীডম্যানের ডান হাতের তর্জনী মানচিত্রের নিচের দিকের একটা অংশ নির্দেশ করলো, ঠিক এই জায়গা থেকে শুরু করো। আমি

জায়গাটায় দাগ দিলাম। বেল্ট পার্কওয়ের উত্তর দিকের রাস্তা ন্যাপ স্ট্রীট, মৃতা ন্যান্সীর গাড়িটা যেখান থেকে এলোমেলো চলা শুরু করেছিল সেখান থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে। এদিক থেকে বুলেট আসা তো একরকম অসম্ভব। অ্যালবার্টের আঙুল ও জায়গায় এসে থামলো কেন?

বুধবার সকালে আরেকজন ডিটেকটিভকে নিয়ে আমি ন্যাপ স্ট্রীটে হানা দিলাম। দুটো দোকানে খোঁজখবর চালিয়ে পৌঁছালাম একটা পেট্রল স্টেশনে। অফিসঘরে মালিকের সঙ্গে দেখা হলো। মালিক মাঝবয়েসী পুরুষ, নাম থিওডোর ডেলিসি।

আপনার কি রাইফেল আছে? আমি প্রশ্ন করি।

হ্যাঁ, আছে একটা। আমার নৌকার দেরাজে। হিসাবের খাতা দেখায় ব্যস্ত ডেলিসি জবাব দিলেন।

কি রাইফেল?

এনফিল্ড, ডেলিসির চোখ তখনও হিসাবের খাতার উপর, ব্রিটেনে তৈরি রাইফেল।

আমরা কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থাকলাম। আমাদের নীরবতার কারণটা বুঝতে পারলেন ডেলিসি, দেখলাম বিবর্ণমুখে তাকালেন আমাদের দিকে। নিজেই বললেন, ঐ মেয়েটি একটি পয়েন্ট টু টু বোরের রাইফেলের গুলিতে মারা গেছে, তাই না? কাগজে তাই পড়েছিলাম।

পুলিশ স্টেশনে নিয়ে আসা হলো ডেলিসিকে। প্রায় সাত ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো ওঁকে। তিনি যা বললেন তার সারমর্ম এই—

ডেলিসি অবকাশ পেলেই নিজের নৌকায় চড়ে উপসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে মাছ ধরতে বেরিয়ে পড়েন। ওখানে যেমন মাছ আছে তেমনি আছে হাঙর। হাঙরের ভয়ে মাছেরা টোপ ধরতে চায় না। সেজন্য মাঝে মাঝেই মাছ ধরার সময় গুলি করে হাঙর মারারও দরকার হয়।

৮ জুলাই, শুক্রবার পরিষ্কার আকাশ দেখে ডেলিসি তাঁর নৌকায় চেপে মাছ শিকারে বেরিয়ে পড়েন। খাঁড়ি থেকে খোলা সাগরের দিকে এগোতে এগোতে তাঁর চোখে পড়লো ভেসে যাওয়া একটা খালি বিয়ারের কৌটো। তখন সকাল সাড়ে আটটা। ডেলিসি তাঁর হাতের পয়েন্ট টু টু বোরের থ্রী নট থ্রী রাইফেল তুলে নিশানা করেন। দেড় কিলোমিটার দূরে দেখা যাচ্ছে ব্রুকলীন শহরের বেল্ট পার্কওয়ের রাস্তা দিয়ে তীরবেগে ছুটে চলেছে গাড়ির সারি। ডেলিসি একবার ট্রিগারে চাপ দিলেন। শব্দ করে ছুটে গেল বুলেট। নিজের অব্যর্থ নিশানায় খুশি হলেন তিনি। পরমুহূর্তে আরেকবার ট্রিগারে টান দিলেন তিনি।

এবার ডেলিসি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেন। ঢেউয়ের ঝাপটায় বুলেটটা জলের প্রায় এক মিটার উপরে লাফিয়ে উঠে তীরবেগে প্লামবীচের বালিয়াড়ি, ঝোপ অতিক্রম করে বেল্ট পার্কওয়ের পুব দিকের রাস্তা বরাবর ঢুকে গেলো। ঠিক ঐ মুহূর্তে ঐ স্থানে পৌঁছেছিল ন্যান্সী ইউয়েনের ক্যামারো গাড়ি। এক আকস্মিক ও দুর্ভাগ্যজনক সমাপতন। বুলেটের গতি তখন খুবই কমে গেছে, পিছনের কাচ বন্ধ থাকলে কোনো ক্ষতিই হতো না। কিন্তু এমনই নিয়তির বিধান যে ওটাই খোলা ছিল সেসময়ে। বুলেট তাই স্বচ্ছন্দে গাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ে চালকের মাথায় আঘাত করলো।

১৯৬৭ সালের ১৮ জুলাই ব্রুকলীনের ফৌজদারি আদালতে থিওডোর ডেলিসির বিচার হলো। অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য তিনি খুনের মামলা থেকে রেহাই পেলেও শহরের প্রান্তসীমায় বে-আইনী রাইফেল চালানোর অভিযোগে ডেলিসিকে একশো ডলার জরিমানা দিতে হলো।

উপসংহার

এই মামলায় অত্যাশ্চর্য তিনটি যোগাযোগের কথা বলাবলি করে সবাই। যেমন জল, বালি আর ঝোপ অতিক্রম করে দেড় কিলোমিটার দূরে কিভাব বুলেটটা অব্যর্থ আঘাত হানলো ন্যান্সী ইউয়েনের মাথায়। শহরের লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে হত্যাকারী আর নিহত মেয়েটির পরিবারের মধ্যে পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ। আর সবচেয়ে যা বিস্ময়কর তা হলো ঐরকম একটা বিরাট অঞ্চলের মধ্যে কোন জায়গায় রাইফেলের মালিককে পাওয়া যাবে সেটা অ্যালবার্ট সীডম্যান কিভাবে নির্ণয় করলেন।

১৯৭২ সালে অবসর নিয়েছেন জীবন্ত কিংবদন্তী অ্যালবার্ট সীডম্যান। অবসর গ্রহণের আগে উনি নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ ডিপার্টমেন্টের প্রধান পদে উন্নীত হয়েছিলেন। আমি অর্থাৎ যার জবানবন্দীতে এই রহস্যময় সত্য কাহিনীটি শুনলেন সেই বার্নি জ্যাকবস অবসর নিয়েছি বছর দুয়েক হলো। স্মৃতিচারণ করতে বসলেই আমার মনে পড়ে বেল্ট পার্কওয়ের মামলার কথা। আমার প্রাক্তন সহকর্মীদের সঙ্গে কখনো দেখা হলে এই মামলার প্রসঙ্গ ওঠে। ওঁদের কাছেই শুনতে পাই এখন পুলিশ দপ্তরে যেসব নতুন কর্মীরা এসেছেন তাঁদের মধ্যেও এই বেল্ট পার্কওয়ে মামলা নিয়ে হরদম আলোচনা হয়।

[সত্য ঘটনাভিত্তিক বিদেশী কাহিনী]

[বৈশাখ ১৪০১]

প্ল্যানচেট, ফেলুদা ও গোয়েন্দা আর্য সেন

চণ্ডী ভট্টাচার্য

গোয়েন্দা আর্য সেন যে প্ল্যানচেট করতেও জানে—এটা জানা ছিল না কারও। সুনন্দবাবুরা তাঁদের ওপরতলার এই বাসিন্দাটিকে কয়েক বছর ধরে দেখে আসছেন, কিন্তু তাঁরাও কোনোদিন জানতে পারেননি মানুষটির গোয়েন্দাগিরি, উপন্যাস লেখা ছাড়াও ওই গুণটি আছে। সুতরাং আর্য যখন প্রস্তাবটা তুলল, তখন স্বাভাবিকভাবেই কথা উঠল, 'যাহ্, আপনি ওসব পারেন নাকি?'

আর্য হাসতে হাসতে বলল, 'দেখুন পারি কিনা। আমাকে শুধু একটা টেবিল, গোটা কয়েক চেয়ার আর একটা মোমবাতি এনে দিন। প্ল্যানচেটে বিশেষ একজনের আত্মাকে নামাব আমি। সেই আত্মাই বলে দেবে ঘড়িটা কোথায় আছে আর কে-ই বা নিয়েছে সেটা। এখন আপনারাই ঠিক করুন প্ল্যানচেটে কাকে ডাকবেন, মানে কার আত্মাকে ডাকা যেতে পারে।'

সুনন্দবাবুর ছেলে ব্যাসদেব ফেলুদার ফ্যান। সে চেঁচিয়ে উঠল, 'ফেলুদা, ফেলুদা।' ব্যাসের দিদি তৃণাও মত দিল তাতে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ফেলুদাকেই ডাকা হোক।'

কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন সুনন্দবাবু। আর্য তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, আমরা ফেলুদার আত্মাকেই নামাব।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ এল সুনন্দবাবুর ভাই অর্ণবের কাছ থেকে, 'কী বলছেন আর্যদা! ফেলুদা কবে শরীরী ছিল যে, তাকে অশরীরী বানাচ্ছেন?'

এবারও আর্য হাসল মিষ্টি করে। বলল, 'অর্ণব, ফেলুদার কাহিনীগুলো পড়েছ তো?'

'পড়েছি কয়েকটা।'

'আমি সব পড়েছি। স-ব।' ব্যাস বলে উঠল।

তৃণাও ভাইয়ের মতো বলল, 'আমিও পড়েছি।'

'দেখলে তো অর্ণব, ফেলুদা কেমন জনপ্রিয়? অমন একজন গোয়েন্দাকে রক্তমাংসের মানুষ ছাড়া আর কিছু ভাবতে ভাল লাগে? হ্যাঁ, মানছি ফেলুদা শরীরী নয়, সাহিত্যের চরিত্র। তবু এরা যখন বলছে—দেখি না, সাহিত্যের এই বিখ্যাত চরিত্রটি আমাদের প্ল্যানচেটে সাড়া দেয় কিনা?'

অর্ণব তবু কী যেন বলতে যাচ্ছিল, আর্য থামিয়ে দিয়ে বলল, 'এদিকে এসো। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলছি।' বলে দুজনেই উঠে একটু দূরে সরে গিয়ে কথা বলতে লাগল।

কোন কথা হলো কে জানে, ফিরে এসে অর্ণব শুধু বলল, 'দেখুন চেষ্টা করে। আমার কোনো আপত্তি নেই।'

সুনন্দবাবুও আপত্তি করলেন না। আপত্তি করবেনই বা কেন, সোনার ঘড়িটা তো তাঁরই। দাদুর কাছ থেকে পাওয়া। কুচবিহারের রাজপরিবার থেকে দাদুই পুরস্কার হিসাবে পেয়েছিলেন ঘড়িটা। ওই ঘড়িটার গল্প অনেকের কাছেই করেছেন তিনি। দেখিয়েছেনও কাউকে কাউকে। গতকাল সন্ধ্যের কিছু পরে শিবশঙ্কর আর সুনীলবাবু এসেছিলেন। তাঁদেরও দেখিয়েছিলেন ঘড়িটা। স্পষ্ট মনে আছে, রেখেও দিয়েছিলেন সযত্নে। আজ সকালে আর খুঁজে পাচ্ছেন না। তাই তো এই সন্ধ্যেতে ওপরতলা থেকে ডেকে এনেছেন আর্যকে। ঘড়িটা তাঁর খুঁজে পেলেই হলো।

প্ল্যানচেটের উপকরণগুলো গোছাতে গোছাতেই সাতটা। পাঁচজন বসল টেবিলটার চারদিকে—সুনন্দবাবু, আর্য, অর্ণব, তৃণা আর ব্যাস। মিডিয়াম অর্ণব।

আর্যর কথামতো সবাই চুপ। নিঃশব্দেই কেটে গেল অনেকক্ষণ। ঘরের মধ্যে তখন তৈরি হয়ে গেছে থমথমে ভাব, একটা গা-ছমছম করা পরিবেশ।

হঠাৎ নিঃশব্দতা ভেঙে গেল আর্যর কণ্ঠস্বরে, 'ফেলুদা, ফেলু-দা! তুমি এখানে আছ?' কথাগুলো ঘুরে-ফিরে বেড়াতে লাগল ঘরের মধ্যে। কোনো উত্তর এল না।

'ফেলুদা, তুমি আছ এখানে?'

এবারও ফেলুদার আত্মা নিরুত্তর। কিন্তু মোমবাতির শিখাটা কাঁপতে লাগল ভীষণভাবে। সবারই শ্বাস-প্রশ্বাস থমকে গেছে। কী হয় কী হয় ভাব।

'আর ইউ হেয়ার, ফেলুদা?'

এবার শোনা গেল ফেলুদার গলা। যেন বহু দূর থেকে ভেসে আসছে কথাগুলো, 'ই-য়ে-স, ইয়ে-স। আমি এখানে।'

'উইল ইউ হেলপ আস?'

'ই-য়ে-স।'

'আমি তোমার কাছে একটা ধাঁধার উত্তর জানতে চাইব। তুমি বলবে?'

'নি-শ্চ-য়।'

'সুনন্দার সোনার হাতঘড়িটা পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে একটা ধাঁধা তার খোঁজ দিতে পারে।'

'ধাঁধাটা কী?'

'সে এক মজার ধাঁধা—

জ্যা-এর মাঝে জিয়নকাঠি
আমি মোটেই খাই না মাটি
হাইতি থেকে আসেন খাঁটি
বড় সাহেব।
ফক্সে নিলে কুকুরছানা
হবেই গায়েব।

শুনেছ তো ফেলুদা? এখন বলো, এর মানে কী? কী বলতে চাওয়া হয়েছে এর ভেতব দিয়ে?'

কোনো উত্তর নেই।

'কী হলো ফেলুদা, চুপ করে গেলে কেন? কী হবে ধাঁধাটার উত্তর?'

'এ তো সহজেই বোঝা যায়। ছড়াটা একটু ভাল করে পড়লেই হলো। তুমি তো গোয়েন্দা। তুমি বুঝতে পারোনি?'

'আমি তোমার কাছ থেকে শুনতে চাই।'

'আই সী—। প্রথম লাইন থেকে পঞ্চম লাইন পর্যন্ত ১, ২, ৩, ১, ২—এই ধারায় অক্ষরগুলো সাজিয়ে যাও। কী পাচ্ছ উত্তর?'

'জ্যামিতি বক্সে। ঘড়িটা কি সেখানেই আছে?'

'এটা বলব না। তুমি বুঝে নাও।'

'আমার তো সেরকমই মনে হচ্ছে।'

আর্যর কথা শেষ হতেই 'পেরেছে, পেরেছে।' বলে হাততালি দিয়ে উঠল ব্যাস।

কিন্তু তৃণা বলল, 'না, না। জ্যামিতি বক্সে বললেই উত্তর হয়ে গেল না। কার জ্যামিতি বক্সে, তা বলতে হবে। ঘড়িটাকেও খুঁজে বার করতে হবে।'

ততক্ষণে অর্ণব গিয়ে সুইচ অন করে দিয়েছে। সে-ও হাসতে হাসতে বলল, 'ঠিক, ঠিক। গোয়েন্দাকে তো গাড়িটাও খুঁজে বার করতে হবে।'

'বেশ, তা হলে বলি—আজ দুপুর পর্যন্ত কি বিকেল পর্যন্তই ধরুন, ঘড়িটা ছিল ব্যাসদেবের জ্যামিতি বক্সের ভেতরে। কিন্তু এখন নেই। সেটা আবার হাত বদল হয়ে গেছে।'

'সে কি!' তীরে এসে নৌকা ডুবে যাবার উপক্রম দেখে সুনন্দবাবু হতাশ।

আর্য বলল, 'হ্যাঁ। হাত বদল হয়ে অন্য জায়গায় চলে গেছে ঘড়িটা। আর সে কাজটা করেছে ফক্স।'

'ফক্স? ফক্স মানে তো খেঁকশিয়াল!' বললেন সুনন্দবাবু।

আর্য হাসল। বলল, 'নিশ্চয়ই তাই। ঘড়িটা যে নিয়েছে, সে নিজের নাম নিয়েছে ফক্স। কারণ নিজেকে সে শিয়ালের মতোই ধূর্ত মনে করে। অবশ্য ধূর্ত কিছুটা সে ঠিকই। কেননা, ধাঁধাটা তার হাত দিয়েই বেরিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, আমাকে আগ্রহী করে তোলবার জন্যে আজ বিকেলেই চিরকুট পাঠিয়েছে—'সাবধান, এ ব্যাপারে নাক গলাবে না। তাহলে মারা পড়বে।' ধাঁধার ছড়াটা আবার লিখে দিয়েছে চিরকুটের পেছনে। হাতের লেখা দেখে বোঝার উপায় নেই। আবার বুদ্ধি করে ছড়াটা কেটেকুটে দিয়ে এমন ভাব সৃষ্টি করেছে যে, মনে হয় ছড়াটা ফালতু। আসলে সে রহস্য উদঘাটনের একটা পথ খোলা রেখেছে ইচ্ছে করেই। যাতে আমাকে ঘাবড়ে দেওয়া যায়। এতগুলো পাকা কাজ যার মাথা দিয়ে বেরোয়, তার ছদ্মনাম তো ফক্সই হওয়ার কথা।'

'কে সে?'

'কে? সুনন্দদা, সে তো আছে আমাদের কাছাকাছিই।'

অর্ণবও কৌতূহলী হয়ে উঠেছে, 'কে, আর্যদা?'

'বলব?'

'কেন বলবেন না? বলুন, কে সে?'

'সে হল মিস তৃণা মুখার্জী।'

'তৃণা!'

'ইয়েস, ইয়েস। মিস তৃণা। আর তার সঙ্গী ব্যাসদেব।'

তৃণা আর ব্যাস পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল একবার। মাথা কাত করল তৃণা। তারপর একই সঙ্গে সজোরে হাততালি দিয়ে উঠল ভাই-বোনে।

লুকিয়ে রাখা জায়গা থেকে ঘড়ি বার করে এনে দিল তৃণা নিজেই।

সুনন্দবাবুর মুখে হাসি ফুটেছে। বকতে গিয়েও বকলেন না ছেলে-মেয়েকে। বললেন, 'কী করে বুঝলেন, তৃণাই সরিয়েছে ঘড়িটা?'

আর্য বলল, 'প্রথমে বুঝিনি। ভেবেছিলাম সত্যিই চুরি গেছে। কিন্তু হুমকি লেখা কাগজটা যখন পেলাম, তখন একটু সন্দেহ হলো, কাজটা এ বাড়িরই কারও। আর ওই ধাঁধাটা, চোর কি চুরি করে নিয়ে গিয়ে ধাঁধা লিখে ঘড়িটার সন্ধান দেবে? অথচ তাই করা হয়েছে। তাতেই বুঝতে পারি আমাকে এ বাড়িরই কেউ পরীক্ষা করতে চায়। ফেলুদার ফ্যান তৃণা-ব্যাস ছাড়া এ বাড়িতে ও কাজটা করবে কারা? তা ছাড়া আমি তো জানি যে, তৃণার ছড়া লেখার হাত আছে। সুতরাং দুয়ে দুয়ে চার। পেয়ে গেলাম উত্তর। তৃণা আর ব্যাসেরই কাজ। তবে ব্যাস নয়। আসল কাজটা করেছিল তৃণাই। আলমারি খুলে ও-ই সরিয়ে ফেলেছিল ঘড়িটা। ব্যাসকে দেখিয়ে রেখে দিয়েছিল ওর জ্যামিতি বক্সের ভেতরে। কিন্তু এক ফাঁকে ওখান থেকেও সরিয়ে ফেলেছিল সে। যাতে আমি আরও ধাঁধায় পড়ে যাই। আপনি বোধহয় লক্ষ্য করেননি, ঘড়িটা জ্যামিতি বক্সে আছে বলামাত্র ব্যাস হাততালি দিলেও তৃণা দেয়নি। আমি লক্ষ্য করেছিলাম ব্যাপারটা। তখনই বুঝতে পারি, ঘড়িটা জ্যামিতি বক্স থেকে সরিয়ে ফেলেছে তৃণা। কি মিস ফক্স? রহস্য উদ্ধার করতে পেরেছি তো?'

তৃণা সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আমরাও আপনার একটা ব্যাপার ধরে ফেলেছি আর্যকাকু। প্ল্যানচেটে আপনি মোটেই ফেলুদার আত্মাকে নামাননি। ওটা আপনার আর ছোটকার কারসাজি।'

তৃণার কথা শেষ হতেই হো হো করে হেসে উঠল আর্য আর অর্ণব।

[কার্তিক ১৪০৩]

নিখোঁজ নটরাজ

অজিত পূততুণ্ড

কৌস্তভ এবার নিয়ে চতুর্থবার বেনারসে এল। কৌস্তভের মেজ পিসীর বিয়ে হয়েছে বেনারস শহরের চৌধুরী পরিবারে। চৌধুরীরা বেনারসের বনেদী পরিবার। পাঁচ পুরুষ তাঁরা সেখানে বাস করছেন। গঙ্গার কাছেই চমৎকার সাজানো বাড়ি তাঁদের। লোহার গেটটা পেরোলেই বাড়িতে প্রবেশের প্রশস্ত পথ। পথের দু' পাশে মোট চারটি ঘর। বাইরের লোকজন এলে এই ঘরগুলোতেই থাকে।

পথটা একটা খোলা প্রাঙ্গণে গিয়ে মিশেছে। প্রাঙ্গণের ডান দিকে একটা ছোট মন্দির। এই মন্দিরের দেবতা নটরাজ। কষ্টিপাথরের তৈরি নটরাজ মূর্তিটি নৃত্যের ভঙ্গিমায় দাঁড়ানো। কপালে একটি দামী চুনী বসানো। মূর্তিটি অবিশ্যি খুব বড় নয়, মাত্র পাঁচ ইঞ্চি লম্বা। তবে খুবই সুন্দর দেখতে।

এক সময় খুব ধুমধাম করে এই নটরাজের পুজো হতো। তখন নটরাজকে অর্ঘ্য না দিয়ে বাড়ির কেউই মুখে কিছু তুলত না। বাড়ির কর্তা অর্থাৎ কৌস্তভের মেজ পিসীর শ্বশুর মারা যাবার পর থেকেই সে-সব কমতে শুরু করে। প্রায় শূন্যে এসে দাঁড়ায় মেজ পিসীর শাশুড়ী বাতে পঙ্গু হবার পর। এখন কেবল নিয়মরক্ষা করার মতো পুজো হয়।

কুলপুরোহিত দু' বেলা পুজো করে যায়, আর বাড়ির কাজের মেয়ে প্রতিদিন একবার মন্দিরের ধোয়া-মোছা করে। ব্যস।

মন্দির সংলগ্ন প্রাঙ্গণ পেরোলেই চৌধুরীদের ভেতর বাড়ি। ভেতর বাড়ির লম্বা টানা বারান্দার শেষ প্রান্তে কৌস্তভের মেজ পিসীর ভাসুর ধৃতিমান চৌধুরীর নিজস্ব ঘর।

ধৃতিমান চৌধুরী একটু খেয়ালী গোছের মানুষ। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বই-পত্র পড়তে ভালোবাসেন। বিশেষ করে ফিজিক্সের বই তাঁর খুবই পছন্দ। ফিজিক্স নিয়ে এম. এস-সি. অব্দি পড়েছিলেন, কিন্তু কি খেয়ালে পরীক্ষা দেননি।

বেনারস শহরে চৌধুরীদের বিশাল দোকান। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির। এই দোকান ছাড়াও তাঁদের অন্যান্য ব্যবসা আছে।

ধৃতিমানরা তিনভাই। ধৃতিমানের ওপর ইলেকট্রনিকসের দোকানের ভার। বাকি দু' ভাই অন্য ব্যবসা দেখেন।

ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করতে করতেই হালে ধৃতিমানের মাথায় নানা রকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার বাতিক প্রবেশ করেছে। আর এই বাতিকের জন্যই ধৃতিমানকে কৌস্তভের ভালো লাগে। ধৃতিমান চৌধুরীও কৌস্তভকে ভালোবাসেন খুব।

কৌস্তভ বেনারসে এসে ধৃতিমানের সঙ্গে ভিড়ে গেল। ধৃতিমান চৌধুরীকে কৌস্তভ বড়জ্যেঠু বলে ডাকে। যেমন তার পিসতুতো ভাই-বোনরা ডাকে।

কৌস্তভ এবার এসে দেখল ধৃতিমান চৌধুরী নিজের ঘরে স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে আছেন। জরুরী প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে প্রায় বেরোন না। কাউকে ঘরে প্রবেশ করতেও দেন না। দুই ভাইকে বলে-কয়ে মাসখানেকের জন্য দোকান থেকে ছুটি নিয়েছেন।

ধৃতিমান কিন্তু কৌস্তুভকে তাঁর ঘরে প্রবেশ করতে বাধা দিলেন না। কৌস্তুভকে দেখে বরং খুশিই হলেন। বললেন, 'আরে কৌস্তুভ তুই! আয় আয়! ঠিক সময়েই এসে পড়েছিস।'

ঠিক সময় বলতে বড়জ্যেঠু কি বোঝাতে চাইলেন কৌস্তুভ তা বুঝল না। ঘরে প্রবেশ করে তার মনে হলো, সে যেন হঠাৎ একটা ফটোগ্রাফারের স্টুডিওতে এসে পড়েছে।

ঘরের এক কোণে একটা স্ট্যান্ডের ওপর দাঁড় করানো আছে একটা যন্ত্র। সেটাকে দেখতে কতকটা টেলিভিশন ক্যামেরার মতন। যন্ত্রটার পেটের কাছে একটা লম্বা হ্যান্ডেল। বোঝাই যায়, হ্যান্ডেলটা ধরে যন্ত্রটার মুখ এদিক-ওদিক ঘোরানো যায়। যন্ত্রটার মুখ চোঙের মতো। এই চোঙা-মুখে একটা লেন্স লাগানো। ক্যামেরার অদূরে একটা ছোট টেবিলের ওপর একটা টেলিভিশন সেটের মতো যন্ত্র। সম্ভবত সেটা একটা মনিটর।

ঘরের মাঝখানে ক্যামেরার চোঙের মুখোমুখি একটা টেবিল। টেবিলের ওপর রাখা টবে লাগানো একটা ফুলগাছ। টেবিলের ওপর গুটিকয়েক সদ্য ছেঁড়া ফুলও পড়ে আছে। তাছাড়া আরো নানা রকম যন্ত্রপাতি ঘরময় ছড়ানো।

কৌস্তুভ ঘরের চারদিক দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে বলল, 'বড়জ্যেঠু, ব্যাপার কি? এটা কোনো ক্যামেরা নাকি? ফুলগাছের ছবি তুলছেন?'

কৌস্তুভের প্রশ্নে ধৃতিমান খুব খুশি হলেন। মৃদু হেসে বললেন, 'তুই ঠিকই ধরেছিস কৌস্তুভ। এটা একটা ক্যামেরাই। তবে আর পাঁচটা সাধারণ ক্যামেরার মতন নয়।'

কৌস্তুভ তাড়াতাড়ি বলল, 'টেলিভিশন ক্যামেরা নিশ্চয়?'

ধৃতিমান বললেন, 'কাছাকাছি গিয়েছিস। তবে পুরোপুরি ঠিক নয়। মানুষের মস্তিষ্কে যেমন স্মৃতি-কোষ আছে, এই ক্যামেরাতেও তেমনি স্মৃতি-ছবি ধরে রাখার ব্যবস্থা আছে। এবং সেই ছবিও সচল।'

কৌস্তুভ বলল, 'স্মৃতি-ছবি মানে?'

ধৃতিমান হেসে বললেন, 'ক্যামেরা মানেই তো ছবি। সুতরাং ক্যামেরার স্মৃতিতে যা ধরা থাকবে তা তো ছবিই হবে। তাকে স্মৃতি-ছবি ছাড়া আর কি বলতে পারি?'

কৌস্তুভ সামান্য অবাক হয়ে বলল, 'কিন্তু যে-কোনো ছবি মানেই তো স্মৃতি, তাহলে!'

কৌস্তুভকে বাধা দিয়ে ধৃতিমান বললেন, 'হ্যাঁ, তা ঠিক। তবে এই ক্যামেরা আলোকতরঙ্গের স্মৃতি থেকে ছবি তোলে কিনা, তাই।'

কৌস্তুভের কাছে ব্যাপারটা কেমন হেঁয়ালি ঠেকল।

ধৃতিমান এবার বললেন, 'তুই ক্যামেরার সামনে দাঁড়া, তোর একটা ফটো তুলি।'

কৌস্তুভ আদেশ পালন করল। ধৃতিমান কৌস্তুভের একটা ফটো তুললেন। পৃথকভাবে ফুলগাছেরও একটা ফটো তুললেন। দুটো পৃথক ফটো তোলা হলে ক্যামেরা বন্ধ করে বললেন, 'এবার তুই গাছ থেকে একটা ফুল তুলে ফ্যাল।'

কৌস্তুভ আদেশমতো গাছ থেকে একটা ফুল তুলে ফেলল। কৌস্তুভের ফুল ছেঁড়া হলে ধৃতিমান নিজেই টেবিলসহ ফুলগাছটাকে সরিয়ে দিলেন এবং ওই শূন্য স্থানের ছবি তুললেন। তারপর বললেন, 'এবার মনিটারের দিকে তাকিয়ে দ্যাখ আমার ক্যামেরা কি কি ফটো তুলল।'

কথাটা বলেই তিনি মনিটরের একটা বোতাম অন করলেন। মনিটরে প্রথমে কৌস্তুভের ছবি দেখা গেল। টেবিলের ওপর রাখা টবসহ ফুলগাছের ছবি। এবং শেষে কৌস্তুভের গাছ থেকে ফুল তোলার ছবি। শেষের ছবিটা তিনি শূন্য স্থান থেকে তুলেছিলেন।

কৌস্তুভ অবাক হয়ে বলল, 'অদ্ভুত তো!'

ধৃতিমান বললেন, 'হ্যাঁ, অদ্ভুত। আর এই ছবিকেই আমি স্মৃতি-ছবি বলছি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কেমন করে এই স্মৃতি-ছবি উঠছে।'

ধৃতিমান সামান্য সময় চুপ করে বলতে লাগলেন, 'আমরা চারপাশে যে-সব জিনিস দেখতে পাচ্ছি

তারা প্রত্যেকেই তাদের নিজস্ব মানের আলোকতরঙ্গ প্রতিফলিত করছে। কেবল আলোকতরঙ্গই না, এক ধরনের বস্তুতরঙ্গেরও প্রতিফলন ঘটছে। প্রতিফলিত তরঙ্গের মান অনুসারে আমরা প্রত্যেকের রূপ দেখতে পাচ্ছি।'

একটু থেমে ধৃতিমান যোগ করলেন, 'কোনো বস্তু স্থানচ্যুত হওয়ার পরেও কিন্তু বস্তু থেকে প্রতিফলিত তরঙ্গের রেশ থেকে যায়, যেমন কোনো গন্ধদ্রব্য সরিয়ে নেওয়ার পরেও গন্ধের রেশ থাকে। আমার এই ক্যামেরা প্রতিফলিত তরঙ্গের এই রেশটুকু থেকে ছবি তুলতে সক্ষম। তবে তার স্মৃতিতে ওই তরঙ্গের মান সম্বন্ধে পরিপূর্ণ ধারণা থাকা প্রয়োজন। যেমন তোর এবং এই ফুলগাছের তরঙ্গ সম্বন্ধে তার ধারণা হয়েছিল আলাদাভাবে তোলা তোদের ফটো থেকে। সেইজন্য তোর ফুল তোলার ছবিটা সে তুলতে পেরেছে।'

ধৃতিমানের কথা শেষ হতে না হতেই বাইরে বারান্দায় বেশ একটা হৈচৈ শোনা গেল। বাড়ির সকলে মিলে কি একটা জিনিস নিয়ে আলোচনা করছে।

তখন সকাল সাতটাও বাজেনি। এত সকালে কিসের এত হৈচৈ বুঝতে না পেরে কৌস্তুভ কৌতূহলী হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাইরে এসে শুনল, মন্দির থেকে নটরাজের মূর্তি চুরি গেছে।

নটরাজের মূর্তি চুরি! কৌস্তুভের মনটা খারাপ হয়ে গেল।

চৌধুরীদের কুলপুরোহিত মহাদেব ভট্টাচার্যের বয়েস বেশি না। বছর তিরিশ। তার পিতা শিবনাথ ভট্টাচার্যের মৃত্যুর পর থেকে এ বাড়িতে পৌরোহিত্যের কাজ করছে। সকালে পুজো করতে এসে সে-ই প্রথম আবিষ্কার করে সিংহাসনে নটরাজ নেই। এবং তারপর থেকেই বাড়িময় হৈচৈ। এদিকে মেজ পিসীর শাশুড়ী কাঁদতে কাঁদতে কেবলই বলছেন, 'এ যে ঘোর অমঙ্গলের চিহ্ন! নটরাজের অন্তর্ধান এ-যে ভয়ঙ্কর ব্যাপার।'

কথাটা একেবারে মিথ্যে না। চৌধুরী পরিবারের দুশো বছরের ইতিহাসে এমন ঘটনা ঘটেনি। নটরাজের অন্য মূল্য যা-ই থাক না কেন, এর আর্থিক মূল্যও কম না। প্রথমত, কষ্টিপাথরের তৈরি মূর্তি। দ্বিতীয়ত, দামী চুনী বসানো। কাজেই যে চুরি করেছে, সে এর আর্থিক মূল্যের কথা ভেবেই চুরি করেছে। কিন্তু কে চুরি করতে পারে এবং কিভাবেই বা চুরি করতে পারে?

বেনারসে আসার পরের দিন ধৃতিমানের আবিষ্কার দেখে কৌস্তুভ এমনই অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে, তার মনে হয়েছিল, বেনারসের আর কোনো কিছু দেখার প্রয়োজন নেই। বেনারসের সেরা জিনিসটিই তার দেখা হয়ে গেছে। কিন্তু নটরাজের অন্তর্ধানের কথা শোনার পর কৌস্তুভের মনে হলো, আর একবার নটরাজকে না দেখা পর্যন্ত বেনারসের কিছুই দেখা হলো না।

পুলিসে খবর দিলে হয়তো ঝামেলা অনেক কমে যেত। কিন্তু ঠাকুরমা পুলিসকে খবর দিতে দিলেন না। তিনি সজল চোখে বললেন, 'বাবা নটরাজের যা ইচ্ছে তা-ই হবে। তিনি নিজেই গেছেন, তাঁর ইচ্ছে হলে আবার নিজেই ফিরে আসবেন।' তারপর ছেলেদের ওপর সামান্য বিরক্ত হয়েই বললেন, 'তোদের মনে ঠাকুর-দেবতার ওপর ভক্তি-শ্রদ্ধা কি আর আছে? আগের মতো নটরাজকে কি আর মানিস? এখন মন-প্রাণ দিয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানা। তিনি আপনা হতেই ফিরে আসবেন।'

কাজেই ব্যাপারটা ওখানেই থেমে গেল। কৌস্তুভের যুক্তিবাদী মনটা অবিশ্যি থেমে থাকল না। সে চুরি যাওয়ার সম্ভাব্য পথ খুঁজতে লাগল।

কৌস্তুভ প্রথমে চৌধুরী পরিবারের লোকজনকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিল। পরিবারের লোকজনকে বাদ দিলে সন্দেহের তালিকায় থাকে তিনজন, যাদের পক্ষে নটরাজ মূর্তি চুরি করা সম্ভব। এই তিনজনের প্রথম জন পুরোহিত মহাদেব ভট্টাচার্য। দ্বিতীয় জন নতুন কাজের মেয়ে সৌদামিনী এবং তৃতীয় জন চৌধুরীদের দোকানের এক কর্মচারী গণেশ শর্মা।

নটরাজের মন্দিরে বিশাল তালা দেওয়া থাকে। এই তালার চাবি থাকে ঠাকুরমার ঘরে। ঘরের দেওয়ালে একটা পেরেকে চাবি ঝোলানো থাকে। পুরুতমশাই পুজো করতে এলে বাড়ির কেউ না কেউ

ঠাকুরমার ঘর থেকে চাবিটা এনে তার হাতে দেয়। পুরুতমশাই নিজেই তালা খুলে পুজোটুজো করে। যাবার সময় বাড়ির কারো হাতে চাবিটা দিয়ে যায়। চৌধুরীবাড়ির এটাই নিয়ম। মহাদেবের ক্ষেত্রেও এই নিয়মই চলছে।

মহাদেব ভট্টাচার্য অবিশ্যি যজমানিকে পুরোপুরি পেশা হিসেবে গ্রহণ করেনি। তার আসল পেশা স্কুলে শিক্ষকতা তাছাড়া ভালো গানও জানে। বাবার আমলের দু-একটা পৌরোহিত্যের কাজ বজায় রেখেছে মাত্র। সকাল-সন্ধ্যায় চৌধুরীবাড়িতে সাইকেল চেপে আসে। কাঁধে থাকে একটা সাইড ব্যাগ। সাইড ব্যাগে গামছা এবং টুকিটাকি দু-একটা জিনিস। মানুষটি সম্ভবত একটু ভুলো গোছের। পুজো সেরে প্রায়ই এই সাইড ব্যাগটা নিয়ে যেতে ভুলে যায়। মাঝপথ থেকে ফিরে এসে তালাটালা খুলে আবার সাইড ব্যাগ নিয়ে যায়। কাজের মেয়ে সৌদামিনীও অনেক সময় তালা খুলে মহাদেবের হাতে ব্যাগটা তুলে দেয়। মহাদেব দ্বিতীয়বার আর মন্দিরের ভেতর প্রবেশ করে না।

গত সন্ধ্যায়ও মহাদেব ব্যাগটা নিতে ভুলে গিয়েছিল এবং সে যথারীতি মাঝপথ থেকে ফিরে এলে সৌদামিনীই তাকে ব্যাগটা বের করে দিয়েছিল। অনেকেই সেটা দেখেছে। এর অর্থ দাঁড়ায়, মহাদেব যদি নটরাজের মূর্তি চুরি করে থাকে তাহলে গতকাল সন্ধ্যাতেই করেছে। সম্ভবত গায়ের চাদরের আড়ালে নটরাজের মূর্তিটি আগেই লুকিয়ে রেখেছিল। সৌদামিনী সাইড ব্যাগটা বের করে আনার সময় তাড়াতাড়িতে নটরাজের মূর্তি আছে কি নেই সেটা ভালো করে লক্ষ্য করেনি।

আর সৌদামিনী যদি চুরি করে থাকে তাহলে?

সৌদামিনীর বয়েস বেশি না, বছর পঁচিশ। অভাবী, ভদ্রঘরের বিধবা। স্কুলে ক্লাস সেভেন অবধি পড়েছে। মাত্র মাস দুয়েক হলো চৌধুরীবাড়িতে কাজ করতে এসেছে। কে জানে মনে মনে সে কি পরিকল্পনা করে রেখেছিল? হয়তো সে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। গত সন্ধ্যায় তার সামনে সেই সুযোগ এসে উপস্থিত হয়েছিল। মহাদেবের ব্যাগটা বের করে আনার মুহূর্তে অতি দ্রুত নটরাজের মূর্তিটা নিজের আঁচলের নিচে লুকিয়ে ফেলে। হয়তো ইতিমধ্যে তার কোনো আত্মীয় বা কোনো পরিচিত মানুষের হাতে মূর্তিটি পাচারও করে দিয়েছে।

আর বাকি রইল গণেশ শর্মা। সে বছর খানেক হলো চৌধুরীদের ব্যবসায় সেলসের কাজে যুক্ত হয়েছে। গ্রামের ছেলে হলেও খুবই স্মার্ট। হিন্দী তো বটেই, ইংরেজীতেও খুব সুন্দর কথা বলতে পারে। বাংলাও মন্দ বলে না। মাসে একবার গ্রামের বাড়িতে যায়। খুবই উচ্চাভিলাষী ছেলে। অন্য কোথাও থাকার ব্যবস্থা করতে পারছে না বলে চৌধুরীদের বাইরের একখানা ঘরে থাকে। অন্য কোথাও থাকার ব্যবস্থা হলেই সে চলে যাবে। শরীর খারাপ বলে গতকাল সারাদিন সে ঘরেই শুয়েছিল। অর্থাৎ গতকাল গণেশ শর্মার নটরাজ মূর্তি চুরি করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল।

মন্দির-প্রাঙ্গণ খুবই নিরিবিলি। গণেশ শর্মা ইচ্ছে করলেই সুযোগ মতো ডুপলিকেট চাবি তৈরি করিয়ে মন্দিরের তালা খুলতে পারে। সাবান অথবা নরম মাটির ওপর চাবির ছাপ তুলে নিয়ে ডুপলিকেট চাবি তৈরি করা খুব একটা কঠিন ব্যাপার না।

এই তিনজনের মধ্যে আসল দোষী কে তার উত্তর একমাত্র বড়জ্যেঠুর ক্যামেরা দিতে পারে। মনে মনে কথাটা ভাবল কৌস্তুভ। কিন্তু তার আগে প্রয়োজন প্রত্যেকের ফটো। এমনকি স্বয়ং নটরাজেরও একটা ফটো প্রয়োজন।

কৌস্তুভের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। একটা গ্রুপ ফটো পাওয়া গেল। দুর্গাপুজোর সময় তোলা। সেই গ্রুপে সৌদামিনী এবং মহাদেবও উপস্থিত ছিল। উপস্থিত ছিল গণেশ শর্মাও। নটরাজের মূর্তির অনেক ছবিই বাড়িতে ছিল, আর একটা সংগ্রহ করল কৌস্তুভ। তারপর ফটো এবং ছবি নিয়ে হাজির হলো ধৃতিমানের ঘরে। ধৃতিমান তখন তাঁর যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যস্ত।

ধৃতিমানের সামনে গিয়ে কৌস্তুভ বলল, 'বড়জ্যেঠু, এবার আপনার ক্যামেরাকে একটা পরীক্ষা দিতে হবে। কিন্তু পরীক্ষার আগে আপনার ক্যামেরার স্মৃতি-কোষে এই ছবিগুলোর স্মৃতি সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করুন!'

ধৃতিমান প্রথমটা কিছু বুঝতে পারলেন না। তাই ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন সামান্য সময়। কিন্তু কৌস্তুভের হাতের ছবিগুলো দেখেই সমস্ত ব্যাপার তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। তিনি উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'চমৎকার আইডিয়া। দেখা যাক কি হয়।'

ধৃতিমান তাঁর ক্যামেরায় গ্রুপ ফটো থেকে প্রত্যেকের পৃথক পৃথকভাবে ফটো তুললেন। ফটো তুললেন নটরাজের মূর্তিরও। তারপর একসময় নিরিবিলিতে মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করে নটরাজের শূন্য সিংহাসনের ফটো তুললেন।

এবং মনিটরের সাহায্যে ফটোগুলো দেখার পালা। কৌস্তুভের মনটা কৌতূহলে উত্তেজনায় টগবগ করতে লাগল।

মনিটর চালু করতে করতে ধৃতিমান বললেন, 'এই ক্যামেরার স্মৃতি-কোষ শেষ থেকে শুরু করে। তোমার ফুল ছেঁড়ার ক্ষেত্রে কেবল একটাই ফটো ছিল, তাই ওখানে শেষ থেকে শুরু করার প্রশ্ন ওঠেনি। কিন্তু নটরাজের মন্দিরের ক্ষেত্রে তা না হওয়ারই সম্ভাবনা। সেখানে একেবারে শেষে নটরাজের মূর্তিটা যে ধরবে প্রথমে তারই ফটো উঠবে। অবশ্য ক্যামেরাকে যাদের ফটো চিনিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে কাউকে থাকতে হবে।'

ধৃতিমান মনিটর চালু করলেন। ভিডিও রেকর্ড চালু হলো যেন। প্রথমে গ্রুপ ফটোর সব কটা ফটো পৃথক পৃথকভাবে দেখা গেল। তারপর কৌস্তুভ এবং ধৃতিমানকে অবাক করে দিয়ে পর্দায় ভেসে উঠল মহাদেবের চলমান ফটো। মহাদেব ভট্টাচার্য সিংহাসন থেকে নটরাজের মূর্তি তুলে নিল কিন্তু মূর্তিটা সিংহাসনে আর রাখল না।

মহাদেবের ছবিটা দেখেই কৌস্তুভ বলে উঠল, 'তাহলে মহাদেব ভট্টাচার্যের কাছেই নটরাজের মূর্তি আছে।'

মনিটর বন্ধ করতে করতে ধৃতিমান বললেন, 'তাই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু মহাদেব তো তেমন ছেলে নয়। ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত।'

ধৃতিমানের কথা শেষ না হতেই বন্ধ দরজায় টোকা পড়ল। কৌস্তুভ দরজা খুলতেই ওদের দুজনকে অবাক করে দিয়ে ঘরে প্রবেশ করল মহাদেব ভট্টাচার্য। তার পরনে ধুতি, গায়ে সাদা চাদর, কাঁধে কাপড়ের সাইড ব্যাগ।

মহাদেব ঘরে প্রবেশ করে ধৃতিমানের কাছে সরে এসে বলল, 'বড়দা, আপনি কি খুব ব্যস্ত? আপনার সঙ্গে আমার একটা জরুরি কথা ছিল।'

ধৃতিমান সহজভাবেই বললেন, 'বলো তোমার কি কথা। কৌস্তুভের সামনেই বলতে পারো। কৌস্তুভ অত্যন্ত রিলায়েবল।'

মহাদেব ধৃতিমানের কথাটা যেন খেয়ালই করল না। সে বিনা ভূমিকাতেই বলতে লাগল, 'এসব ভড়ং ভালো লাগছে না। বাড়ির কারো শ্রদ্ধা নেই, ভক্তি নেই, আন্তরিকতা নেই। কেবল কতগুলো আনুষ্ঠানিক ব্যাপার চলছে। সকাল-সন্ধ্যায় দীপ-ধূপ-ধুনো, আর ঘণ্টা নাড়ানো। এসবের কি কোনো মানে আছে? বাড়ির সবাই যে-যার মতো চলছে আর একা নির্বান্ধব পড়ে আছেন নটরাজ। যেন নটরাজ এই বাড়ির কেউ না। তা তিনি যখন এ-বাড়ির কেউই নন তখন তাঁকে হটিয়ে দিলেই তো ল্যাটা চুকে যায়। বাড়িতে একটা বাইরের মানুষ দু' দিন থাকলেও বাড়ির লোকজন জিজ্ঞাসা করে, কিগো কেমন আছ? কিন্তু একবারের জন্যও নটরাজের খোঁজ নেয় না কেউ। আমি দু' বেলা আসছি, আর দম দেওয়া কলের পুতুলের মতো কাজ করে যাচ্ছি। এসব ভড়ং না?' মহাদেবের গলায় অভিমানের সুর প্রকাশ পেল।

একটু থেমে সে বলল, 'নটরাজকে তাই বলেছি, তুমি কেন অবহেলা সহ্য করে পড়ে থাকবে? তুমি আমার সঙ্গে এই ব্যাগের মধ্যে থাকো। আমি যেখানে যাব, তুমি যাবে। আমি যখন গান গাইব, তুমি শুনবে। কিন্তু গোলমাল বাধালেন এ বাড়ির বড়মা। তিনি বলে বসলেন, নটরাজ নিজের ইচ্ছাতেই

গেছেন, ইচ্ছে হলে তিনি নিজেই আবার ফিরে আসবেন। কি গভীর বিশ্বাস একবার ভাবুন তো! তখনই বুঝলাম, বড়মার এই গভীর বিশ্বাসের জন্যই নটরাজ অন্যদের অশ্রদ্ধা, অভক্তি গায়ে মাখেন না। নিশ্চিন্তে সব মেনে নেন। আমিও তাই মত বদলেছি। ঠিক করেছি ওই বিশ্বাসের সিংহাসনেই নটরাজকে বসিয়ে দেব। আজই। অন্যদিনের মতো সন্ধ্যারতি সেরে চলে যাবার সময় নটরাজকে রেখে দেব। কাল সকালে বড়মা দেখবেন তাঁর বিশ্বাসের জোরে নটরাজ আবার ফিরে এসেছেন।'

কি একটু ভেবে সে আবার বলল, 'আপনাকে কেন এসব বলছি জানেন? বলছি এই জন্য যে, বড়মা যখন থাকবেন না তখন অন্তত আপনার মনে এই বিশ্বাসটুকু যেন থাকে। আপনি সকলের বড়! আর বড়র তো অনেক দায়! বড়র আচ্ছাদনের আড়ালে থেকে ছোটরা প্রায়ই পার পেয়ে যায়। নইলে নটরাজ বড় ব্যথা পাবেন।'

কৌস্তভ হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল মহাদেবের দিকে। এমন অদ্ভুত লোক সে জীবনে দেখেনি। নটরাজ সম্বন্ধে এমনভাবে কথা বলছে যেন সেই কষ্টিপাথরের মূর্তি সত্যিই কোনো জীবন্ত মানুষ।

মহাদেবের কথার উত্তরে ধৃতিমান মৃদু হেসে বললেন, 'তুমি একটা পাগল ছেলে হে, মহাদেব। এই কথাটা তুমি আমাকে আগেই বলতে পারতে। এত সব কাণ্ড করতে গেলে কেন?'

মহাদেব এবার অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলল, 'আপনার আপনজনের কথা আমায় মনে করিয়ে দিতে হবে, তারপর আপনি মনে করবেন? এ যে লজ্জার কথা! নটরাজের লজ্জা! এত কালের সম্পর্ক আপনাদের!'

ধৃতিমান এবার সত্যিই কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। মহাদেবের একটা হাত ধরে বললেন, 'নটরাজের আর অবহেলা হবে না ভাই। এবারকার মতো তুমি আমাদের মাপ করো। তুমি নিঃশব্দে তাঁকে তাঁর সিংহাসনে বসিয়ে দাও।'

মহাদেবের চোখে-মুখে খুশির আভা ছড়িয়ে পড়ল। তাকে দেখে মনে হলো সে যেন অনেক কিছু পেয়ে গেছে।

পরদিন সকালে নটরাজকে যথাস্থানে দেখে চৌধুরীবাড়িতে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। সবাই এসে জড়ো হলো মন্দিরে। নটরাজের মাহাত্ম্যে সবাই অভিভূত হয়ে পড়ল। সবাই দেখল, আনন্দে মহাদেবের দু-চোখে জলের ধারা।

ধৃতিমান এক সময় কৌস্তভের কানে কানে বললেন, 'আমার ক্যামেরা নিয়ে গর্ব করে লাভ নেই। তার ক্ষমতা খুব সামান্য। সে কেবল মানুষের বাইরের ছবিটাই তুলতে পারে। মহাদেবের মতো মানুষের হৃদয়ের খবর সে দিতে পারে না।'

কৌস্তভ অনুভব করল, কথাটা সত্যি। অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।

[কার্তিক ১৪০৩]

তান্ত্রিকের তুকতাক

মনোতোষ মিশ্র

খবরটা ছড়িয়ে পড়ে। নীলপুরের হস্টেলের পড়ার ঘর থেকে পাড়ায় পাড়ায়। পাড়া ছাড়িয়ে গাঁয়ে-গঞ্জে। হস্টেলের ছেলেরা সন্ধ্যের পর কেউ ঘর ছেড়ে বেরোয় না। প্রথম চোখে পড়েছে মজিদের। তার ঘরের বারান্দার পাশে লাল-হলুদ গাঁদাফুলের সীমাঘেরা কাঁকুরে রাস্তা পেরিয়ে, বড় আমগাছের ডালে কে যেন পা ঝুলিয়ে হাতে বেত নিয়ে বসে থাকে। ভূগোলের মিলু স্যারের মতো অবিকল দেখতে। মিলু স্যার ম্যালেরিয়ায় মারা যাওয়ার পরও নীলপুর হস্টেলের মায়া ছাড়তে পারেননি। মজিদ থেকে মানব, বিভাস, অমিত, বিশু, নন্দ হয়ে এলাকা জুড়ে খবরটা ছড়িয়ে পড়ে।

প্রথমে হস্টেল সুপার নিমাই স্যার বিশ্বাস করেননি। কিন্তু একদিন মিলু স্যারের প্রাণের বন্ধু নিমাই স্যারও দেখেছেন। সেই থেকে তিনিও ভয়ে ঘর ছেড়ে বেরোন না। মাঝে মাঝেই আতংকের সুরে আওড়ান, আমডালে মিলু দোলে, আমডালে মিলু দোলে। সন্ধ্যে হলেই দরজা বন্ধ করে রাম-লক্ষ্মণের ছবিতে ধূপ-ধুনো দিয়ে শুয়ে পড়েন। কিন্তু এতগুলো ছেলের দায়িত্ব তাঁর উপর সুতরাং কিছু একটা উপায় চাই। খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে তান্ত্রিকের। ছড়ারপুর গাঁয়ের ডাকসাইটে তান্ত্রিক কমল গোঁসাইয়ের ডাক পড়েছে। ভীষণ নামডাক। দু-চারদিন পর সব ঠিক করবেন বলে নিমাই স্যারকে খবর পাঠিয়েছেন। কিছুদিন আগে হরি মুখুজ্যের নাত-বৌ-এর ভূত ছাড়িয়ে প্রতিপত্তি আরো বেড়েছে। লাউদোহা শ্মশানঘাটে অমাবস্যার রাতে তন্ত্রসাধনা করেন। চোর-ডাকাতও ভয়ে শ্মশানঘাটে যায় না। ছ-ফুট লম্বা, মাথায় জটা, বড় বড় চোখ, রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে সাপের মতো একটা লাঠি। দিনের বেলায় তাঁকে দেখলে ছোট ছেলে-মেয়েরা ভয়ে পালায়। তান্ত্রিকের তুকতাক আর জড়িবুটির ভয়ে বড়রা তাঁকে এড়িয়ে চলে। সেই ডাকসাইটে তান্ত্রিক এবার হস্টেলে শান্তি ফেরাবেন।

আম-জাম-কাঁঠাল-বট-নিমগাছে ঘেরা ছবির মতো হস্টেল। একটু দূরেই ছোট পাহাড়। শালডিহা পেরিয়ে বিরাট শালবন। নামেই শালবন। কি গাছ নেই এই বনে। সবরকমের গাছে ঘেরা শালবনে দিনের বেলায় গা ছম-ছম করে।

হস্টেল সুপার নিমাইবাবু আর ভূগোলের মিলু স্যার রোজ বেড়াতেন ছোট পাহাড়ে। কোনো কোনো দিন ক্লাস নাইনের ছাত্র মিতুনও স্যারদের সঙ্গে যেত। একদিন মিলু স্যার ছোট পাহাড়ের ঝরনার পাশে বসে নিমাই স্যারকে জিজ্ঞেস করেন, নিমাই বলতে পারিস শালবনের ঐ গাছগুলোর কত বয়স?

তোর এই নীলপুর স্কুলে এসে আমি নিজের বয়সই ভুলে গেছি।

কেন! এত সুন্দর সবুজে ঘেরা ছবির মতো হস্টেল তোর খারাপ লাগে?

দূর! দূর! কি রকম যেন সব ভুতুড়ে ভুতুড়ে। গাছগুলো যেন গিলতে আসে।

গাছগুলো নয়, আমি তোকে ভূত হয়ে গিলতে আসব। সোজা ঐ শালবনে নিয়ে গিয়ে তোকে আমি চিঁবিঁয়ে খাঁব।

তোকে বিশ্বাস নেই, তুই সব পারিস মিলু।

ভয় পাচ্ছিস বোধ হয় নিমাই? জানিস ঐ যে দুরের বটগাছটা, ওখানে কয়েকজন গলায় দড়ি দিয়ে

আত্মহত্যা করে ভূত হয়েছে। গাছের তলা দিয়ে রাতের বেলায় কেউ গেলেই ঝুপ করে তুলে নিয়ে চিঁবিঁয়ে চিবিঁয়ে খাঁয়।

তুই আমাকে বাচ্চা ছেলে পেয়েছিস?

মোটেই না, এক অমাবস্যার রাতে গাছটার তলা দিয়ে যদি যেতে পারিস তাহলে বুঝবো তোর কত সাহস। ভূতেরা তখন হাতে দড়ি নিয়ে তোকে ডাকবে আঁয় আঁয় আঁয়।

চুপ কর। যত সব.....

সেই হাসি-খুশি মানুষটা মারা যাওয়ার পর আমডালে ভূত হয়ে দোল খাচ্ছেন, ব্যাপারটা কিন্তু মিতুনের কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। মিতুন রোগা-পটকা হলে কি হয়, ভীষণ সাহসী। হস্টেলের ছেলেদের মধ্যে মিতুনই অবাস্তব গালগল্প বিশ্বাস করে না। ভূত-টুত, তন্ত্র-মন্ত্র একেবারেই না। দু-চারদিনের মধ্যেই তান্ত্রিক নাকি ভূগোল স্যারের আত্মাকে কৌটোবন্দী করে শালডিহার শালবন ছাড়িয়ে উড়িয়ে দেবেন আকাশে। যতসব বুজরুকি। স্যারের কথা খুব মনে পড়ছে তার। শুধু পড়াশুনো নয় কতরকমের গল্প বলতেন ঐ আমগাছের নিচে বসে। রামায়ণ, মহাভারত, বিজ্ঞানের টুকিটাকি, আরো কত কি। মঙ্গল গ্রহের কথা শোনাতেন। এমন সুন্দর করে বলতেন মনে হতো মঙ্গল গ্রহ যেন চোখের সামনে। যে কোনো বিষয়কে মিলু স্যার এমনভাবে বোঝাতেন যা ভোলা যায় না। বার বার মনে পড়ছে মিতুনের। স্যার বলতেন, কানের সঙ্গে মনের যোগ না হলে যেমন ঠিক শোনা হয় না, তেমনি চোখের সঙ্গেও মনের যোগ না হলে দেখেও কিছু দেখা হয় না। তোরা এই ক'দিনে কত শুনেছিস, কত কিছু দেখেছিস কিন্তু ক-টা মনে আছে তোদের? এই যে মিতুন সেদিন আমার সঙ্গে শালবনে গিয়ে পাখির বাচ্চাটা মরে যাবে বলে মহুয়া গাছের বাসায় রেখে এসেছিল, তারপরে প্রায় দশবার জিজ্ঞেস করেছে, স্যার বাঁচবে তো বাচ্চাটা? মহুয়া গাছে আবার সাপ নেই তো? আরো কত কি। তার মানে পাখির বাচ্চাটার মরা-বাঁচার ব্যাপার দেখে শুধু চোখ নয় যোগ করেছিল মনও। মনোযোগ যে কোনো বিষয়ের সফল হওয়ার চাবিকাঠি। বুঝেছিস?

হাসি-খুশি সেই মানুষটা ম্যালেরিয়ার জ্বরে মারা গিয়ে ভূত হয়েছেন। অসম্ভব! হতেই পারে না। স্যার এখন মেঘ হয়ে আকাশ, বাতাস, পাহাড়, নদী, শালবন, ফুলের পাপড়ি ছুঁয়ে ছুঁয়ে সাগরে মিলিয়ে গেছেন। চিকচিক করে ওঠে মিতুনের চোখ।

সাহসে ভর করে তার শরীরে, হস্টেলের ঘর থেকে টর্চটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সে। রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। হস্টেল সুপারের ঘরে উঁকি মেরে দেখে তিনি আরামে ঘুমুচ্ছেন। রাম-লক্ষ্মণের ছবিতে ধূপ জ্বলছে জোনাকির মতো। জোনাকি রাস্তাতেও। তেঁতুল গাছের পাতায় পাতায় চাঁদের আলোর ঝিকিমিকি। ঝিঁঝি পোকার একটানা কান্না। তেঁতুলগাছটা পেরিয়ে থমকে দাঁড়ায় মিতুন! আলো-আঁধারিতে কে একটা একমুখ দাড়ি নিয়ে এগোয় আর পিছোয়, হাতে একটা লাঠি! মিতুন পিছন ঘুরে দেখে তেঁতুল গাছের মাথায় ফট-ফট, ফট-ফট আওয়াজ! মনে হয় পাখিদের ঝটপটানি। আগে তো নীলপুরের তারিণী খুড়ো তেঁতুলগাছের ডাল থেকে হস্টেলের পাঁচিল পেরিয়ে খেজুর গাছের মাথায় জাল বেঁধে রাখত বাদুড় ধরার জন্য। বাদুড়রা ফল খেয়ে নিঝুম রাতে সাঁকাই-সিন্নির জঙ্গলে ফেরার পথে ধরা পড়ত তারিণী খুড়োর ফাঁদে। কিন্তু মিলু স্যারের খবরটা ছড়িয়ে পড়ার পর সব চুপচাপ। সামনে কিন্তু দাড়িমুখোটা লাঠি নিয়ে এগোয় আর পিছোয়। পিছোয় আর এগোয়।

মিতুনের একটু ভয় ভয় করে। তবে কি মিলু স্যার আমডাল থেকে নেমে.....? যা হবে হবে, এই চিন্তা করে সে এগিয়ে যায়। এবার সে হেসে ফেলে। এতদিন ধরে দেখছে তবু কলাগাছগুলোর কথা মনে পড়েনি তার! একটা দলছুট কলাগাছ মোচাসহ বাতাসে দুলছে। আলো-আঁধারিতে মনে হচ্ছে দাড়িমুখো মানুষটা এগোচ্ছে আরা পিছোচ্ছে। মনে সাহস বাড়ে তার। দূরের বড় আমগাছটার দিকে চোখ রাখে। কিন্তু একি! সত্যিই তো সাদা পাঞ্জাবি পরে বেত হাতে কে যেন দুলছে! হস্টেলের পাঁচিলের

ওপাশ থেকে কর-র-র-র, কর-র-র-র একটা আওয়াজ আসছে। মিতুন গা থেকে জামাটা খুলে ফেলে পাঁচিলের গা ঘেঁষে পা টিপে টিপে এগিয়ে যায়। আমগাছের কাছে এসে কালো পাথরে উঠে দেখতে পায় নিচে কে যেন হাতে একটা লাঠি নিয়ে কি একটা ঘোরাচ্ছে, আর সেটা শব্দ করছে কর-র-র-র, কর-র-র-র। উপরে আমডালে সাদা পাঞ্জাবি পরে বেত হাতে কেউ দুলছে।

এবার মিতুনের সন্দেহ হয়। কালো পাথরের উপর থেকে নেমে একটা বড় আকারের পাথর নিয়ে অনেক কষ্টে আবার কালো পাথরের উপরে ওঠে সে। নিচু হয়ে থাকা লোকটার কোমর লক্ষ্য করে পাথরটা ফেলে দেয়। 'বাবারে গেলাম রে' বলে একটা বিকট চিৎকার করতে করতে থেমে যায়। ভয় পায় মিতুন, মরে গেল না-কি লোকটা? পাঁচিল টপকে নেমে পকেট থেকে টর্চটা বার করে দেখে তান্ত্রিক কমল গোঁসাই পাথরের ঘায়ে কোমর বেঁকে মুখ থুবড়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। পাশে একটা ঝুড়িতে দড়ি, ঝাঁটা, আয়না, হুইল। আর কালো নাইলনের সুতোটা আমডালে খড়ের কাকতাড়ুয়ার পাঞ্জাবির সঙ্গে বাঁধা। নিচ থেকে হুইল গোটালেই পাঞ্জাবিটা দোলে আর হুইলটার আওয়াজ হয় কর-র, কর-র। সবাইকে ভয় দেখানোর কারসাজি। ভণ্ড তান্ত্রিক এইভাবে ভয় দেখিয়ে রোজগার করে।

মিতুন তাড়াতাড়ি দড়ি দিয়ে তান্ত্রিকের হাত দুটো শক্ত করে বেঁধে সোজা হস্টেলে এসে চিৎকার করে, 'ভূত ধরেছি, ভূত ধরেছি।' চিৎকার শুনে মজিদ, মানব, বিভাস, অমিত, বিশু, নিমাই স্যার, নন্দ, অশোক, মৃণাল আরো সবাই উঠে আসে। মিতুনের কাছে সবকিছু শুনে সবাই এগিয়ে যায়। হস্টেলের পাঁচিল পেরিয়ে আমগাছের নিচে গিয়ে দেখে সত্যিই তান্ত্রিক কমল গোঁসাই যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। সবাই মিলে তান্ত্রিক বাবাজিকে হস্টেলে নিয়ে আসে। হস্টেল সুপার বলেন, গোঁসাইকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে পাঠাতে হবে। গাঁয়ের লোকজনদের খবর দাও, সবাইকে ভণ্ডামিটা দেখাতে হবে। এতদিনে ডাকসাইটে, লোকঠকানো তান্ত্রিকের তুকতাক এবার শেষ। সাবাস মিতুন। তুই সাহস করে এগিয়ে না গেলে রহস্যের সমাধান হতো না, এবার তোরা সবাই শান্তিতে পড়াশোনা করতে পারবি।

নীলপুর হস্টেলে, আশেপাশের গাঁয়ে ঘরে নেমে আসে খুশির জোয়ার। নিঝুম রাতে সবুজ ছায়াঘেরা ছবির মতো স্কুলের ঘাসে ঘাসে গাছের পাতা ছুঁয়ে নেমে আসে চাঁদের আলোর ঝিকিমিকি, চিকিমিকি।

[পৌষ ১৪০৮]

রতনগড়ের রানীমা

চুনীলাল সরকার

ক্রিং ক্রিং, ক্রিং ক্রিং, ...

সেদিন সকালে ডক্টর ডিসুজার উন্মাদ আশ্রম 'হ্যাপি নুক'-এর টেলিফোনটা বেজে উঠল।

হ্যালো, ডঃ ডিসুজা স্পীকিং।

আমি রতনগড়ের দেওয়ানজী বলছি।

বলুন, আপনার জন্য কী করতে পারি?

আমাদের রানীমা আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চান।

কী ব্যাপার বলুন তো? ডঃ ডিসুজা খাড়া হয়ে বসলেন।

ব্যাপারটা টপ সিক্রেট। টেলিফোনে বলা যাবে না। আপনি আজকের একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে পারবেন? দি ম্যাটার ইজ এক্সট্রিমলি আরজেন্ট।

জাস্ট আ মিনিট। ডঃ ডিসুজা ডায়েরিতে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, সন্ধ্যে ছ'টার পরে আসুন, ততক্ষণে ভিজিটররা সবাই চলে যাবে।

থ্যাঙ্কু।

কাঁটায় কাঁটায় সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টায় কালো রঙের একখানা ঝাঁ চকচকে লিমুজিন হ্যাপি নুকের নুড়ি বিছোনো পথ ধরে বাগান পেরিয়ে সোজা পোর্টিকোর সামনে এসে দাঁড়াল। গাড়ির বনেটে রতনগড় এস্টেটের পতাকা শোভা পাচ্ছে। বুলেটপ্রুফ কালো কাচে ঢাকা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত গাড়িটির দিকে এক নজর তাকালে সমীহ না করে পারা যায় না।

সাদা উর্দীপরিহিত গাড়ির চালক গাড়ি থেকে নেমে সসম্ভ্রমে পেছনের দরজা খুলে দাঁড়াল। এক রমণী শান্তভাবে লঘু পায়ে গাড়ি থেকে নেমে এলেন। সর্বাঙ্গ থেকে রূপ যেন ঠিকরে পড়ছে। বিশেষ করে থুতনির ছোট্ট তিলটি তাঁকে তিলোত্তমা করে তুলেছে। চালচলনে রাজকীয় আভিজাত্যের ছাপ স্পষ্ট। ইনিই রানীমা।

দেওয়ানজী এবং রানীমার দেহরক্ষীও গাড়ি থেকে নেমে এলেন। দেহরক্ষীর পরনে গাঢ় জলপাই রঙের পোশাক চালক এবং রক্ষী উভয়ের বুক-পকেটের একটু ওপরে ধাতব পাতে তাঁদের নাম খোদিত রয়েছে এবং দুই স্কন্ধপ্রান্তে উজ্জ্বল পেতলের পাতে ইংরেজি অক্ষরে 'রতনগড় এস্টেট' কথা দুটি জ্বলজ্বল করছে।

দেওয়ানজী রানীমার সঙ্গে ডঃ ডিসুজার পরিচয় করিয়ে দিলেন। সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোতেও তাঁর ওপরের পাটির সোনাবাঁধানো দাঁতটি চকচক করে উঠল। ডঃ ডিসুজা রানীমাকে করজোড়ে অভ্যর্থনা করে তাঁর চেম্বারে নিয়ে গেলেন।

দেওয়ানজী অল্প কথায় ডঃ ডিসুজাকে রানীমার আগমনের কারণ বুঝিয়ে বললেন। সম্প্রতি রতনগড়ের রত্নভাণ্ডার থেকে এক বাক্স মহামূল্যবান হীরে রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে গেছে যেগুলির আর্থিক মূল্যের চেয়ে পারিবারিক মূল্য রাজাবাবুর কাছে অনেক বেশি। অ্যানুয়াল স্টক টেকিংয়ের সময় ব্যাপারটা ধরা পড়েছে। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও বাক্সটি উদ্ধার করা যায়নি। বর্তমান রাজাবাবু এগুলি তাঁর পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন। এর উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরবর্তী

বংশধরদের হাতে তুলে দিয়ে যাওয়া রাজাবাবুর পবিত্র দায়িত্ব এবং কর্তব্য। সেই দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালনে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হওয়ায় রাজাবাবু মানসিক দিক দিয়ে ভীষণ ভেঙে পড়েছেন। দিন দিন অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। ইদানিং এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে রাজাবাবুর রীতিমতো মানসিক চিকিৎসার প্রয়োজন।

রানীমা একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

ডঃ ডিসুজা সব শুনে বললেন, পেশেন্ট কোথায়? তাঁকে আনেননি কেন?

দেওয়ানজী বললেন, রাজাবাবুকে আনার আগে রানীমা একবার আপনার আশ্রমটি ঘুরে দেখতে চান।

ওহ্ সিওর। বলে ডঃ ডিসুজা নিজে রানীমাকে সমস্ত আশ্রমটি পুঙ্খানুঙ্খ ঘুরিয়ে দেখালেন। আশ্রমের ব্যবস্থাপনায় সন্তুষ্ট রানীমা ভি আই পি পেশেন্টদের জন্য সংরক্ষিত দু'টি বাতানুকূল কেবিনের একটি রাজাবাবুর জন্য অ্যাডভান্স বুক করলেন। রানীমার ইশারায় দেওয়ানজী একটি অ্যাটাচি খুলে পাঁচশ টাকার একটি বান্ডিল ডঃ ডিসুজার হাতে দিলেন। ডঃ ডিসুজা কী একটা বলতে যেতেই রানীমা মৃদু স্বরে বললেন, ও কিছু নয়। আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাজাবাবুকে সারিয়ে তোলার চেষ্টা করুন।

ডঃ ডিসুজা কথা দিলেন, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। রাজাবাবুকে কী আজই আনছেন?

হ্যাঁ আজই। কিন্তু ওঁকে আনাই তো মুশকিল। তাছাড়া উনি যদি ঘুণাক্ষরেও টের পান ওঁকে উন্মাদ আশ্রমে আনা হচ্ছে তাহলে হয়তো একটা অনর্থ বাধিয়ে বসবেন।

তাহলে কী করবেন?

আমার মনে হয়, আপনি যদি একটা ঘুমের ওষুধ লিখে দেন তাহলে আর ঝামেলা থাকে না। আমি ওঁকে কিছুর সঙ্গে মিশিয়ে খাইয়ে দেব। উনি বুঝতে পারবেন না।

ডঃ ডিসুজা এক মিনিট ভেবে একটা প্রেসক্রিপশন লিখে দিলেন।

হ্যাপি নুক থেকে বেরিয়ে একটা ওষুধের দোকান হয়ে রানীমার গাড়ি সোজা বৌবাজারের বিখ্যাত হীরে ব্যবসায়ী ফুলচাঁদ ঝুনঝুনওয়ালার দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। ঝুনঝুনওয়ালার দোকান তাঁর বাড়ির নিচেই। মাস খানেক আগে রানীমা এখান থেকে এক সেট বহু মূল্যবান জড়োয়ার গয়না কিনেছিলেন। তাই রানীমার গাড়ি আসতে দেখেই ঝুনঝুনওয়ালা স্বয়ং তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এসে রানীমাকে সাদর অভ্যর্থনা করে ওপরে নিজের খাস কামরায় নিয়ে গেলেন এবং হাঁকডাক করে লস্যি আর লাড্ডু আনতে বললেন। দেওয়ানজী তৃপ্তি করে খেলেও অনেক অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও রানীমা কিছুই ছুঁয়ে দেখলেন না।

আগেরবার রাজাবাবু স্বয়ং এসেছিলেন। এবার রানীমাকে একা দেখে ঝুনঝুনওয়ালা জিগ্যেস করলেন, রাজাবাবু এলেন না?

দেওয়ানজী সব খুলে বললেন। ঝুনঝুনওয়ালা শুনে হায় হায় করতে লাগলেন।

দেওয়ানজী বললেন, আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।

বোলেন।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এক বাক্স উৎকৃষ্ট হীরে যোগাড় করে দিতে হবে। টাকার জন্য ভাববেন না। যত দাম চান দেব। কিন্তু রাজাবাবুর পছন্দ হওয়া চাই। আমরা ওগুলো দেখিয়ে রাজাবাবুকে বলব তাঁর খোয়া যাওয়া হীরে খুঁজে পাওয়া গেছে। তাহলে উনি ভাল হয়ে উঠতে পারেন। ব্যাপারটা বুঝেছেন?

ঝুনঝুনওয়ালা চোখ গোল গোল করে বললেন, এই কোথা? দক্ষিণ আফ্রিকার কিম্বার্লি খনির নাম শুনিয়েছেন?

কেন বলুন তো?

ওর চেয়ে ভাল হীরে তামাম দুনিয়ায় খুঁজে পাবেন না। হামি ওদের ইস্টার্ন জোনের সোল এজেন্ট আছি।

তাই নাকি? তাহলে তো আমরা ঠিক জায়গাতেই এসেছি।

ঝুনঝুনওয়ালা সিন্দুক খুলে এক বাক্স হীরে বের করে এনে রানীমার সামনে মেলে ধরে বললেন, দেখেন, পসন্দ্ হোয় কি না।

রানীমা নিস্পৃহভাবে বললেন, আমার পছন্দে-অপছন্দে তো হবে না। রাজাবাবুর পছন্দ হওয়া চাই। আপনি একবার আমাদের সঙ্গে যেতে পারবেন? তাহলে খুব ভাল হয়।

ঝুনঝুনওয়ালা একটু ইতস্তত করে বললেন, কুথায় যেতে হোবে?

হোটেল প্যারাগন।

লেকিন হামার যাওয়া কী ঠিক হোবে? রাজাবাবু হামাকে দেখলে সন্দেহ করতে পারেন। তাছাড়া হামার গাড়িটাও.....

ঝুনঝুনওয়ালা শেষ করার আগেই রানীমা বললেন, আপনি রাজাবাবুর সামনে যাবেন কেন? রিসেপশনে একটু অপেক্ষা করবেন। আমরা রাজাবাবুকে একবার দেখিয়ে নিয়েই ডিসিশন নেব। আর গাড়ির জন্য ভাববেন না। আমার গাড়ি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাবে।

ঝুনঝুনওয়ালা কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে বললেন, ঠিক আছে। আপনারা গাড়িতে গিয়ে বোসেন, হামি সিন্দুক বন্ধ করিয়ে আসছে।

গাড়ি স্টার্ট করতে দেওয়ানজী একটি সুদৃশ্য রুপোর ডিবে খুলে তবকে মোড়া এক খিলি পান আয়েস করে মুখে পুরলেন। সৌজন্যবশত ঝুনঝুনওয়ালাকেও এক খিলি দিলেন। ঝুনঝুনওয়ালা আরামসে পান চিবোতে চিবোতে দেওয়ানজীর কোলে ঢলে পড়লেন।

রানীমার গাড়ি ফিরে আসতেই হ্যাপি নুকে আবার সাড়া পড়ে গেল। ডঃ ডিসুজার নির্দেশে ঝুনঝুনওয়ালা ওরফে রাজাবাবুকে স্ট্রেচারে শুইয়ে কেবিনে নিয়ে যাওয়া হলো। রানীমা আবার পরের দিন সকালে আসবেন বলে সেদিনের মতো বিদায় নিলেন।

এদিকে এত রাত হয়ে গেল অথচ ঝুনঝুনওয়ালা ফিরে এলেন না দেখে তাঁর বাড়ির লোক উসখুস করতে লাগলেন। এই আসবে, এই আসবে, করতে করতে রাত বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর রীতিমতো উদ্বিগ্ন হয়ে হোটেল প্যারাগনে ফোন করলেন। ঝুনঝুনওয়ালা তাঁদের বলে গিয়েছিলেন তিনি কোথায় যাচ্ছেন। হোটেলে হদিস করতে না পেরে খোদ লালবাজারে খবর দিলেন।

ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট (ক্রাইম ব্রাঞ্চ) থেকে সরেজমিনে তদন্ত করতে এসে তারা বিশেষ কিছুই জানতে পারল না। গাড়ির নম্বরটা পর্যন্ত কেউ লক্ষ্য করেনি। ঝুনঝুনওয়ালার খাস কামরায় তখনও লস্যি আর লাড্ডুর পাত্রগুলো ছড়ানো অবস্থায় ছিল। টেবিলের এক কোণে হঠাৎ একটি শৌখিন লেডিস পার্স পুলিশের নজরে পড়ল। তার ভেতরে শ'খানেক টাকা, একটি রুমাল আর ডঃ ডিসুজার প্রেসক্রিপশনটি পাওয়া গেল। যে ছেলেটি লস্যি এবং লাড্ডু পরিবেশন করতে ঢুকেছিল সে পার্সটিকে রানীমার বলে সনাক্ত করল।

এই ক্লুটুকু ধরেই পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে হ্যাপি নুকে এসে হাজির হলো। এত রাতে পুলিশ আসতে দেখে ডঃ ডিসুজা খুব হকচকিয়ে গেলেন। সব শুনে তিনি ওদের ঝুনঝুনওয়ালার কেবিনে নিয়ে গেলেন। পুলিশ ফটোর সঙ্গে মিলিয়ে ঝুনঝুনওয়ালাকে সহজেই সনাক্ত করল। ঝুনঝুনওয়ালা তখন তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় কী একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন। ডঃ ডিসুজার নির্দেশে কড়া করে দু'কাপ ব্ল্যাক কফি খাইয়ে দিতেই তন্দ্রাভাবটা কেটে গেল। তিনি বিছানায় ওপর উঠে বসলেন।

একে একে সমস্ত ঘটনা তাঁর মনের কোণে উঁকি মারতে লাগল। গাড়িতে পান খেয়ে তিনি দেওয়ানজীর কোলে এলিয়ে পড়লেন। সেই সুযোগে দেওয়ানজী তাঁর পকেট থেকে হীরের বাক্সটা হাতিয়ে নিলেন। বুঝতে পারলেও তিনি বাধা দিতে পারলেন না। তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন ভেবে ওরা নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করে কথা বলছিল। তিনি কিন্তু তখনও পুরোপুরি চেতনা হারাননি। সব কথাই কানে যাচ্ছিল।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত দু'টো বাজল। ঝুনঝুনওয়ালা কপালে করাঘাত করে বললেন, চিড়িয়া ভাগ গিয়া।

ইন্সপেক্টর পাকড়াশী ঝুনঝুনওয়ালার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললেন, কার কথা বলছেন?

ঝুনঝুনওয়ালা চিৎকার করে উঠলেন, ঐ ছদ্মবেশী রানীমা আর দেওয়ানজী দমদম থেকে মুম্বাই হয়ে হামার হীরের বাক্স লিয়ে দুবাইয়ের দিকে পালাচ্ছে। হায় হায়! হামার হীরের কী হোবে?

ইন্সপেক্টর সঙ্গে সঙ্গে মোবাইল ফোনে দমদম বিমানবন্দরে যোগাযোগ করে জানতে পারলেন যে দুবাইগামী একটি প্লেন সত্যি সত্যি রাত ১১.৪০ মিনিটে দমদম থেকে টেক অফ করার কথা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে একটা উড়ো ফোন আসে যে প্লেনের প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে কয়েকজন জঙ্গী আত্মগোপন করে আছে। তারা প্লেনটিকে হাইজ্যাক করতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। প্রতিটি যাত্রীকে আপাদমস্তক তল্লাশি করা হয়। খবরটা অবশ্য মিথ্যে ছিল। কিন্তু প্লেনটি শেষ পর্যন্ত অনেক দেরিতে টেক অফ করে।

ইন্সপেক্টর পাকড়াশীর চোখ দু'টো চকচক করে ওঠে, ওহ মাই গড! তাহলে এখনও উপায় আছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে লালবাজারের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। গোটা গোয়েন্দা বিভাগ তৎপর হয়ে উঠল। রানীমা আর দেওয়ানজীর চেহারার বর্ণনা দিয়ে খবর গেল সান্তাক্রুজ বিমানবন্দর আর মুম্বাই পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে। ফলে সান্তাক্রুজে অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে ছদ্মবেশী রানীমা ও দেওয়ানজী ধরা পড়ল। রানীমার থুতনির তিলটি এবং দেওয়ানজীর সোনাবাঁধানো দাঁত মুম্বাই পুলিশকে যথেষ্ট সাহায্য করল।

ফিরতি বিমানেই ওদের কলকাতায় ফিরিয়ে আনা হলো। পুলিশের তদন্তে ধরা পড়ল, কলকাতায় এটি প্রথম অপারেশন হলেও এরা একটি আন্তর্জাতিক চোরাকারবারি দলের সঙ্গে যুক্ত। রানীমাই এদের নেত্রী। দলটির জাল নোটেরও কারবার আছে। ডঃ ডিসুজাকে দেওয়া পাঁচশ টাকার নোটের বান্ডিলটি পুরো জাল ছিল। অবশ্য এত করেও ঝুনঝুনওয়ালার হীরের বাক্সটি উদ্ধার করা গেল না। সেটি যেভাবেই হোক পাচার হয়ে গেছে।

ঝুনঝুনওয়ালা বললেন, চোর পাকড়াও করিয়েছেন এতেই হামি খুশি হইয়েছে। চোরাই মালের হামার প্রয়োজন নাই।

পুলিশ তো অবাক—প্রয়োজন নেই মানে?

মানে ওগুলো নকলি মাল ছিল। শেষ হাসিটি ঝুনঝুনওয়ালাই হাসলেন।

[ভাদ্র ১৪০৮]

জাহাঙ্গীরের ছুরি

সঞ্জয়কুমার ভুঁইয়া

'তাহলে এটাই নিচ্ছেন স্যার?' একটা বাদশাহী আমালের ছুরি এগিয়ে দিয়ে সামনে বসা ভদ্রলোকের দিকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন গোবিন্দবাবু।

মাঝবয়সী চেহারার ভদ্রলোক। কাঁচাপাকা চুল। পরনে কুচকুচে কালো রঙের দামী কোট-প্যান্ট। চোখে রোল্ডগোল্ডের চশমা। মাথায় পুরনো আমলের একটা ইংলিশ হ্যাট। থেকে থেকে দু' আঙুলের ফাঁকে ধরা বাঁকানো কাঠের পাইপটা একবার করে টেনে নিচ্ছিলেন।

এ হেন একজন সাহেব ব্যক্তি যে গোবিন্দ সাঁতরার পলেস্তারা খসা, বহুকালের পুরনো কিউরিওর দোকানে এসে জিনিসপত্রের দাম করছেন এটা তাঁর কাছে ভাগ্যের ব্যাপার বৈকি। ঠাকুর্দার আমলের দোকান। বাবাও দেখাশোনা করেছেন। সেই ঠাকুর্দার আমলেই দেওয়ালে প্রথম ও শেষবারের মতো রঙ পড়েছিল। ধুলোপড়া ভাঙা কাচের শোকেসগুলোও সেই সময়কার। এর মধ্যেই গোটাকতক ঐতিহাসিক জিনিসপত্র নিয়ে গোবিন্দবাবুর কারবার।

অবশ্য এ দোকানের কটা জিনিস যে ঐতিহাসিক সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই দারুণ বিদ্যেটা তিনি শিখেছিলেন বাবার কাছে। দাদুর আমলে দোকান রমরম করেই চলত। সেরকমই শুনেছেন। তখন নাকি অনেক নামী-দামী লোকের আনাগোনা ছিল দোকানে। এখন চল্লিশ পাওয়ারের একটা টিমটিমে বাতি জ্বেলে গোবিন্দবাবু বসে থাকতে থাকতে শেষ অবধি ঘুমিয়ে পড়েন। সপ্তাহ-শেষে আঙুলের কর ধরে খদ্দেরের সংখ্যা গোনেন আর উড পেনসিলের পেছনটা চিবোতে চিবোতে লাভের হিসেবটা খতিয়ে দেখেন।

গোবিন্দবাবুর দোকানে যত না খদ্দের আসে তার চেয়ে বেশি আনাগোনা করে তাঁর আড্ডাবাজ বন্ধুরা। তাঁর নিজেরও এ ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ। গত তিন দিন ধরে দোকানে কোনো খদ্দেরের পায়ের ধুলো পড়েনি। তাই হঠাৎ এক দেশী সাহেবের উপস্থিতিতে তাঁর মনটা আনন্দে নেচে উঠল।

—'নিয়ে যান স্যার, খোদ আকবরের আমলের জিনিস। এমন জিনিস একবার মিস্ করলে আর হয়তো পাবেন না।' কালো বাঁটের ওপর সাপের জিভের মতো বেঁকানো ফলাযুক্ত ছুরিটার দিকে তাকিয়ে গোবিন্দবাবু বলে উঠলেন।

ভদ্রলোক ছুরিটা হাতে নিয়ে সেটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন।

—'হেঁ হেঁ, এটাকে যে-সে জিনিস ভাববেন না স্যার। স্বয়ং আকবর এটা উপহার দিয়েছিলেন তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীরকে। আপনাকে বলতে বাধা নেই, এই ছুরি যে কত কণ্ঠনালীর ওপর দিয়ে কচাৎ কচাৎ করে চলে গেছে তার ইয়ত্তা নেই।' দোকানে অন্য কোনো খদ্দের না থাকলেও ভদ্রলোকের কানের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে কথাগুলো বললেন গোবিন্দবাবু।

ভদ্রলোক একমনে বুড়ো আঙুল দিয়ে ছুরিটার ধার পরীক্ষা করতে লাগলেন। অনেক দিনের পুরনো জিনিস দেখলেই বোঝা যায়। বহুকাল পড়ে থাকার ফলে জং ধরে গেছে। পরিষ্কার করে নিলে এখনো যে কোনো জিনিস কাটার পক্ষে যথেষ্ট।

—'তা এর দক্ষিণা কত?' ভদ্রলোকের কাঁচাপাকা গোঁফ সমেত ঠোঁট দুটো একবার নড়ে উঠেই স্থির হয়ে গেল।

গোবিন্দবাবু মাথাটা চুলকে সলজ্জ ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, 'মানে, বুঝতেই তো পারছেন স্যার, একটা ঐতিহাসিক বস্তু, অনেক লুকিয়ে চুরিয়ে রাখতে হয়েছে, নইলে এতদিন হয়তো গভর্নমেন্টের ঘরেই চলে যেত। অন্য লোক হলে পুরোপুরি দু'শই নিতাম, কিন্তু আপনি ওই দেড়শই দেবেন।'

অন্য লোক হলে হয়তো প্রথমেই তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠত, কিন্তু আশ্চর্য, ভদ্রলোক কোনোরকম দরদাম না করেই মানিব্যাগ থেকে কড়কড়ে একটা একশো টাকার নোট আর একটা পঞ্চাশ টাকার নোট এগিয়ে দিলেন গোবিন্দবাবুর দিকে।

এটা গোবিন্দবাবুর তিরিশ বছরের দোকানদারি জীবনে একটা রেকর্ড। তিনি নিজেই প্রথমটা হতচকিয়ে গেলেন। না স্বপ্ন নয়, সত্যি সত্যিই তাঁর নাকের ডগায় পাখার হাওয়ায় দুটো নোট ফড়ফড় করে উড়ছে। গোবিন্দবাবু হাতটা এগিয়ে দিলেন নোট দুটোর দিকে, তারপরই চিলের মতো ছোঁ মেরে সে দুটোকে সটান নড়বড়ে ক্যাশ-বাক্সটার মধ্যে চালান করে দিয়ে হেঁ হেঁ করে চাইলেন ভদ্রলোকের দিকে।—'মানে বুঝলেন না স্যার, কটা লোকে আর এ সব জিনিসের কদর বোঝে। এখনকার খদ্দের মাত্রই সব চাকচিক্যের দিকে নজর, আসল জিনিসটাকে কেউ আর চিনতেই চায় না। দেখুন দিকি আপনার মতন কি রকম সমঝদার লোক আজ ভগবান জুটিয়ে দিলেন! অক্ষয়, দে বাবা দে, স্যারকে জিনিসটা মুড়ে দে।'

রুক্ষ চেহারার মিশকালো একটা ছেলে এতক্ষণ দরজার পাশে একটা নড়বড়ে চেয়ারে বসে ব্যাপারটা পিট্‌পিট্ করে লক্ষ্য করছিল। টানা তিন দিন বাদ মালিকের আদেশে একটা মনের মতো কাজ পেয়ে স্প্রীংয়ের মতো তড়াং করে লাফিয়ে উঠল।

—'তা স্যার এটা কি সাজিয়ে রেখে দেবেন, নাকি ব্যবহার করবেন? তা ধারও নেহাৎ কম নেই, একটু ঘষে-মেজে নিলেই একেবারে নতুন জিনিস।' গোবিন্দবাবু বুড়ো আঙুলটা তর্জনীতে ঠেকিয়ে যেন একবার শিউরে উঠলেন।

—'তা ধরুন মাঝে-মধ্যে দরকার পড়লে চামড়া-টামড়া .....'

লোকটা বলে কি? কসাই নাকি? তাও আবার দেড়শ টাকা দামের একটা একবেগদা ছুরি দিয়ে! গোবিন্দবাবুর হাঁ-টা ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে।

তাঁর বিস্ময়ের ঘোর কাটে না, এর মধ্যেই অক্ষয় এসে কাগজে মোড়া ছুরিটা এগিয়ে দেয় ভদ্রলোকের দিকে।

ভদ্রলোক নমস্কার জানিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। গোবিন্দবাবু বলে উঠলেন, 'এক মিনিট স্যার, আপনার বিলটা—বলে ইঁদুরে কাটা একটা বিলবই-এর ওপর খস্‌খস্ করে দরদাম লিখে, ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার নামটা স্যার।'

—'আবার এসবের কি দরকার, আচ্ছা বেশ, লিখুন শ্রীঅলোকমোহন চট্টোপাধ্যায়।' ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় বললেন।

—'ধন্যবাদ, এই নিন স্যার।'

বিলটা চালান হয়ে গেল একটা কালো মানিব্যাগে।

—'আচ্ছা চলি, নমস্কার।'

—'নমস্কার।'

ভদ্রলোকের জুতোর মচ্‌মচ্ শব্দ একসময়ে রাস্তায় গিয়ে মিলিয়ে গেল।

গোবিন্দবাবু হাত দুটো জোড় করা অবস্থাতেই হাঁ করে খানিকটা চেয়ে রইলেন দরজার দিকে।

ভদ্রলোক দোকান ছেড়ে চলে যেতেই অক্ষয় একলাফে তাঁর সামনে এসে বড় বড় চোখ করে বলে উঠল, 'ওঃ, আপনি কি খেলই দেখালেন! চিনে মার্কেটের পনেরো টাকার জিনিস একেবারে একশ পঞ্চাশ টাকায়! তাও আবার জাহাঙ্গীরের নামে!' তার চোখেমুখে তারিফ।

গোবিন্দবাবু এতক্ষণে কিছুটা ধাতস্থ হলেন। সত্যিই এতদিনকার ব্যবসায়ী জীবনে একটা বিরাট

কাণ্ড করে ফেলেছেন তিনি। একশ পঁয়ত্রিশ টাকা নেট্ প্রফিট। তিনি অত্যন্ত খুশি। 'জয় মা লক্ষ্মী, সাধে কি তোমায় লোকে স্মরণ করে। যাও বাবা অক্ষয়, চা নিয়ে এসো। নলিনের দোকানের মশলা দেওয়া চা, তার সঙ্গে গরম ফুলুরি। আহা!'

সেদিন সকাল থেকেই দিনটা মেঘলা মেঘলা। গোবিন্দবাবু অন্য দিনের মতো ফাটা গদিতে বসে বসে ঢুলছেন। অক্ষয় একমনে টুলে বসে মাছিগুলোর সঙ্গে চোর চোর খেলছে। সেই দু'দিন আগে এক বাজখাঁই ভদ্রলোক দেড়শ টাকায় জাহাঙ্গীরের ছুরি সওদা করে নিয়ে গেলেন, তারপর থেকে আবার যে কে সেই। বসে বসে ঝিমোনো।

হঠাৎ একসঙ্গে অনেকগুলো বুটের খটখট আওয়াজে গোবিন্দবাবুর তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। প্রথমটা তিনি ভাবলেন বুঝিবা সেদিনের মতো কোনো খদ্দের। তারপরই দু' হাত দিয়ে চোখ কচলে অনেকগুলো সাদা পোশাকের লাইন দেখে টানটান হয়ে উঠে বসলেন! অক্ষয়ের মুখে কেবল পু পু.....শব্দটা শোনা গেল।

সর্বনাশ, এ যে ইন্সপেক্টর অতীন বোস! যাঁর ভয়ে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়। তাঁর সঙ্গে গোটাকতক চেলাচামুণ্ডা। কিন্তু হঠাৎ এখানে কেন? তবে কি তাঁর প্রত্নতাত্ত্বিক কারবারের কথা জানাজানি হয়ে গেছে? গোবিন্দবাবুর মুখটা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বলির পাঁঠার মতো ভয়ে পা দুটো ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগল। গলা শুকিয়ে কাঠ।

—'আপনিই এ দোকানের মালিক গোবিন্দ সাঁতরা?' একটা ঝাঁঝালো গলার প্রশ্ন তেড়ে আসে গোবিন্দবাবুর দিকে।

কাঁপা গলায় তিনি তোতলাতে থাকেন, 'আ-আজ্ঞে। কি-কিন্তু কেন স্যার-র?'

—'এই বিলটা আপনার দোকানের?'

এক টুকরো কাগজ এগিয়ে আসে তাঁর চোখের সামনে। এ কি! এ যে গত পরশু দিনের সেই ভদ্রলোককে ছুরি বিক্রীর বিল। তাহলে কি তাঁর চিনে-মার্কেট রহস্য ফাঁস করে দিয়েছেন ভদ্রলোক! কিন্তু জানলেন কেমন করে?

গোবিন্দবাবু তখন ঘামতে শুরু করেছেন। ইন্সপেক্টরের প্রশ্নে তিন-চারবার ঢোঁক গিলে কোনোমতে মাথাটা একবার সামনের দিকে ঝোঁকালেন।

—'মানে একটা স্যাড নিউজ—' ইন্সপেক্টর যেন এতক্ষণে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে শুরু করলেন। 'সেদিন যে ভদ্রলোক আপনার দোকান থেকে ছুরিটা কিনে নিয়ে যায়, সে রাতেই সে আত্মহত্যা করে।'

—'অ্যাঁ!' গোবিন্দবাবু আঁতকে উঠে মুখ বিকৃত করলেন।

—'আমরা জানতে চাই ও আত্মহত্যা করেছে নাকি কেউ পাকা হাতে ওর কণ্ঠনালীর ওপর দিয়ে ওই ছুরিটাই চালিয়ে দিয়েছে। কারণ ছুরির বাঁটটা খালি হাতে ধরা হয়নি। ধরা হয়েছে একটা কাপড় জড়িয়ে। সেই কাপড়ের টুকরোটা বিংশ শতাব্দীর জিনিস হতে পারে না! সুলতানি কিংবা মুঘল আমলের। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মত সেটাই।

আপনি হয়ত জানেন না যে খুন হয়েছে সে আসলে ছিল দাগী আসামী। পুলিশ অনেকদিন ধরেই ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। অপরাধ জগতে জাহাঙ্গীর খাঁ নামেই ওর পরিচয়। আমরা আপনার কাছে জানতে চাই ওই কাপড়ের টুকরোটা দিয়েই কি ছুরিটা মোড়া ছিল? তা যদি হয় তো এটা আত্মহত্যাই।'

গোবিন্দবাবুর হাঁ-টা ক্রমশ বড় হচ্ছিল। এই প্রশ্ন শুনে 'আঁক' করে একটা শব্দ করে উঠলেন। কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে একবার শুধু মাথাটা নাড়লেন।

ইন্সপেক্টর বললেন, 'মৃতদেহের পাশে একটা চিরকুট পাওয়া গেছে, তাতে একটা অদ্ভুত ছড়া লেখা রয়েছে। সেটা পড়লে মনে হয় ও আত্মহত্যাই করেছে।

'জাহাঙ্গীরের ছুরির রহস্য অনেক ভাই।
সাজা দেবার আগে দোষটা জানা চাই।
পাপী ছাড়া কেউ একে কোরোনাকো ভয়।
আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।'

গোলাপী কাগজের ওপর নীল কালিতে লেখা কবিতার চিরকুটটা গোবিন্দবাবুর চোখ থেকে ঝুলে পড়া চশমাটার সামনে খানিকক্ষণ নৃত্য করে আবার সোজা চলে গেল ইন্সপেক্টরের পকেটে।

—'ছুরিটা নিয়েই সবচেয়ে বড় রহস্য ছিল,' বললেন ইন্সপেক্টর, 'আপনার দেওয়া বিলটাই সে রহস্য মিটিয়ে দিল। আপনিই তো এটা ওকে বিক্রি করেছিলেন?'

ভীষণ ভয়ে গোবিন্দবাবু বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'আপনার ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। আপনি তো কেবল বিক্রেতার ভূমিকা পালন করেছেন। তবে ওর এই আত্মহত্যা প্রমাণ করল, ক্রাইম ডাজ নট পে। আচ্ছা চলি, বিরক্ত করে গেলাম, নমস্কার।'

বুটের দঙ্গল আবার মার্চ করতে করতে চলে গেল।

অক্ষয় পুলিশ দেখে পাশ কাটিয়ে পালাবে ভেবেছিল। কিন্তু ইন্সপেক্টরের বৃত্তান্ত শুনে সেই যে দম ধরে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে ছিল, সব চলে যেতে একটা বিস্ময়সূচক প্রবল শব্দ করে দমটা ছেড়ে বলল, 'কাপড়টা তো আপনি বিক্রি করেননি। তা হলে ব্যাপারটা কি হলো!'

গোবিন্দবাবু বললেন, 'তা নিয়ে আর তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না। যা হবার হয়েছে—ভাবুক পুলিশ। এ নিয়ে আর কথা না বলাই ভালো।'

[অগ্রহায়ণ ১৩৯৮]

রহস্যময় বাড়ি

জাহান আরা সিদ্দিকী

ভার্সিটি থেকে ফিরেই ছোট খালার চিঠিটা হাতে পেলাম। সংক্ষিপ্ত চিঠি। তাতে লেখা আছে—আমি যেন অবিলম্বে তাঁর কাছে চলে যাই। ইতিমধ্যে খালার বড়সড় একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে। ডাক্তাররা জানিয়ে দিয়েছেন যে খুব বেশিদিন তিনি আর বাঁচবেন না। তাঁর মনের অবস্থা খুবই খারাপ। মৃত্যুর আগে তিনি আমাকে শেষবারের মতো দেখতে চান। সেইসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর বাড়ি ও টাকাপয়সা তিনি ইতিমধ্যে আমার নামে উইল করে দিয়েছেন। আমি যত দ্রুত সম্ভব সেখানে গিয়ে সেসব যেন বুঝে নিই।

চিঠিটা পড়েই মনটা খারাপ হয়ে গেল। খালা ছেলেবেলায় আমাকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছিলেন বলে আমার প্রতি তাঁর বিশেষ টান রয়েছে। নিঃসন্তান থাকায় তাঁর সমস্ত সম্পত্তি আমাকে দিয়ে যাবেন এ মোটামুটি সবাই জানত। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে তিনি মৃত্যুপথযাত্রী হবেন সেটা কেউই ভাবতে পারেনি।

খালার বিয়ে হয়েছিল একজন জাপানী ভদ্রলোকের সঙ্গে। খালা ট্রেনিং-এ জাপান যাবার পর তাঁর সঙ্গে জানা-শোনা হয়, সেই থেকে বিয়ে। তাঁদের দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে সন্তান না থাকায় দুজনেই আমাকে খুব আদর করতেন।

কলেজে পড়ার সময় তাঁরা আমাকে ঢাকা-জাপান রিটার্ন টিকিট পাঠিয়েছিলেন। তখন ওঁদের সঙ্গে আমি হিরোসিমাতে গিয়েছিলাম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত হিরোসিমা যে এখন অত্যাধুনিক একটা শহর ভাবতেই পারিনি। সব ধ্বংস হলেও যে মিউনিসিপ্যালিটি বিল্ডিংটার উপর পরমাণু বোমাটির বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল সেটির ধ্বংসাবশেষ আজ ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পাশে বয়ে চলেছে ছোট্ট নদী। জায়গাটিকে কেন্দ্র করে মিউজিয়াম থেকে স্মৃতিসৌধ সবই আছে। পরমাণু বোমায় নিহতদের অসংখ্য স্মৃতিচিহ্ন মিউজিয়ামে সাজানো রয়েছে। মাঠে ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে শান্তির প্রতীক পায়রা।

খালা তখন ওসাকাতে থাকতেন। চমৎকার অত্যাধুনিক শহর। মাটির তলে সুড়ঙ্গপথে ট্রেনে ঘুরতাম আমরা। তিনি আমাকে টোকিও বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন। ওসাকার চাইতেও বড় শহর। দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ফিরে আসার পর খালা চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে খালু অবসর গ্রহণ করেছেন বলে শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত তাঁদের ফ্ল্যাটটি বিক্রি করে দিয়ে তাঁরা শিকোকু দ্বীপের নির্জন শহরতলিতে চমৎকার একটা পুরনো কাঠের বাংলো কিনেছেন। সেখানে প্রকৃতির কোলে থাকতে তাঁদের ভালো লাগছে।

এর কিছুদিন পরই খালুর মৃত্যুর খবর আসে। মা চেয়েছিলেন খালা যেন দেশে ফিরে আসেন। কিন্তু খালা বললেন দেশে এসে তিনি কী করবেন? জাপানে তিনি দোভাষীর কাজ করতেন। প্রচুর ছেলেমেয়ে তাঁর কাছে ইংরেজি শিখতে আসত। দিনগুলো খালার এত ব্যস্ততায় কেটে যেত যে তিনি কখনও নিঃসঙ্গ বোধ করেননি। এমনকি শিকোকুতেও তাঁর প্রচুর ছাত্র-ছাত্রী। তবে কথা দিলেন, একদম বৃদ্ধ হয়ে গেলে তখন দেশে ফিরে আসবেন।

এরই মধ্যে এই দুর্ঘটনা। আমি দ্রুত প্লেনের টিকিট কেটে টোকিওর উদ্দেশে রওনা দিলাম। প্লেন

মাটিতে অবতরণ করার কিছুটা আগেই চোখে পড়ল মাউন্ট ফুজি। বিকেলের রোদের আলোয় চুড়োটা চকচক করছিল।

টোকিওতে আমি একদিনও না থেকে সরাসরি শিকোকুতে খালার বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। শহর ছাড়িয়ে বেশ নির্জন এলাকায় ছোট্ট একটা কাঠের বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। পাশে বিশাল মাঠ। সেখানে অজস্র চেরি ফুলের গাছ। শীতের আগমন উপলক্ষে গাছের পাতাগুলো ঝরে পড়েছে। বাড়ির পেছন দিকে তাকালে দূরে পাহাড়ের চুড়ো চোখে পড়ে। কাছাকাছি ঘর-বাড়ি নেই, বেশ খানিকটা দূরে কয়েকটা বাড়ি-ঘর।

গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢোকার আগেই মজিদ আমাকে দেখে এগিয়ে এসে বলল, আপা, ঠিক সময় এসে গেছেন। ওনার যা অবস্থা তাতে রাত কাটে কিনা সন্দেহ।

মজিদ আমাদের দেশের ছেলে। রংপুরের এক গ্রামে ওর বাবা চাষবাস করে খায়। মজিদ স্কুলের চত্বর পেরুতে না পারলেও বেশ চটপটে ছিল। কীভাবে যেন ম্যানেজ করে জাপানে চলে এল। বিভিন্ন হোটেল-রেস্টুরেন্টে সে বেয়ারার কাজ করত। বিয়েও করেছিল একটি জাপানী মেয়েকে। নাম মিচিকো।

খালা জাপানে বসবাস করার পর থেকেই মজিদ নিয়মিত তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। খালারা শিকোকু যাবার কিছুদিন পর মজিদের জন্য সেখানে একটি চাকরি যোগাড় করে দিলেন। খালু মারা যাবার পর খালা যখন নিঃসঙ্গ হয়ে গেলেন, মিচিকো আর মজিদ তাঁকে প্রায়ই সঙ্গ দিত। ওরা এলে খালার বেশ ভালো লাগত দেখে তিনি স্থির করলেন ওনার খালি রুমটাতে ওদের থাকতে দেবেন। মজিদের আর্থিক অবস্থা সুবিধের না হওয়ায় সে সাগ্রহে প্রস্তাবটা লুফে নিল। বিনে পয়সায় জাপানের মতো জায়গায় এরকম একটা খালি ঘর পাওয়া রীতিমতো সৌভাগ্যের ব্যাপার। খালারও এ ব্যবস্থায় একটা লাভ হল। মজিদ সকালে রেস্টুরেন্টের কাজে বেরিয়ে গেলেও বউ ঘরে থাকে। আপদে-বিপদে খালার সে-ই ভরসা। বাঙালির সঙ্গে ঘর করতে করতে মিচিকো বেশ ভালো বাংলায় কথা বলতে শিখে গিয়েছিল। ওরা সঙ্গে থাকাতে খালা অতটা নিঃসঙ্গ বোধ করতেন না।

মজিদ আমাকে প্রথমেই খালার কক্ষে নিয়ে গেল। খালা খাটে চোখ বন্ধ করে শুয়েছিলেন। মিচিকো শিয়রের কাছে একটা চেয়ারে বসেছিল। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, শিগগির আসুন, বার বার চোখ মেলে উনি আপনার খোঁজ করছেন।

খালা ইতিমধ্যে ওর কথা শুনে চোখ মেলে তাকিয়েছেন। আমি তাঁর পাশে বসে হাত দুটো ধরলাম। ঠাণ্ডা হাত। আমাকে দেখে খালার নিস্তেজ হয়ে যাওয়া চোখে খানিকটা আলো জ্বলে উঠল। ফিসফিস করে বললেন, তুই এসেছিস রুবি। উঃ, কি দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিলাম! মারা যাবার আগে তোর সঙ্গে দেখা হবে—

তুমি মোটেই মারা যাচ্ছ না। আমি তোমাকে ভালো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।

খালা ম্লান হেসে বললেন, হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে দিয়েছে। আর কোনো চিকিৎসা বাকি নেই। শোন, তোকে যে জন্য ডেকেছি সে কাজটা আগে সেরে ফেলি। আমার যাবতীয় সম্পত্তির উইলটা উকিলের কাছে রাখা আছে।

খালা, এ সব কথা এখন থাক।

খালা এত কথা একসঙ্গে বলে সম্ভবত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন, তারপর চোখ খুলে এদিক-ওদিক তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, কে ও?

আমি তাঁর উপর ঝুঁকে পড়ে জিগ্যেস করলাম, কার কথা জিগ্যেস করছ?

তাঁর উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি ঘরের চারিদিক হাতড়ে বেড়াল। তারপর আমার মুখের উপর স্থির হল। ফিসফিস করে বললেন, আমি ঘুমালে আমার পাশে প্রেতাত্মা ঘুরে বেড়ায়। ও কি আমাকে নিতে এসেছে?

আমি চমকে উঠে তাঁর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম। খালা এসব কী বলছেন? উনি কি তবে ঘোরের মধ্যে রয়েছেন? তাঁর হাতটা শক্তভাবে ধরে বললাম, এখানে কোনো প্রেতাত্মা নেই।

শুধু আমি। তুমি ভুল দেখছ।

উনি ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন, ভুল নয়। স্পষ্ট দেখেছি আমি। একবার না, কয়েকবার। আমি চিৎকার করলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কী ভয়ংকর চেহারা ঐ প্রেতাত্মাটার!

খালা তুমি ঘুমাও তো।

আমি খালার গায়ে হাত রাখতে উনি কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেন। রাতে খেতে বসে মিচিকোকে জিগ্যেস করলাম, খালা কীসব আবোল-তাবোল বকছিল। তাঁর কাছে নাকি প্রেত আসে। ক'দিন হল উনি এ ধরনের প্রলাপ বকছেন?

মিচিকোর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে উঠল। পাশের চেয়ারে উপবিষ্ট মজিদ। তাড়াতাড়ি এ প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে বলল, এসব কথা থাক। রাতে ও ভয় পাবে।

বুঝলাম ভয়ের কোনো ব্যাপার ঘটেছে। ব্যাপারটা জানার জন্য আমার মধ্যে কৌতূহল দানা পাকিয়ে উঠল। বললাম, ভয়ের কিছু নিশ্চয়ই আছে, নইলে ও অযথা কেন ভয় পাবে?

মজিদ দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বলল, আপনি ভয় পাবেন বলে বলতে চাইনি। এই বাড়িটা ছিল একজন বুড়ির। শেষ বয়সে বার্ধক্যের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে সে আত্মহত্যা করেছিল। এরপর বেশ কিছুদিন বাড়িটা খালি পড়েছিল। পরে যারাই বাড়িটা কিনত তারা রাতে অদ্ভুত সব শব্দ শুনতে পেত এবং ভৌতিক কার্যকলাপ লক্ষ করত। ফলে বাড়িটাতে বেশিদিন কেউ টিকতে পারত না। মাঝে বেশ কিছুদিন সব শান্ত থাকলেও ইদানিং সেই ভৌতিক কাণ্ডকারখানা ফের শুরু হয়েছে।

কি ধরনের কাণ্ডকারখানা?

প্রথমে আপনার খালা অদ্ভুত সব ছায়ামূর্তি তাঁর ঘরে ঘোরাফেরা করতে দেখেন। আমরা শুনে তাঁর অসুস্থ মস্তিষ্কের কল্পনা বলে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু একদিন সন্ধ্যায় একাকী ঘরে মিচিকোও ক্ষণিকের জন্য একটা সাদা কাপড়ে আবৃত মূর্তি তার পেছনে দেখতে পেয়েছিল। সে চেঁচিয়ে উঠতেই মূর্তিটা হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিল।

চোখের ভুল নয়তো?

দু'দুজন মানুষ আলাদাভাবে কী করে ভুল দেখে?

হতে পারে একজনের কথা শুনে অপরজন প্রভাবিত হয়েছিল।

মজিদ আমার যুক্তির উত্তরে মাথা হেলিয়ে বলল, কিন্তু আমি রাতে যে স্বপ্ন দেখলাম—

তুমি আবার কী দেখলে?

ঘুমের মধ্যে একজন ভয়ংকর কুৎসিত মূর্তি আমাকে বলেছিল যে এ বাড়ি যদি অবিলম্বে ত্যাগ না করি তবে প্রেতাত্মারা আমাদের গলা টিপে খুন করে ফেলবে।

আমি আর কথা না বাড়িয়ে চুপ করে চিন্তা করতে থাকলাম। মজিদের এ স্বপ্নের অর্থ কী? সম্ভবত খালার আর মিচিকোর কথাবার্তা ওর অবচেতন মনে প্রভাব ফেলেছে। নইলে সে অমন স্বপ্ন দেখে কেন আর এসব অদ্ভুত কথাবার্তাই বা বিশ্বাস করে কীভাবে।

পরদিন সকালে আমি যখন খালাকে ফলের রস খাওয়াচ্ছিলাম, হঠাৎ তিনি আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, রুবি, তুই এ বাড়িতে থাকিস না। যত তাড়াতাড়ি পারিস বেচে দিয়ে চলে যাস।

কেন ওসব কথা তুলছ?

এ বাড়িতে একটা কিছুর অস্তিত্ব আমি গত ক'দিন থেকেই টের পাচ্ছি। এখানে থাকলে ওরা তোর ক্ষতি করতে পারে।

অসুস্থ বলে তোমার নার্ভগুলো দুর্বল হয়ে পড়েছে। এজন্য তুমি এসব অলীক দৃশ্য দেখছ বা শব্দ শুনতে পাচ্ছ। যাকগে এসব ভাবনা বাদ দিয়ে এখন ঘুমাও তো।

খালা আর কথা বাড়ালেন না। শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। এর দু'দিন পর খালার মৃত্যু হল।

এরমধ্যে আমি বা অন্য কেউ কোনো ভৌতিক বস্তুর অস্তিত্ব টের পেলাম না। সব কাজকর্ম নির্বিঘ্নে সমাধা হল। খালা বেঁচে থাকতে ফোনে তাঁর উকিলের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। শেষকৃত্যের পরদিনই উকিল কুরোদা এসে খালার উইল আমার হাতে দিয়ে গেলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে দেশে ফিরে না গিয়ে খালার নির্দেশমতো বাড়িটা বেচে দেবার আয়োজন করতে থাকলাম।

এরমধ্যে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। একদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ মিচিকো ছুটে এসে আমার ঘরে ঢুকল। ভয়ে ওর সমস্ত শরীর কাঁপছিল। চোখ দুটো বিস্ফারিত। আমি তাড়াতাড়ি ওর হাত ধরে খাটে বসিয়ে দিয়ে জিগ্যেস করলাম, কী হয়েছে?

সে উত্তর না দিয়ে শিউরে উঠল। ওকে এক গ্লাস জল এনে দেবার পর ও খানিকটা সুস্থ হল। তখন সে বলল, বিছানায় শুয়ে ছিলাম। হঠাৎ মনে হল কার পায়ের শব্দ। শব্দটা বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল। আমি চোখ খুলতেই দেখি—

কথাগুলো সে শেষ করতে পারল না, আবার কাঁপতে থাকল। বহুকষ্টে উদ্ধার করলাম যে সে স্বচক্ষে খালাকে তার শিয়রের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। আমি ভূত-প্রেতে কখনই বিশ্বাস করি না। ভাবলাম মৃতের বাড়িতে সারাক্ষণ এসব চিন্তা করার ফলে মিচিকো এ ধরনের দৃশ্য দেখেছে। আমি ব্যাপারটা সিরিয়াসলি নিলাম না। সেদিন রাতে খাবার টেবিলে মজিদকে খুবই চিন্তাগ্রস্ত বলে মনে হল।

মিচিকো তেমপুরা রেঁধেছিল। খেতে আমার মোটেই ভালো লাগছিল না। একগাদা মশলাবিহীন ঝোলের মধ্যে সিদ্ধ নুডলস্, সামুদ্রিক শৈবাল আরা মাঝারি আকারের একটা চিংড়ি। বাধ্য হয়ে এসব খাবারই খেতে হচ্ছিল। মজিদ ঠিকমতো খাচ্ছিল না।

মজিদ তুমি কি সন্ধ্যার ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করছ?

মজিদ আমার কথা শুনে ফিরে তাকাল। কিছু একটা বলতে চায় অথচ বলতে দ্বিধা করছে। অভয় দিয়ে বললাম, তোমার সঙ্কোচের কোনো কারণ নেই। যা ভাবছ সেটা নির্দ্বিধায় আমাকে বলতে পার।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে মজিদ আমাকে জরিপ করে বলল, ভাবছি শুধু মিচিকোর কথাটাই নয়। গতরাতে আমারও একটা ব্যাপারে বেশ অস্বস্তি লেগেছিল।

মিচিকো ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে মজিদের হাত দুটো আঁকড়ে ধরল। বুঝলাম ঘটনাটা সে ইতিমধ্যে শুনেছে।

কী ব্যাপার বলো তো?

রাত তখন বেশ গভীর। হঠাৎ আমার ঘুমটা ভেঙে গেল। তারপরই শব্দটা কানে এল। মনে হল আমার দরজায় কে যেন মৃদু টোকা দিচ্ছে। ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠে বললাম, কে?

উত্তর এল না। ভাবলাম ঘুমের ঘোরে ভুল শুনেছি। চোখে যখন তন্দ্রা লেগে এসেছে তখন আবার শব্দটা শুনতে পেলাম। শব্দটা এবার বেশ স্পষ্ট, কে যেন আমার, মিচিকোর নাম ধরে ডাকছে। প্রথমে আমার মনে হল আপনার হয়তো কোনো সমস্যা হয়েছে। লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে দরজাটা খুলে দিলাম। করিডোরটা অন্ধকারে ঢাকা। লাইট জ্বালাতে প্রথমে যে দৃশ্যটা চোখে পড়ল তাতে আমি বেশ অবাক হয়ে গেলাম। সদর দরজাটা হাট করে খোলা। তীব্র শীতল বাতাস এসে ঘরে ঢুকছে। আমি তাড়াতাড়ি দরজার কাছে গিয়ে বাইরে তাকালাম। বাইরে আলো জ্বলছে। কোথাও কেউ নেই। ঘরে ফিরে দেখি মিচিকো অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

আমি আর ওকে না জাগিয়ে শুয়ে পড়লাম। সারারাত কান খাড়া করে রাখলাম কিন্তু কোনো শব্দ বা ডাক শোনা গেল না। তবু আমার মনটা খচখচ করতে থাকল। কে ডাকছিল আমাকে? ভালো করে চিন্তা করতে মনে হল গলারা স্বরটা আপনার খালার মতো। একবার ভাবলাম হঠাৎ ঘুম ভেঙে ভুল শুনেছি। কিন্তু সদর দরজাটা খুলল কে? আমার স্পষ্ট মনে আছে রাতে ঘুমাতে যাবার আগে আমি দরজাটা ভালোমতো বন্ধ করে দিয়েছিলাম। বাইরে থেকে চাবি ছাড়া দরজা খোলা সম্ভব নয়।

তাহলে?

মিচিকো সায় দিয়ে বলল, দরজাটা বন্ধ ছিল সে আমিও দেখেছি। কিন্তু এতবড় ঘটনাটা তুমি আমাকে জানালে না কেন? আমি তবে সতর্ক থাকতাম।

কথাটা বলে স্বামীর দিকে অনুযোগ ভরা দৃষ্টিতে সে তাকাল। মজিদ আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলল, আমি ভেবেছিলাম তোমাকে বললে তুমি অযথা ভয় পাবে।

আমি এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলাম। এবার বললাম, সন্ধ্যার ঘটনাটার পর তুমি ওকে জানিয়েছ, তাই তো?

মজিদ ঘাড় নাড়িয়ে সম্মতি জানাল।

আমি বললাম, তাহলে গতরাতের ঘটনা শুনে সে প্রভাবিত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু ব্যাপারটা তাহলে কী?

মিচিকো বলল, ভূত।

আমি হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললাম, দূর, ভূত বলে কিছু আছে নাকি?

মিচিকো বলল, অবশ্যই আছে। পাড়া-প্রতিবেশীরা বলেছে এ বাড়িতে এত ভূতের উপদ্রব ছিল যে বাড়িওয়ালা সস্তায় বাড়িটা বেচে দিয়েছিল। এ অঞ্চলে সবাই এটাকে প্রেতের বাড়ি বলেই জানে।

আমি একটু অবাক হলাম। জাপানের মতো উন্নত, আধুনিক দেশের লোকজনও দেখা যাচ্ছে এসব বিশ্বাস করে। সেদিন রাতে আর এ নিয়ে কথা হল না। প্রচণ্ড শীত পড়েছিল। আমি খাওয়া শেষে তাড়াতাড়ি বিছানায় কম্বলের নীচে ঢুকলাম। কখন যে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছি নিজেই জানি না। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। মনে হল মাথার দিকের জানালার কাছে টুকটুক করে আওয়াজ হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে মজিদের কথাটা আমার মনে পড়ল। কিন্তু আমি মোটেই ঘাবড়ে গেলাম না। আমার মনে হল এসব কিছুর মধ্যেই একটা রহস্য আছে। বিছানা ছেড়ে উঠে লাইট জ্বালালাম। শব্দটা থেমে গেছে। আলোটা নিভিয়ে দিয়ে আমি অন্ধকারের মধ্যে বিছানায় খানিকক্ষণ কান পেতে রইলাম। কিন্তু আর কোনো আওয়াজ কানে এল না।

পরদিন সকালে আমি মজিদকে কথাটা বলতে ওদের দুজনের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, দেখলেন তো, আমি ভুল শুনিনি।

বেলা দশটার দিকে আমি খালার উকিলের কাছে ফোন করে বললাম, আপনার সঙ্গে আমারা কিছু কথা আছে।

বলুন কী কথা?

বাড়িটা বিক্রির ব্যাপারে কোনো অগ্রগতি হল কি?

দেখুন একটু সময় তো লাগবেই। তবে হয়ে যাবে। আপনি এ নিয়ে অযথা দুশ্চিন্তা করবেন না। ইতিমধ্যে দু'তিনজন পার্টি বাড়িটার ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছে।

আমি আর তাঁকে ভূত-প্রেতের ব্যাপারটা জানালাম না। ভদ্রলোক শুনে নিশ্চয়ই হাসবেন। কিন্তু সেদিন রাতে এমন একটা ঘটনা ঘটল যার পর কথাটা তাঁকে না জানিয়ে পারলাম না।

যথারীতি রাতে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়েছিলাম। গতরাতের মতো শব্দে ঘুম ভেঙে অন্ধকারের মধ্যে কান পাতলাম। শব্দটা আজ আর জানলার কাছে নয় বরং দরজার ওদিকে হচ্ছে বলে মনে হল। সঙ্গে সঙ্গে বাতি জ্বালালাম। দরজায় টুকটুক করে কেউ টোকা দিচ্ছে। আমি দরজার কাছে গিয়ে জিগ্যেস করলাম, কে? সঙ্গে সঙ্গে শব্দটা থেমে গেল। কয়েক মিনিট আমি নিঃশব্দে ওভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম। শব্দটা আর পাচ্ছি না। তবে ক্ষীণ একটা আওয়াজ পেলাম। মনে হল যেন দরজা বন্ধের আওয়াজ। আমি বুকে সাহস টেনে দরজাটা খুলে বাতিটা জ্বালালাম। পরমুহূর্তে মেঝের দিকে চোখ পড়তে চমকে উঠলাম। একটা মাঝারি আকারের কঙ্কাল। সামনের দরজাটা খোলা, বাতাস হু হু করে এসে ঘরে ঢুকছে। আতঙ্কে আমার বুকটা ধক করে উঠল। তারপরই মনে হল স্রেফ একটা কঙ্কালকে ভয় পাবার কী আছে? কঙ্কালটা আমার কী ক্ষতি করতে পারবে? কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কঙ্কালটা এখানে এল কীভাবে? এটা কি মানুষের না পশুর কঙ্কাল? ব্যাপারটা জানা দরকার।

আমি মজিদদের না ডেকে কঙ্কালটা আমার ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে এলাম। সে রাতে আর কোনো শব্দ হল না। ভোরের দিকে আমিও ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে কঙ্কালের হাড়গুলো বড়সড় হাতব্যাগে ভরে সোজা চলে গেলাম কুরোদার অফিসে। তিনি তো আমাকে দেখে অবাক। তাঁকে আমি সংক্ষেপে সব জানালাম। উনি শুনে-টুনে বললেন, আপনার কি বিশ্বাস হয় এসব প্রেতের কাজ?

আমি জোর গলায় বললাম, অসম্ভব।

কুরোদা বললেন, আমিও তাই মনে করি। জায়গাটা নির্জন, মনোরম পরিবেশ। এসব নির্জন জায়গায় বাড়ি নিয়ে ভূত-প্রেতের কাহিনি বানানো হয় সে আমিও জানি। কিন্তু আপনি বলছেন বাস্তবে হচ্ছে। ব্যাপারটা ভেবে দেখার মতো। যাকগে, এই কঙ্কালগুলো আপনি বরং আমার কাছে রেখে যান। আমি পরীক্ষা করিয়ে দেখতে চাই।

সেদিন রাতে তেমন কোনো ঘটনা ঘটল না। কিন্তু পরদিন সকালে কুরোদা ফোন করে চিন্তিতভাবে বললেন, ব্যাপারটা তো একটু গোলমেলে হয়ে গেল। যে দু'তিনজন পার্টি বাড়িটা দেখে খুব আগ্রহ প্রকাশ করেছিল তারা হুট করে পিছিয়ে গেছে। স্থানীয় লোকজন নাকি তাদের জানিয়েছে ও বাড়িতে অদ্ভুত সব ভৌতিক কাণ্ডকারখানা ঘটছে। ওরা এসব শুনে-টুনে কেটে পড়েছে।

আমি অস্ফুটে মন্তব্য করলাম, আশ্চর্য! এই বৈজ্ঞানিক যুগেও মানুষ এসব বিশ্বাস করে! ফোনের অপর প্রান্ত থেকে কুরোদার হাসির আওয়াজ ভেসে এল, বিশ্বাস না করে উপায় কী? আপনি স্বয়ং এসব ভৌতিক কাণ্ডকারখানার সাক্ষী।

দেখুন, আমার মনে হচ্ছে একটা ব্যাপার আছে। কিন্তু কী সেটা ধরতে পারছি না। যদি দৃষ্টিভ্রম হয় তবে আমরা তিনজন কীভাবে দেখছি? তাছাড়া এই কঙ্কালটাই বা ঘরে এল কী করে? গতকাল ঘুমাতে যাবার আগে আমি নিজে দেখেছি সদর দরজা বন্ধ ছিল। কী করে সেটা দিব্যি নিজ থেকে খুলে গেল?

শুনুন, আমি ব্যাপারটা ভেবে দেখছি, চিন্তা করবেন না।

চিন্তা না করে উপায় কী বলুন! যত অলীকই হোক না কেন এর উপর ভিত্তি করে বাড়িটার বিক্রি আপাতত বন্ধ হয়ে গেল।

আপনি ঘাবড়াবেন না, কিছু একটা উপায় হবেই।

সেদিন রাতে বিছানায় শুয়ে আমার আর কিছুতেই ঘুম এল না। পুরো ব্যাপারটা এত অবাস্তব, অথচ ঠিকই ঘটে যাচ্ছে। আর আমি এই বিদেশ-বিভুঁয়ে কী করব কিছুই বুঝতে পারছি না। বাড়িটাও সহজে বেচে তাড়াতাড়ি ফিরতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। সব মিলিয়ে নানান দুশ্চিন্তার মধ্যে বিছানায় নিদ্রাহীন অবস্থায় এপাশ-ওপাশ করতে থাকলাম।

ভোর রাতের বেশ খানিকটা আগে সবে চোখে তন্দ্রা লেগে এসেছে, হঠাৎ দূরে কোথা থেকে তীব্র নারীকণ্ঠের আর্তনাদ ভেসে এল। সে আর্তনাদ এত বিভীষিকাপূর্ণ যে আমার বুকের ভেতরটা ক্ষণিকের জন্য হলেও শিউরে উঠল। পরমুহূর্তে মনে হল গলাটা মিচিকোর। তবে কি সে কোনো বিপদে পড়েছে? আমি লাফ দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে ওদের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম।

ঘরের দরজা বন্ধ। আমি টোকা দিতেই মজিদ স্বয়ং এসে দরজা খুলে দিল। ভেতরে হালকা আলো জ্বলছে। বিছানায় বসে ভয়ার্ত চোখে থরথর করে কাঁপছে মিচিকো। আমি তাকে জড়িয়ে ধরে বেশ খানিকক্ষণ বসে থাকার পর সে খানিকটা ধাতস্থ হল। মজিদও যে বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছিল সেটা ওর চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল।

মানসিক স্থিতি ফিরে পাবার পর মিচিকো দৃঢ়কণ্ঠে বলল, কালই আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। এই ভয়ংকর অভিশপ্ত বাড়িতে আর একটা রাতও আমি থাকতে রাজি নই।

এত রাতে সে কেন চিৎকার করে উঠেছিল সে ব্যাপারে কৌতূহল থাকলেও জানতে চেয়ে ওকে আরও আপসেট করে দিতে চাইনি। কিন্তু ওকে কথা বলতে দেখে জিগ্যেস না করে থাকতে পারলাম না। বললাম, কী দেখেছিলে?

আবারও শিউরে উঠল মিচিকো। তারপর বিছানার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে বলল, ওখানে উনি শুয়েছিলেন।

কার কথা বলছ?

বুঝতে পারছেন না?

না।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে মনে হল আমার গায়ে ঠাণ্ডা কারও স্পর্শ পাচ্ছি। ঘরে হালকা আলোটা এসব শুরু হবার পর থেকে জ্বালিয়ে রেখেছিলাম। চোখ খুলে তাকিয়ে দেখি....ওরে বাপরে, দৃশ্যটা কল্পনা করতে ..... কথা শেষ না করে সে থেমে গেল।

মজিদ তাগাদা দিয়ে বলল, কী দেখেছিলে বলো। এখন তো আমরা আছি। অত ভয় করছ কেন?

আন্টি আমার পাশে শুয়ে ছিলেন। শরীরটা বরফের মতো ঠাণ্ডা। চোখ দুটো খোলা, কঠিন সে চোখের দৃষ্টি। না না, এ বাড়িতে আমি আর থাকতে পারব না। আমি নিশ্চিত তাঁর আত্মা এখানেই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মজিদ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আমরা চলে গেলে আপনি একলা থাকতে পারবেন তো? এই অবস্থায় আমরা কী করে থাকি বলুন? স্রেফ আপনার কথা ভেবে.....

আমার মাথায় কিছুই খেলছিল না, বললাম, চিন্তা-ভাবনা করে কাল সকালে একটা সিদ্ধান্ত নিলেই হবে।

আমি ঘরে ফেরার একটু পরই বাইরে ভোরের আবছা আলো ফুটে উঠতে শুরু করল। আমি আর বিছানায় না শুয়ে চিন্তা করতে থাকলাম। বেলা বাড়তেই সোজা কুরোদার অফিসে গিয়ে হাজির হলাম। তিনি একটু অবাক চোখে তাকালেন। আমি তাঁকে সব খুলে বললাম। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে তাঁকে গতদিনের মতো অতটা চিন্তিত মনে হল না। বরং অত্যন্ত স্বাভাবিক গলায় আমাকে বললেন, ওরা যেতে চায় যাক। আপনি একটা রাত একলা থেকে দেখুন না কী হয়। যদিও আমার মনে তখনও যথেষ্ট সাহস ছিল তবু নির্জন বাড়িটাতে রাতে একাকী থাকবার কথা কল্পনা করে একটু দমে গেলাম। কিন্তু কুরোদার সামনে ভয় প্রকাশ করাটাও লজ্জার ব্যাপার। কুরোদা আমাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করছিলেন। সাহস যুগিয়ে বললেন, এ ঘটনাটা আমি স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে জানিয়ে রেখেছি। ফলে শারীরিক কোনো বিপর্যয় যাতে না আসে সে ব্যবস্থা আমি ইতিমধ্যে করে ফেলেছি।

এত টেনশনের মধ্যেও আমি হেসে ফেললাম, ভূতের সঙ্গে পুলিশ কীভাবে পেরে উঠবে?

আপনিও তবে এসবে বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন?

আরে দূর!

মুখে কথাটা উড়িয়ে দিলেও ভেতরে ভেতরে আমার মধ্যে এক ধরনের সন্দেহ দেখা দেওয়া শুরু করেছিল। এসব কিছুর অর্থ কী? খালার মৃত্যুর আগে থেকে অশরীরী উৎপাত শুরু হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর উপদ্রব যেন আরও বেড়ে গেল। তবে কি সত্যিই.....

সন্দেহটা ফের মনে আসতেই জোর করে সরিয়ে দিলাম। এসব অদ্ভুত চিন্তা-ভাবনাকে যতই প্রশ্রয় দেব ততই চেপে বসবে। বিকেলের দিকে মজিদ ও মিচিকো বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে চলে গেল। জানিয়ে দিল পরে একসময় এসে তাদের সব মালপত্র নিয়ে যাবে। আপাতত যেহেতু হোটেলে উঠছে এসব নেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব না। যাবার আগে আমাকেও উপদেশ দিল এই 'হন্টেড বাড়ি' থেকে সরে পড়তে। আমি ওদের সামনে মুখে হাসি টেনে সাহস দেখালেও ভেতরে ভেতরে একটু বিচলিত না হয়ে পারলাম না।

সন্ধ্যার পর বাড়িটা নিঝুম হয়ে গেল। আমি বংলোর সামনে চেয়ার পেতে একাকী কিছুক্ষণ বসে রইলাম। দূরে পাহাড়ের কালচে চুড়ো চোখে পড়ছে। পত্রহীন গাছগুলো সারি সারি প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে। আশেপাশে লোকজন নেই। দূরের একসারি ঘর-বাড়িতে আলোর শিখা। চারদিকটা কী স্তব্ধ!

হঠাৎ আমার মনের মধ্যে ভয় ঢুকতে থাকল। একলা এই বাড়িতে আমি বিপদে পড়ে শত চিৎকার করলেও কেউ শুনতে পাবে না। এ বাড়িতে একলা রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে কি ভুল করলাম? কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেছে। এই অসময়ে আবার কোথায় গিয়ে হোটেল খুঁজব! তার চাইতে কোনোমতে রাতটা এখানে কাটিয়ে কালই দেশে ফিরে যাব। কুরোদা যা বলছেন তাতে বাড়িটা বিক্রি হবার সম্ভাবনা কম। অযথা সময় নষ্ট আর এই মানসিক অশান্তি। পরে যদি কুরোদা কোনো গ্রাহক পান তখন সব ঠিকঠাক হলে আমি চলে আসতে পারব। এভাবে বাড়ি বিক্রির জন্য অপেক্ষা করার কোনো অর্থ হয় না।

তীক্ষ্ণ শীতল হাওয়া প্রবাহিত হচ্ছে। ওভারকোটের অভ্যন্তরে শরীরের হাড়গুলো যেন জমে যাচ্ছে। কী তীব্র শীত! আর ক'দিন বাদে বরফ পড়তে শুরু করবে। বাইরে আর বসে থাকতে পারলাম না, ভয় ভয় করলেও ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। আজ রাতে আর বাড়িতে কেউ নেই, স্রেফ আমি। কথাটা ভাবতেই মনের মধ্যে ভয়টা আরও চেপে বসল।

রাতে বিছানায় শুয়ে কিছুতেই ঘুম এল না। মনের ভেতর টেনশন এমন দানা পাকিয়ে উঠেছে যে ঘুম আসার সম্ভাবনাও নেই। সারাক্ষণ মনে হতে থাকল আমি একলা। কিছু একটা রহস্যময় ব্যাপার এ বাড়িকে কেন্দ্র করে ঘটছে। কী সেটা? সেটা যাই হোক মানুষের উপস্থিতি সে এখানে চায় না। কথাটা ভাবতেই আজ আর অন্ধকার ঘরে থাকার সাহস হল না। ডিম লাইট জ্বালিয়ে রাখলাম। তারপরও মনের মধ্যে থেকে অস্বস্তিকর ভাবটা দূর হল না। রাত ক্রমাগত বাড়তে থাকল। দূরে কতগুলো কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল। তারপর আবার সব চুপচাপ। হঠাৎ আমার মনে হল অত্যন্ত ক্ষীণ একটা শব্দ যেন কানে প্রবেশ করল। শব্দটা অনেকটা দরজা খোলার মতো। বাড়িতে তো কেউ নেই, তবে দরজা খুলছে কে?

লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসলাম। চারিদিকে আবার তেমনি স্তব্ধতা। কেবল ভাবছি মনের ভুল, ঠিক তক্ষুনি একটা পায়ের শব্দ পেলাম। শব্দটা আমার দরজার অপরপ্রান্তে এসে থামল। ভয়ে বুকটা দুরুদুরু করতে থাকল। স্পষ্ট বুঝলাম দরজার অপরপ্রান্তে কিছু একটা উপস্থিত হয়েছে। কী করব ভাববার আগেই দরজায় টোকা পড়ল।

কে? আমি চিৎকার করে উঠলাম। উত্তর নেই। কিন্তু দরজায় টোকার বদলে এখন জোরে জোরে করাঘাত শুরু হল। কে যেন ধাক্কা মারছে দরজায়। শব্দটা ধীরে ধীরে জোরালো হচ্ছে। মনে হচ্ছে দরজাটা বুঝি ভেঙে পড়বে। এই প্রথম ভয়ে আমি শিউরে উঠলাম। চিৎকার করতে চাইলাম। কিন্তু আমার গলা দিয়ে আওয়াজ বের হচ্ছে না। দরজায় দড়াম দড়াম করে শুধু ধাক্কা পড়ছে। পাতলা দরজাটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। আমি আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে কী করব বুঝতে না পেরে ফোনটা ওঠালাম। কুরোদাকে ফোন করে সাহায্য চাইব কিংবা যদি মৃত্যুও হয় তবে তার আগে তাঁকে সব জানিয়ে যাব।

কুরোদার ফোন ক্রমাগত বাজছে কিন্তু কেউ ওঠাচ্ছে না। তিনি কি তবে বাড়ি নেই কিংবা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন! এখন আমি কী করব? এই ভয়াবহ নির্জন রাতে আমাকে রক্ষা করার কেউ নেই। পাথরের মূর্তির মতো আমি দরজার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার চোখের সামনে দরজাটা প্রচণ্ড শব্দ করে ভেঙে পড়ল। আর সেইসঙ্গে দেখলাম দরজার অপরপ্রান্ত একটা ভয়ংকর দৃশ্য। আপাদমস্তক সাদা কাপড়ে আবৃত একটা মনুষ্যমূর্তি। তবে মুখটা মানুষের নয়, বীভৎস একটা দানবের। শুধু চোখ দুটো ফুটোর মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে।

এই প্রথম আমি প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে উঠলাম। দানবটা আমার দিকে এগিয়ে আসতে থাকল। পরক্ষণেই দরজার অপরপ্রান্তে কতকগুলো দ্রুত পায়ের আওয়াজ আর মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। দানবটা মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল। তারপরই ঘর থেকে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করল। কিন্তু ততক্ষণে ঘরে চারজন লোক ঢুকে পড়েছে। তারমধ্যে কুরোদাও রয়েছেন। লোকগুলো দানবটাকে একসঙ্গে চেপে ধরেছে। আর কুরোদা একটানে তার মুখোশটা টেনে ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন। দানবের মুখ মানুষের মুখে

পরিণত হয়েছে। আর সে মুখটার দিকে তাকিয়ে আমার কণ্ঠ থেকে আপনা-আপনি বিস্ময়সূচক আর্তনাদ বেরিয়ে এল, মজিদ!

পরদিন বিকেলে আমি কুরোদার সঙ্গে এ বিষয়ে কথাবার্তা বললাম। কুরোদা বললেন, প্রথমেই আমার সন্দেহ জেগেছিল। অনুমান করেছিলাম এ কোনো ভূত-প্রেতের কাজ নয়, স্রেফ মানুষের কাজ। কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগল, কে এই কাজটা করবে? কার স্বার্থ এতে জড়িয়ে আছে? পরে যখন দেখলাম যারা এ বাড়ি কিনতে আগ্রহী ছিল তারা কেটে পড়েছে তখন সন্দেহটা আরও ঘনীভূত হল।

কৌতূহল দমন করতে না পেরে তাঁর কথা শেষ হবার আগেই জিগ্যেস করলাম, মজিদ বাড়িটা তার দখলেই রাখতে চেয়েছিল, তাই না?

ঠিক তাই। সে যখন বুঝতে পেরেছিল আপনার খালা বাড়িটা আপনাকে দিয়ে যাচ্ছেন তখন সে ছদ্মবেশ ধারণ করে তাঁকে ভয় দেখাতে শুরু করে। সে জানত আপনার খালার হার্ট দুর্বল। ভয় পেয়ে আকস্মিক উত্তেজনায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি মারা যেতে পারেন। সেক্ষেত্রে তিনি আর আপনাকে ডেকে পাঠানোর সুযোগ পেতেন না। কিন্তু সে পরিকল্পনা মাঠে মারা গেল। আপনিও চলে এলেন, বাড়িটা বিক্রি করার ব্যবস্থা শুরু হল। মজিদ আর মিচিকো তখন ফন্দি এঁটে বিভিন্ন প্রেতের কল্প-কাহিনি বানিয়ে ভয় দেখিয়ে আপনাকে ভাগিয়ে দিতে চাইল। ভেবে দেখুন, আপনি কিন্তু কখনও আপনার খালাকে ভূতরূপে দেখেননি। দেখেছে ওরা দুজনে। যে শব্দটব্দ শুনেছেন বা জন্তুর যে কঙ্কাল আপনার ঘরের সামনে ছিল—

এখন তো পরিষ্কার বুঝতে পারছি এসব ওদের কীর্তি। ভেতর থেকে নিঃশব্দে দরজাটা ওরাই খুলে দিত।

সেইসঙ্গে আশেপাশে লোকজনদের বলে বেড়াতে লাগল ভূতের উপদ্রবের কথা। আমি আশেপাশের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি। কখনই এই বাড়িটাতে ভূতের উপদ্রবের কোনো কাহিনি ছিল না। এরাই এটাকে এমনভাবে ছড়াতে থাকল যাতে করে যারা বাড়িটা কিনতে আগ্রহী হবে তারা কেটে পড়বে। এবং বাস্তবে হয়েছিলও তাই। যারা বাড়ি দেখতে এসেছিল, মজিদ তাদের এসব কাহিনি বলে ভয় দেখিয়ে দিয়েছিল।

আপনি তলে তলে এত সব খবর সংগ্রহ করে রীতিমতো গোয়েন্দাগিরি করে যাচ্ছেন, একথা আমাকে জানালেন না কেন?

কুরোদা মিটিমিটি হেসে বললেন, যতক্ষণ না হাতেনাতে অপরাধীকে ধরতে পারছি ততক্ষণ আমিই বা কী করে নিশ্চিত হই। তবে এটুকু বুঝতে পেরেছিলাম যে আপনি রাতে এখানে একাকী থাকলে আপনাকে ভয় দেখানোর একটা প্রচেষ্টা নেওয়া হবে। আমিও এমন একটা সুযোগের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। পুলিশের সঙ্গে যোগসাজশ করে বাড়িটার পাশে ওৎ পেতে বসে রইলাম। মাঝরাতে দেখলাম বহু দূরে একটা গাড়ি এসে থামল। তারপর দানববেশী মানুষটা ধীরে ধীরে আপনার বাড়ির দিকে এগিয়ে আসতে থাকল। আমরাও বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে ওকে অনুসরণ করতে থাকলাম। ওর কাছে বাড়ির দরজার চাবি থাকায় সহজেই ও দরজা খুলে আমাদের অনেক আগে ভেতরে ঢুকে গেল। আমাদের আশঙ্কা হচ্ছিল এরই মধ্যে ও আপনার কোনো ক্ষতি করে ফেলে কিনা।

একেবারে সঠিক সময়ে এসেছিলেন আপনি। কুরোদা, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

কুরোদার সহায়তায় আমি বাড়িটা বেচে দেশে ফিরে এসেছিলাম। বিচারে মজিদ আর মিচিকোর কী শাস্তি হয়েছিল সেটা অবশ্য আর জানার সুযোগ হয়ে ওঠেনি।

[ভাদ্র ১৪১১]

অজানা সংকেত

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

বিকাশ অফিসে ঢুকেই খবর পেল ডঃ কৌশিক তাকে ব্যস্ত হয়ে খুঁজছেন। ও তাই দ্রুত তাঁর ঘরের দিকেই চলল। বন্ধ দরজার সামনে এসে টোকা মারতে ভিতর থেকে শোনা গেল 'কাম ইন'। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল বিকাশ। ডঃ কৌশিক ঘরে পায়চারি করছিলেন।

আমাকে খুঁজছিলেন, স্যার, বিকাশ বলল।

হ্যাঁ, বিকাশ, চেয়ারে বসে বললেন ডঃ কৌশিক, বোস।

দপ্তরের ডিরেক্টর হিসেবে ডঃ কৌশিক সকলের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় আর সম্মানের পাত্র। তাঁর বয়স প্রায় ষাট। রোদে পোড়া তামাটে রঙ। মাথায় সম্পূর্ণ সাদা পাতলা চুল। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। চেহারা মাঝারি।

তোমাকে কেন ডেকেছি, জান? এক বিশেষ অভিযানে যাচ্ছি আমরা, তোমাকেও আমাদের সঙ্গে নিতে চাই, ডঃ কৌশিক বললেন।

আমাকে, স্যার? একটু অবাক হয়ে গেল বিকাশ।

অফিসে বিকাশ প্রায় সর্বকনিষ্ঠ কর্মচারী। ওয়্যারলেস অপারেটার আর কম্পিউটার অপারেটার হিসেবে সে খুবই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। ডঃ কৌশিক তাই তাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন।

ডঃ কৌশিক বিকাশকে অবাক হতে দেখে বললেন, এই অভিযান খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর অত্যন্ত গোপনীয়। দলে থাকছে চারজন, আমি ছাড়া প্রফেসর মেটা, মিঃ ভার্গব আর তুমি। সব কথাই তোমাকে বলছি। সরকারের নির্দেশে বিন্ধ্য পর্বত এলাকায় অনুসন্ধান চালাব আমরা। এই অনুসন্ধান কিসের জন্য আন্দাজ করতে পার?

মাথা নাড়ল বিকাশ, না, স্যার।

খবর পেয়েছি সেখানে থোরিয়ামের ভাণ্ডার আছে যা আমাদের দেশের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। এই সার্ভে আর অনুসন্ধানের মুখ্য কাজটি করবেন প্রফেসর মেটা। তাঁকে তুমি চেন না। তিনি এই সব অনুসন্ধানের কাজে অত্যন্ত দক্ষ তাই তাঁর সহায়তা নিচ্ছেন সরকার। আর মিঃ ভার্গবই একমাত্র ওই এলাকা সঠিকভাবে চেনেন। তিনিই হবেন পথপ্রদর্শক।

কিন্তু, স্যার, আমি—?

হাসলেন ডঃ কৌশিক, তোমায় রাখছি বিশেষ এক কারণে। সেই কারণটা জানতে চাও? শোন, এই ধরনের কাজে সতর্কতা অত্যন্ত জরুরী। তোমার কাজ হবে ট্রান্সমিটার আর বেতার তরঙ্গ মারফত সদর দপ্তরে অনবরত যোগাযোগ রেখে চলা। কোনোরকম ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না। কেউ এই থোরিয়ামের ভাণ্ডারের অস্তিত্ব টের পাক আর ভয়ানক কোনো বিপদ ঘটুক, এ আমরা কখনও হতে দিতে পারি না, তাই এই সতর্কতা। আমরা বেছে বেছে লোক নিয়েছি। বাইরের অন্য কেউ থাকছে না।

বুঝেছি, স্যার, বিকাশ খুশি হয়ে বলল দায়িত্বের কথা জেনে।

তোমার উপর আমি নির্ভর করতে পারি, বিকাশ?

নিশ্চয়ই স্যার।

আমি তা জানি বলেই তোমাকে নির্বাচন করেছি। ডঃ কৌশিক বলে চললেন, এখন শোন, তিনদিনের

মধ্যেই আমরা যাত্রা করব। সেইভাবে তৈরি হয়ে নেবে আর কাউকেই আমাদের গন্তব্যস্থলের কথা জানাবে না, এমনকি বাড়িতেও নয়।

তাই হবে, স্যার।

বিকাশ বিদায় নিয়ে নিজের ঘরে চলে এল। অভিযানের কথা ভাবতে ভাবতে কম্পিউটারের সামনে বসে কিছু প্রোগ্রামিং করতে শুরু করল। কিন্তু বোতাম টেপামাত্রই পর্দায় যে কথাগুলো ফুটে উঠল তার জন্য ও একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। ভীষণ অবাক হয়ে বিকাশ দেখল ও যা করতে চেয়েছে তার বদলে কতকগুলো এলোমেলো ইংরাজী শব্দ পর্দার বুকে ফুটে উঠেছে। লেখাগুলো এইরকম ঃ

DNGR DNGR DNT TRST MTA
TRTR TRTR BWR DNGR

হতভম্ব হয়ে বিকাশ ভাবল, তবে কি যন্ত্রটায় কোনো গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে! ও আবার নতুন করে বোতাম টিপল। এবারেও আগের মতোই এলোমেলো কিছু ইংরাজী শব্দ পর্দায় ফুটে উঠল ঃ

DNT TRST MTA DNGR
DNGR TRTR BWR

বারবার তিনবার একই ধরনের লেখা পর্দায় ফুটে উঠতে দেখে গালে হাত রেখে ভাবতে লাগল বিকাশ। সত্যিই আজব কাণ্ড, কম্পিউটারের বুকে এ ধরনের কিছু লেখা ফুটে ওঠা! লেখাটা যে সাংকেতিক কোনো কিছু সে বিষয়ে নিশ্চিত হলো বিকাশ। কিন্তু কেন এ ধরনের লেখা পর্দায় ফুটে উঠছে, ও কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না।

কি হতে পারে এটা? কেউ কি ওর অজান্তে কম্পিউটারে কিছু করেছে? কিন্তু তাই বা হবে কেমন করে? এতে কার কি স্বার্থ থাকতে পারে?

শেষ পর্যন্ত বিকাশ ভাবল মাথা ঠাণ্ডা করে পরে ও এটা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখবে, তারপর দেখা যাবে।

দুটো দিন এরপর অভিযানের সমস্ত কিছু গুছিয়ে নিতেই কেটে গেল। কম্পিউটারের ব্যাপারটা বিকাশ প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। যাত্রার আগের দিন মনে পড়তেই ও আবার কম্পিউটারের সামনে বসল।

বোতাম টিপতেই আবার সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল পর্দায়। লেখাটা এবার একটু অন্যরকম ঃ

DNGR AHD BWR DNT TRST
MTA TRTR TRTR KP WTCH

এবার সত্যিই চিন্তায় পড়ে গেল বিকাশ। মনে মনে ও বুঝল ব্যাপারটাকে আর অবহেলা করা যাবে না, আজই ডঃ কৌশিককে জানাতে হবে। তার আগে যেমন করেই হোক দেখতে হবে এ কোনো সংকেত কিনা।

সে-রাতে কাগজ-পেন্সিল নিয়ে বিকাশ শব্দগুলোকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করল। সাংকেতিক শব্দের পাঠোদ্ধার সম্বন্ধে ওর আগেই কিছু জ্ঞান ছিল, তাই কাজে লাগাল লিখে রাখা শব্দগুলোর ওপর।

প্রায় সারা রাত না ঘুমিয়েও সাংকেতিক শব্দগুলোর পাঠোদ্ধারে সফল হলো না বিকাশ। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে ভোরের দিকে শুয়ে পড়তেই বিদ্যুৎচমকের মতো কিছু যেন মনে পড়ল ওর। লাফিয়ে উঠে পড়ল বিকাশ। তাই তো! মহা মূর্খ ও, এমন সহজ অর্থ ধরতে পারেনি!

উত্তেজনায় কাঁপা হাতে বিকাশ কাগজে লিখে ফেলল উদ্ধার করা কথাগুলো।

একেবারে প্রথম দিনের সংকেত থেকে লিখে ফেলল,

ডেঞ্জার ডেঞ্জার ডু নট ট্রাস্ট মেটা
ট্রেটর ট্রেটর বিওয়্যার ডেঞ্জার

তারপর—

ডু নট ট্রাস্ট মেটা ডেঞ্জার

ডেঞ্জার ট্রেটর বিওয়্যার

তারপর—

ডেঞ্জার অ্যাহেড বিওয়্যার ডু নট ট্রাস্ট

মেটা ট্রেটর ট্রেটর কিপ ওয়াচ।

উত্তেজনায় বিকাশের মাথার চুল যেন খাড়া হয়ে উঠল। কেউ কম্পিউটারে সংকেত পাঠিয়ে ওকে সাবধান করে দিতে চেয়েছে মেটা সম্পর্কে। বিপদ আসছে, মেটা বিশ্বাসঘাতক, তার উপর নজর রাখতে বলা হয়েছে।

সকাল হতেই সংকেতের পাঠোদ্ধার করা কাগজগুলো নিয়ে অফিসে ছুটল বিকাশ, ডঃ কৌশিকের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে এখনই সতর্ক করে দিতে হবে।

ডঃ কৌশিক তাঁর ঘরে মিঃ ভার্গব আর অন্য একজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ওকে দেখে বললেন, তোমার কথাই ভাবছিলাম, বিকাশ। ইনিই প্রফেসর মেটা। আর প্রফেসর মেটা, এই হলো বিকাশ, আমাদের তরুণ ওয়্যারলেস আর কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ। ও আমাদের সঙ্গে থাকছে।

বিকাশ প্রফেসর মেটাকে খুঁটিয়ে দেখল। মধ্যবয়স্ক প্রফেসর মেটা বেশ হাসিখুশি সুদর্শন পুরুষ, চোখে চশমা, পরনে দামী সুট।

কিছু বলবে নাকি? ডঃ কৌশিক বললেন।

না, না, তেমন কিছু না, বিকাশ বলল।

ঠিক আছে, একটু পরে তোমায় ডেকে পাঠাব।

বিকাশ ফিরে এসে প্রফেসর মেটার কথা ভাবতে লাগল। প্রফেসরকে দেখে ভাল মানুষ বলেই মনে হয়। তবু—। নাঃ, ভেবে লাভ নেই, ভবিষ্যতেই প্রমাণ পাওয়া যাবে।

একটু পরেই ডঃ কৌশিক বিকাশকে ডেকে পাঠালেন। বিকাশ ঘরে ঢুকতেই তিনি বললেন, তোমাকে কেমন চিন্তিত মনে হচ্ছে। ব্যাপার কি?

আপনি হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবেন না, স্যার, কথাটা তবু না বলে পারছি না, বলে বিকাশ আনুপূর্বিক সমস্ত কিছু খুলে বলল আর পাঠোদ্ধার করা সংকেতের অর্থও দেখাল।

লেখাটায় চোখ বুলিয়ে ডাঃ কৌশিক গম্ভীর হয়ে বললেন, আশ্চর্য! প্রফেসর মেটা খ্যাতিমান অধ্যাপক। সুনামও তাঁর যথেষ্ট, তাঁকে অবিশ্বাস করা কঠিন। তবু—। না, বিকাশ, তুমি আমার মাথায় সন্দেহের পোকা ঢুকিয়ে দিয়েছ। আমাদের সতর্ক হতে হবে। তুমি একথা কাউকে বলবে না। শুধু ভার্গব জানবে। ও আমার বহুদিনের পরিচিত, ওকে বিশ্বাস করি। আমরা একটা মুহূর্তও মেটাকে নজরের আড়াল করব না অভিযানের সময়। প্রয়োজনে তুমি বেতারে সাহায্য চাইতে পারবে।

এবার শোন। আজ রাতেই আমরা বোম্বাই মেলে যাত্রা করব বিলাসপুরে। সেখান থেকে মূল অভিযান শুরু হবে। অমরকণ্টক হয়ে আমরা যাব বিন্ধ্য পর্বতের মেকলে পাহাড়ে। সঙ্গে মালপত্র বইবার জন্য থাকবে মালবাহক। পাহাড়ের কোলে আমাদের শিবির স্থাপন করে সেখান থেকেই পরীক্ষার কাজ চালানো হবে। যাও, এবার তৈরি হয়ে নাও, সময় বেশি নেই। শুধু সাবধানতার জন্য আমি সঙ্গে রাখছি এটা—। ডঃ কৌশিক একটা ছোট্ট রিভলভার পকেট থেকে বের করে দেখালেন।

তারপর যাত্রা। যথাসময়ে ট্রেন ছাড়ল। হাওড়া থেকে বোম্বাই মেলে বিকাশরা পৌঁছল বিলাসপুর। সমস্ত বন্দোবস্ত আগে থেকেই করা ছিল। সেই মতো তিনটে জিপে মালপত্তর ও মালবাহক কুলিদের নিয়ে ওঁরা রওনা হলেন বিন্ধ্য পর্বতের দিকে।

শরতের শেষ, তাই বাতাসে শিরশিরে আমেজ। নতুন এই অভিযানে এসে বেশ ভাল লাগছিল বিকাশের। প্রফেসর মেটা খুবই উৎসাহী। মিঃ ভার্গবের মধ্যে কোনো টেনশান নেই। শুধু ডঃ কৌশিকের কপালে চিন্তার রেখা।

উপত্যকা পেরিয়ে বিন্ধ্য পর্বতের এলাকায় বিকেলের কাছাকাছি পৌঁছল জিপ। মিঃ ভার্গবই পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় ছিলেন। এরপর জিপ থেকে নামানো হলো সমস্ত মালপত্র ও রসদ। পাহাড়ের কোলে শিবির স্থাপনের ব্যবস্থা তদারকি করে চললেন মিঃ ভার্গব। তিনটে তাঁবু খাটানো হলো।

একটা তাঁবুতে থাকবেন ডঃ কৌশিক আর বিকাশ, অন্য দুটোর একটাতে ডঃ ভার্গব ও প্রফেসর মেটা, অন্যটাতে মালবাহকেরা। জিনিসপত্র প্রথম তাঁবুতেই থাকবে ঠিক হলো।

সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। কুলিরা রাতের খাবার তৈরি করার আয়োজন শুরু করল। অবশ্য তার আগে এল গরম কফি আর কিছু স্ন্যাকস। সকলে পরের কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করতে চাইলেন। ঠিক হলো পরদিন সকাল আটটার মধ্যেই চড়াই ভেঙে আসল জায়গার উদ্দেশে রওনা হবেন তাঁরা।

মিঃ ভার্গব জানালেন, চড়াই তেমন বেশি হবে না তাই মালবাহকেরা নিচেই থেকে যাবে, সামান্য জিনিসপত্র নিয়ে শুধু উপরে উঠবেন দলের অভিযাত্রী চারজন। সফল না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন মূল শিবিরেই ফিরে আসা হবে।

নটার মধ্যে রাতের খাওয়া শেষ করে সকলে তাঁবুতে বিছানায় আশ্রয় নিলেন। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। শুয়ে পড়লেও ঘুম আসছিল না বিকাশের, নানারকম চিন্তা জেগে উঠছিল মাথায়।

সকালে ঘুম ভাঙার পর ডঃ কৌশিকের হুকুমে সকলে দ্রুত তৈরি হয়ে নিল। চা পান করার পর যাত্রা শুরু হলো ঠিক আটটায়। এবারও পথ দেখিয়ে উঠতে শুরু করলেন মিঃ ভার্গব।

বিকাশের কাঁধে পোর্টেবল ট্রান্সমিটার আর জরিপের যন্ত্রপাতি, মিঃ ভার্গবের কাছে ড্রিলিং মেশিন আর প্রফেসর মেটার কাঁধে খাবারের প্যাকেট আর কফির ফ্লাস্ক।

চড়াই তেমন দুর্গম নয় তাই উঠতে কোনো কষ্ট হলো না কারো। চারপাশে ছোট ছোট গাছ আর পাথর। প্রায় চারশ' ফিট ওঠার পর দেখা গেল বেশ সমতল খানিকটা জায়গা, চারদিকে ঝোপ আর পাথর। মিঃ ভার্গবের নির্দেশে সেখানেই থামল সকলে।

কফি খেয়ে নিল সকলে এবার। মিঃ ভার্গব জানালেন এটাই সেই জায়গা, এখানেই শুরু করতে হবে অনুসন্ধানের কাজ।

প্রফেসর মেটা এবার খুশি মনে ড্রিলিং মেশিন নিয়ে কাজে নেমে পড়লেন। বিকাশ তার যন্ত্রপাতি নামিয়ে একটু দূরের একটা উঁচু পাথরের উপর গিয়ে বসল। ওখান থেকে চারপাশের দৃশ্য খুব সুন্দর দেখায়। শুধু ডঃ কৌশিক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে প্রফেসর মেটার কাজ লক্ষ্য করতে লাগলেন।

ঘণ্টা দুই কাজ করেও খুশি মনে হলো না প্রফেসর মেটাকে। ড্রিল করে কিছুই পাওয়া গেল না।

এরই মধ্যে লাঞ্চ প্যাকেট নিয়ে মধ্যাহ্নের খাওয়া সেরে নিলেন সবাই। বিকেল প্রায় তিনটের সময় সকলে আবার ফিরে এলেন মূল শিবিরে। রাতে খাওয়া হয়ে গেলে পরের দিনের কাজ সম্পর্কে আলোচনা করে যে যাঁর তাঁবুতে ঢুকে শয্যায় আশ্রয় নিলেন।

দ্বিতীয় দিনেও তেমন সুফল মিলল না। ডঃ কৌশিক চিন্তিত হলেন।

তৃতীয় দিন আবার সকলে সেই সমতলে পৌঁছলেন। এবার অন্যদিকে নতুন করে একটা পাথুরে টিবির বুকে ড্রিলিং করে পরীক্ষা করবেন ঠিক করলেন প্রফেসর মেটা।

বেলা প্রায় বারোটা। সূর্য মধ্যগগনে। বেশ গরম লাগছিল বিকাশের। হঠাৎ প্রফেসর মেটার মুখে অস্ফুট একটা শব্দ শুনে ডঃ কৌশিক তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি বলে উঠলেন, কি ব্যাপার, প্রফেসর?

উত্তেজনায় মুখ লাল প্রফেসর মেটার। তিনি বলে উঠলেন, আমরা সফল হয়েছি, ডঃ কৌশিক। এখানে সত্যিই থোরিয়ামের ভাণ্ডার আছে!

ডঃ কৌশিক, ভার্গব ও বিকাশ উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন এই কথা শুনে। প্রফেসর মেটা দারুণ খুশি খুশি গলায় বললেন, সত্যি খুব আনন্দের দিন আজ। আসুন, সকলে মিলে সেলিব্রেট করা যাক।

উৎসাহের আতিশয্যে প্রফেসর ফ্লাস্ক থেকে গরম কফি ঢেলে তিনজনকে পরিবেশন করলেন।

কয়েকটা আনন্দঘন মুহূর্ত, তারপরেই ডঃ কৌশিক, মিঃ ভার্গব আর বিকাশ জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। স্থির রইলেন শুধু প্রফেসর মেটা।

পড়ে থাকা তিনজনকে লক্ষ্য করতে করতে পাল্টে গেল তাঁর চোখ-মুখের ভাব। একটু আগের সেই সুদর্শন ভদ্রলোকের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এল এক নতুন মানুষ। লোভে চকচক করছে দুই চোখ। হা হা শব্দে পাহাড় কাঁপিয়ে হেসে উঠে বললেন, আঃ কি আনন্দ! এই থোরিয়ামের ভাণ্ডার এখন শুধু আমার। এই তিনজনকে এবার পাহাড় থেকে নিচে ফেলে দেব, তারপর—

প্রফেসর মেটা এগিয়ে এসে প্রথমে বিকাশের অচেতন দেহটা কাঁধে তুলে নিয়ে পাহাড়ের কিনারার দিকে এগোলেন।

দাঁড়ান, প্রফেসর মেটা! ডঃ কৌশিকের বজ্রকণ্ঠ শুনে বিকাশের অচেতন দেহটা মাটিতে ফেলে দ্রুত ঘুরে পকেটে হাত ঢোকাতে গেলেন প্রফেসর মেটা। তিনি প্রায় স্তম্ভিত।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে লাভ নেই প্রফেসর, ডঃ কৌশিক তাঁর রিভলভার তুলে বলে উঠলেন। আপনার অস্ত্রটি বিকাশ আগেই তুলে নিয়েছে তাকে যখন কাঁধে তুলেছিলেন। আপনি যে বিশ্বাসঘাতক তা আমরা জানতাম। কম্পিউটার আমাদের সংকেতে আপনার কথা জানিয়ে দিয়েছিল। আমরা তাই এক মুহূর্তের জন্যেও আপনাকে নজরের আড়াল করিনি। আর এখানে আসার আগে পুলিশকেও অ্যালার্ট করে এসেছি। আপনি জানেন না আপনার দেওয়া কফিও আমরা খাইনি, কারণ বিকাশ দেখেছে আপনি ওতে কি যেন মেশাচ্ছেন। আমাদের অজ্ঞান হওয়াটা শুধুমাত্র একটা ভান ছিল। দেশের সঙ্গে এই বিশ্বাসঘাতকতা করতে লজ্জা হলো না আপনার? জানি না কাদের হয়ে একাজ করেছেন, তবে পুলিশ আপনাকে বাধ্য করবে তাদের নাম বলতে। বিকাশ, ট্রান্সমিটারে খবর পাঠাও, পুলিশ আসুক।

উন্মাদের মতো হেসে উঠলেন প্রফেসর মেটা। আমাকে ধরার শক্তি আপনাদের নেই, ডঃ কৌশিক। আর যা জানতে চাইছেন কোনোদিনই তা জানতে পারবেন না—। কথাটা বলেই কেউ কিছু করার আগে ঝড়ের বেগে ছুটে গিয়ে পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিলেন প্রফেসর মেটা।

ঘটনার আকস্মিকতায় স্তব্ধ হয়ে গেলেন সকলে। বিকাশই প্রথম পাহাড়ের কিনারায় ছুটে গেল। ওর চোখে পড়ল অনেক নিচে একটা পাথরের উপর পড়ে রয়েছে প্রফেসর মেটার রক্তাক্ত দেহটা। সে দেহে প্রাণ আছে বলে মনে হলো না তার।

ডঃ কৌশিক ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন, লোভের কি করুণ পরিণতি! কার বা কাদের হয়ে প্রফেসর দেশের এতবড় সর্বনাশ করতে চেয়েছিলেন সেটা হয়তো আর জানা যাবে না। কিন্তু এমন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি—। বিকাশ, আজ তোমার জন্যই আমরা বেঁচে আছি। কম্পিউটারের সংকেতের অর্থ তুমিই বের করেছিলে। আমি গর্বিত তোমার জন্য।

ডঃ কৌশিকের প্রশংসায় বিকাশের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

[বৈশাখ ১৪০৪]

দেওয়াল লিখন

অনিলকুমার ঘোষ

রহস্যান্বেষী অঞ্জন ঘোষের ড্রইংরুমে তার ছোট বোন পিউ আসন্ন পরীক্ষার পড়া তৈরি করছিল। পাশে বসে অঞ্জনের বন্ধু ও সহকারী তুষার রায় তাকে সাহায্য করছিল। এমন সময় বাইরে একটা মোটর থামার শব্দ শোনা গেল। একটু পরে ঘরে ঢুকলেন একজন প্রৌঢ় রাশভারী ভদ্রলোক। তাঁর মুখচোখে গভীর উদ্বেগের ছায়া। তুষারের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, অঞ্জনবাবু আছেন? বলুন পাবলিক প্রসিকিউটার গগন মুখার্জী এসেছেন।

বাস্তভাবে উঠে তুষার বলল, অঞ্জন তো এখন কলকাতায় নেই। বিশেষ একটা দরকারী কাজে বোম্বে গেছে। ফিরতে দেরি হবে।

হতাশভাবে একটা সোফায় বসে পড়ে গগনবাবু বললেন, অঞ্জনবাবু নেই? আমি যে একটা প্রয়োজনীয় পরামর্শের জন্যে তাঁর কাছে এসেছিলাম।

তুষার বলল, আমি অঞ্জনের বন্ধু ও সহকারী, তুষার রায়। আর এ হলো অঞ্জনের ছোট বোন পিউ.... মানে পিয়ালী ঘোষ। আপত্তি না থাকলে আপনি আপনার সমস্যার কথা আমাকে বলতে পারেন। আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি যদি কিছু সাহায্য করা সম্ভব হয়।

গগনবাবু একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, ঘটনাটা একটা খুনের। খুনীকে পুলিশ ঠিকই ধরেছে এবং প্রমাণ যা কিছু সংগ্রহ করেছে, তার সাহায্যে আমি আদালতে খুনীকে দোষী প্রমাণ করিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু....

—কিন্তু কী? তুষার জিজ্ঞাসা করল।

—বাদ সেধেছে মৃত ব্যক্তির অসমাপ্ত ডাইং ডিক্লেরেশন।

—তার মানে? মৃত ব্যক্তি মৃত্যুকালীন জবানবন্দী দিয়ে গেছেন? তাহলে তো কেসটা খুব সোজা হয়ে গেছে।

—মোটেই তা নয়। সোজা তো হয়ইনি, বরং আরো ঘোরালো হয়ে পড়েছে, গগনবাবু বললেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কোনো কারণে বিশ্বনাথবাবু তাঁর হত্যাকারীকে চিনতে ভুল করেছিলেন।

তুষার বলল, সম্পূর্ণ কেসটা শুনতে পেলে....

—নিশ্চয়ই, বাধা দিয়ে গগনবাবু বললেন, আমি প্রথম থেকেই বলছি—

মৃত বিশ্বনাথ মজুমদার ব্যারাকপুরের একজন নামকরা বড়লোক ছিলেন। তাঁর কোনো ছেলে নেই। আছেন শুধু এক বিধবা মেয়ে রাণীবালাদেবী ও তাঁর তিন ছেলে অবলাকান্ত সেন, অধীরকান্ত সেন ও অবনীকান্ত সেন। মেয়ে বিধবা হবার পর থেকেই বিশ্বনাথবাবু তাঁর মেয়ে ও তিন নাতিকে নিজের কাছেই এনে রেখেছিলেন এবং যে উইল তিনি করেছিলেন সেই উইল অনুযায়ী তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সমস্ত সম্পত্তি এই তিন নাতিরই পাওয়ার কথা।

তবে বিশ্বনাথবাবুর তিন নাতিই এক একটি রত্ন। বিদ্যার দৌড় এদের কারোরই বেশি নয়। চিরকাল বদলোকের সঙ্গে মেলামেশা করে শুধু কুশিক্ষাই পেয়েছে। অসম্ভব রকমের বাবুগিরি ও বিলাসিতায় বহু টাকাপয়সা নষ্ট করেছে। বিশ্বনাথবাবু এদের হাতখরচের জন্যে যথেষ্ট টাকা দিতেন না বলে ওরা ধার-দেনায় প্রায় ডুবতে বসেছিল। মোটা টাকা না পেলে ওদের জেলে যাওয়া কেউ রুখতে পারতো না।

নাতিদের মতিগতি দেখে বৃদ্ধ বিশ্বনাথবাবু ক্রমেই হতাশ হয়ে পড়ছিলেন। শেষে একদিন তিন নাতিকে ডেকে শেষবারের মতো সাবধান করে জানিয়েছিলেন—এর পরও যদি তারা সৎপথে না আসে, তাহলে তিনি তাঁর উইল বদলে সমস্ত সম্পত্তি কোনো মঠে দান করে দেবেন। ফলে নাতিরা ভীষণ রেগে বিশ্বনাথবাবুকে খুন করবে বলে শাসায়। বিশ্বনাথবাবুর সেক্রেটারী রজত পাত্র এই শাসানি শুনেছিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পর বিশ্বনাথবাবুর হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়। হাউস ফিজিসিয়ান রোজ এসে তাঁকে পরীক্ষা করে ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে যেতেন। রাণীবালাদেবী তাঁর বাবার দেখাশোনা করতেন। সেক্রেটারী রজতবাবুও সেবাযত্ন করতেন। নাতিরাও মাঝে মাঝে এসে বিশ্বনাথবাবুর কুশল জিজ্ঞাসা করতো কিংবা ওষুধপত্র এনে দিত। কিন্তু ওদের মতলব ছিল অন্য। আসলে ওরা ভাবতো, কবে বুড়ো মরবে, আর সম্পত্তিটা ওদের হাতে আসবে।

গত পনেরোই অক্টোবর সন্ধ্যায় রজতবাবু স্থানীয় থানায় ফোন করে জানান যে, বিশ্বনাথবাবু খুন হয়েছেন। খবর পেয়ে ইন্সপেক্টার রায় তক্ষুণি সদলবলে ঘটনাস্থলে যান। তিনি গিয়ে দেখলেন বিশ্বনাথবাবুর ঘরের সামনে ছোটখাট একটা ভিড়। রাণীবালাদেবী অঝোরে কাঁদছেন। তাঁর তিন ছেলে বিবর্ণ শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে। আর আশেপাশে দাঁড়িয়ে বাড়ির চাকরবাকরেরা। ঠিক দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিলেন রজতবাবু। তিনি কাউকে ঘরে ঢুকতে দেননি।

ঘরে ঢুকে মিঃ রায় দেখলেন বিছানা ও দেওয়ালের মাঝখানে উপুড় হয়ে মেঝেতে পড়ে রয়েছে বিশ্বনাথবাবুর মৃতদেহ। হাত দুটো সামনের দিকে ছড়ানো। ডান হাতের তর্জনীতে লেগে রয়েছে তাজা রক্ত। মৃতদেহ থেকে একটা রক্তের ধারা ঘরের মেঝেতে বয়ে যাচ্ছে।

সহসা মিঃ রায়ের দৃষ্টি বিশ্বনাথবাবুর ঠিক সামনের দেওয়ালের নিচের দিকটায় পড়ল। পড়তেই ভীষণভাবে চমকে উঠলেন তিনি। দেওয়ালের গায়ে রক্ত দিয়ে ঈষৎ আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা রয়েছে—খুনী অব—। লেখাটা অসম্পূর্ণ। স্পষ্ট বোঝা যায়, মৃত্যুর আগে বিশ্বনাথবাবু নিজের রক্ত দিয়ে খুনীর নাম লিখে যেতে চেয়েছিলেন।

পুলিশ ফটোগ্রাফার বিভিন্ন কোণ থেকে ছবি তোলার পর মিঃ রায় চারিদিক পরীক্ষা করে অতি সাবধানে মৃতদেহটা উল্টে দিয়ে দেখলেন, বিশ্বনাথবাবুর বুকের নিচের দিকে একটা গভীর ক্ষত।

রজতবাবু তাঁর জবানবন্দীতে বলেছেন, কয়েকটি দরকারী ওষুধ কিনে বাড়ি ফিরতে সেদিন তাঁর সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। তিনি জানতেন ওই সময় রাণীবালাদেবী পূজায় ব্যস্ত থাকেন। বিশ্বনাথবাবু ঘরে একা। তাই বাড়ি পৌঁছেই আগে তিনি বিশ্বনাথবাবুর কাছে যান। কিন্তু তাঁর ঘরের কাছাকাছি আসতেই একটা ভয়ার্ত আর্তনাদ শুনতে পেলেন। আর ঠিক তারপরই একটা কাতর যন্ত্রণাদায়ক গোঙানি। রজতবাবু প্রথমে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। তারপর ছুটে বারান্দা পেরিয়ে বিশ্বনাথবাবুর ঘরের সামনে গিয়ে দেখেন ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ঘরে আলো জ্বলছিল কিন্তু কে যেন আলোটা নিভিয়ে দিল। পরক্ষণেই দরজা দড়াম করে খুলে সামনে দণ্ডায়মান রজতবাবুকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে একটি লোক ঝড়ের মতো বারান্দা ও উঠোন পেরিয়ে ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বারান্দার উজ্জ্বল আলোতে রজতবাবু স্পষ্টই দেখতে পেলেন লোকটি বিশ্বনাথবাবুর মেজ নাতি অধীরকান্ত।

নিজেকে সামলে রজতবাবু বিশ্বনাথবাবুর অন্ধকার ঘরে ঢুকে হাতড়ে হাতড়ে সুইচটা টিপতেই আলো জ্বলে উঠল। আর আলো জ্বলতেই তাঁর চোখে পড়ল এক ভয়াবহ দৃশ্য।

ঘরের মেঝেটা যেন রক্তে ভেসে যাচ্ছে। আর তারই মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছেন বিশ্বনাথবাবু। যন্ত্রণায় তাঁর সারা দেহ বেঁকে বেঁকে যাচ্ছিল।

বিশ্বনাথবাবুর অবস্থা দেখে রজতবাবু বুঝতে পেরেছিলেন বৃদ্ধের মৃত্যু আসন্ন। তাই তিনি মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে হত্যাকারীর নাম জিজ্ঞাসা করতে থাকেন। বিশ্বনাথবাবুও প্রাণপণে কথা বলার চেষ্টা

করেন কিন্তু তাঁর গলা দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ ছাড়া আর কিছুই বের হয় না। মরিয়া হয়ে তিনি সমস্ত শক্তি এক করে নিজের রক্তে ডান হাতের তর্জনী ডুবিয়ে সামনের দেওয়ালে লিখতে শুরু করলেন। কিন্তু 'ব' অক্ষরটার শেষ টান পুরো হতে না হতেই ঢলে পড়লেন।

রজতবাবু তাঁর জবানবন্দীর শেষে বললেন যে, অধীরবাবু যখন তাঁকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে পালিয়ে যান, তখন তাঁর হাত থেকে চাদরে জড়ানো কী যেন পড়ে যায়। সেটি দরজার সামনেই পড়ে ছিল। মিঃ রায় দেখলেন চাদরটিতে রক্তমাখা। তিনি সাবধানে চাদরটি খুলতেই তার ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একটি রক্তমাখা ছোরা। ফরেনসিকের রিপোর্ট অনুসারে এই ছোরা দিয়েই বিশ্বনাথবাবুকে হত্যা করা হয়েছিল।

তুষার ও পিউ একমনে গগনবাবুর কথা শুনছিল। তুষার জিজ্ঞেস করল, চাদর ও ছোরাটা কার তা জানা গেছে কি?

—হ্যাঁ, গগনবাবু বললেন, ছোরা ও চাদর দুটোই বিশ্বনাথবাবুর। ছোরাটা তিনি শখ করে কোনো প্রদর্শনী থেকে কিনেছিলেন। সেটা ঘরের খোলা তাকেই থাকতো।

—ছোরার বাঁটে কার আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে?

—কারুর না। পুলিশের মতে আততায়ী ঘরে ঢুকে বিশ্বনাথবাবুকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে হত্যার সংকল্প করে। সে সাবধানে ছোরাটা তাক থেকে তুলে নেয়। তারপর আলনা থেকে চাদর তুলে ছোরার বাঁট পরিষ্কার করে নেয়। পরে চাদর দিয়ে ছোরাটা ধরে সাবধানে এগিয়ে যায় খুন করতে। কিন্তু ততক্ষণে বিশ্বনাথবাবুর ঘুম ভেঙে গেছে। তিনি ছোরা হাতে আততায়ীকে দেখে আর্তনাদ করে উঠে দাঁড়ান। ততক্ষণে আততায়ী ছোরা চালিয়ে দিয়েছে। ছোরাটা ঠিক জায়গায় লাগলে বিশ্বনাথবাবুর মৃত্যু সঙ্গে সঙ্গে ঘটতো। কিন্তু আততায়ী এ ব্যাপারে অনভিজ্ঞ হওয়ায় আঘাতটা নিচের দিকে করে। ফলে বিশ্বনাথবাবু সঙ্গে সঙ্গে মারা যান না। তিনি মাটিতে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকেন।

তুষার চিন্তিতভাবে বলল, বোঝা যাচ্ছে, অধীরবাবু চাদর ও ছোরা বাইরে কোথাও ফেলে দিয়ে প্রমাণ লোপ করতে যাচ্ছিলেন।

—অধীরবাবু তাঁর জবানবন্দীতে কী বলেছেন?

—সে বলেছে সে নাকি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কোনো নির্দিষ্ট জায়গার নাম বলতে পারেনি। রজতবাবুকে ধাক্কা দেওয়া এবং বিশ্বনাথবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে ছোরাসুদ্ধ চাদর ফেলে ছুটে পালিয়ে যাওয়া এসবই সে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছে। অথচ ঐ বাড়ির দুইজন চাকরও তাকে ছুটে পালাতে দেখেছে। মিঃ রায় হত্যাপরাধে অধীরবাবুকে গ্রেপ্তার করেছেন।

—অবলাবাবু ও অবনীবাবু তাঁদের অ্যালিবাই দিতে পেরেছেন?

—না। ওরা নাকি গঙ্গার ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। অথচ আশ্চর্য কথা, খুনের ঠিক পরই সবাই বাড়ি ফিরে এল। মিঃ রায় ওদের ঐ বাড়িতেই দেখেছিলেন। যাই হোক, অবলা বা অবনীর গতিবিধি সম্পর্কে আমার জানার দরকার নেই। আমি শুধু অধীরের প্রতি দৃষ্টি রাখছি। যারা তাকে খুন করে পালাতে দেখেছে এবং পুলিশ যে সব প্রমাণ সংগ্রহ করেছে, তার সাহায্যে আমি অধীরকে খুনী প্রমাণ করিয়ে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু মুশকিল করেছেন বিশ্বনাথবাবু নিজে। উনি নিশ্চয় অবলা বা অবনীকে খুনী ভেবে 'অব' কথাটা লিখেছিলেন। ওদিকে জাস্টিস মৈত্রের আদালতে কেসটা পড়েছে। তিনি কড়া লোক। নিখুঁত প্রমাণ না হলে তিনি আসামীর বিরুদ্ধে কোনো সাজাই দেবেন না। আবার আসামীর পক্ষে দাঁড়িয়েছেন দুঁদে উকিল হলধর রায়। তিনি প্রমাণ করে দেবেন যে ঘরের উজ্জ্বল আলোতে খুনীকে স্পষ্ট দেখে বিশ্বনাথবাবু তার নাম লিখে পুলিশকে জানাবার চেষ্টা করেছিলেন। যদিও তিনি খুনীর নামের শেষ অক্ষরটা লিখে যেতে পারেননি তবুও 'খুনী অব'-এর সোজা মানে 'খুনী অবলা' কিংবা 'খুনী অবনী' হতে পারে কিন্তু তাঁর মক্কেলের নাম কোনোক্রমেই হতে পারে না।

একটু থেমে পকেট থেকে গোটা কয়েক ফটো বের করে তুষারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এই হলো পুলিশ ফটোগ্রাফারের তোলা অকুস্থলের ছবি।

তুষার চিন্তিতভাবে ফটোগুলো পরীক্ষা করে পিউকে দিয়ে বলল, আমিও ডাইং ডিক্লেরেশনের মানে বুঝতে পারছি না। প্রমাণ দেখে অধীরকে খুনী বলে বোঝা যায়। তবু মৃত ব্যক্তি যখন অবলা বা অবনী লিখতে যাচ্ছিলেন, তখন পুলিশের উচিত ঐ দুইজনের সম্বন্ধে আরো খোঁজখবর করা। সত্যিই তো, ডাইং ডিক্লেরেশনকে তো অবহেলা করা যায় না।

পিউ একমনে ফটোগুলো দেখছিল। সেই সঙ্গে গভীরভাবে কী যেন ভাবছিল। হঠাৎ তার চোখ দুটো অস্বাভাবিক দীপ্তিতে ঝকঝক করে উঠল। মুখে ফুটে উঠল একটুকরো হাসি।

তুষারের মন্তব্য শুনে গগনবাবু বিরক্তভাবে উঠতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় পিউ বলে উঠল, আপনি কোনো চিন্তা না করে কেস চালিয়ে যান। পুলিশ প্রকৃত অপরাধীকেই গ্রেপ্তার করেছে।

গগনবাবু অবাক হয়ে পিউর দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, কিন্তু বিশ্বনাথবাবুর....

—বিশ্বনাথবাবু খুনীকে ঠিকই চিনেছিলেন এবং তিনি তার নামই লিখতে যাচ্ছিলেন—

গগনবাবু ভ্রূ কুঁচকে বললেন, কী বলছো তুমি? বিশ্বনাথবাবু তো 'খুনী অবলা' বা 'খুনী অবনী' লিখতে যাচ্ছিলেন।

—না, বিশ্বনাথবাবু 'খুনী অধীর' লিখতে যাচ্ছিলেন।

সন্দিগ্ধ সুরে গগনবাবু বললেন, তাহলে 'খুনী অব' লিখলেন কেন?'

হাসতে হাসতে পিউ বলল, আপনি তো জানেন, বাংলায় 'ধ' অক্ষরটা লিখতে হলে প্রথমে 'ব' লিখে, তার উপরে একটা ছোট দাগ দিলেই 'ধ' অক্ষর তৈরি হয়। বিশ্বনাথবাবু 'ধ' লেখার জন্যে প্রথমে 'ব' লিখেছিলেন। কিন্তু উপরের ঐ ছোট দাগটা দেবার আগেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। মনে হয় ফোরেনসিক ডিপার্টমেন্ট আর পুলিশের হস্তলিপিবিশারদরাই সন্দেহের নিরশন ঘটাতে পারবেন।

চমৎকৃত হয়ে গগনবাবু বললেন, সাবাস! এই না হলে রহস্যান্বেষীর বোন!

[ফাল্গুন ১৩৯৫]

কালীনাথের শব্দছক

অমিতাভ পাল

আমার নাম ধনঞ্জয় দত্ত, এই ভাবেই শুরু করলেন ভদ্রলোক, আমার বাবার নাম কালীনাথ দত্ত। তিন মাস হলো বাবা মারা গেছেন। বাবা যখন মারা যান, আমি বিদেশে ছিলাম। বিদেশ থেকে ফিরে শুনলাম, বাবা তাঁর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি উইল করে গেছেন আমার দাদা, বোন ও আমার নামে। আমার দাদার নাম জনমেজয় এবং বোনের নাম রঞ্জনা। বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। তার শ্বশুরবাড়ি বর্ধমানে। বাবার উইলের ব্যাপারে আমাদের কিছু বলার নেই। কিন্তু—

একটু থামলেন ধনঞ্জয়বাবু। তাঁকে থামতে দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু কিসের?

তিনি পুনরায় খেই ধরলেন, বাবার কাছে একটা সোনার পাখি ছিল। পাখি বললাম বটে, আসলে সেটি মিশরের প্রাচীন কোনো দেবতার মূর্তি। মূর্তির শরীরটা মানুষের মতো কিন্তু মাথাটা পাখির। মূর্তির নামটা বাবা জানতেন। বলেও ছিলেন কিন্তু এই মুহূর্তে আমি মনে করতে পারছি না। আমাদের পরিবারে মূর্তিটা সোনার পাখি বলেই পরিচিত। মূর্তিটা খুব বড় নয়, ইঞ্চি চারেক লম্বা। আগাগোড়া সোনার। পাখির চোখে মুক্তোদানার মতো দুটি পান্না বসানো। সোনার দাম হিসেবে করলে মূর্তিটার বাজারমূল্য লাখ দেড়েকের বেশি নয় কিন্তু প্রাচীন বস্তু হিসাবে এর মূল্য অনেক। এর আরও একটি মূল্য আছে আমাদের কাছে।

আমি শুধোলাম, কী সেই মূল্য?

পুরুষানুক্রমে আমরা বিশ্বাস করে এসেছি, মূর্তিটি সৌভাগ্যের প্রতীক। মূর্তিটি যার কাছে থাকবে, সে সৌভাগ্যবান।

তাহলে আপনার বাবাও সৌভাগ্যবান।

তিনি সেরকমই ভাবতেন নিজেকে।

তবে তো মূর্তিটি সবাই পেতে চাইবে?

চাইলেও পেত না। সেখানেও একটা পারিবারিক প্রথা চালু আছে।

কী রকম?

বংশানুক্রমে মূর্তিটি পাবে সেই বংশের ছোট ছেলে।

—অর্থাৎ প্রথা অনুযায়ী মূর্তিটি আপনার পাবার কথা।

তিনি বললেন, সেই প্রথা মেনেই বাবা উইল করে মূর্তিটি আমাকে দিয়ে গেছেন। অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রীর সঙ্গে মূর্তিটা থাকত একটা লোহার সিন্দুকে। বাবার মৃত্যুর পর সিন্দুক খুলে দেখা গেল, সমস্ত জিনিস ঠিকঠাক আছে, নেই শুধু মূর্তিটা। বাড়ির মধ্যে আর যেখানে যেখানে রাখতে পারেন, আমরা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। কিন্তু কোনো ফল হয়নি। মূর্তিটা খুঁজে পাইনি। আপনাকে ওটা খুঁজে বার করতে হবে।

আমি বললাম, চেষ্টা করব। মূর্তিটা যদি এখনও বাড়ির মধ্যে থাকে অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে, আর যদি বাইরে পাচার হয়ে গিয়ে থাকে, তো বলা মুশকিল। আপনার কী ধারণা?

আমি যেহেতু বাইরে ছিলাম, তাই এ ব্যাপারে আমার কোনো ধারণা নেই।

আমি বললাম, না থাকাই স্বাভাবিক। অনুসন্ধানের কাজটা শুরু করার আগে আমি একবার দেখতে চাই সেই জায়গাটা, যেখানে মূর্তিটা থাকত। সেই সঙ্গে আপনাদের বাড়িটাও।

ধনঞ্জয়বাবু বললেন, নিশ্চয়ই দেখবেন। আপনার অসুবিধা না থাকলে এখুনই যেতে পারেন। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে।

আমি দেখলাম, সেটাই ভালো। আজ রবিবার। আশা করা যায়, বাড়িতে সবাই থাকবে। কথা বলার দরকার হলে একসঙ্গে সবাইকে পাওয়া যাবে। আমি চটপট তৈরি হয়ে নিলাম। গাড়িতে যেতে যেতে আরও কিছু পারিবারিক তথ্য জানতে পারলাম। বাড়িতে ধনঞ্জয়বাবুর দাদা-বৌদি ছাড়াও আছে বছর আটেকের এক ভাইপো। ভাইপোর নাম পিন্টু। জনমেজয়বাবুর বড়বাজারে কাপড়ের গদি আছে। সেখানে বিভিন্ন নামকরা মিলের কাপড় পাইকারি কেনাবেচা হয়। পারিবারিক ব্যবসা। অনেকদিন বাবার সঙ্গে জনমেজয়বাবু দেখাশোনা করেছেন। এখন একাই দেখছেন। গত দশবছর কালীনাথবাবু ব্যবসার আর কিছুই দেখতেন না, ছেড়ে দিয়েছিলেন বড় ছেলের হাতে। সেই সুবাদে তিনি ব্যবসাটা বড় ছেলেকেই দিয়েছেন।

বেশি সময় লাগল না। বিবেকানন্দ রোড ধরে একটু এগিয়ে গলির মধ্যে বাড়িটা। পুরনো বাড়ি, একটু সেকেলে ধরনের। দোতলা। একতলার পুরোটাই ভাড়াটেদের দখলে। আমরা সরাসরি দোতলায় উঠে গেলাম।

বড় বড় ঘর। টানা বারান্দা। বারান্দায় নকশাকরা লোহার রেলিং। দোতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ডানদিকের ঘরটা কালীনাথবাবুর। সেই ঘরেই আছে লোহার সিন্দুকটা। সেকেলে লোহার সিন্দুক যেমন হয়, তেমনি। আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। সিন্দুকটা এখন ফাঁকা। তালা ভেঙে সিন্দুকের জিনিসপত্র বার করা হয়েছে।

ঘরে আসবাবপত্র বলতে একটা খাট। খাটে বিছানা পাতা। একটা পড়ার টেবিল। টেবিলে কিছু বইপত্র, লেখার সরঞ্জাম। একপাশে ডাঁইকরা খবরের কাগজ। টেবিলের দু'পাশে দুটি চেয়ার। এছাড়া একপাশের দেয়ালে একটা আলমারি। আলমারিতে নানা ধরনের বই। বইপত্রগুলি একটু নেড়েচেড়ে দেখলাম। বইপত্র সাগ্রহের অনেকখানি জুড়ে আছে ছড়ার বই। সেকাল ও একালের ছড়াকারদের ছড়ার সংকলন। একজন বয়স্ক লোকের সংগ্রহের মধ্যে এতগুলি ছড়ার বই দেখে খুব অবাক হলাম। কৌতূহল চেপে রাখতে পারলাম না, কী ব্যাপার বলুন তো?

ধনঞ্জয়বাবু বললেন, ব্যাপারটা কিছু নয়। একসময় বাবা ছড়ার চর্চা করতেন। শেষ বয়সে নিজের পয়সায় একটা ছড়ার সংকলনও করেছিলেন। বইটা বিক্রি-টিক্রি কিছু হয়নি। কিছু তিনি বিনামূল্যে নিজের চেনাশোনাদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন আর বাকি বইগুলি গুছিয়ে রাখা আছে আলমারিতে।

সত্যিই তাই। আলমারির নিচের দুটি তাক জুড়ে বই-এর অনেকগুলি কপি। একটা বই টানতেই নামটা আমার নজরে পড়ল, 'আমার ছড়া'।

ইতিমধ্যে আলাপ হলো জনমেজয়বাবুর সঙ্গে। জনমেজয়বাবু বললেন, শেষের দু'তিন বছর, বিশেষ করে মা মারা যাবার পর, বাবাকে অন্য একটা নেশায় পেয়েছিল।

আমি জানতে চাই, নেশাটা কী?

মা মারা যাবার পর বাবা বাড়ির বাইরে বড় একটা যেতেন না, কারও সঙ্গে মেলামেশাও করতেন না। সারাদিন এই ঘরের মধ্যে থাকতেন। একা একা সারাক্ষণ টেবিলের উপর ঝুঁকে খবরের কাগজের শব্দছক সমাধান করতেন। সেই সময় আমার আট বছরের ছেলে পিন্টু ছাড়া আর কারও সঙ্গে কথা বলতেন না। আমরা লক্ষ্য করেছি, অন্য কেউ ঘরে ঢুকলেও বিরক্ত হতেন তিনি।

আমি প্রসঙ্গ পালটে শুধোলেম, আপনি সোনার পাখিটা সম্পর্কে কিছু জানেন?

জানবো না কেন? পাখিটা আমাদের পারিবারিক সম্পত্তি। পাখিটা থাকত লোহার সিন্দুকে। সিন্দুকের চাবিটা বাবার কাছেই থাকত। বাবা যেদিন মারা যান, ঘরের মধ্যে গোলমাল আর লোকজনের ভিড়ে

চাবিটা কীভাবে যেন হারিয়ে যায়। চাবিটা আমরা আর খুঁজে পাইনি। ধনঞ্জয় বিদেশ থেকে ফেরার পর সকলের উপস্থিতিতে সিন্দুকটা ভাঙা হয়।

সকলে মানে?

ধনঞ্জয়, রঞ্জনা, বাবার এক উকিল বন্ধু এবং আমি।

কী দেখলেন?

দেখলাম উইলে যেমন পারিবারিক সম্পদের উল্লেখ আছে, তার সব কিছু আছে, শুধু সোনার পাখিটা নেই।

পাখিটা ঠিক কখন থেকে পাওয়া যাচ্ছে না, এ বিষয়ে আপনার কোনো ধারণা আছে?

জনমেজয়বাবু ঘাড় নাড়লেন, না।

কোনো অনুমান?

না।

কখনও কি জিনিসটা বিক্রি করার কোনো কথা হয়েছিল?

কীভাবে যেন খোঁজ পেয়ে একবার পুরনো জিনিসপত্র কেনাবেচার এক দালাল এসেছিল কিন্তু বাবা বিক্রি করা তো দূরের কথা, জিনিসটা তাকে দেখাতেই রাজী হননি।

সোনার পাখিটা আর কোথায় থাকতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

ঘাড় নাড়ালেন জনমেজয়বাবু, জানি না।

পিন্টু দাদুর টেবিলের কাগজপত্র নিয়ে নড়াচাড়া করছিল। সে এবার বলে উঠল, আমি জানি।

আমরা সবাই চমকে উঠে তার দিকে তাকালাম। পিন্টুর বয়স মাত্র আট বছর হলেও সে বেশ চটপটে আর সপ্রতিভ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি জানো কোথায় আছে সেই পাখিটা?

আবার ঘাড় নাড়ল সে, জানি।

আমি শুধোলাম, কোথায়?

সে গম্ভীরভাবে বলল, ছড়ার মধ্যে।

ছড়ার মধ্যে! আমরা সবাই হেসে উঠলাম। আমি আর একটু বিশদভাবে জানার জন্য তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি করে জানলে?

দাদু বলেছিলেন, যে অনেক সাপ মেরেছে, সে এবার পাখিটাকেও মেরে ফেলবে। তাই দাদু পাখিটাকে ছড়ার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, পিন্টু তুমি কী খুঁজছো?

সে বলল, দাদুর ছড়ার খাতা।

পেয়েছো?

পাচ্ছি না।

পিন্টুর সঙ্গে আমিও গিয়ে হাত লাগালাম। খুঁজতে শুরু করলাম। টেবিলে নানা ধরনের পত্র-পত্রিকা, পুরনো খবরের কাগজ আর লেখার সরঞ্জাম ছড়ানো। টেবিলের দেরাজটা বন্ধ আছে। পিন্টু টানাটানি করে খোলার চেষ্টা করছে, পারছে না। আমি জোরে টানতেই দেরাজটা খুলে গেল। পিন্টু দেরাজের ভিতর থেকে টেনে বার করল একটা বাঁধানো খাতা, এই তো!

আমি খাতাটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলাম। খাতার সামনের দিকে অনেকগুলি ছড়ার খসড়া। পরের দিকে ছড়া বেশি নেই, তার বদলে নানা ধরনের শব্দছকের সমাধান। সূত্রসহ কিছু শব্দছকের খসড়া, যা বোধহয় তিনি নিজে বানিয়েছিলেন। খাতার শেষ শব্দছকটি অসমাপ্ত। পাশাপাশি দশটি এবং উপরে-নিচে দশটি করে লাইন। লাইনে দশটি করে খোপ। মোট একশ খোপের শব্দছক। উপরের দিকে চারটি লাইনে একটি করে খোপ ছেড়ে একটি করে অক্ষর বসানো। নিচের বাকি ছটি লাইনের সব কটি ফাঁকা। সম্ভবত, মৃত্যুর আগে তিনি শব্দছকটি বানাতে শুরু করেছিলেন কিন্তু শেষ করে যেতে পারেননি। ছকটিতে কোনো সূত্রও নেই, হয়তো ভেবেছিলেন, ছকটি তৈরি করার পরে সূত্রগুলি লিখবেন।

আমি পিন্টুকে বললাম, তোমার দাদুর ছড়ার খাতাটা আমি কয়েকদিনের জন্য নিয়ে যাবো। তোমার আপত্তি নেই তো?

সে বলল, আপত্তি নেই, কিন্তু ফেরত দিতে হবে।

আমি বললাম, অবশ্যই।

কালীনাথবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমরা দোতলাটা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। দোতলায় মোট পাঁচটা ঘর। একটা ঘর কালীনাথবাবুর। এই ঘরে কালীনাথবাবু থাকতেন তাঁর বইপত্র, লেখালেখি এবং শব্দছক নিয়ে। পাশের ঘরটি কালীনাথবাবুর স্ত্রীর। স্ত্রী মারা যাবার পর ঘরটা ফাঁকা পড়ে আছে। রঞ্জনা বর্ধমান থেকে দু'চার দিনের জন্য এলে, এই ঘরে থাকে। তারপর একটা ছোট বারান্দা। তার পাশাপাশি দুটি ঘর। একটিতে স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে থাকেন জনমেজয়বাবু, অন্যটিতে ধনঞ্জয়বাবু। বাকি ঘরটি তিনতলার ছাদে ওঠার মুখে, আসলে এটি একটি সিঁড়িঘর। সিঁড়িঘর হলেও খুব ছোট নয়; লম্বা-চওড়ায় দশ ফুট। ঘরটার ব্যবহার ঠাকুরঘর হিসাবে। ঘরের একপাশে উঁচু বেদির উপরে নানা দেব-দেবীর বাঁধানো ছবি। ছবির সামনে ছোট পিতলের ঘট, লক্ষ্মীর ঝাঁপি, পুজোর বাসন-কোসন, ঘণ্টা, এইসব ঘরোয়া পুজোর উপকরণ। সবকটা ঘরের দেয়াল সাদা, দেখলেই বোঝা যায় নিয়মিত ঘরের কলি ফেরানো হয়। লাল রঙের সিমেন্টের মেঝে, চারপাশে কালো রঙের বর্ডার। দীর্ঘদিনের ধোয়া-মোছায় আয়নার মতো ঝকঝকে। ব্যতিক্রম শুধু পুজোর ঘরটি। পুজোর ঘরের মেঝেতে শ্লেজড টালি। দোতলাটা ঘুরে দেখার ফাঁকে জনমেজয়বাবুর সঙ্গে তাঁর ব্যবসা সংক্রান্ত দু'চার কথা হলো। কেমন চলছে, জিজ্ঞেস করতে তিনি জানালেন, আগে ভালো চলত। এখন আর ততটা ভালো নয়। গত দু'বছর মন্দা চলছে, তার উপর বাজারে প্রতিযোগিতা বেড়ে গেছে। বেশি করে ক্যাপিটাল ঢালতে না পারলে দাঁড়ানো মুশকিল।

ধনঞ্জয়বাবুর বাড়ি থেকে ফেরার পর তিনদিন কেটে গেছে। ইতিমধ্যে কালীনাথবাবুর ছড়ার খাতাটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে ফেলেছি। ছড়াগুলির মধ্যে কোনো সমাধান সূত্র পাইনি। ছড়াগুলি সাধারণ মানের। পড়লেই বোঝা যায়, শেষ বয়সের চেষ্টা, খুব একটা উতরোয়নি।

খাতার শব্দছকগুলি কালীনাথবাবুর নিজের করা। ছকের তলায় পাশাপাশি ও উপরে-নিচের সমাধান সূত্র দেওয়া আছে। সুতরাং সমাধান করতে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি। সাদামাটা ধরনের শব্দছক। তার মধ্যে রহস্যের কোনো গন্ধ নেই। বাকি আছে অসমাপ্ত শব্দছকটি। সঙ্গে কোনো সমাধান সূত্র না থাকায় কীভাবে সমাধান করব, ভাবতে ভাবতেই একটা দিন কেটে গেল। শব্দছকটি আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি।

বারবার দেখতে দেখতে একটা প্রশ্ন আমার মাথায় উঁকি মারল। কালীনাথবাবু শব্দছকের মতো করে যা লিখেছেন, তা কি আসলে শব্দছক, নাকি ছড়া? যদি ছড়া হয়, ছকের ফাঁকা খোপগুলিতে একটি করে অক্ষর বসাতে পারলেই পুরো ছড়াটি পাওয়া যাবে। এই সিদ্ধান্তে আসার পর আমি ছকের দ্বিতীয় লাইনের শেষ খোপটিতে বসালাম, খি। কারণ প্রথম লাইনের শেষ অক্ষরটি খি আছে। ছড়ায় মিল আনার জন্য পরপর দুটি লাইনের শেষ অক্ষর সাধারণত একই হয়। সুতরাং দ্বিতীয় লাইনের শেষ শব্দটি খুব সহজেই পাওয়া গেল, রাখি। অনুরূপভাবে চতুর্থ লাইনের শেষ শব্দটিও পেয়ে গেলাম, তেড়ে। এরপর প্রথম লাইনের শেষ শব্দটি নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করলাম। এটি হবে এমন কোনো শব্দ, যার শেষ অক্ষরটি, খি। বারবার পিন্টুর কথাটা মনে পড়ছিল। কথাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে শব্দটা পেয়ে গেলাম। পিন্টু বলেছিল দাদু পাখিটা লুকিয়ে রেখেছে ছড়ার মধ্যে। ছন্দের মিলে পাখির সঙ্গে রাখি শব্দটা মিলে যায় খুব ভালোভাবে। একটু মাথা খেলাতেই চতুর্থ লাইনের তেড়ের সঙ্গে তৃতীয় লাইনের ছেড়ের মিল খুঁজে পেলাম। কিছুক্ষণের চেষ্টায় ছড়ার প্রায় অর্ধেকটা উদ্ধার করে ফেললাম। এখন ছড়াটা দাঁড়াল এই রকম—

□ প □ রে □ মারবে পাখি
সে □ ভ □ তে লুকিয়ে রাখি
□ শা □ কো □ পাঁচটি ছেড়ে
□ ই □ স □ বেজায় তেড়ে।

বড়বাজারের দোকানগুলি বেলা দশটায় খুলে যায়। তাই জনমেজয়বাবু বাড়িতে থাকবেন না, এটা ধরে নিয়েই আমি বেলা দশটার পরে গিয়ে হাজির হলাম তাঁর বাড়িতে। ধনঞ্জয়বাবু বাড়িতেই ছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি মহাভারত পড়েছেন?

ঘাড় নাড়লেন তিনি, হ্যাঁ। পড়েছি। কেন বলুন তো?

মহাভারতের এমন একটি চরিত্রের নাম বলুন, যিনি অনেক সাপ মেরেছিলেন।

আপনি কি জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞের কথা বলছেন?

জনমেজয় যজ্ঞের আগুনে বহু সাপকে পুড়িয়ে মেরেছিলেন। আপনার দাদার নামও তো জনমেজয়।

পিন্টু বোধহয় কাছেপিঠে খেলা করছিল, আমার সাড়া পেয়ে সে দৌড়ে এসে হাজির, দাদুর খাতাটা এনেছো?

আমি বললাম, এনেছি।

সোনার পাখিটা খুঁজে পেয়েছো?

পাবো কী করে, তোমার দাদু তো পাখিটাকে লুকিয়ে রেখেছেন।

ছড়ার মধ্যে?

শুধু কী ছড়া, শব্দছকের মতো ছককাটা ঘরের মধ্যে। তুমি কি জানো, সেই ছককাটা ঘরটা কোথায়?

পিন্টু গম্ভীরভাবে বলল, জানি।

আমি ধনঞ্জয়বাবুকে বললাম, একটি ছোট শাবল বা খুরপি জোগাড় করতে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বাগানের ঘাস তোলার খুরপিটা এনে হাজির করলেন। আমি পিন্টুকে বললাম, চলো, এবার শব্দছকের সঙ্গে ছককাটা ঘরটা একবার মিলিয়ে দেখি।

আমরা সবাই এসে হাজির হলাম তিনতলার সিঁড়ির মুখের ঠাকুরঘরে। আমি কালীনাথবাবুর অসমাপ্ত শব্দছকের একটা কপি ধনঞ্জয়বাবুর হাতে দিয়ে বললাম, দেখুন।

চৌকো স্লেজড টালি বসানো ঘরের মেঝেটাকে দেখতে লাগছে ঠিক যেন শব্দছকের খোপাকাটা ছকের মতো। পাশাপাশি দশটা এবং উপরে-নিচেও দশটা করে লাইন। ঘরের টালির সংখ্যা এবং শব্দছকের খোপের সংখ্যাও হুবহু এক। আমি ধনঞ্জয়বাবুকে বললাম, ঈশান কোণের পাঁচটি টালি ছেড়ে ছয় নম্বর টালিটা তুলে ফেলতে। তিনি টালিটা তুলতে শুরু করলেন। খুরপি দিয়ে চাড় দিতেই স্লেজড টালিটা আলগা হয়ে উঠে এল আর টালির নিচে ফাঁকা গর্তের মতো জায়গাটা থেকে বেরিয়ে পড়ল সোনার পাখিটা। পাখিটা খুঁজে পেয়ে ধনঞ্জয়বাবু এতটাই বিহ্বল হয়ে পড়লেন যে প্রথমে কোনো কথাই ফুটল না তাঁর মুখে। রেশ একটু কাটতে তিনি শুধোলেন, কী করে বুঝলেন?

কালীনাথবাবুর ছড়াটা আমি পড়তে দিলাম পিন্টুকে। সে চেঁচিয়ে পড়ল—

সাপ মেরেছে মারবে পাখি
সেই ভয়েতে লুকিয়ে রাখি
ঈশান কোণে পাঁচটি ছেড়ে
ওই আসছে বেজায় তেড়ে।

[ভাদ্র ১৪০৯]

ট্রেজার হান্ট

গোপালচন্দ্র হালদার

ঘোঁতনদা, জিপিডি আসছে। বল করছিল লাল্টু। ব্যাট হাতে উইকেটে দাঁড়িয়ে ঘোঁতন। পল্টু উইকেট কীপার। বুবাই মিডঅফ আর টুকাই মিডঅনে ফিল্ডিং করছে। পার্কে বৈকালিক খেলার মাঝে বল করতে গিয়ে লাল্টু হঠাৎ থেমে বলে উঠল, ঘোঁতনদা, জিপিডি আসছে। লাল্টুর মুখোমুখি পার্কের গেট। সুতরাং তারই চোখে পড়েছে আগে।

ঘোঁতন এবং অন্য সাথীরা কৌতূহলে ফেটে পড়ল। হঠাৎ এই সময় জিপিডির আগমন। জিপিডি তো আর যেমন তেমন মানুষ নন, যেখানে সেখানে ওনার পায়ের ধুলো পড়ে না। বাংলার সেরা গোয়েন্দা, নিজের বাসভবনে পিতলের নেমপ্লেটে জ্বলজ্বল করে লেখা—গ্রেট প্রাইভেট ডিটেক্টিভ। অবশ্য আই কর্পস্ মেম্বাররা ভদ্রলোককে আড়ালে জিপিডি বলে ডাকে।

কৌতূহলে ফেটে পড়লেও ঘোঁতন বলল, ওদিকে তাকাস না, ওতে কদর কমে যায়। খেলা চালিয়ে যা। মনে হচ্ছে ভদ্রলোক আবার কোনো দরকারে.....

ঘোঁতনের কথা শেষ হতে না হতেই লাল্টু হাত ঘুরিয়ে বল করল। অপ্রস্তুত ঘোঁতনকে কোনোরকম সময় না দিয়ে বলটা মিডল উইকেট উপড়িয়ে ফেলল। অমনি অন্যরা চেঁচিয়ে উঠল, হাউস দ্যাট।

ফট ফট ফট। কাছ থেকে হাততালির শব্দ ভেসে এল। সাবাস লাল্টু। এমন দুর্দান্ত বল করতে বহুদিন কাউকে দেখিনি। জিপিডি বলে উঠলেন। এখন থেকে চেষ্টা করে গেলে বাংলার ক্রিকেট টিমে তোমার একদিন জায়গা হয়ে যাবে।

ওরা ঘুরে দাঁড়িয়ে সেই চেনা পরিচিত গোলাকার টাক, আলুর মতো মুখ, ড্যাবড্যাবে চোখ এবং শরীর ছেড়ে বেরিয়ে আসা ভুঁড়ির অধিকারীকে দেখতে পেল। টুকাই এমন স্বরে বলল যেন এই প্রথম জিপিডিকে দেখল, আরে আংকেল যে! কি ব্যাপার, এমন সময় আপনার আগমন?

জিপিডির সঙ্গে আরো তিনজন অচেনা ব্যক্তি। আই কর্পস্ মেম্বাররা তাদেরকেই দেখছে। ঘোঁতন বলে উঠল, এনাদের তো চিনতে পারছি না।

আগে কখনও দেখলে তো চিনবে! আয়াম রিপ্রেজেন্টিং দেম, মানে এনারা হলেন আমার মক্কেল। অন্যদের ব্যাপারেই তোমাদের কাছে আসতে হলো, হেঁ হেঁ হেঁ। তবে আমি তা চাইছিলাম না, মানে তোমরা তো জানো আমি কেমন ব্যস্ত মানুষ, আজ মুম্বাই কাল দিল্লী পরশু চেন্নাই। তাই ওঁদের ব্যাপারে বিশেষ সময় দিতে পারব না। সেজন্যেই তোমাদের কাছে মানে হেঁ হেঁ হেঁ.....

জিপিডি মানেটা খুলে না বললেও ওদের বুঝতে অসুবিধা হলো না যে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করা জিপিডির পক্ষে অসাধ্য তাই ওনার মক্কেলদের ধরে এনেছেন ওদের সাহায্য চাইতে। এদিক-ওদিক ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে জিপিডি বললেন, চলো ওখানটায় গিয়ে বসি, তারপর সব খুলে বলা যাবে।

পার্কের একপাশে বহু পুরনো একটা বটগাছ। চাতালের ধুলো ঝেড়ে সবাই বসলে জিপিডি বলতে শুরু করলেন, এনারা হলেন দত্ত অ্যান্ড সন্স জুয়েলার্সের বর্তমান মালিক—অমল, বিমল ও কমল দত্ত। কলকাতার তিনটে নামী জুয়েলার্সের মধ্যে দত্ত অ্যান্ড সন্স একটি। তোমরা বরং এনাদের মুখ থেকে কেসটা শোনো। আপনাদের সমস্যাটা এদের খুলে বলুন। জিপিডি শেষের কথাটা দত্ত ভাইদের বললেন।

অমল, বিমল ও কমল দত্ত তিন ভাই নিজেদের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন, অর্থাৎ কে মুখ খুলবেন।

শেষে বড় ভাই অমল দত্ত মুখ খুললেন, বনেদী স্বর্ণকার বলতে যা বোঝায় আমরা তাই, মানে আমার প্রপিতামহের আমল থেকেই এটা আমাদের বংশগত পেশা। প্রত্যেকেই তাঁদের সাধ্যানুযায়ী দোকানটাকে বড় করে গেছেন। আমার বাবার ক্ষেত্রেও এর অন্যথা হয়নি। আমরা তিন ভাই বরাবরই একটু উড়নচণ্ডী গোছের। তার জন্যে আমরা তিন ভাই বরাবরই ওনার না-পছন্দের তালিকায় ছিলাম। কারণ ওনার কেমন যেন একটা বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল মনে যে ওনার মৃত্যুর পর ব্যবসা আমাদের হাতে পড়ে উচ্ছন্নে যাবে।

বিমল আর কমল উসখুস করতে লাগলেন, মনে হলো ওঁদেরও কিছু বলার আছে। অনুমান মতোই বিমল বললেন, দাদা আসল কথাটা বলো না।

হ্যাঁ বলছি। মাস তিনেক আগে বাবা ইহলোক ত্যাগ করেছেন। দোকান এখন আমরাই দেখাশুনো করছি। আমাদের প্রপিতামহের আমল থেকে সবারই দুষ্প্রাপ্য এবং অমূল্য মণিরত্ন সংগ্রহ করার প্রবণতা ছিল এবং সেগুলো পুরুষানুক্রমে উত্তরপুরুষদের হাতে এসে যায়। মণিরত্নগুলো পৃথিবীর নানান দেশের অকশান থেকে দালালের মাধ্যমে কিনে আনা হতো। শেষ উত্তরাধিকারী হিসেবে দুষ্প্রাপ্য পাথরের এই সংগ্রহ আমার বাবার হাতে এসে পড়েছিল। কিন্তু ভারি আশ্চর্যের ব্যাপার, বাবার মৃত্যুর পর আমরা সেগুলোর আর কোনো সন্ধান পাইনি। সমস্ত বাড়ি এবং দোকান তন্নতন্ন করে খুঁজেও আমরা সেগুলোর হদিস পাইনি। অথচ আমরা জানি যে বংশের ধারা অনুযায়ী ওগুলো বাবা বিক্রি করেননি। আমাদের বিশ্বাস তিনি সেগুলো একটি জায়গায় লুকিয়ে রেখে গেছেন। আগেই বলেছি আমরা তিন ভাই আমাদের উড়নচণ্ডী চালচলনের জন্যে ওনার বিরাগভাজন ছিলাম, উনি হয়তো মনে করে থাকতে পারেন যে দুষ্প্রাপ্য পাথরের সেই সংগ্রহ আমাদের হাতে পড়লে সেগুলো আমরা নয়ছয় করে ফেলব। তাই তিনি সেগুলো এমন এক গুপ্তস্থানে লুকিয়ে রেখে গেছেন, যার হদিস আমরা বের করতে পারছি না। সেজন্যেই আমরা ঘনশ্যামবাবুর শরণাপন্ন হই।

হ্যাঁ হ্যাঁ, এতক্ষণে জিপিডি মুখ খুললেন, এক হপ্তা আগে ওনারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আমি এ ক'দিন ওনাদের বাড়ি এবং দোকান দফায় দফায় তন্নতন্ন করে খুঁজেছি, কিন্তু সেই অমূল্য পাথরের কোনো হদিস বের করতে পারিনি। তাই ওনাদের তোমাদের কাছে নিয়ে এলাম। কারণ এসব কেস তোমরা বেশ ভালো হ্যান্ডেল করতে পারো। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে রণদেববাবু, মানে ওনাদের বাবা, তিন ছেলের নামে একটি করে চিঠি দিয়ে গেছেন।

চিঠি দিয়ে গেছেন মানে? একই বাড়িতে যখন সবাই থাকেন তখন চিঠি দেওয়ার কি দরকার হলো? পল্টু বলে উঠল।

না মানে, আমাদের কিছু বদ দোষের জন্যে বাবার বিরাগভাজন ছিলাম তো, তাই শেষের দিকে উনি আমাদের সঙ্গে কথা-টথা বলতেন না। সেজন্যেই ঐ চিঠি আর কি।

চিঠিগুলো দেখতে পারি কি? ঘোঁতন হাত বাড়াল।

আলবৎ পারো। তবে ওগুলো দেখে এ কেসের কোনো সুরাহা হবে বলে মনে হয় না। চিঠিগুলো দেখে আমার কিন্তু একটা বদ্ধ ধারণা হয়েছে যে শেষের দিকে রণদেববাবুর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। নাহলে মৃত্যুশয্যায় কেউ অমন চিঠি লিখতে পারে? দেখো না, তোমরাই দেখো। জিপিডি বুকপকেট থেকে তিনটে ভাঁজ-করা কাগজ বার করে ঘোঁতনের হাতে দিলেন।

ঘোঁতন ভাঁজ খুলে চিঠিতে চোখ বোলাতে লাগল। অন্যরাও ঝুঁকে পড়ল। চিঠি তিনটে হলেও আসল বক্তব্য একইরকম। শুধুমাত্র সম্বোধনে কিছু হেরফের করা হয়েছে। যেমন—রেসুরে অমল, জুয়াড়ী বিমল এবং মদ্যপ কমল। এছাড়া ভেতরের বক্তব্য একই। বড়ছেলে অমল দত্তকে মৃত রণদেববাবুর লেখা চিঠিটা আই কর্পস্ মেম্বাররা পড়তে শুরু করল।

রেসুরে অমল—

তোমার বদ স্বভাবটির জন্যে বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছি। কিন্তু এখন এই মৃত্যুশয্যায় শুয়ে

শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার অপেক্ষায় পড়ে থেকে মনে হলো তোমাকে শোধরানোর জন্যে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান দিয়ে যাই। সে কারণেই এই পত্র লেখা। আমার পূর্বপুরুষরা এবং আমি নিজে সাধ্যমতো চেষ্টা করে গেছি ব্যবসা বাড়াতে এবং বাড়িয়েছিও। বলাবাহুল্য আমার মৃত্যুর পরে ব্যবসা তোমাদের তিন ভাইয়ের হাতে পড়ে লাটে উঠবে। মৃত্যুপথযাত্রী বাবার শেষ অনুরোধ রেসের মাঠে পয়সা বরবাদ না করে ব্যবসা বড় করে তোলার চেষ্টা করো। সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা করে আমি কোনো উইল রেখে যাচ্ছি না। আমার অনুরোধ আমার মৃত্যুর পর তোমরা তিন ভাই শোধরাবে এবং একান্নবর্তী পরিবারে বাস করবে। সবসময় একসঙ্গে থাকবে। কয়েক কোটি টাকার দুষ্প্রাপ্য মণিরত্ন যা আমার পূর্বপুরুষরা সংগ্রহ করে রেখে গেছেন তারও উত্তরাধিকারী তোমরা। কিন্তু তোমরা যেমন অকর্মণ্য এবং অপদার্থ, সেগুলো পাওয়ার উপযুক্ত নও। ধুর আর কত জ্ঞান দেবো! তোমরা তো আমার উপদেশ মানবে না। বরং ছড়ার পাগলামি মাথায় আসছে। এই এসে গেল—

চোখ বুজে পরী। ভেবে কেন মরি।
সামনে এগিয়ে যা। ধাপ মেপে পা।
সাত-পাঁচ ভেবে।
বারো ধাপ হেঁটে। বাঁয়ে বিশ ডাঁয়ে
ত্রিশ। কাক-বক উড়িস। বকুল গাছে
বসিস।

নাঃ ছড়ার পাগলামি কেটে গেল। আমার এই পত্রটি মাদুলি করে হাতে পরো, নয়তো ফটো বাঁধিয়ে দেওয়ালে ঝুলিয়ে রেখো। বলা যায় না তোমাদের পুত্র-কন্যাদের মধ্যে যোগ্য কেউ আসতে পারে যে এই পত্রের মর্ম বুঝবে। আঃ ঘুম পাচ্ছে। শেষ ঘুম হলেই বাঁচি.....

—তোমার হতভাগ্য পিতা

চিঠিটা পড়ে ঘোঁতন বলল, আমি তো চিঠির মধ্যে পাগলামির কোনো লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না, বরং উনি ছেলেদের শোধরানোর জন্যে নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

পাগলামির লক্ষণ দেখতে পাচ্ছো না? তবে এখানটা কি? জিপিডি ঝুঁকে পড়ে 'চোখ বুজে পরী.....' ইত্যাদি লেখা ছড়াটা দেখালেন।

ঘোঁতন মিচকি হাসল, আপনি নাকি সাতদিন ধরে চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে কেসটা জলের মতো সোজা।

অ্যাঁ! উপস্থিত সকলের গলা দিয়ে বিস্ময়সূচক শব্দটি বেরিয়ে এলো।

অ্যাঁ নয় হ্যাঁ। এখন তো সন্ধ্যে হতে চলেছে, আজ আর সময় হবে না। আপনারা বরং কাল সকালে এই পার্কের গেট থেকে আমাদের তুলে নিয়ে যাবেন, ধরুন সকাল দশটা নাগাদ। মনে হয় আপনাদের বাড়িতে পা দিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মামলা সলভ করে দিতে পারব।

অমল দত্ত ঘোঁতনের দু'হাত চেপে ধরে বললেন, বাঁচালে ভাই। ঠিক আছে, তাহলে ঠিক সকাল দশটায় তোমাদের এখান থেকে তুলে নেব। দত্তরা তিন ভাই উঠে পড়লেন এবং গেটের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা লাল মারুতি গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন।

জিপিডি যাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখালেন না। বরং ঘোঁতনের গায়ের কাছে সরে এসে বললেন, তুমি সত্যিই কি কিছু বুঝতে পেরেছ? আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছি না যে ঐ মামুলি কাগজটা দেখে তুমি.....

মনে তো হচ্ছে বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আংকল একটা কথা ভেবে আশ্চর্য লাগছে, এমন একটা সাদামাটা কেস নিয়ে আপনি সাত-সাতটা দিন কাটিয়ে দিলেন!

হি-হি-হি-হি। পল্টু লাল্টু বুবাই টুকাই হেসে উঠল, আমরা প্রফেশনাল গোয়েন্দা হলে আপনার রুজি-রোজগার বন্ধ হয়ে যেত।

উঁহু এতটা নয়, এতটা বাড়িয়ে বোলো না। আসলে আমার অবস্থা কেমন জানো? সেই বিশাল ডিগ্রীধারী প্রফেসারের মতো, যিনি নিজের ক্লাস সেভেনে পড়া ছেলের রচনা লিখতে গিয়ে স্নাতক পর্যায়ের রচনা বানিয়ে ফেলেন। কিংবা অংকে ভীষণ পারদর্শিতা সত্ত্বেও দশ সেকেন্ডে একটা ছিদ্র দিয়ে পনেরো গ্যালন জল বেরলে বারো সেকেন্ডে কতটা জল বেরুবে বলতে পারেন না ঝটপট। মানে সোজা ব্যাপারগুলো উন্নত মস্তিষ্কে জটিল মনে হয় আর জটিল ব্যাপারগুলো জলবৎ তরলং মনে হয়। আমার অবস্থা অনেকটা তেমনই। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ।

বয়ঃকনিষ্ঠ টুকাই গম্ভীর গলায় বলল, কথাটা সত্যিই ভেবে দেখার মতো।

পল্টু দুঃখী মুখে বলল, ব্যাপারটা খারাপ লাগে তাই না? এত উঁচু পর্যায়ে উঠে গেছেন যে নিচে নামতে পারেন না।

বুবাই ঠাট্টার সুরে বলল, আংকল, ওরা আসলে বলতে চাইছে যে আপনি জি স্কোয়ার।

মানে? তোমরা কি আমাকে পিঞ্চিং ইনসাল্ট নাকি ইনসাল্টিং পিঞ্চ করছ? দোখদুটো পিটপিট করতে করতে জিপিডি ওদের সত্যিকার মনোভাব বোঝার চেষ্টা করলেন।

আসলে জি স্কোয়ার কথার মানে হলো গ্রেট গুলিস্ট। কিন্তু ঘোঁতন মিথ্যে বলে ব্যাপারটা সামলে নিল, আরে না না। জি স্কোয়ার মানে হলো গ্রেট অ্যান্ড জিনিয়স।

ও তাই বলো, তোমরা ভারি মজা করতে পারো, হেঁ হেঁ হেঁ.....। জিপিডি হাসি সম্পূর্ণ করতে পারলেন না, গেটের দিক থেকে পিঁ পিঁ করে অমলবাবুদের গাড়ির হর্ন বেজে উঠল। জিপিডি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললেন, কাল তাহলে ঠিক দশটায়.....

কিন্তু আংকল, কাল কি আপনি এ শহরে থাকবেন? মানে আপনি আবার ব্যস্ত মানুষ কিনা, কাল দিল্লী কিংবা মুম্বাই যাওয়ার প্রোগ্রাম নেই তো?

ওহ্ ভুলেই গেছিলাম, কালই তো একটা নার্কোটিক্স গ্যাঙের সঙ্গে টক্কর নিতে মুম্বাই যাওয়ার কথা ছিল। যাকগে যাত্রাটা নাহয় একদিনের জন্যে পিছিয়ে দেব। আচ্ছা চলি, ওনারা অপেক্ষা করছেন। জিপিডি তাঁর কমিকাল প্রোফাইল নিয়ে হেলতে দুলতে গেটের দিকে এগিয়ে গেলেন।

আই কর্পস্ মেম্বাররা সেদিকে তাকিয়ে মিচকি হাসতে লাগল।

সমাধান পর্ব

ঘড়ির কাঁটা এখনও দশটার ঘরে পৌঁছায়নি। পার্কের গেটের সামনে পাঁচ বন্ধু দাঁড়িয়ে। দুটো গাড়ি ওদের গায়ের কাছে এসে থামল। একটাতে জিপিডি আর দত্তদের মেজ ও ছোটভাই। অন্যটায় অমল দত্ত একাই। পাঁচ বন্ধু অমল দত্তর গাড়িতে উঠে বসামাত্র গাড়ি চলতে শুরু করল।

রবিবারের সকাল। পথে ভিড়ভাড় বিশেষ নেই। গাড়ি তীব্রগতিতে এগিয়ে চলেছে। নিউ আলিপুরে পশ পাড়ায় গাড়ি ঢুকল। কিছু পরে একটা বিশাল গেটের মধ্যে ঢুকে কার ড্রাইভ ধরে এগিয়ে গিয়ে একটা মডার্ন দোতলা বাড়ির সামনে এসে থামল। গাড়ি দুটো থামতেই দুজন ভৃত্যশ্রেণীর লোক দৌড়ে এসে দরজা খুলে ধরল। অমল দত্ত গাড়ি থেকে নেমে হুকুম দিলেন, রামু, এদের জন্যে মিষ্টি আর সরবতের ব্যবস্থা করো। আর তোমরা চলো বাড়ির ভেতরে। অমলবাবু শেষের কথাটা ঘোঁতনদের বললেন।

ঘোঁতন ততক্ষণে সমস্ত চত্বর মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণে মগ্ন। অমল দত্তের কথা শুনে বলল, না আংকল, মনে হচ্ছে বাইরেই আমাদের কাজ মিটে যাবে। বলেই ঘোঁতন কার ড্রাইভ দিয়ে এগিয়ে গেল। বিশাল লনের মাঝখানে পরীর মর্মর মূর্তি। পরীর দৃষ্টি নিচের দিকে নামানো থাকায় মনে হয় যেন তার চোখ দুটি বোজানো। মূর্তির জড়ো করা দু'হাতের ফাঁক দিয়ে জলের ফোয়ারা পড়ছে অবিরত। ঘোঁতন সেদিকে এগোল।

লাল্টু পল্টু বুবাই টুকাইও ওর পিছু পিছু চলতে লাগল। দত্তরা একটু তফাৎ থেকে ওদের অনুসরণ

করলেন। পরীর মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে ঘোঁতন বাঁ-পাশে তাকাল। তারপর সামনের দিকে গুনে গুনে বারো ধাপ হেঁটে গেল। সেখান থেকে বাঁয়ে ঘুরে বিশ ধাপ হাঁটল। তারপর ডানদিকে ত্রিশ ধাপ। ঘোরে পাওয়া মানুষের মতো সবাই কিছু না বুঝে ঘোঁতনের অদ্ভুত কার্যকলাপ দেখতে দেখতে অনুসরণ করতে লাগল। ত্রিশ ধাপ শেষ হতে ঘোঁতন দেখল পাঁচিল-ঘেঁষা মাথা-ঝাঁকড়া একটা বকুল গাছের নিচে এসে পড়েছে। ঘোঁতন বকুল গাছের গোড়া আর তার চারপাশটা খুঁটিয়ে দেখল। সমস্ত লনের মতোই গাছের গোড়া পর্যন্ত সবুজ ঘাসে ঢাকা। কোথাও এতটুকুও উঁচু-নিচু কাটাখোঁড়া নেই। এ পর্যন্ত দেখে ঘোঁতন ঘুরে দাঁড়াল। অমল দত্তকে বলল, আপনার চাকরদের কাউকে বলুন একটা কোদাল নিয়ে আসতে। এখানটায় একটু খুঁড়তে হবে।

অমল দত্ত প্রয়োজনীয় হুকুম দিতেই একজন চাকর দৌড়ে গিয়ে একটা কোদাল নিয়ে এল। ঘোঁতন ওর পায়ের কাছটা দেখিয়ে বলল, এখানটায় খুঁড়ুন।

মিনিট কুড়ি-পঁচিশের মধ্যে দু'ফিট বাই তিন ফিটের একটা গাড্ডা তৈরি হলো। তখনও পর্যন্ত কিছুই পাওয়া গেল না। কাজের লোকটি ঘোঁতনের নির্দেশ মতো খুঁড়ে চলল। একটু পরেই কোদালের ডগাটা শক্তমতো কোনো বস্তুতে লেগে ঠং করে শব্দ হলো। ঘোঁতন হাত তুলে লোকটাকে থামতে বলল। তারপর উবু হয়ে বসে হাত দিয়ে ওপরের মাটি সাবধানে সরাতে লাগল। কয়েক মিনিট পরে গর্তর মধ্যে কোনো ধাতু চকচক করে উঠল। আরো কিছুটা মাটি সরিয়ে ঘোঁতন যেটি উপরে তুলে আনল সেটি আট বাই বারো ইঞ্চির সুদৃশ্য কারুকাজ করা একটা রুপোর বাক্স। বাক্সটা দেখেই লাল্টুরা চারজনে হুররে বলে চেঁচিয়ে উঠল। জিপিডি কোনোরকমে বললেন, হোয়াট আ ব্রিলিয়ান্ট হাইডিং প্লেস। আর দত্তভাইরা লাফিয়ে উঠলেন, ইউরেকা।

ততক্ষণে ঘোঁতন তালাবিহীন বাক্সের ডালা খুলে মেলে ধরেছে। সবার চোখ বাক্সের মধ্যে স্থির হয়ে আছে। আশা ছিল দুষ্প্রাপ্য মণিরত্নগুলো ঝকমক করে জ্বলে উঠবে, কিন্তু একটা ভাঁজ করা কাগজ ছাড়া বাক্সের ভেতরটা বিলকুল খালি। দত্তভাইরা বললেন, বাবা কি তাহলে আমাদের জন্যে খালি বাক্সটা রেখে গেলেন?

ঘোঁতন কোনো উত্তর না দিয়ে বাক্সের মধ্যে থেকে ভাঁজ করা কাগজটা বের করে আনল। ভাঁজ খুলে দেখল ছড়ার ছন্দে কয়েকটা লাইন সেখানে লেখা—

ফাঁকা ফাঁকা বাক্স ফাঁকা,
তোরা সবাই ন্যাকা বোকা
গোল গোল বাঘের চোখ,
মধ্যে দেখ মণির থোক
মণি তোদের হাতের মুঠোয়,
মাথায় যদি বুদ্ধি গুঁতোয়
বাপের নাম ভুলিস নারে,
পারিস যদি খেটে খা-রে।

কাগজটা সবার হাতে হাতে ঘুরে আবার ঘেঁতনের হাতে ফিরে এল। জিপিডি ঘোঁতনের গায়ের কাছে সরে এসে বললেন, রণদেববাবু ওয়াজ সার্টেনলি আ মিস্ট্রি ম্যান।

থামুন তো। ঘোঁতন জিপিডিকে থামিয়ে আবার ছড়ার লাইনকটা আওড়াতে লাগল। একটু পরে অমল দত্তকে বলল, আপনাদের বাড়িতে বাঘের কোনো বড়সড় ছবি-টবি আছে কি, কিংবা ধরুন মূর্তি?

বাঘের ছবি! বাঘের মূর্তি! তার সঙ্গে মণিরত্নের কি সম্পর্ক থাকতে পারে বুঝতে না পেরে অমল দত্ত কয়েকবার ঢোঁক গিললেন। এই পুঁচকে ছোঁড়াদের ওপর নির্ভর করাটাই বোকামি হয়ে গেছে। কিন্তু এখন তো আর কিছু করার উপায় নেই, তাই অমল দত্ত কয়েক মুহূর্ত নীরবে ভাবলেন। তারপর বলে উঠলেন, আরে কি আশ্চর্য, বসার ঘরেই তো বাঘের একটা বিশাল মূর্তি আছে। তোমাকে এখনই দেখাচ্ছি।

একতলায় বসার ঘরের দরজার সামনে এসে ঘোঁতন থমকে দাঁড়াল। ঘরটা এত বড় যে হলঘর বললেও অত্যুক্তি হয় না। হলঘরের ঠিক মাঝখানে একটা নকল বাঘ দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বিকট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। গুটিগুটি পায়ে ঘোঁতন বাঘের স্ট্যাচুর দিকে এগিয়ে গেল। কয়েক মিনিট ধরে কিছু দেখল। তারপর মৃদু হেসে অমল দত্তকে বলল, আমাকে চাকু জাতীয় একটা কিছু দিতে পারেন?

বিশাল মাপের ডাইনিং টেবিলের ওপর রাখা ফলের ঝুড়ি থেকে পাওয়া গেল একটা ছোট চাকু। ঘোঁতন সেটা নিয়ে কেউ কিছু বোঝার আগেই চাকুর ডগা দিয়ে বাঘের দু'চোখ থেকে মুরগীর ডিমের মতো বড় সাইজের মণি দুটো তুলে দিল। তারপর গর্তের মধ্যে আঙুল পুরে দিয়ে চোখের দু'পাশে লাগানো টেপ খুলে ট্রান্সপারেন্ট কাগজের একটা টিউব বের করে আনল। এভাবে অপর চোখ থেকে আরেকটা টিউব বেরুল। টিউব দুটো ঘোঁতন অমল দত্তের দিকে বাড়িয়ে ধরল, এ দুটোর মধ্যে পাবেন আপনাদের পারিবারিক মণিরত্নের সংগ্রহ।

তবুও হতভম্বের মতো অমল দত্ত দাঁড়িয়ে আছেন দেখে ঘোঁতন টেবিলের কাছে গিয়ে টিউব দুটোর মুখ থেকে টেপ খুলে সে দুটো টেবিলের ওপর উপুড় করে দিল। অমনি ঠক ঠক শব্দে অনেকগুলো পাথর টেবিলের ওপর গড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে লাল নীল সবুজ আলোর বিচ্ছুরণ খেলে যেতে থাকল। এ বিচ্ছুরণ সৃষ্টির কারণ টেবিলের ওপর পড়ে থাকা মণিরত্নগুলো।

ও মাই গড্! আনন্দে আত্মহারা দত্তভাইরা পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলেন। পরম মমতাভরে পাথরগুলোয় তাঁরা হাত বোলাতে লাগলেন।

একটু পরে উচ্ছ্বাস থেমে যেতে অমল দত্ত ঘোঁতনের দিকে ঘুরে বললেন, যে কাজ ঘনশ্যাম পতিতুণ্ডির মতো একজন নামকরা প্রাইভেট ডিটেক্টিভ করতে পারেননি তা তুমি কেমন করে পারলে?

ঘোঁতন হেসে বলল, দেখুন, এ মামলায় রহস্যের নামগন্ধ আদৌ ছিল না, কারণ আপনার স্বর্গত পিতার চিঠিতেই ছিল মণিগুলো লুকিয়ে রাখার সন্ধান। মনে করুন না সেই ছড়াটা 'চোখ বুজে পরী.....' ইত্যাদি। ছড়ায় পরিষ্কার বলা হয়েছে পরীর মূর্তির সামনে থেকে বারো ধাপ সোজা হেঁটে যেতে হবে, তারপর বঁদিকে বিশ ধাপ এবং ডানদিকে ত্রিশ ধাপ এগিয়ে গেলে বকুল গাছটা পড়বে, তারও উল্লেখ আছে ছড়ার মধ্যে। সেভাবেই আমি বকুলগাছের নিচে পৌঁছে আপনার চাকরকে গাছের গোড়ায় খুঁড়তে বলি। তখন রুপোর খালি বাক্স উদ্ধার হয়। তার ভেতরে পাওয়া কাগজটার মধ্যেই ছিল মণিগুলোর প্রকৃত সন্ধান। আমি আগেই বলেছিলাম কেসটা জলের মতো সোজা, আর আপনার বাবাও বোধহয় চাননি কেসটাকে জটিল করে রেখে যেতে।

অমল দত্ত ঘোঁতনের হাত চেপে ধরলেন, আমার অনুরোধ, এই পাথরগুলোর মধ্যে থেকে তুমি যে কোনো একটা পাথর বেছে নাও। সেটাই হবে তোমাদের ফিস।

ঘোঁতন খেলাচ্ছলে একটা ছোট সবুজ পাথর হাতে তুলে প্রশ্ন করল, এই পাথরটার কত দাম হবে?

অমল দত্ত বললেন, তা হাজার ত্রিশ থেকে হাজার পঞ্চাশের মধ্যে হতে পারে। দামের জন্যে ভেব না, পছন্দ হলে ওটা তুমি রেখে দিতে পারো।

ঘোঁতন সবুজ পাথরটা অমল দত্তকে ফেরত দিয়ে বলল, গোয়েন্দাগিরি আমাদের পেশা নয়, নেশা। আমাদের বুদ্ধির কিছুটা খরচ করে যদি কারো উপকার হয় তো সেটাই আমাদের বড় পুরস্কার। এ পাথর আপনার পূর্বপুরুষদের সংগ্রহ, সুতরাং এটি যত্ন করে রেখে দিন।

জিপিডি অনেকক্ষণ ধরে উসখুস করছিলেন, এবার বললেন, হেঁ হেঁ, আরে উনি যখন খুশি হয়ে দিতে চাইছেন তখন নিয়েই নাও না। অবশ্য ওটা যদি তুমি না রাখতে চাও তো আমাকে প্রেজেন্ট করতে পারো। কি বলেন দত্তবাবু?

সেটা সম্পূর্ণত নির্ভর করছে ঘোঁতনের ওপর।

ঘোঁতন জিপিডির দিকে তাকিয়ে দেখল ভদ্রলোকের দু'চোখ প্রত্যাশায় জ্বলজ্বল করছে। সবুজ পাথরটা আবার তুলে নিয়ে তাঁর দিকে বাড়িয়ে ধরল সে, নিন, পাথরটা আপনাকে উপহার দিচ্ছি।

জিপিডি পাথরটা একরকম ছিনিয়ে নিয়ে চোখের সামনে ধরে বললেন, এমন একটা পাথরের আংটি পরার সাধ আমার বহুদিনের, এবার সে আশা পূরণ হতে চলেছে। থ্যাংকু দত্তবাবু। থ্যাংকু ঘোঁতন।

দত্ত পরিবারে নেমে এসেছে খুশির জোয়ার। হলঘরের দেওয়ালে ঝুলন্ত রণদেববাবুর পোর্ট্রেটটাও যেন মনে হলো হাসছে। হলঘর ছাড়ার আগে ঘোঁতন দত্তদের তিন ভাইকে বলল, আশা করি মৃত বাবার প্রত্যাশা মতোই আপনারা শোধরাবেন।

সে আর বলতে! উফ্ বাবা আমাদের উচিত শিক্ষা দিয়ে গেছেন। এবার থেকে আমরা রীতিমতো মেহনত করব যাতে পারিবারিক সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকে।

দত্তদের গাড়িতে বাড়িমুখো ফিরে চলেছে জিপিডি সহ আই কর্পস্ মেম্বাররা। চলন্ত গাড়িতে সবুজ পাথরটা চোখের সামনে ধরে জিপিডি বললেন, এবারকার ট্রেজার হান্টের কথা আমার সারাজীবন মনে থাকবে। পাথরটা বাঁধিয়ে আংটি করে পরব। আংটিটা যখনই দেখব তখনই তোমাদের আর মণিরত্নের রহস্যের কথা মনে পড়ে যাবে। বেশ থ্রিলিং ফিল হবে, নাকি ফিলিং থ্রিল হবে?

কেউ জিপিডির কথার উত্তর দিল না। শুধু বয়ঃকনিষ্ঠ টুকাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিসফিস করে বলল, গোয়েন্দা না তো হাতি। আ রীয়াল জি-স্কোয়ার, মানে গ্রেট গুলিস্ট। কেউ ওর কথা শুনতে পেল কিনা বোঝা গেল না।

গাড়ি নয়নচাঁদ লেনের দিকে এগিয়ে চলেছে।

[ভাদ্র ১৪০৮]

বাবা সোমেশ্বরের অন্তর্ধান রহস্য

সঞ্জয় ব্রহ্ম

বছরের প্রথম দিনেই অঘটনটা ঘটল। ভোর রাতে আবিষ্কৃত হলো বাবা সোমেশ্বর উধাও! মন্দিরের বাইরে তখন কয়েক হাজার মানুষের ভিড়। এদের মধ্যে আবালবৃদ্ধবনিতা রয়েছেন।

বাবা সোমেশ্বরের গাজন এই অঞ্চলের বিখ্যাত গ্রামীণ উৎসব। চৈত্র সংক্রান্তির মধ্যরাতে দেবতা পালকি চড়ে গ্রাম পরিক্রমা করেন। তারপর স্নানাদি সেরে পরের দিন, অর্থাৎ বাংলা নববর্ষের দিন ভক্তজনের সামনে দেখা দেন। ফি-বছর এই উৎসব হয়। মেলা বসে। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আসেন। এইরকম জাঁকজমক চলে কয়েকদিন ধরে।

ভগবান মহাদেব বা শিবরূপী বাবা সোমেশ্বর দেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন লক্ষ্মণ সেনের আমলের কোনো এক হিন্দু সামন্তরাজা। কালো কষ্টিপাথরের ওপর মণিমাণিক্য খচিত এই দেববিগ্রহ দেখতে অনেকটা পদ্মাসনে আসীন ধ্যানস্থ বুদ্ধের মতো। প্রাচীনত্বের এবং নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে এর গুরুত্ব অপরিসীম। আর ভাস্কর্যশৈলীও এর অসাধারণ। অতএব এ হেন মহা মূল্যবান বিগ্রহ বর্তমানে থাকেন চারদিকে কংক্রিট ও লোহার খাঁচায় ঘেরা কঠিন প্রহরায়। মন্দিরের ভেতরের অংশে অর্থাৎ দেবস্থানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। মন্দিরের ঠিক সম্মুখভাগে আলাদা একটি কালো পাথরের বিগ্রহ রয়েছে। তাতেই ভক্তরা ফুল-বেলপাতা দেন। সাধারণের বিশ্বাস ঐ বিগ্রহ পূজা করলেই বাবা সোমেশ্বর সন্তুষ্ট হবেন।

দেবতার আসল বিগ্রহটি কুঠুরিতেই অবস্থান করেন। মন্দির পরিচালনার দায়িত্বে বর্তমানে রয়েছেন ট্রাস্টি বোর্ড। ট্রাস্টি বোর্ডে জেলা ও অঞ্চলের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আছেন। মন্দিরের প্রণামী ও বাবা সোমেশ্বরের নামে দেবোত্তর সম্পত্তি বাবদ আদায়ের জন্য আদালতের রিসিভার রয়েছেন। সেই টাকাতেই মন্দিরের খরচ চলে।

প্রতি বৎসরের মতো এবারেও মহাসমারোহে গাজন উৎসব হয়েছে। তিন দিন আগে থেকে বোলান, বাউল, রঙ পাঁচালীর আসর জমেছে। সঙ্গে গাজনের ভক্তদের বিবিধ শারীরিক কসরৎ দেখা গেছে। এইরকম আনন্দ অনুষ্ঠানের মধ্যেই চৈত্র সংক্রান্তির দিন মধ্যরাতে পালকিতে চড়িয়ে সোমেশ্বরদেবকে অঞ্চল পরিক্রমণে বার করা হয়েছে। সে এক আলোকোজ্জ্বল মিছিল। মশাল আর বাদ্যযন্ত্র নিয়ে দেবতাকে পালকি চড়িয়ে অসংখ্য মানুষ চলেছেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। পরিক্রমণ শেষে দেবতা মন্দিরে ফেরেন। তারপর ভোর রাত থেকেই শুরু হয়ে যায় পূজার ডালি হাতে নিয়ে দেবতা দর্শনের লাইন। পরের দিন কে আগে দেবতার মুখদর্শন করবেন এবং পূজা দেবেন।

এ বছরেও প্রচুর জনসমাগম হয়েছে মন্দির চত্বরে। তাঁরা ভোর রাত থেকে অপেক্ষা করে আছেন; কখন মন্দিরের দরজা খুলবে এই প্রতীক্ষায়। কিন্তু সকাল পেরিয়ে বেলা বাড়তে থাকে; মন্দিরের দরজা খোলে না। ক্রমেই দর্শনার্থীরা অধৈর্য হয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। পুলিশকে ভিড় সামাল দিতে হিমশিম খেতে হয়। অবশেষে পুলিশের তরফ থেকে মন্দিরের পুরোহিতদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে, জানা যায় বাবা সোমেশ্বর উধাও!

সেই মুহূর্তে পুরোহিতকুল মহা সমস্যায় পড়লেন। একে তো মূর্তি উধাও। তার ওপর এই বিপুলসংখ্যক দর্শনার্থীকে এখন কিভাবে সামাল দেওয়া হবে?

বিগ্রহ চুরির ঘটনা প্রশাসনের কানে আসতেই থানার অফিসার-ইন-চার্জ মিটিং করলেন থানার

অন্যান্য অফিসারদের নিয়ে। তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হলো মেজবাবু, সিনিয়র সাব ইন্‌স্‌পেকটর অনিমেষ পাকড়াশীকে।

অনিমেষবাবু ঘটনাস্থলে এলেন বেলা বারোটায়। তখনও মন্দিরের দরজা খোলেনি। ভোর রাত থেকে অপেক্ষারত দর্শনার্থীরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। অনিমেষবাবু মন্দিরের পেছনের দরজা দিয়ে প্রধান পুরোহিতের সঙ্গে ভেতরে ঢুকলেন। দুটো কাঠের দরজা এবং লোহার কোলাপসিবল গেট পেরিয়ে মূল মন্দিরের মধ্যে বিগ্রহের সামনে যেতে হয়। বিগ্রহের শূন্য বেদীটার চারপাশে অনিমেষবাবু নিখুঁতভাবে লক্ষ্য করলেন। এই অংশ সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। অনিমেষবাবু সন্দেহের সূত্র চিন্তা করতে করতে ভ্রূ কোঁচকালেন। আশ্চর্য! এরকম সুরক্ষিত জায়গা থেকে বিগ্রহ চুরি গেল কিভাবে?

ভয়ার্ত কণ্ঠে প্রধান পুরোহিত পঞ্চানন ভট্টাচার্য মশাই বললেন, কি কাণ্ড বলুন দেখি স্যার! এখন এত মানুষের ভিড়। তাদের কি জবাব দিই? অনিমেষবাবু প্রয়োজন ছাড়া কথা বলেন না। শোনেন বেশি। দেখেন খুঁটিয়ে। তিনি ভেবে পান না কিভাবে এমন সুরক্ষিত অবস্থা থেকে বিগ্রহটি চুরি হলো! আবার তাও কোনো নির্জন রাতে নয়। কলরবমুখর উৎসবের রাতে! কাজেই চোর কে এই মুহূর্তে সন্দেহ করা কঠিন। সে যাই হোক, আপাতত সমস্যা হলো পূজা দিতে আসা ভক্তদের সামাল দেওয়া।

অনিমেষবাবুকেই সিদ্ধান্ত নিতে হলো। তাঁর নির্দেশে জনসাধারণকে জানানো হলো যে দেবতা স্বপ্নাদেশ দিয়েছেন তিনি আজ বস্ত্র আচ্ছাদিত হয়ে ভক্তদের দেখা দেবেন। সিদ্ধান্তটা জানিয়েই মন্দিরের দরজা খুলে দেওয়া হলো। ইতিমধ্যে পুলিশও 'কিউ'টা সোজা করে নিয়েছে। জনতা হাতের ডালি নিয়ে এক এক করে এগুচ্ছে আর সামনের বিগ্রহে পূজা নিবেদন করে বস্ত্রে ঢাকা বস্তুটিকে দেবতা জ্ঞানে প্রণাম করে বেরিয়ে যাচ্ছে। কাউকে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে দেওয়া হচ্ছে না। কেউ বেশি কৌতূহলী হলে তাকে বলা হচ্ছে স্বপ্নাদেশের কথা। এভাবে দর্শনার্থীদের সামাল দিতে প্রায় সন্ধ্যা গড়াল।

ইতিমধ্যে থানার ও. সি., এস. ডি. পি. ও. সাহেব এসে মন্দির চত্বর ঘুরে গেছেন। গোটা ঘটনাটা জেলা পুলিশ এবং প্রশাসন অবহিত হয়েছেন। অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী পাঠানো হয়েছে। রেডিও মেসেজে অন্যান্য থানাগুলোকে জানানো হয়েছে। হাইওয়ে পেট্রল গ্রুপকেও নজর রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সন্ধ্যা নামলে মন্দিরের পূজার্থীদের ভিড় কমতেই তদন্তকারী অফিসার অনিমেষ পাকড়াশী তাঁর কাজ শুরু করলেন। ইতিমধ্যে মন্দিরের প্রতিটি আনাচ-কানাচগুলো দেখা হয়ে গেছে। এলাকার মাতব্বর, পঞ্চায়েত প্রধান, বিধায়ক প্রায় সকলেই ততক্ষণে খবর পেয়ে এসেও গেছেন। স্থির হলো আপাতত মন্দিরের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত পুরোহিত ও পাহারাদারদের জেরা করা হবে থানায় নিয়ে গিয়ে।

থানায় এসে পুরোহিতদের জেরা করা হলো প্রায় ঘণ্টা তিনেক ধরে। কিন্তু সোমেশ্বরদেবের অন্তর্ধান রহস্যের কোনো কিনারা করা গেল না। জেরা করার সময় বড়বাবু ছিলেন। ঠিক হলো ওই মুহূর্তে 'বেনিফিট অব ডাউটে' কাউকে আটক করা যাচ্ছে না। তাই সকলকে ছেড়ে দেওয়া হবে, কিন্তু শর্ত রইল পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত কেউ অঞ্চলের বাইরে যেতে পারবে না। যেতে গেলে অনুমতি লাগবে। তার জন্য পুলিশের কড়া নজরদারির ব্যবস্থাও করা হবে।

থানা থেকে বেরিয়ে পুরোহিতরা একে অপরের মুখ লক্ষ্য করে। সকলেই বিস্মিত। সকলেরই জিজ্ঞাসা কাকে সন্দেহজনক মনে হয়? এর মধ্যে দেখা যায় ওদের দলের সকলেই আছে, একমাত্র কার্তিক ছাড়া। কার্তিক প্রধান পুরোহিতের ছেলে। ছোকরা বদের ধাড়ি। নেশাভাঙ করে। কিন্তু বাউল গান গায় অসাধারণ।

অঞ্চল প্রধান কার্তিককে চেনেন। এরা বেরিয়ে আসার পর তিনিও কার্তিকের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করে ও. সি-কে জানিয়েছেন। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ গোপন রেখে পরদিন ভোরবেলায় কার্তিককে থানায় তুলে নিয়ে আসেন অনিমেষবাবু। কার্তিকের কাছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। তার বাড়ি পুলিশ সার্চ করে। সেখানে বিবর্ণ একটি ভিজিটিং কার্ড মেলে। কার্ডটিতে ইংরেজি হরফে লেখা রয়েছে অভি রায়, ফ্রি-ল্যান্স ফোটোগ্রাফার, কেয়ার অফ কালার ও প্রিন্ট, ১২, আর এ কিদওয়াই রোড, কলিকাতা।

পুলিশের জেরার উত্তরে কার্তিক জানায় জনৈক ফোটোগ্রাফার দু'বছর আগে তাকে এক বাউল মেলায় এই কার্ডটি দিয়েছিলেন। এরপরেও বিভিন্ন গ্রামীণ মেলায় ও উৎসবে তার সঙ্গে ঐ ফোটোগ্রাফারের দেখা হয়েছে। এবারে ভদ্রলোক তাদের গ্রামে এসেছেন চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন। সে ঐ ফোটোগ্রাফারের সঙ্গে দু'দিন ছিল। ভদ্রলোক তার অনেকগুলো ছবি তুলেছেন। তাকে খাইয়ে-দাইয়েছেন। কিন্তু ঐ ভদ্রলোকই যে বিগ্রহ চুরি করেছেন সেটা অবশ্য সে দেখেনি বা জানে না। তবে তিনি মন্দিরের পেছনের দরজা, সামনের দরজা সব ঘুরে ঘুরে দেখেছেন। আর বার বার তাকে অনুরোধ করেছেন মূল মন্দিরের ভেতরে তাঁকে নিয়ে গিয়ে দেবতাকে একবারটি দর্শন করাতে। কার্তিক পুলিশকে জানায় যে সে বলেছিল তা সম্ভব না। কিন্তু পরে ভদ্রলোক যখন খুব পীড়াপীড়ি করেন তখন দুইশত টাকার বিনিময়ে সে তাঁকে মন্দিরের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয় সকলের অজ্ঞাতে। সময়টা সে বেছে নেয়, ঠিক যখন মধ্যরাতে দেবতাকে পালকিতে চড়িয়ে মন্দির থেকে গ্রাম পরিক্রমণের জন্য বার করা হবে। ঐ ব্যস্ততা হইচইয়ের ফাঁকে সে ফোটোগ্রাফারকে মন্দিরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। পালকিসহ মিছিল গ্রামের পথে এগিয়ে গেলে প্রধান পুরোহিত মন্দিরের দরজায় তালা দিয়ে মিছিলে যোগ দেন। এর পরে কি ঘটেছে সে তা জানে না।

কার্তিকের জবানবন্দী ও ফোটোগ্রাফারের কার্ডটি পেয়ে অনিমেষবাবু উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। মনে মনে ভাবেন ঐ কার্ডের ঠিকানা অনুযায়ী গেলে রহস্যের সন্ধান মিলবে।

আর দেরি না করে অনিমেষবাবু কার্তিককে নিয়ে কলকাতার ঐ কালার ল্যাবরেটরিতে হানা দিলেন। কালার ল্যাবরেটরির মালিক গুজরাটি ভদ্রলোক ঝানু ব্যবসায়ী। তিনি পুলিশ দেখে ঘাবড়াবার পাত্র নন। তিনি তাঁর ট্রেড লাইসেন্স ও অন্যান্য কাগজপত্র দেখিয়ে বলেন যে ঐ নামে তাঁর ওখানে কেউ নেই। সঙ্গে সঙ্গে অনিমেষবাবু জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে ল্যাব-এর কেয়ার অফে ফোটোগ্রাফারের নাম এল কি করে? মেহেরাজী চটজলদি উত্তর দেন, দেখুন মশাই, বাজার থেকে কতগুলো কার্ড কিনে যা ইচ্ছে তাই ছেপে কেউ যদি কারোকে দেয় তো আমি কি করতে পারি? হতাশ হন অনিমেষবাবু। কত আশা নিয়ে ছুটে এসেছিলেন।

স্টুডিও ও কালার ল্যাবরেটরিতে বিভিন্ন রকম খদ্দের আসছে। মেহেরাজী তাই দোকানের কাউন্টার থেকে অনিমেষবাবু, দুই কনস্টেবল আর কার্তিককে নিয়ে ভেতরে অফিসঘরে বসিয়েছিলেন। মেহেরাজী ব্যবসায়ী। তিনি কাউকে চটাতে চান না। তিনি এদের কোল্ড ড্রিংস দিয়ে আপ্যায়িত করেন।

অনিমেষবাবু আশাহত হলেও মনে মনে ছক কষতে থাকেন। কি সূত্রে এই দোকানের কেয়ার অফে ঐ ফোটোগ্রাফার-এর নাম হতে পারে! তিনি মেহেরাজীকে আবার প্রশ্ন করেন, আচ্ছা এ নামে আপনার কোনো খদ্দের আছে? মেহেরাজী বলেন, দেখুন আমার এই স্টুডিওতে কত লোকই তো আসে। সবার ঠিকানা কেউ কি ডিটেলসে লেখে? অনিমেষবাবু জিজ্ঞেস করেন, পুরো ঠিকানা লেখে না কেন? মেহেরাজী এবার একটু রেগে যান। বলেন, দেখুন মশাই, আমরা ব্যবসা করবো না গোয়েন্দাগিরি করবো বলতে পারেন? অনিমেষবাবু মেহেরাজীকে শান্ত করতে বলেন, অন্যভাবে নেবেন না। আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম আপনার ব্যবসায়ের স্বার্থে প্রয়োজন হয় না কি? মানে ধরুন, প্রিন্ট করতে দিল। পরে আর সেগুলো নিল না। মেহেরাজী উত্তর দেন, আননোন কাস্টমার হলে আমরা টাকা অ্যাডভান্স নিই। আর রেগুলার ডিলিংস থাকলে অনেক সময় আবার কিছু নিই না। অনিমেষবাবু এবার আরও একটু মোলায়েম করে বলেন, তবুও অনুগ্রহ করে আপনার অর্ডার বই বা রিসিটের মধ্যে ঐ নাম বা ঐ ধরনের কোনো নাম পাওয়া যায় কিনা দেখবেন?

কিঞ্চিৎ বিরক্ত হলেও, নাছোড়বান্দা অনিমেষবাবু শেষ পর্যন্ত মেহেরাজীকে রাজী করতে পারলেন। প্রায় দশ-বারোটা পুরনো রিসিট আর অর্ডার বই আনিয়ে মেহেরাজী পাতা ওলটাতে থাকেন। ইংরেজি আদ্য অক্ষর 'এ' দিয়ে অনেক নাম পাওয়া যায়। অসিত, অনিক, অভিক, অভি এ রকম বহু নামই পাওয়া যায়। কিন্তু কোথাও কোনো ঠিকানা লেখা নেই। সবই শুধু ক্যালকাটা লেখা। বইপত্তর ঘাঁটতে

ঘাঁটতে মেহেরাজী বেশ বিরক্তি প্রকাশ করছেন। তবুও ঘেঁটে চলেছেন। হঠাৎ একটা পাতার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো। লেখা অভি রায়। আরজেন্ট। তার পাশে একটা টেলিফোন নম্বর।

এ রকম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েই অনিমেষবাবু এক মুহূর্তও না দেরি করে, সেখানে বসেই ঐ টেলিফোন নম্বরে ফোন করেন। এটি উত্তর চব্বিশ পরগনার একটি অঞ্চলের টেলিফোন নম্বর। খোঁজ পাওয়া যায় অভির। যে বাড়ির ফোন নম্বর তার কয়েকটা বাড়ি পরেই অভিদের বাড়ি। অনিমেষবাবু নিজের পরিচয় গোপন রেখে কায়দা করে জেনে নেন অভির বাড়ির ঠিকানা।

নির্ধারিত ঠিকানায় পৌঁছে অনিমেষবাবু দেখেন ছোট্ট দোতলা বাড়ি। অভির বাবা অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ মানুষ। দোতলায় অভির ঘর কাম ফোটোগ্রাফির ওয়ার্কশপ থেকে চটে মোড়া অবস্থায় বাবা সোমেশ্বরের বিগ্রহ অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেল। অভিকে তখন বাড়িতে না পাওয়া গেলেও পরে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছিল। আইন মোতাবেক শাস্তির ব্যবস্থা হয়েছিল। আর বাবা সোমেশ্বর এখান থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়ে সোজা তাঁর গ্রামের বাড়িতে পৌঁছান। তারপর এক শুভক্ষণে মহাসমারোহে বাবা সোমেশ্বর আবার তাঁর বেদীতে অধিষ্ঠিত হলেন।

[পৌষ ১৪০৪]

কৃষ্ণের গোয়েন্দাগিরি

নন্দলাল ভট্টাচার্য

শেষ পর্যন্ত গোয়েন্দাগিরিতেও নামতে হলো শ্রীকৃষ্ণকে। সবাই মিলে যেভাবে সন্দেহের আঙুল তার দিকে তুলছে, প্রসেনের মৃত্যুর জন্য তাকেই দায়ী করছে এবং স্যমন্তক মণিটা সেই চুরি করেছে বলে রটাচ্ছে তাতে কৃষ্ণের পক্ষে আর ঘরে বসে থাকা সম্ভব হলো না।

একদিন তাই বলরাম এবং অন্য যাদবদের ডেকে কৃষ্ণ বলল, দেখ, সত্যিই প্রসেন মারা গেছে কিনা, মারা গেলেও কিভাবে মারা গেছে আর তার মণিটাই বা কোথায় গেছে, তার কিছুই আমরা জানি না। তাই চল, প্রসেন যে পথে শিকারে গেছিল আমরাও সে পথ ধরে এগোই। হয়তো রহস্য ভেদ করতে পারব।

শ্রীকৃষ্ণের কথায় কারো কারো মনে সন্দেহ দেখা দিলেও বেশির ভাগই কিন্তু তার যুক্তি মেনে নিল। সাক্ষ্য প্রমাণ না পেলে তো কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। সুতরাং দেখাই যাক, কৃষ্ণের কথামতো একবার জঙ্গল তল্লাশ করে যদি পাওয়া যায় কোনো সূত্র।

বাধ্য হয়েই প্রসেনের দাদা সত্রাজিৎকেও যেতে হলো তাদের সঙ্গে। মণিটা ছিল যদুবংশীয় এই রাজা সত্রাজিতেরই। মণিটার ছিল অশেষ গুণ। যার কাছে মণিটা থাকত তার সোনাদানার কোনো অভাব থাকত না। প্রত্যেক দিন মণিটা থেকে পাওয়া যেত আট ভার (প্রায় ১ লক্ষ ৪৪ হাজার তোলা) করে সোনা। তার ওপর যেখানে মণিটা থাকত তার আশপাশের এলাকাতে কখনও কোনো রোগ, শোক, অনাবৃষ্টি দেখা দিত না। এমন মণি হারিয়ে ভেঙে পড়াটা তাই স্বাভাবিক। তাছাড়া সত্রাজিতের দৃঢ় ধারণা প্রসেনকে খুন করে মণিটা নিয়েছে কৃষ্ণই। কেননা মণিটার ওপর তারই লোভ ছিল সবচেয়ে বেশি।

রাজা সত্রাজিৎ ছিল সূর্যের উপাসক। তার পুজোআচ্চায় সন্তুষ্ট হয়ে সূর্য একদিন সরাসরি হাজির হয় তার কাছে। সত্রাজিতের আরাধনায় সূর্য যে খুব খুশি হয়েছে সেই কথাটি জানিয়ে সূর্য নিজের গলা থেকে ওই স্যমন্তক মণির হারটা খুলে রাজা সত্রাজিৎকে দিয়ে দেয়।

সূর্য চলে যাবার পর সত্রাজিৎ সেই স্যমন্তক মণির হার গলায় দিয়ে রাস্তায় বেরোতেই সবার চোখ ঝলসে যায়। মণিটার তেজ যেন হাজার সূর্যের চেয়েও বেশি। ভয়ে ভয়ে সবাই গিয়ে কৃষ্ণকে বলে, কী জানি কেন, দ্বারকার পথে হেঁটে আসছে সূর্য।

কৃষ্ণ তাড়াতাড়ি রাস্তায় এসে দেখে, সূর্য নয়, রাস্তা দিয়ে আসছে সত্রাজিৎ। তার গলায় রয়েছে একটি মণি, তারই আলোতে সবার চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। সব দেখে শুনে কৃষ্ণ বলে, সূর্য কোথায়? ও তো আমাদের সত্রাজিৎ।

তাই বুঝি! সবাই যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

কৃষ্ণ এবার সত্রাজিৎকে বলে, দেখ সত্রাজিৎ, তোমার গলায় যে মণিটা রয়েছে ওটা থাকা উচিত রাজা উগ্রসেনের গলায়। তুমি ওটা মহারাজকে দিয়ে দাও।

সত্রাজিৎ কিন্তু সূর্যের দেওয়া ওই মণিটা কিছুতেই হাতছাড়া করতে চায় না। তাই কোনো কথা না বলে সে বাড়ি চলে যায়।

এরই কয়েকদিন পরে সত্রাজিতের ভাই প্রসেন ওই মণিটা গলায় দিয়ে বনে যায় শিকার করতে। প্রসেন ছিল মস্ত শিকারী। তার তীরের মুখ থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে পারত না জঙ্গলের কোনো পশুই। প্রসেনের ক্ষতিও করতে পারত না কেউ।

সেদিনও মণিটা গলায় ঝুলিয়ে চারিদিক আলোয় আলো করে প্রসেন শিকার করছে। কিন্তু কপাল মন্দ। পেছন থেকে হঠাৎ একটা সিংহ লাফিয়ে পড়ে তার মুণ্ডুটাকে শরীর থেকে ছিঁড়ে ফেলল। তারপর এগিয়ে গেল সেই মণিটা নিয়ে।

সিংহের গলায় স্যমন্তক মণির হারটা দেখতে পেল ভাল্লুকদের রাজা জাম্বুবান। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে পড়ল সে সিংহের ওপর। তাকে মেরে মণিটা নিয়ে সে চলে গেল গুহার মধ্যে। সেখানে তার ছেলেকে মণিটা দিল গুলি খেলার জন্য।

এখন এতসব ঘটনার কথা তো আর দ্বারকার মানুষ জানে না। তারা শুধু জানে শিকার করতে গিয়ে প্রসেন আর ফিরে আসেনি। শিকারের সময় যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে গিয়ে থাকতে পারে, এমন সম্ভাবনার কথা তাদের চিন্তারও অতীত। তাই তারা ধরে নিয়েছিল মণিটা কৃষ্ণই চুরি করেছে আর গভীর জঙ্গলে প্রসেনকে মেরেও ফেলেছে ঐ কৃষ্ণই।

যাই হোক, প্রসেনের ঘোড়ার পায়ের দাগ লক্ষ্য করে করে একসময় কৃষ্ণ সবাইকে নিয়ে হাজির হয় সেই গভীর বনের ভেতর। সেখানে সবাই দেখতে পেল প্রসেনের রক্তাক্ত দেহটা। দেখেই ভায়ের শোকে সত্রাজিৎ কেঁদে আকুল।

প্রসেনের বীভৎস মৃতদেহটা দেখে ওরা ভেবে পায় না এমনভাবে তাকে খুন করল কে?

কৃষ্ণের কিন্তু সেদিকে নজর নেই। সে তাড়াতাড়ি প্রসেনের জামাকাপড় ঘেঁটে দেখল মণিটা আছে কিনা? না, নেই। কৃষ্ণ বুঝতে পারল, যে প্রসেনকে মেরেছে, সেই মণিটা নিয়ে চম্পট দিয়েছে। কিন্তু কে সে?

মৃতদেহটাকে ভাল করে পরীক্ষা করে কৃষ্ণ দেখল তার গায়ে রয়েছে খাবলানোর দাগ। এ নিশ্চয়ই কোনো হিংস্র জন্তুর কাজ, সম্ভবত সিংহ। মাটির ওপর ভাল করে নজর রাখতেই কৃষ্ণ বুঝল তার অনুমান সঠিক। এগুলো সিংহেরই পায়ের ছাপ। কৃষ্ণ এবার তাই সেই সিংহের পায়ের ছাপ ধরে এগোল।

কিছুদূর গিয়েই কৃষ্ণের চোখে পড়ল একটা বিরাট সিংহ মরে পড়ে রয়েছে। সিংহটাকে কেউ যেন তীক্ষ্ণ নখে ফালাফালা করে দিয়েছে। মণিটা কিন্তু সিংহের কাছেও নেই। কিন্তু ভিজে মাটিতে রয়েছে ভাল্লুকের পায়ের ছাপ। কৃষ্ণ এবার সেই দাগ অনুসরণ করে পৌছোল একটা গুহার কাছে।

গুহার মুখে পৌছেই থমকে দাঁড়াল কৃষ্ণ, বলরাম এবং অন্যরা। এবার কী করা যায় এটাই ভাবছে কৃষ্ণ। এমন সময় গুহার মধ্যে একটি বাচ্চার কান্না শোনা গেল। বাচ্চাটির কান্না থামাতে কেউ যেন বলছে, আর কাঁদে না, আর কাঁদে না। এই দেখ তোমার বাবা কেমন সুন্দর মণির বল এনে দিয়েছে— এই নিয়ে খেলা কর তুমি!

কথাগুলো বাইরে থেকে শুনেই কৃষ্ণ বুঝতে পারল ভাল্লুকরাজ জাম্বুবানই সিংহকে মেরে মণিটা নিয়ে এসেছে। কৃষ্ণ এবার তাই দাদা বলরাম এবং অন্যদের বলল, তোমরা বাইরে দাঁড়াও, আমি জাম্বুবানকে মেরে এখনই মণিটা নিয়ে আসছি।

সবাই অপেক্ষা করতে থাকে। কৃষ্ণ হুঙ্কার দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। জাম্বুবান তখন বিশ্রাম করছিল। কৃষ্ণের হুঙ্কারে বাইরে এসে কৃষ্ণকে দেখেই আক্রমণ করল সে। শুরু হলো দুজনের রীতিমতো কুস্তি। একদিন দু'দিন নয়, আঠারো দিন ধরে চলে লড়াই।

এদিকে অতদিনেও কৃষ্ণকে বাইরে আসতে না দেখে সবাই ভাবল, ভাল্লুকের হাতে প্রাণ গেছে তার। সাহস করে কেউ আর ভেতরে ঢুকল না। সেখান থেকেই হায় হায় করতে করতে ফিরে এল দ্বারকায়।

ওদিকে কৃষ্ণ আর জাম্বুবান—দুজনেই সমান। হার আর কেউ মানে না। তবে আঠারো দিনের পর জাম্বুবান ক্রমে যেন দুর্বল হয়ে পড়ল। কৃষ্ণের সঙ্গে আর এঁটে উঠতে পারল না সে। বাধ্য হয়েই হার মেনে ক্ষমা চাইল সে কৃষ্ণের কাছে।

কৃষ্ণও তাকে ক্ষমা করল। প্রাণে না মেরে ছেড়ে দিল। কৃতজ্ঞ জাম্বুবান এবার মণিটা তো ফিরিয়ে দিলই, ওই সঙ্গে নিজের মেয়ে জাম্ববতীরও বিয়ে দিয়ে দিল কৃষ্ণের সঙ্গে।

দ্বারকায় সবাই যখন কৃষ্ণের শোকে অধীর, সত্রাজিৎও যখন মণি চুরির জন্য অন্যায়ভাবে কৃষ্ণকে সন্দেহ করার লজ্জায় মরমে মরে আছে, সেই সময় কৃষ্ণ ফিরে এল নতুন বউ জাম্ববতী আর সেই সমন্তক মণি নিয়ে। মণিটা সে ফিরিয়ে দিল সত্রাজিৎকে। সত্রাজিৎও কৃষ্ণকে মিথ্যে সন্দেহ করার পাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্য তার সঙ্গেই বিয়ে দিয়ে দিল নিজের মেয়ে সত্যভামার।

এই বিয়ে নিয়ে এবার শুরু হলো আরেক অশান্তি। শুধু তাই নয়, মণিটা আবার চুরি গেল এবং সেই সঙ্গে একটা খুনও হলো। অতএব ফের রহস্যভেদ করতে এগিয়ে আসতে হলো কৃষ্ণকে।

সত্রাজিতের মেয়ে সত্যভামা ছিল অসাধারণ সুন্দরী। তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল শতধন্বা, কৃতবর্মা আর অক্রুর। এরাও সবাই রাজার ছেলে। কিন্তু এদের সঙ্গে বিয়ে না দিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে সত্যভামার বিয়ে দেওয়ায় এরা সবাই চটে লাল। এই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ খুঁজতে থাকে তারা।

সুযোগ এসে গেল কিছুদিনের মধ্যেই। হস্তিনাপুরে কৌরবপ্রধান দুর্যোধন পাণ্ডবদের মারবার জন্য বারণাবতে জতুগৃহ তৈরি করেছে এবং সেখানে পাণ্ডবদের থাকতে পাঠিয়েছে খবর পেয়েই কৃষ্ণ ছুটল সেখানে তাদের রক্ষা করার জন্য। সত্যভামা রইল তার বাবা সত্রাজিতের কাছে।

শতধন্বা দেখল এই সুযোগ। সে চুপিচুপি একদিন সত্রাজিতের প্রাসাদে ঢুকে মণিটা চুরি করে ঘুমন্ত সত্রাজিতকে খুন করে পালাল। পালানোর সময় শতধন্বাকে দেখে ফেলল অনেকেই কিন্তু ধরতে পারল না কেউ।

শতধন্বা তখন বেপরোয়া। সূর্যের দেওয়া স্যমন্তক মণি এখন তার কাছে। অক্রুর, কৃতবর্মা তার সহায়, এখন আর তাকে পায় কে এমন একটা ভাব।

বাবাকে খুন হতে দেখে সত্যভামা প্রথমে কেঁদে ভাসাল। তারপরই সত্রাজিতের মৃতদেহ তেলের মধ্যে ভিজিয়ে রেখে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ছুটল হস্তিনাপুরে কৃষ্ণের কাছে। কৃষ্ণ সবকিছু শুনে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল দ্বারকায়।

দ্বারকায় এসেই দাদা বলরামকে কৃষ্ণ বলল, তুমি তো স্যমন্তক মণির সব কথাই জানো। শতধন্বা রাজা সত্রাজিৎকে খুন করে পালিয়েছে। এর একটা প্রতিবিধান করা দরকার।

ভায়ের কথায় সায় দিয়ে বলরাম বলে, নিশ্চয়ই। এখুনি একটা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

ব্যবস্থা আর কী? ব্যবস্থা মানে তো যুদ্ধ। তাই কৃষ্ণ সারথিকে বলল রথ বার করতে। ওদিকে কৃষ্ণ মারতে আসছে শুনেই শতধন্বা ছুটে গেল কৃতবর্মা আর অক্রুরের কাছে।

কৃতবর্মা আর অক্রুর কিন্তু কৃষ্ণ বলরামের ভয়ে শতধন্বাকে সাহায্য করল নয়। ওরা বলল, না বাপু ওসবের মধ্যে আমরা নেই। মণিটা চুরি করেছ তুমি, খুনও করেছ তুমি, এখন ফল যা ভোগ করার তাও করতে হবে তোমাকেই।

বেচারা শতধন্বা আর কী করে! মণিটা তখন সে অক্রুরকেই দিয়ে বলে, তুমি বরং এটা রাখ। আর আমিও পালাই কৃষ্ণর হাত থেকে বাঁচার জন্য।

মণিটার জন্য অক্রুরেরও একটু লোভ ছিল, তাই সে রাজী হয়ে গেল এক কথাতেই। শতধন্বাও তাকে মণিটা দিয়ে ঘোড়ায় চেপে পালাল মিথিলার দিকে।

তাড়া লাগাল কৃষ্ণ। মিথিলার বনে ঢোকার মুখে শতধন্বার ঘোড়াটা পড়ে মারা গেল। বাধ্য হয়ে শতধন্বা ছুটে বনের মধ্যে ঢুকতে গেল। ওদিকে কৃষ্ণ ততক্ষণে এসে গেছে। শতধন্বাকে বনে ঢুকতে দেখেই রেগে চক্রটা ছুঁড়ে ঘ্যাচ করে কেটে ফেলল তার মুণ্ডুটা। তারপর রথ থেকে নেমে তাড়াতাড়ি সেই স্যমন্তক মণিটার খোঁজ করে তার পোশাক-আসাকের ভেতর। কিন্তু কোথায় মণি? সেটা তো রয়েছে অক্রুরের কাছে। কৃষ্ণ তো আর তা জানে না। তাই বলরামকে এসে বলে, কী ব্যাপার বল তো দাদা, শতধন্বার কাছে তো মণিটা নেই।

বলরামের কিন্তু বিশ্বাস হলো না কথাটা। সে বলেই ফেলল, বুঝতে পেরেছি কৃষ্ণ, আমাকে ফাঁকি দেওয়ার জন্যই তুমি এই কাণ্ডটা করেছ। যাও তোমার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক নেই।

কৃষ্ণ যত বোঝাতে যায় বলরাম ততই রেগে যায়। শেষমেশ মণি নিয়ে দু'ভায়ে বেশ একচোট হয়ে গেল। বলরাম রেগে চলে গেল মিথিলায় আর কৃষ্ণ একাই ফিরে এল দ্বারকায়।

দ্বারকায় ফিরে এলেও মনটা কিন্তু ভাল নেই কৃষ্ণের। একে তো যে মণিকে নিয়ে এত কাণ্ড সেই স্যমন্তক মণিটাই পাওয়া গেল না, তার ওপর দাদা বলরাম এই সামান্য ব্যাপারটা নিয়ে তাকে ভুল বুঝল। সব মিলিয়ে কৃষ্ণ বেশ মনমরা। সমস্যার সমাধান একমাত্র হতে পারে মণিটা পাওয়া গেলে। কিন্তু কোথায় থাকতে পারে মণিটা!

ওদিকে মণিটা পাওয়ার পর অক্রুরের কপাল গেছে খুলে। সে প্রতিদিন ওই মণিটার কাছ থেকে পাচ্ছে আট ভার করে সোনা। এত সোনা দিয়ে কী করবে ভেবে পায় না অক্রুর। জানাজানি হয়ে গেলে কৃষ্ণ মণিটা কেড়ে নিতে পারে জেনেও অক্রুর শুরু করে দান-যজ্ঞ।

দেখতে দেখতে অক্রুরের যজ্ঞের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল দিগ্বিদিকে। ব্যাপার দেখে কৃষ্ণের কেমন সন্দেহ হলো। এত বড় যজ্ঞ করার সামর্থ্য অক্রুরের নেই, তাহলে সে করছে কী করে? তবে আর দেখতে হচ্ছে না, মণিটা নিশ্চয়ই অক্রুরের কাছে আছে। কিন্তু অক্রুর নিজের থেকে না বললে তো আর জানা যাবে না তা। তাই সুযোগ খুঁজতে থাকে কৃষ্ণ। এদিকে ঘটে গেল একটা ঘটনা। একটা জ্ঞাতি বিরোধে জড়িয়ে পড়ল অক্রুর। সেই বিরোধ মারাও পড়ল একজন। আর তাতেই ভয় পেয়ে মণি নিয়ে অক্রুর পালাল দ্বারকা থেকে।

অক্রুর চলে যাওয়ার পরেই দ্বারকায় শুরু হলো প্রচণ্ড খরা। এতটুকু বৃষ্টি নেই দ্বারকায়। কৃষ্ণ এবার পুরোপুরি নিশ্চিত হয়, মণিটা আছে অক্রুরেরই কাছে। কেননা, মণিটার এমনই গুণ সেটা যেখানে থাকে তার ত্রিসীমানায় অনাবৃষ্টি, খরা হয় না।

কৃষ্ণ ভাবতে থাকে অক্রুরকে কিভাবে আবার দ্বারকায় ফিরিয়ে আনা যায়। ওদিকে দ্বারকার প্রবীণ ব্যক্তিরাও বলেন, অক্রুরের বাবা শফষ্ক ছিলেন একজন অসাধারণ সাধু পুরুষ। তিনি যেখানে থাকতেন সেখানে অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ কখনও হতো না। তাঁরই ছেলে অক্রুর। তারও নিশ্চয় কিছু ক্ষমতা আছে। কাজেই তাকে ফিরিয়ে আনা হোক দ্বারকায়।

কথামতো লোক ছুটল অক্রুরের কাছে। ততদিনে বুঝিয়ে-সুজিয়ে বলরামকেও আনা হয়েছে দ্বারকায়। বলরাম এলেও কৃষ্ণের সঙ্গে তার সম্পর্কটা স্বাভাবিক হয়ে ওঠেনি তখনও। মণিটা যে কৃষ্ণই সরিয়েছে এ সন্দেহটা তখনও রয়ে গেছে বলরামের মনে। তাই কৃষ্ণকে সে একটু এড়িয়েই চলে। বলরামের এই ব্যবহার কৃষ্ণকে কষ্ট দেয় খুবই কিন্তু সে জানে, সন্দেহ না-ঘোচানো ছাড়া সব আর আগের মতো হবে না কিছুই। তাই কৃষ্ণ অপেক্ষা করতে থাকে অক্রুরের জন্য।

অক্রুর দ্বারকায় পা দেওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি শুরু হলো। কৃষ্ণ বুঝল অক্রুরের জন্য নয় তার মণির জন্যই এই বৃষ্টি হচ্ছে। তাই এবার সত্যটা প্রকাশ করার অভিনব ব্যবস্থা নিল সে।

বৃষ্টির পর দ্বারকার অবস্থা যখন স্বাভাবিক, আবার যখন চাষবাস শুরু হয়েছে, সেই সময় কৃষ্ণ একদিন তার বাড়িতে বিরাট এক ভোজ দিল। যাদবদের মধ্যে যারা প্রধান প্রধান মাতব্বর গোছের লোক, তাদের সবাইকে নেমন্তন্ন করল কৃষ্ণ। অক্রুর আর বলরামকেও ডাকল।

সারাদিন ধরে চলল খাওয়া-দাওয়া। সবাই বেশ হাল্কা মেজাজে আছে। চলছে নানা হাসি-ঠাট্টা, গল্প-গুজব। তারি মধ্যে কৃষ্ণ হঠাৎই অক্রুরকে বেমক্কা বল বসে, দেখ অক্রুর, শতধন্বা মারা যাবার আগে সে স্যমন্তক মণিটা তোমার কাছে রেখে গেছে সেটা আমি জানি, কিন্তু আমার দাদা বলরামের তা বিশ্বাস হচ্ছে না কিছুতেই। তার ধারণা, মণিটা সরিয়ে রেখেছি আমিই। তাই নিয়ে আমাদের দু' ভায়ের মধ্যে আর সে ভাবও নেই। এর জন্য আমিও কষ্ট পাচ্ছি মনে মনে। তা তুমি যদি ভাই, মণিটা একবার সবাইকে দেখিয়ে দাও তাহলেই কিন্তু সব সন্দেহ দূর হয়। আমাদের দু' ভায়ের আবার আগের মতো ভাব হয়। আমাদের ভাব হোক এটা কি তুমি চাও না ভাই!

কৃষ্ণের এ কথায় অক্রুর একদম যেন জলে পড়ে। কৃষ্ণ যে একদিন মণিটা কেড়ে নেবে এ ভয়

অক্রূরের ছিল। কিন্তু সে যে এমনভাবে বেকায়দায় ফেলবে তা বুঝতে পারেনি। ওদিকে মাতব্বরাও অক্রূরকে বলে, কৃষ্ণ যা বলছে তা যদি সত্যি হয়, তাহলে একবার মণিটা দেখিয়ে দাও। তাতে ওদের দু' ভাইয়ের মিলটা অন্তত হবে।

একরকম নিরুপায় হয়েই অক্রূর পোশাকের ভেতর থেকে সোনার একটা কৌটো বের করে। তার ঢাকনা খুলতেই চোখ ধাঁধিয়ে যায় সবার। মণিটা হাজার সূর্যের মতো জ্বলজ্বল করছে কৌটোটার ভেতর।

অক্রূর এবার মণিটা কৃষ্ণকেই দিয়ে দিতে চায়। বলে, দেখ, মণিটা নিয়ে অশান্তি তো কম হলো না। এখন থেকে তুমিই বরং এটা রাখ।

সঙ্গে সঙ্গে ভাগ চেয়ে বসে বলরাম। আর সত্যভামা বলে, ওটা তার পিতৃধন—তাই ওতে ওরই অধিকার।

কৃষ্ণ কিন্তু রহস্যভেদ করার আনন্দে তখন হাসছে। উদার আনন্দে কৃষ্ণ বলে, না, ওটা রাখার যোগ্যতা আমাদের কারোরই নেই। ওটা থাক অক্রূরেরই কাছে। কেননা আমাদের মধ্যে অক্রূরই একমাত্র নির্লোভ ও সংযমী।

কৃষ্ণের কথার যুক্তি মেনে নেয় সবাই। আর ওই সঙ্গে ধন্য ধন্য করে এমন নিপুণভাবে রহস্যভেদ করার জন্যে। সেই থেকে দ্বারকায় কৃষ্ণের বয়স্যরা তাকে ডাকতে থাকে রহস্যভেদী কৃষ্ণ বলেও।

[কার্তিক ১৩৯৮]

জঙ্গল-বাড়ির রহস্য

সুব্রত মাইতি

লাল টালির ছাউনির বারান্দাওয়ালা ছোটো দোতলা বাড়িটা চোখে পড়তে থমকে দাঁড়াল শিখর। তারপর পকেট থেকে পোস্টকার্ড সাইজের হাতে আঁকা পেন্সিল স্কেচটা বের করে দেখল। মনে মনে ছোটদাদুর তারিফ করল সে। শিখরের খুব অ্যাডভেঞ্চারের শখ। মাঝে মাঝে আবার গোয়েন্দা হতেও সাধ জাগে ওর। কোথাও বেড়াতে গেলে ও সব সময় সঙ্গে একটা ছোট ব্যাগ রাখে যার মধ্যে থাকে ক্যামেরা, টর্চ, ছুরি, দড়ি, কম্পাস ও আরও নানা টুকিটাকি জিনিস। সব সময় ওর মাথায় নানারকম পরিকল্পনা ঘুরঘুর করে।

এবার পুজোর ছুটিতে বাড়ির সবাই দার্জিলিং বেড়াতে যাচ্ছে। কিন্তু ট্যাক্সি করে স্টেশনে গিয়ে ট্রেনের রিজার্ভ সিটে বসে আগে থেকে বুক করা হোটেলে ওঠার মধ্যে অ্যাডভেঞ্চার কোথায়? শুকনো মুখে বসে ভাবে শিখর। তার মনের অবস্থা দেখে হঠাৎ মাথায় একট বুদ্ধি খেলে যায় ছোটদাদুর। ওনার ছবি আঁকায় খুব নাম। সারা বছর দেশের এখানে-ওখানে, এমনকি দেশের বাইরেও ছোটদাদুর ছবির প্রদর্শনী হয়। বিভিন্ন কাগজে সে সবের আলোচনা বেরোয়। ঝট করে একটা ছবি এঁকে ফেললেন দাদু। তারপর দুটো কাগজে কি লিখে আলাদা খামে ভরে মুখ আঠা দিয়ে সেঁটে দিলেন। একটার ওপর শিখরের নাম লিখলেন। অন্যটার ওপর লিখলেন, কল্যাণ সরকার। তারপর বললেন, 'তোর জন্য দারুণ এক অ্যাডভেঞ্চারের ব্যবস্থা করেছি। এই যে ছবির বাড়িটা, এটা আমার বন্ধু কল্যাণ সরকারের। আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগে ওর এই বাড়িতে ছিলাম সপ্তাহ দুই। ট্রেনে ঝাড়গ্রাম পৌঁছে বাস ধরে প্রায় দেড় ঘণ্টার পথ মল্লিকপুর। স্টপেজে নেমে দেখবি শাল জঙ্গলের ভেতর দিয়ে দক্ষিণে চলে গেছে একটা লরি ঢোকার মতো চওড়া রাস্তা। ঐ রাস্তা ধরে দু'আড়াই কিলোমিটার এগুলে একটা বাঁকের মাথায় সাধারণ পায়ে চলা পথ এঁকেবেঁকে জঙ্গলে ঢুকে গেছে। ঐ রাস্তায় সামান্য কিছুটা গেলেই চোখে পড়বে এই ছবির মতো বাড়িটা। মনে রাখিস বড় রাস্তাটা যথেষ্ট আঁকাবাঁকা এবং অনেকগুলো পায়ে চলা পথ বিভিন্ন জায়গায় ওটার থেকে জঙ্গলে ঢুকে গেছে। বাস স্টপেজ থেকে শুরু করে বাকি রাস্তাটা কিন্তু খুব নির্জন। কাউকে জিজ্ঞেস করে যে সঠিক পথ খুঁজে পাবি, সে উপায় নেই। নিতান্তই যদি অসুবিধেয় পড়িস তাহলে তোর নাম লেখা খামটা খুলে দেখিস, ভেতরে সব হাল-হদিস লেখা আছে। তবে খামটা না খুলে ফেরত আনাটাই তোর ক্রেডিট। সঙ্গের খামটা কল্যাণের হাতে দিস। ওতে তোর পরিচয় জানিয়ে চিঠি লেখা আছে। অবশ্য তোকে এই অ্যাডভেঞ্চারে পাঠিয়ে একটু দুশ্চিন্তা থেকেই যাচ্ছে। বহু বছর কল্যাণের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। এই সময় যদি ঐ বাড়িতে কেউ না থাকে! সে রকম পরিস্থিতিতে ঝাড়গ্রাম ফেরার বাস পাওয়া গেলে তো ভালোই নাহলে মল্লিকপুরে ফিরে এসে রাতটা কোনোরকমে কোথাও ম্যানেজ করে পরের দিনই বাড়ি ফিরে আসতে হবে কিন্তু। আর যদি ভালোভাবে পৌঁছে কল্যাণের দেখা পাস, তাহলে ওকে লিখে দিয়েছি একটা টেলিগ্রাম করে দিতে। তোর খবর পাওয়ার পরই আমরা নিশ্চিন্তে দার্জিলিং যেতে পারব।'

হাতের ছবির সঙ্গে বাড়িটা মেলাল শিখর। ছোটদাদুর স্মৃতিশক্তি কি দারুণ তীক্ষ্ণ! দশ বছর আগে থেকে গেছেন এই বাড়িতে তবু কি সঠিকভাবে এঁকেছেন বাড়িটা। দোতলা বাড়ি। বোঝা যাচ্ছে উপরে দুটো রুম, নিচে দুটো। বারান্দায় লাল টালি। বাড়ির সামনে সিঁড়ির একপাশে একটা তুলসিমঞ্চ। শিখর

যেখানে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে একটা সরু ইঁট বিছানো রাস্তা গিয়ে শেষ হয়েছে সিঁড়ির কাছে। রাস্তার একদিকে একটা বাঁধানো কুয়ো। অন্যদিকে ছোট্টো বাগান। অযত্নে আগাছায় ভর্তি। হাতের ছবিটার সঙ্গে কি সুন্দর মিলে যাচ্ছে সবকিছু। ঠিক যেন ছোটদাদু এখুনি এটা এখানে বসে দেখে দেখে এঁকেছেন। শিখরের অনুসন্ধানী মন সক্রিয় হয়ে ওঠে। নাঃ কিছু একটা ভুল বের করে ছোটদাদুকে হারিয়ে দিতে হবে। খুব মনোযোগ দিয়ে ছবির সঙ্গে দৃশ্যটা মেলাল সে। তারপর একসময় চমকে উঠে নিজের মনে ফিসফিসিয়ে বলে, 'পেয়েছি, পেয়েছি।' সবটাই ঠিকঠাক মিলে যাচ্ছে কেবল ঐ সিমেন্টের তুলসিমঞ্চটা ছাড়া। এটা বেঢপ চেহারার। দাদুর ছবিটার তুলনায় বেশ ছোট এবং চওড়া। তার থেকে বড় কথা, ছবিতে তুলসিমঞ্চের গায়ে একটা 'ওঁ' লেখা। কিন্তু সত্যিকারের মঞ্চে তো তা নেই। আচ্ছা এমন তো হতে পারে তুলসিমঞ্চটা কোনো কারণে নতুন করে বানাতে হয়েছে! নাঃ তা কি করে হবে! যেখানে বাড়িটাই একটুও বদলায়নি, সেখানে তুলসিমঞ্চটাই বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে কেন! আর যদি হয়ও, সিমেন্ট দিয়ে সারিয়ে নিলেই যথেষ্ট। নতুন করে বানাবার দরকার কি? ছোটদাদুই ভুল করেছেন।

মনে মনে উল্লসিত হয় শিখর আর ঠিক সে সময় দড়াম করে দরজাটা খুলে গেল। একটা হেঁড়ে গলা ভেসে এল, 'কে ওখানে ঘুরঘুর করছে? মতলবটা কি অ্যাঁ?' বলতে বলতে একটা দশাসই চেহারার লোক বেরিয়ে এল। পরনে লুঙ্গি। ওপরে একটা হাতকাটা গেঞ্জি। মিশমিশে কালো লোকটার চোখ দুটো ঘোর লাল। মুখে কাঁচা-পাকা না-কামানো দাড়ি। সাহস করে পা বাড়াল শিখর। তারপর সরকারদাদুর নাম লেখা চিঠিটা এগিয়ে দিল। চিঠিটা হাতে নিয়ে হতভম্বভাবে একবার শিখরের দিকে, একবার চিঠিটার দিকে তাকাল লোকটা। তারপর ফস্ করে খাম ছিঁড়ে পড়তে শুরু করল।

মনে মনে খুবই বিরক্ত হয় শিখর। একি বিচ্ছিরি অভ্যেস, অন্যের চিঠি খুলে পড়া! এ লোকটা যে সরকারদাদু নয় তা হলফ করে বলতে পারে সে। ছোটদাদুর কাছে কত গল্প শুনেছে সরকারদাদুর। উনি নাকি বেশ ফর্সা, লম্বা চেহারার, মুখে মিষ্টি হাসি লেগেই আছে। দিনরাত বই পড়েন, আর অবসর সময়ে সেতার বাজান, ফুলের বাগান করেন। ওনার একমাত্র ছেলে ফ্রান্সে থাকেন।

সে একটু উঁচু গলায় বলে, 'শুনছেন, সরকারদাদু কোথায়?'

আবার চমকায় লোকটা। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর খপ্ করে ওর হাতটা চেপে ধরে বলে, 'ভেতরে এসো।'

শিখর অনুভব করে এ কেবল সৌজন্যবোধে তার হাত ধরা নয়। বরং বেশ জোরেই চেপে ধরে রেখেছে। যেন সে সরকারদাদুর সঙ্গে দেখা না করে পালিয়ে যেতে না পারে!

দোতলার একটা ঘরে ওকে এনে বসাল লোকটা। তারপর বেরিয়ে গেল। শিখর হাতের ব্যাগটা রেখে ঘুরে ঘুরে ঘরটা দেখে। ঐ তো বুড়ো মতো একজনের ছবি। চোখে চশমা, হাসিমুখ, মাথায় পাকা চুল। ঠিক মিলে যাচ্ছে ছোটদাদুর বর্ণনার সঙ্গে। ঘরের একপাশে একটা বিশাল পালঙ্ক। পালিশ নষ্ট হয়ে কালো হয়ে গেছে। পালঙ্কের কাঠের ওপর আঙুল বোলায় শিখর। বেশ কিছুটা ধুলো উঠে আসে। তার মানে এই ঘর বহুদিন ব্যবহার করেনি কেউ। ঘরের অন্য দিকে দুটো বিরাট আলমারি। দুটোই বই-এ ঠাসা। ছোটদাদুর কাছে শুনেছে শিখর, সরকারদাদুর বই-এর দারুণ নেশা। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে প্রত্যেক হপ্তাতেই কিছু না কিছু বই কেনার অর্ডার দেন উনি। আচ্ছা এটা যদি সরকারদাদুর শোয়ার ঘর হয়, তাহলে পালঙ্কের ওপর এত ধুলো কেন? পাশে একটা টেবিল। ওটার ওপরেও কিছু বই-খাতা। সব ধুলোয় ভর্তি। একটা দেরাজ অল্প খোলা। একটু টেনে দেখল শিখর, দেরাজটা খালি। ভেতরের বেশ কিছুটা জায়গায় ধুলো। যেন বহুদিন এভাবে আধখোলা হয়ে আছে। আলমারি দুটোর কাছে গেল সে। বইগুলো দেখল। অধিকাংশ বই-এর নামও শোনেনি সে। তবু যে বইগুলো নতুন বলে মনে হলো, চটপট সেগুলো বের করে দু'এক পাতা উল্টে তাদের প্রকাশের তারিখ দেখে নিল সে। সব থেকে কাছাকাছি সময়ের যে তারিখগুলো পাওয়া গেল তা আজ থেকে প্রায় পাঁচ বছর আগের। তাহলে কি আজ থেকে পাঁচ বছর আগেই সরকারদাদুর বই পড়ার শখ উবে গিয়েছে? অথবা অন্য কোনো ঘরে

আর একটা লাইব্রেরি আছে যা গত পাঁচ বছরের কেনা বইতে সাজানো? কিন্তু পাল্লার ফাঁক দিয়ে ধুলো ঢুকে এই দুটো আলমারির বইগুলো নোংরা হয়ে আছে। যিনি বই ভালোবাসেন তিনি এটা সইবেন কেন?

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। একটু সরে এসে ইতস্তত করে ধুলোয় ভর্তি পালঙ্কে বসল শিখর। সেই হেঁড়েমুখ লোকটা ঘরে এল। বলল, 'বারান্দার ঐ কোণে বাথরুম আছে। হাতমুখ ধুয়ে নাও। তোমার চা আসছে'। তারপর শিখরের সপ্রশ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে একটু চোখ নামিয়ে বলল, 'সরকারবাবু বাজারে বেরিয়েছেন। একটু পরেই আসবেন।' গলাটা কি একটু কেঁপে গেল লোকটার?

বাথরুম থেকে ফিরে শিখর দেখল পালঙ্কের ওপর নতুন চাদর বিছিয়ে দিয়েছে কেউ। টেবিলটাও মোছা। ওপরে এক গ্লাস জল। একটা প্লেটে কিছু লুচি, বেগুন ভাজা, মিষ্টি। দারুণ ক্ষিদে পেয়েছে শিখরের। মিষ্টিগুলো চিনির ডেলার মতো বিচ্ছিরি। তাও চেটেপুটে খেল সে। এরপর কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল ঘরে।

ক্রমশ বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে। কোথাও কোনো মানুষ-জনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। আস্তে আস্তে বারান্দায় এল সে। বাড়িটার চারদিকেই শাল জঙ্গল। অদ্ভুত নিস্তব্ধ। ওদিকের ঘরটার দিকে গেল শিখর। ঘরটায় শেকল দেওয়া। তালা ঝুলছে। কিন্তু দেখে মনে হলো নিয়মিত ব্যবহার হয়। জানালাগুলো বন্ধ। একটা জানালার পাল্লা একটু ঠেলতে হঠাৎ খুলে গেল ওটা। সে দেখল ভেতরে অনেকগুলো বস্তা স্তূপ করে রাখা। সমস্ত দেওয়ালে ঝুল-কালি। একপাশে দড়ি খাটিয়ে কয়েকটা তেল চিটচিটে লুঙ্গি আর গামছা শুকোতে দেওয়া হয়েছে। অবাক হয় শিখর। সরকারদাদুর রুচির যে পরিচয় সে পেয়েছে তার সঙ্গে যেন এসব খাপ খায় না। জানালা থেকে চোখ সরিয়ে এনে চমকায় শিখর। সে দেখে সেই হেঁড়েমুখ লোকটা বারান্দার ও প্রান্ত থেকে তীব্র চোখে তাকে দেখছে।

সন্ধ্যার পর শিষ ওঠা হ্যারিকেন টেবিলে রেখে গেল একজন মাঝবয়সী লোক। এরও পরনে লুঙ্গি আর গেঞ্জি। মাথায় আবার টিকি। একটা বই খুলে পড়তে চেষ্টা করল শিখর। ভালো লাগল না। একটু রাত হতেই ঐ ঘরে তার জন্য রাতের খাবার আনা হলো। পরোটা, ডাল আর আলুর তরকারি। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হো হো করে হাসতে হাসতে এলেন এক বৃদ্ধ। পরনে ধুতি, খালি গা, মাথায় টাক। এসেই একটা চেয়ার টেনে বসে চোখ মটকে বললেন, 'কি নাতি, কখন আসা হলো, তোমার দাদুর খবর ভালো তো?' তারপর অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকা শিখরকে রহস্য করে বললেন, 'চিনতে পারছো না তো? আমি তোমার দাদুর বন্ধু কল্যাণ সরকার।'

বিস্ময়ে গলা দিয়ে স্বর বেরোতে চাইছে না শিখরের। সে বুঝল পাড়ার থিয়েটারে যেমন লোকে রাজা, মন্ত্রী সাজে, এ তেমনই একজন সেজে আসা কেউ। শুধু অভিনয়টা একদম জানে না। কি করে সে বিশ্বাস করবে এই অমার্জিত চেহারা ও গ্রাম্য রসিকতা করা লোকটি দারুণ পণ্ডিত, ওস্তাদের মতো সেতার বাজান! ভাবতে ভাবতে তার চোখ দুটো দেওয়ালের ছবিটার দিকে চলে গেল। তা দেখে সামনে বসা লোকটার মুখ কালো হয়ে গেল। সে দড়াম করে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আচ্ছা খেয়ে নাও। পরে কথা হবে।' দুপদাপ করে হেঁটে চলে গেল লোকটা। শিরশিরিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত যেন শিখরের শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল। সে বুঝতে পারে একটা বিপদের মধ্যে এসে পড়েছে।

মুখ-হাত ধুয়ে দরজায় খিল দিয়ে পালঙ্কে এসে বসল শিখর।

চারিদিকে রাত্রির অরণ্যের থমথমে ভাব। ঝিঁঝি পোকার শব্দ। জানালা দিয়ে দেখা যায় গাছের ফাঁকে ফাঁকে জোনাকির উড়োউড়ি। সমস্ত গাছ-গাছালির ওপর যেন একটা হাল্কা কুয়াশার প্রলেপ। অনেক, অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে ব্যাগটা হাতড়ে কাছে এনে চেন খুলে ছোট্টো টর্চ বের করল শিখর। হাতঘড়িটা দেখল। রাত দুটো। পা টিপে টিপে দরজার কাছে এল সে। কান পেতে থাকল কিছুক্ষণ, কোনো শব্দ শোনা যায় কিনা, তারপর খিল খুলে বেরিয়ে এল। বারান্দা দিয়ে হেঁটে এসে সিঁড়ির মুখের দরজায় চাপ দিল শিখর। নিচ থেকে বন্ধ। এটাই আশা করছিল সে। দোতলা বাড়িটা এমনভাবে তৈরি, এই দরজাটা বন্ধ করে দিলে আর কোনোভাবে নামা বা ওঠার পথ নেই। বিকেলেই ভালো করে দেখেছে

শিখর। ছাদের জলের পাইপগুলোও থামের ভেতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সম্ভবত চোর-ডাকাতের ভয়ে। ঘরে ফিরে ব্যাগ হাতড়ে নাইলনের গিঁটওয়ালা দড়িটা বের করল সে। তারপর বারান্দার থামের সঙ্গে বেঁধে নিচে ঝুলিয়ে দিল। টর্চটা দাঁতে কামড়ে আস্তে আস্তে নামতে শুরু করল শিখর।

চওড়া রাস্তাটায় পৌঁছে শিখরের খুব মন চাইল মল্লিকপুরের দিকে ছুট দিতে। কিন্তু সে বুঝল তা করতে গেলেই ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। যদি লোকগুলো জানতে পারে তাহলে ওরা ওদিকেই ধাওয়া করবে। কখন বাস পাওয়া যায় তা-ই তো জানে না সে। সুতরাং উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করল শিখর। প্রায় এক ঘণ্টা হাঁটার পর সে দেখল একটা ছোটখাটো বাজার।

কিছুটা গিয়েই শিখর দেখল একটা কাঠের গেটের ওপর কাচের বাক্সে টিমটিমে বাতি জ্বলছে। কাচের ওপর লাল কালি দিয়ে লেখা—থানা। গেট খুলে ভিতরে ঢুকল সে।

শিখরের কাছে সব শুনে হো হো করে হাসলেন দারোগাবাবু। বললেন, 'ঐ বাড়িতে তো শর্মারা থাকে। ওরা নিম, মহুয়া ইত্যাদির ব্যবসা করে। তোমার সঙ্গে মজা করেছে ওরা। তোমার দাদু জানেন না আজ থেকে পাঁচ বছর আগে কল্যাণ সরকার মশাই সন্ন্যাস নিয়ে এখান থেকে চলে গেছেন। যাওয়ার আগে এই বাড়িটা শর্মাদের দান করে গেছেন। একসময় বোধহয় কিছু আর্থিক সমস্যায় পড়েছিলেন, তখন একতলাটা শর্মাদের ভাড়া দিয়েছিলেন। নিয়মিত ভাড়া দেওয়া ছাড়াও নানা উপকার করত ওরা সরকারবাবুর। তাই হয়তো সন্ন্যাস নিয়ে চলে যাওয়ার সময় ভালোবেসে ওদের বাড়িটা উপহার দিয়ে গিয়েছেন উনি।

'না দারোগাবাবু', অনুনয়ে ভেঙে পড়ে শিখর, 'আমার ধারণা কোনো বড় ধরনের গোলমাল আছে। হয়তো.....হয়তো কেন নিশ্চয়ই সরকারদাদুকে মেরে ফেলেছে কেউ।'

'বলছো কি হে ছোকরা?' দারোগাবাবু খাড়া হয়ে বসেন। 'প্রমাণ করতে পারবে?'

'মনে হচ্ছে পারবো, কিন্তু তার আগে লোকগুলোকে ধরে ফেলতে হবে। আমাকে না দেখতে পেলেই হয়তো পালাবে ওরা।'

'বেশ দেখছি কি করা যায়!'

ভোর হওয়ার আগেই নিঃশব্দে বাড়িটা ঘিরে ফেলা হলো। লোকগুলো তখনো নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিল। তাই সহজেই ধরা গেল। সেই হেঁড়েগলা লোকটা ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'হয়েছেটা কি দারোগাবাবু? এত রাতে মস্করা শুরু করলেন নাকি?'

দারোগাবাবু ঠেলে শিখরকে সামনে এগিয়ে দিলেন। 'একে চেনো?'

হাঁ করে বড়বড় চোখে ওর দিকে দেখে লোকটা। মাথা নেড়ে না বলতে গিয়েও খাবি খাওয়া গলায় বলে, 'হ্যাঁ, চিনি।'

'কে বল তো?'

মুখ দিয়ে কথা সরে না লোকটার।

সবাইকে আটকে দারোগাবাবু বললেন, 'এবার বলো হে শিখরবাবু তোমার প্রমাণ কোথায়? নাহলে বুঝেছ তো যা ঝামেলায় ফেললাম এজন্য শর্মারা আমাকে ছাড়বে না।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন,' শিখর অল্প অল্প হাসে। বলে, 'এবার কয়েকটা গাঁইতি আর বেলচা নিয়ে কাজে লাগতে হবে। তুলসিমঞ্চটা ভাঙতে হবে।'

তুলসিমঞ্চের ভিত খুঁড়ে তুলতে পাওয়া গেল কঙ্কালটা। তখনো আঙুলে আংটি, গলায় একটা সরু সোনার চেন। হেঁড়েমুখ লোকটা ততক্ষণে নেতিয়ে পড়েছে। আর সেই দাদু-সাজা বুড়োটা হেঁড়েমুখের দিকে আঙুল তুলে হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, 'আমি কিছু জানি না গো.....ঐ দুর্যোধন ব্যাটাই তো খুন করে গুম করল গো....ওর পাপে আমরা সবাই মরলুম গো.....।'

বিকেল চারটে নাগাদ বাড়ি ফিরল শিখর। ওকে দেখে বাড়ির সবাই হৈ হৈ করে উঠল। কেউ বলে,

'ঠিক ট্রেনে উঠেছিলি তো?' কেউ বলে, 'নিশ্চয়ই সারারাত জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছিস। চোখ, মুখ আর পোশাকেই অবস্থা দেখেই বোঝা যাচ্ছে।' তারপর শিখরের মুখে সব শুনে এ ওর ওপর গড়িয়ে পড়ে আর কি! ছোটদাদু তো ঠাট্টা করে বলেই ফেললেন, 'নাঃ, শিখরবাবু এবার বাস্তবের গোয়েন্দা না হয়ে কল্পনার গোয়েন্দা হয়েছেন।'

সবার অবিশ্বাসের হাসি কিন্তু মিলিয়ে গেল যখন পরের দিন সকালেই একদল রিপোর্টার এবং ফটোগ্রাফার এসে পৌঁছোলেন বাড়িতে। একটু পরেই এলেন টিভির লোকজন। শুধু বাড়িতে নয়, গোটা পাড়ায় হৈচৈ শুরু হলো। এরপর কতো ফটো, কতো প্রশ্ন। বাড়ির লোকেরা তো বিশ্বাসই করতে পারছে না ব্যাপারটা। সেদিন রাতের খবরে শিখরের ছবি দেখানো হলো টিভিতে। একদিনেই শিখর গোটা এলাকার হিরো হয়ে গেল। রাতে শুতে যাওয়ার সময় ছোটদাদুকে ফিসফিস করে বলল শিখর, 'যে যাই বলুক সব কৃতিত্ব কিন্তু তোমার দাদু। আমি তো জানি তোমার চোখ একবার যা নজর করে তা কখনো ভোলে না। তাই তো তোমার স্কেচের সঙ্গে তুলসিমঞ্চটা মিলছে না দেখে প্রথম থেকেই মনের মধ্যে একটা সন্দেহ জন্ম নিয়েছিল।'

[পৌষ ১৪০৪]

সবুজ নটরাজ

সিদ্ধার্থ সেনগুপ্ত

ছাত্রদের কাছে মাস্টারমশাই বা নীলু স্যার। আমার কাছে নীলুদা। বাইরের লোকের কাছে তিনি প্রত্নতত্ত্ববিদ বা আর্কিওলজিস্ট নীলাদ্রি চক্রবর্তী।

ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় তুখোড়। খেলার মধ্যে ক্রিকেট ভালো খেললেও ফুটবল-অন্ত প্রাণ। নীলুদা বলে, 'দুস্, ক্রিকেট আবার একটা খেলা নাকি? সাত ঘণ্টা ধরে দু'দলের এগারোজন করে খেলোয়াড় দাঁড়িয়ে থাকল কখন অপোনেন্ট তার হাতে নাড়ুর মতো বলটা ফেলবে। সে হচ্ছে ফুটবল, সবসময় রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা, অসাধারণ সব গোল, স্বপ্নের মুভমেন্ট—কী নেই!'

আমি বলি, 'তবে আমাদের দেশ এত পিছিয়ে কেন নীলুদা?' নীলুদার অ্যানালিসিসটা এরকম—'আসলে কি জানিস, আমাদের ট্যালেন্ট সার্চটাই গোলমেলে। সত্তরের দশকে এক সাহেব ফুটবলবিশারদ এসেছিলেন আমাদের দেশে। তাঁকে আমাদের ফুটবলের উন্নতির জন্য কিছু বক্তব্য পেশ করতে বলা হয়েছিল। মাসদুয়েক সারাদেশে ঘোরার পর উনি বলেছিলেন যে, ভারতে যদি ট্রাইবালদের নিয়ে ফুটবল টিম করা হয় তাহলে ভারতীয় ফুটবলের উন্নতি অনিবার্য। কারণ কী জানিস? ওদের দম আমাদের থেকে ষোল আনা বেশি, আর ওরা ন্যাচারাল অ্যাথলিট। যেমন সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা বা নর্থ-ইস্টে নাগা বা মিজোদের নিয়ে একটা মিকস্ড ফুটবল টিম তৈরি করা। কিন্তু সে সাহেবকে কেউ বিশেষ পাত্তা দেয়নি, আর তাই আমাদের দেশের ফুটবলও আর বিদেশে পাত্তা পায়নি।'

হঠাৎ নীলুদা একটা ফেলোশিপ পেয়ে চলে গেল আমেরিকায়। একেবারে খোদ স্মিথসোনিয়ন ইন্সটিটিউশনের ডাকে। এক বছরের জন্য। যাবার সময় বলল, 'মনখারাপ করিস না সকু (আমার নাম শাক্যসিংহ, সবাই বলে সকু), দেখতে দেখতে কেটে যাবে। রেগুলার মেল করবি, গিয়েই মেল-অ্যাড্রেস পাঠাচ্ছি।'

নীলুদা আমার পিসতুতো দাদা কিন্তু ছোটবেলা থেকেই আমরা প্রায় একই সঙ্গে মানুষ হয়েছি। আমার পিসেমশাই কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। পিসেমশাই হঠাৎ মারা যান। নীলুদা তখন ছোট, বছর বারো বয়স। নীলুদাকে নিয়ে পিসিমা আমার বাবার কাছে এসে ওঠেন। সেই থেকে নীলুদা আর আমি একসঙ্গে বড় হয়েছি।

আমার বাবা কলকাতার এক নামী দৈনিকের চিফ রিপোর্টার। সেই সূত্রে ছোটবেলা থেকে দেখছি বাড়িতে নানা ধরনের খবরের কাগজের আনাগোনা। আর আমারও ছোট থেকে কাগজ খুঁটিয়ে পড়ার অভ্যাস। এটা অবশ্য আমার মা শিখিয়েছে। মা সবসময় বলে, 'কাগজ টপ টু বটম পড়বে, কিছু মিস করবে না।'

প্রায় মাস ছয়েক হল আমার হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা শেষ হয়েছে। পরীক্ষার প্রায় আড়াই মাস পরে রেজাল্ট বের হতে দেখা গেল আমি ভালোই করেছি। আমার বরাবরই ইতিহাস নিয়ে পড়ার ইচ্ছে। নীলুদার মতো আর্কিওলজিস্ট হবার ইচ্ছা। প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হলাম ইতিহাসে অনার্স নিয়ে। বাবা বলেছিলেন হায়ার সেকেন্ডারিতে রেজাল্ট ভালো হলে একটা কম্পিউটর কিনে দেবেন। প্রায় সাড়ে তিন মাস হল রেজাল্ট বেরিয়েছে, এখনো সেরকম কিছু দেখছি না। হঠাৎ সেদিন কলেজ থেকে ফেরার পর

মা বলল, 'সকু, তোর ঘরের লাইটটা ফিউজ হয়ে গেছে। হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে একটা বাল্ব নিয়ে আয় তো।'

আমি ভালো ছেলের মতো হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে একটা বাল্ব কিনে নিয়ে এলাম। আমার ঘরে ঢুকে দেখি ঘর ঘুটঘুটে অন্ধকার। জানালা সব বন্ধ। এমন তো কোনোদিন হয় না। একটা জানলা তাড়াতাড়ি খুলে দিলাম। খুলতেই বিকেলের একফালি পড়ন্ত রোদ ঘরের খানিকটা আলো করল। হঠাৎ মনে হল আমার টেবিলটা যেন কীরকম অন্য লাগছে। একি! আমার টেবিলের উপর সাদা ধবধবে একটা আস্ত কম্পিউটর। আমার সারা শরীরে আনন্দের শিহরন খেলে গেল। হোওয়াট এ সারপ্রাইজ। আমি 'মা-অ-আ' বলে ঘর থেকে ছুটে বেরোতেই দেখি মা বাইরে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে।

'কিরে কেমন সারপ্রাইজ দিলাম। এটা তোমার ভালো রেজাল্ট করার জন্য। তোমার বাবা তলে-তলে সব ব্যবস্থা করেছেন, আমায় কিছুই বলেননি, আজকে সকালে জানতে পারলাম।'

আমার তখনকার অবস্থাটা ঠিক ভাষায় বোঝানো যাবে না। আমি দৌড়ে মাকে জড়িয়ে ধরলাম, চোখে আমার আনন্দাশ্রু।

বাবা অফিস থেকে ফিরতেই বাবাকে প্রণাম করলাম। বাবা বলল, 'সকু, শুধু ইন্টারনেট কানেকশানটা বাকি আছে। ওটার ব্যাপারে আমাদের অফিসের যে সফটওয়ার ইনচার্জ তাকে আমি বলেছি। দু-চার দিনের মধ্যে কেউ এসে ওটা করে দেবে।'

দু'দিনের মধ্যে ইন্টারনেট কানেকশন এসে গেল। এরই মধ্যে আমি নীলুদার ই-মেল অ্যাড্রেসটা পেয়ে গেছি।

নীলুদা লিখেছে, এখানে খুব খাতির করছে। সবাই ভীষণ সিস্টেম্যাটিক। ছবির মতো ইন্সটিটিউট। মিউজিয়ামটা বিশাল, একদিনে দেখা সম্ভব নয়। আমাদের দেশের প্রচুর শিল্প আছে। যদিও ওরা যথেষ্ট যত্নবান তবুও মনে হয় হয়তো আমাদের নিজের দেশে ওগুলো থাকলে ভালো হত। নীলুদা আরও লিখেছে—এখানকার সাউথ এশিয়ান সেকশানের কিউরেটর একজন বাঙালি। অত্যন্ত পণ্ডিত লোক, নাম বিক্রমাদিত্য রায়। স্মিথসোনিয়ান ইন্সটিটিউশনের একজন স্তম্ভ। ভীষণ বিনয়ী ও সদাহাস্যময়। আজ এখানেই শেষ করলাম। শুয়ে পড়, কাল আবার রাতে (আমাদের সকাল) মেল করব।

আমি ভীষণ উত্তেজিত, এক তো নিজস্ব কম্পিউটর পেয়েছি। দ্বিতীয়ত নীলুদার সঙ্গে রেগুলার ই-মেলে যোগাযোগ রয়েছে। এটা আমার কাছে টনিকের মতো কাজ করে।

আজ রবিবার, বাবার ছুটি। ছুটির দিন সকালে বাবা প্রায় দু-আড়াই ঘণ্টা ধরে খবরের কাগজগুলো পড়ে। তখন কারুর বাবাকে ডিসটার্ব করার অধিকার নেই। কলেজ স্ট্রিটের পুরোনো বইয়ের দোকান থেকে একটা খুব রেয়ার বই পেয়ে গিয়েছিলাম—এ. কে. নারায়ণ-এর লেখা 'দি ইন্দো-গ্রিকস'। অসাধারণ বই। সেটাই খাটে বসে-বসে পড়ছিলাম, এমন সময় বাবা ডাকল, 'সকু, সকু, একবার নীচে আয় তো।'

বাবা ড্রইংরুমে বসে কাগজ পড়ে। দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আমি সঙ্গে সঙ্গে হাজির। বাবার সামনে দাঁড়াতেই বাবা 'এশিয়ান এজ' কাগজটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'দেখ, এই খবরটা পড়েছিস?' বাবার আঙুলটা কাগজের যে জায়গায় সেখানে দেখলাম লেখা আছে 'রেয়ার এমারেল্ড স্ট্যাচু স্টোলেন।' এমারেল্ড মানে তো পান্না, পান্না বসানো আস্ত একটা মূর্তি। এ আবার হয় নাকি!

কাগজে লিখেছে—মাসখানেক আগে তামিলনাড়ুর শিবগঙ্গা জেলা থেকে একটি সাড়ে তিন ফুট উচ্চতার পান্না বসানো নটরাজ মূর্তি খননকার্যের সময় পাওয়া যায়। মূর্তিটি পাণ্ড্য রাজবংশের সময়কার অনুমান করা যায়। তারপর সেটিকে মহাধুমধাম সহকারে চেন্নাই মিউজিয়ামে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। পরশু মিউজিয়াম বন্ধ করার পর যখন গতকাল সকালে খোলা হয় তখন দেখা যায় যে মূর্তিটি তার স্থান থেকে গায়েব হয়েছে। কে বা কারা নিয়েছে এ ব্যাপারে পুলিশ এখনো কিছু বার করতে পারেনি। সি বি আই-কে খবর দেওয়া হয়েছে এবং রাজ্য ও রাজ্যের বাইরে সমস্ত এয়ারাপোর্টগুলোতে

রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে যাতে কেউ যেন মূর্তিটি দেশের বাইরে না নিয়ে যেতে পারে। মূর্তিটির আনুমানিক মূল্য আন্তর্জাতিক বাজারে প্রায় পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার।

খবরটা পড়ে আমি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছি। বাবা আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'কিরে কী বুঝলি? মূর্তিটার দাম আমাদের টাকায় কত হবে বল তো? একটা ছোটখাটো পাওয়ার প্ল্যান্ট হয়ে যায় ঐ টাকায়। সেই দামের মূর্তি কিনা একটা স্টেট মিউজিয়াম থেকে চুরি হয়ে গেল! নিশ্চয় ভেতরের লোকের হাত আছে।'

আমি শুধু মাথা নাড়লাম। রাগে-দুঃখে আমার মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছে না। নীলুদাকে খুব মিস করছি। ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে আমার মনে হয় ঐতিহাসিক জিনিস রক্ষণাবেক্ষণের একটা ভগ্নাংশ দায়িত্ব যেন আমাদের উপরেও আসে আর সেই জন্যই এত যন্ত্রণা। রাতে ঘরে গিয়ে মেল চেক করলাম: নীলুদা একটা পাঠিয়েছে, লিখেছে—ভালোই আছি। আমাদের যেমন দিল্লির ন্যাশনাল মিউজিয়াম বা কলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, সেরকম কুড়িটা মিউজিয়াম মিলে একটা স্মিথসোনিয়ান ইন্সটিটিউশান। ১৮৪৬ সালে তৈরি, জেমস স্মিথসন বলে এক ধনী ব্রিটিশ কেমিস্ট কাম মিনারলজিস্ট-এর দেওয়া টাকায়। এরপরে লিখেছে—মাসে ২০০০ ডলার রিসার্চ অ্যালাওন্স দিচ্ছে। ভাবছি ছুটি পেলে একটু এদিক-ওদিক ঘুরব। মেন বিল্ডিংটাকে বলে 'দি কাস্‌ল', ওটাই সবচেয়ে পুরোনো। কী সুন্দরভাবে নিজের দেশের এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো যত্ন করে রেখেছে। ভাবলে অবাক লাগে। ভালো থাকিস। নীলুদা।

তার মানে এখনো ওখানে খবর পৌছোয়নি। আমি চটপট মেলবক্সে কম্পোজ খুলে নীলুদাকে মেল করলাম—নীলুদা, এইমাত্র তোমার মেল পেয়েছি। তবে এখানে এক সর্বনাশ কাণ্ড ঘটেছে। চেন্নাইয়ের মিউজিয়াম থেকে সাড়ে তিন ফুট উঁচু নটরাজের মূর্তি চুরি গেছে। মূর্তিটা আগাগোড়া পান্না বসানো। তুমি তাহলে এবার ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে এর দামটা আন্দাজ করতে পারছ? আমার মনে হচ্ছে মূর্তিটা আমেরিকাতে পাচার হবার চান্স বেশি কেননা আমাদের দেশে বা ইউরোপে এত দাম দিয়ে কেনার মতো লোক কেউ নেই। একটু চোখ-কান খোলা রেখো। কোনো খবর পেলে আমাকে জানিও। উদ্বিগ্ন থাকলাম।

ইতি সকু।

রাতে ভালো করে ঘুমোতে পারলাম না। তিনবার উঠে বাথরুমে গেছি। শেষবার ভোর চারটের সময়। তখন একবার মেলবক্সটা খুলে দেখলাম। না, কোনো উত্তর নেই। মনটা খারাপ হয়ে গেল। তাহলে কি নীলুদা আর মেলবক্স খোলেনি? ভোরবেলা ঘুমিয়ে পড়েছি হঠাৎ দেখি মা ডাকছে, 'এই সকু, তোর ফোন, নীলু করছে, তাড়াতাড়ি ধর।' ধড়মড় করে উঠে ছুটলাম ফোন ধরতে।

ফোনটা ধরতেই ওপারে নীলুদার গলা, 'তোর মেল পেয়েছি। কালকে একটু ব্যস্ত ছিলাম বলে ঠিক সময়মতো খবরটা পাইনি। যা বলছি মন দিয়ে শোন, দরকার হলে কাগজ-কলম নিয়ে লিখে নে।' আমি বাবার প্যাড থেকে কাগজ নিয়ে বসলাম। 'হ্যাঁ, বলো নীলুদা।' 'ভালো করে শোন, চেন্নাই মিউজিয়ামের কিউরেটর মিঃ অরবিন্দ স্বামীনাথন আমার বিশেষ বন্ধু, আমি তাকে অলরেডি মেল করেছি। তুই আমার রেফারেন্স দিয়ে তাঁকে মেল কর, আসকিং ফর এভরি ডিটেলস রিগার্ডিং দিস বার্গলারি। তারপর আমাকে ডিটেলস জানা। খবরের কাগজে এই সম্বন্ধে কোনো খবর থাকলে আমাকে জানাস। সাবধানে থাকিস। ছাড়লাম।' রিসিভারটা রাখার পরে যেন ধড়ে প্রাণ এল। যাক, নীলুদা যখন ব্যাপারটা জেনেছে তখন একটা কিছু সূত্র বের হবেই।

মুখ ধুয়ে কোনোরকমে ব্রেকফাস্ট সেরে প্যাডের কাগজটায় স্বামীনাথনের মেল অ্যাড্রেসটা দেখলাম—এ স্বামীনাথন @ ভি এস এন এল ডট কম। সোজা নিজের ঘরে এসে কম্পিউটার খুলে স্বামীনাথনকে মেল করলাম। ঠিক নীলুদা যেভাবে বলেছে সেইভাবে। এবার প্রতীক্ষার পালা। ঘণ্টায়

ঘণ্টায় শুধু মেলবক্স চেক করছি, কিন্তু কোথায় কী! স্বামীনাথনের মেলের টিকিও দেখা যাচ্ছে না। অগত্যা দেড়টার সময় খিদের টানে ভাত ডাল তরকারি গলাধঃকরণ করে এসে আবার মেশিনের সামনে। ইউ হ্যাভ ওয়ান আনরেড মেসেজ—কম্পিউটরের স্ক্রিনে লেখাটা ভেসে উঠতেই সারা শরীরে উত্তেজনা। সঙ্গে সঙ্গে ইনবকসে ক্লিক করলাম—ফ্রম এ স্বামীনাথন @ ভি এস এন এল ডট কম টু—শাক্যসিংহ চৌধুরী @ ইয়াহু ডট কো ডট ইন.....

তোমার মেল পেয়েছি। ব্যস্ত ছিলাম বলে ঠিক সময় উত্তর দেওয়া হয়নি। নীলাদ্রির মেলও পৌঁছেছে। এখানে ভয়ানক অবস্থা, সবাই সবাইকে সন্দেহ করছে। আরও মুশকিল হয়েছে যে, নটরাজের মোটে একটি ফোটোগ্রাফ আমাদের কাছে মজুদ। আসলে ঘটনাটি যে এত দ্রুত ঘটবে কেউ ভাবতে পারেনি। ইন্সটল করার পর আমাদের নিয়ম হচ্ছে মূর্তির অন্তত দশ-বারোটা ছবি বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে তুলে রাখতে হয় ভবিষ্যতের জন্য। কিন্তু চোর সেই সুযোগটুকুও দেয়নি আমাদের। আমরা পুরো বোকা বনে গেছি। সি বি আই কেসটা হাতে নিয়েছে। বিভিন্ন বর্ডারে খবর দেওয়া হয়েছে। কোনো সন্দেহজনক ব্যাপার দেখলে সঙ্গে-সঙ্গে ওরা জানাবে। মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব ও জম্মু-কাশ্মীরের পুলিশকে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। আরও কিছু ডেভেলপমেন্ট হলে জানাব। নীলাদ্রিকে বিস্তারিত ভাবে তুমি জানিয়ে দিও।—অরবিন্দ স্বামীনাথন।

আমি সঙ্গে-সঙ্গে স্বামীনাথনকে মেলব্যাক করলাম—আমাকে নটরাজের ছবিটা স্ক্যান করে পাঠান।

বিকেলের মধ্যে স্বামীনাথনের কাছ থেকে স্ক্যান করা নটরাজের ছবি এসে গেল। ব্লাক অ্যান্ড হোয়াইট ছবি, তবে পরিষ্কার। নটরাজের নৃত্যরত ভঙ্গিমা, পেছনের অগ্নিবলয়টা নেই। চুলও খোলা নয়। তবে চোখ-মুখ ধারালো। অসাধারণ কারুকার্য। যে মূর্তিটা তৈরি করেছিল তার প্রোপোরশন জ্ঞান নিখুঁত।

ছবিটাকে কপি করে মেল করলাম। স্বামীনাথন যা-যা বলেছে সেই তথ্যগুলো দিয়ে। রাত্তিরে নীলুদা আমাকে মেলব্যাক করল—তোর পাঠানো ছবি আর ডিটেলস পেয়েছি। আমি এখানকার বড়-বড় অকশান হাউসগুলোর ইভেন্টের উপর নজর রাখছি। ওদিকে আর কোনো খবর থাকলে জানাস—নীলুদা।

পরের দিন আর কারুর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। নীলুদাও চুপচাপ, স্বামীনাথনও কিছু পাঠায়নি। কলেজ থেকে ফিরে বিকেলে খেয়ে-দেয়ে হাত-মুখ ধুয়ে কম্পিউটরের সামনে বসলাম। মেলবক্স খুলতেই দেখি স্বামীনাথনের মেসেজ—শাক্য, একটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা ঘটেছে। রাজস্থান বর্ডারে একজন মূর্তি-পাচারকারী ধরা পড়েছে, কিন্তু তার কাছে যেগুলো পাওয়া গেছে সেগুলো সবই নকল। লোকটার নাম ভিসামল। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছে। আমাদের লোক রাজস্থান রওনা হয়ে গেছে।

আমি পুরো ই-মেলটা কপি করে নীলুদাকে পাঠিয়ে দিলাম।

দু'দিন পরে স্বামীনাথনের মেল এল—আমাদের এক্সপার্টরা রাজস্থান গিয়ে দেখে মূর্তিগুলো সব আলকাতরার তৈরি। তাই প্রমাণের অভাবে লোকটাকে ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আমি নীলুদাকে মেল করে সব জানালাম।

রাত্তিরে শুয়ে-শুয়ে ভাবছি পান্নার নটরাজ এখন কোথায়। হয়তো আমাদের দেশ ছেড়ে সুদূর কোন দেশে, যেখানে কিছু অর্থলোলুপ দালাল ওটা বেচবে কোনো আমেরিকান বা ইউরোপিয়ান কোটিপতির ড্রইংরুমে শোভাবর্ধনের জন্য। হঠাৎ দরজায় আস্তে টোকার আওয়াজ শুনে চিন্তার জালটা ছিঁড়ে গেল। এত রাতে? কারুর আবার কিছু হল নাকি? তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেখি মা দাঁড়িয়ে ঘুমচোখে। 'তোর ফোন, নীলু করছে, বলে ভীষণ জরুরি দরকার।' মা কর্ডলেসটা আমার হাতে এগিয়ে দিল।

আমি তাড়াতাড়ি ফোনটা ধরতেই ওপারে নীলুদার ঠান্ডা গলা, 'শোন, সাংঘাতিক ব্যাপার হয়েছে। সবুজ নটরাজ কালো চাদর পরে দেশের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমার কথা বুঝেছিস?' আমি ফোনটা

ধরে বোকার মতো মাথা নাড়লাম। 'কিচ্ছু বুঝিসনি। মেলবক্সটা খোল সব বুঝবি। এক্ষুনি, দেরি করলেই সর্বনাশ।' ওপারে রিসিভার রাখার আওয়াজে আমার ঘুমের ঘোরটাই কেটে গেল। কী বলে রে বাবা! সবুজ নটরাজ, কালো চাদর পরে.....। হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মতো কথাগুলো আমায় আঘাত করল। তাই তো, এটা তো আমি ভাবিনি? তাড়াতাড়ি মার হাতে কর্ডলেসটা দিয়ে বললাম, 'শুয়ে পড়ো।' মা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ব্যাপারটা কী, রাতদুপুরে দুই ভাইতে মিলে মস্করা হচ্ছে?'

'মা, তুমি বুঝবে না। ব্যাপারটা গুরুতর, যাও শুয়ে পড়ো।'

'যাচ্ছি বাবা যাচ্ছি, বেশিক্ষণ জেগো না যেন, কাল কলেজ আছে।' সব মায়েরই এক চিন্তা। ছেলের স্বাস্থ্য। মা চলে গেল।

আমি তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে পিসিটা অন করলাম। মেলবক্সটা খুলতেই নীলুদার মেসেজ—ভালো করে আমার মেসেজটা পড়, পড়ে এক্ষুনি স্বামীনাথনকে মেল কর। রাজস্থান বর্ডারে যে মূর্তিগুলো ধরা পড়েছিল নকল বলে, তার একটার মধ্যে নিশ্চয় আমাদের হারানো মানিক পান্নার নটরাজও ছিল। আসলে অনেকগুলো নকল মূর্তির মধ্যে পান্নার নটরাজের উপর একটা আলকাতরার সলিড কোটিং দিয়ে মূর্তিটা পাচার করা হয়েছে অথবা হবে। আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওই লোকটা, অর্থাৎ ভিসামলকে ধরতে হবে। হি ইস দি কি টু আওয়ার সাকসেস। ওর কাছ থেকে বেরোবে সবুজ নটরাজ অন্তর্ধান রহস্যের চাবিকাঠি। তাড়াতাড়ি কর, দরকার হলে অরবিন্দকে ফোন করে জাগাবি, ফোন নম্বর হল ০৪৪-২৫৫১-৬২৫৯।

নীলুদার ডিটেকশান পাওয়ার দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। কুড়ি হাজার মাইল দূরে বসে ও যেটা ভাবতে পারল সেটা বড়-বড় সরকারি অফিসারদের মাথায় এল না। আমি সঙ্গে-সঙ্গে স্বামীনাথনকে মেল করলাম। ফোন করতে গেলে আবার বাবার ঘরে গিয়ে মা-বাবার ঘুম ভাঙিয়ে ফোন করা। এবার বাবাকে বলব আমার ঘরে একটা প্যারালাল ফোন লাইন দিতে। স্বামীনাথন তো সকালের আগে উঠবে না আর মেল চেক করতে করতে আটটা হবেই। তাই ভাবলাম একটু শুয়ে নিই।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি তার ঠিক নেই। দরজায় ধাক্কার শব্দে ঘুম ভাঙল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি সর্বনাশ, সাড়ে নটা বাজে। রাত জাগার ফল। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেখি মা দাঁড়িয়ে। 'কিরে সারারাত জেগে, বেলা অবধি ঘুমোলে চলবে, কলেজ-টলেজ যেতে হবে না?'

'মা প্লিজ, আজকে মনে হচ্ছে আর কলেজ যাওয়া হবে না।'

মা রেগে বলল, 'আমাকে প্লিজ বলে কোনো লাভ নেই, যখন কলেজ থেকে নাম কেটে দেবে তখন বুঝবি। এখন দয়া করে খেয়ে নাও।'

কোনোরকমে প্রাতঃকৃত্য সেরে খেয়েই নিজের ঘরে ফেরত। ঘরে ঢুকেই মেশিন চালাতেই দেখি স্বামীনাথন মেল পাঠিয়েছে—তোমার মেল সকালে খুলেই পেয়েছি। নীলাদ্রির অনুমান যদি সত্যি হয় তাহলে ওঁর তারিফ করতে হবে। যাই হোক সি বি আই-এর অফিসাররা ভিসামলের সন্ধানে রওনা দিয়েছেন। আশাকরি সাফল্য আসবে। খবর পেলেই মেল করব। মাঝে-মাঝে মেল চেক কোরো।

পরের সাত-আট ঘণ্টা যে কী উত্তেজনায় কেটেছে তা বলার নয়। প্রত্যেক আধঘণ্টা অন্তর মেল চেক করছি। ইনবক্স শূন্য। তার মধ্যে নীলুদার একটা মেল এসে গেছে কোনো খবর আছে কিনা জানতে চেয়ে। আমি মেলব্যাকও করে দিয়েছি।

রাত্তির নটার সময় স্বামীনাথনের মেল এল—আমি বুঝতে পারছি তোমার মনের অবস্থা। তাই পুরো ঘটনাটা মেল করলাম। সেই লোকটি, ভিসামল, তাকে ধরা হয়েছে উদয়পুরের এক বিলাসবহুল হোটেলের কামরা থেকে। দু'ঘণ্টা জেরা করার পর সে স্বীকার করে যে মূর্তি পাচারকারী আন্তর্জাতিক দলের চাঁই হচ্ছে জিয়া নামে এক কোটিপতি ব্যবসায়ী যে বিদেশের নামী অকশান হাউসগুলোর ভারতীয় অফিসের দালাল হিসেবে কাজ করে। সে গোপনে তাদের কাছে গত দশ বছরে কয়েকশো কোটি টাকার প্রত্নসামগ্রী পাচার করেছে। এই সব অকশান হাউসগুলো জিয়াকে প্রচুর কমিশন দেয় প্রত্নসামগ্রী

পাচারের জন্য। জিয়া চেন্নাই মিউজিয়ামের একজন সিকিওরিটি অফিসার, যার নাম ভেলাপ্পন, তাকে কয়েক লক্ষ টাকার টোপ ফেলে। ভেলাপ্পনকে প্রতিশ্রুতি দেয় বিদেশে ভালো চাকরি দেবার। ভেলাপ্পন কায়দা করে মূর্তিটির সিকিওরিটি ডিউটি নেয়। সেই রাতে ভেলাপ্পনের চোখের সামনে জিয়ার ছ'জন লোক নটরাজকে গায়েব করে। অত্যন্ত আধুনিক এবং অসম্ভব দামী পোর্টেবল ক্রেন ব্যবহার করে নটরাজকে জায়গা থেকে তোলা হয়, তারপর প্রায় নিঃশব্দ চাকাওয়ালা ছোট গাড়ির সাহায্যে বাইরে বার করে ট্রাকে তুলে তারপর চম্পট দেয় চোরেরা। যেসব আধুনিক যন্ত্রপাতি ওরা ব্যবহার করেছে আমরা ভাবতেই পারব না। যন্ত্রপাতিগুলো আলাদা-আলাদা ভাবে খুলে মিউজিয়ামে এনে পনের মিনিটের মধ্যে আসেম্বলড করে অপারেশন করে বেরিয়ে যায়। ঠিক হলিউডের ছবির মতো। সি বি আই-এর অফিসাররা ভেলাপ্পনকেও গ্রেপ্তার করেছে কেরালার এক পাঁচতারা হোটেল থেকে। জিয়ার বাড়িতে নামী অকশান হাউসগুলোর সঙ্গে ওর আদান-প্রদান যা হয়েছে, তার বেশ একগোছা কাগজপত্র আর কিছু বেনামী ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টও পাওয়া গেছে। সবই বিদেশি ব্যাঙ্কে। আর আসল খবর—সবুজ নটরাজকে পাওয়া গেছে জিয়ার প্রাসাদোপম বাড়ির পেছনের বাগানে মাটির তলায়। জিয়ার বাড়িটিকে এখন পুলিশ চব্বিশ ঘণ্টাই ঘিরে রেখেছে। প্রথমে জিয়া স্বীকার করতে চায়নি তবে অফিসাররা গায়ে হাত তুলতেই সে ভেঙে পড়ে। সারা গায়ে আলকাতরা মাখানো নটরাজকে দেখে কে বলবে এর দাম বাজারে পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার। শেষে নীলাদ্রিকে আমার অভিনন্দন জানিও। কালো নটরাজের চাদর ছুরির ডগা দিয়ে সরাতেই পান্নার জৌলুস বেরিয়ে পড়েছে। বিদেশি অকশান হাউসগুলোর গতিবিধির উপর শ্যেনদৃষ্টি রাখা হয়েছে। জিয়ার উদ্দেশ্য ছিল যে, আলকাতরা মাখানো নটরাজকে ভিসামলের হাতে তুলে দেবে এবং ভিসামল সেটা নিয়ে ভারতের সীমানা পার করবে রাতের অন্ধকারে। যদি ধরাও পড়ে তাহলে আগের বারের মতো নকল মূর্তি ভেবে পুলিশ ছেড়ে দিতে পারে। এই পরিকল্পনা নিয়ে জিয়া এগোচ্ছিল কিন্তু বাদ সাধল নীলাদ্রি চক্রবর্তী নামে এক বাঙালি প্রত্নতত্ত্ববিদের উপস্থিত বুদ্ধি। আমরা ঠিক করেছি তামিলনাড়ুর সরকারের পক্ষ থেকে নীলাদ্রিকে সম্মান দেওয়া হবে, ও দেশে ফিরলে। এবার সবুজ নটরাজ থাকবে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার বেড়াজালে। তোমাকেও অভিনন্দন, আমাদের ঠিক সময় মেলে খবর দেওয়ার জন্য। আশীর্বাদ করি জীবনে অনেক বড় হও। অরবিন্দ স্বামীনাথন।

আমি পুরো ই-মেলটা বেশ কয়েকবার পড়লাম। মনে হল বুকের উপর থেকে একটা পাথর নেমে গেল। ভীষণ আনন্দও হচ্ছিল এই বড় অপারেশনের একজন ছোট্ট অংশীদার হতে পেরে। সবই সম্ভব হল কম্পিউটরের দৌলতে। আজকে যদি কম্পিউটর আর ই-মেল না থাকত, এতক্ষণে সবুজ নটরাজ আলকাতরা গায়ে দিয়ে দেশের বাইরে পগার পার হতে পারত।

নীলুদাকে সব জানিয়ে মেল করলাম। শেষে লিখলাম—কনগ্রাচুলেশনস নীলুদা, থ্রি চিয়ার্স ফর ই-মেল। হিপ-হিপ হুররে।

[ভাদ্র ১৪১৪]

গণেশ উধাও!

উৎপল চক্রবর্তী

মাথার উপর দিকে তাকিয়ে একটু অবাকই হল বিল্টু। এইরকম হু-পো, হু-পো স্বরে যে কোনো পাখি ডাকতে পারে সেরকম কোনো ধারণাই ওর ছিল না। থাকবে কী করে, ও তো হুপ-হুপে হনুমানদের কথাই শুনেছে। গতবার পরীক্ষার পর ছোটকার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে মন ভরে অনেক হনুমান দেখেও এসেছে, কিন্তু এই প্রায় হনুমান কণ্ঠের পাখি এল কোত্থেকে? অনেকটা ময়না পাখির মতো গড়নটা তার আর শরীরে বিস্কুট রঙের একটা হালকা ছোঁয়া তার উপরে আবার সাদা-কালো ডোরা কাটা দাগ। মাঝে মাঝে ওদের দিকেই যেন তাকিয়ে ঝুঁটিটা তুলে দিচ্ছিল আবার পরক্ষণেই তা নেমে আসছিল ঠোঁটের উপর।

যে উঁচু পাঁচিলের উপর বসে পাখিটা ডাকছিল আর ঝুঁটি নাচাচ্ছিল তার ঠিক নীচেই ও আর ছোটকা মাটিতে পড়ে আছে। মাথাটায় এখনও খুব টনটনে ব্যথা রয়েছে। উঠে বসতে গেল, পা টলে পড়ল।

কিছুক্ষণ কসরতের পর মোটামুটি দাঁড়াতে পারল বিল্টু। পাশে ছোটকাও পাখিটাকে দেখছে পিটপিট করে। এবার ছোটকাই বলল ফিসফিস স্বরে, মোহনচূড়া পাখিটা আমাদের লক্ষ করছিল রে। ওরা উল্টোপাল্টা কিছু দেখলেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে।

এখন শীতের মাঝামাঝি। ওরা যে পাঁচিলের সামনে পড়ে আছে তার সামনে শুধু ধূ ধূ করা মাঠ। এখন মাঠে কোনো ফসল নেই, শুধু কেটে নেওয়া ধানের গোড়াগুলি পড়ে আছে। পাতলা কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে যেন ঘুমোচ্ছে সারা মাঠটা।

বিল্টুর মনে পড়ল গত কালকের ঘটনা। বাঁকুড়ার এই প্রত্যন্ত পোখন্না গ্রামে বিল্টু আর তার মাসতুতো দাদা ছোটকা এসেছে দু'দিন আগে। ক'দিন আগেই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় খবর পেয়েছিল ঐ পোখন্না গ্রামে আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার তরফ থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হয়েছে। তখনই ছোটকা জিজ্ঞাসা করে—হ্যাঁরে বিল্টু, ছোটমামা এবার বাঁকুড়ায় গেছে নাকি রে?

হ্যাঁ, ও তো যাবেই।

একবার যাবি বাঁকুড়ায়? এখন তো পড়াশুনার চাপ-টাপ তেমন নেই, টানা পনেরো দিন ছুটি পাব। চল, একবার দেখে আসি খোঁড়াখুঁড়ির ব্যাপারটা।

নিজেদের মধ্যে মোটামুটি ব্যাপারটা ঠিক হয়ে যেতেই এবার মা আর বাবাকে রাজি করানোর পালা। ওরা আগেও তো এমন কতবার গেছে। গত দু'বছর আগেই আর্কিওলজিকাল সার্ভে থেকে যখন মালদার হাবিবপুরে খোঁড়াখুঁড়ি করে বর্মন বংশের চন্দ্রবর্মনের সমসাময়িক সব নিদর্শন বার করল তখন তো ছোটমামাই ওদের নিয়ে গিয়ে সব ঘুরিয়ে এনেছিলেন। ক্যাম্পের তাঁবুতে থাকা, মাটি খুঁড়ে পুরোনো সভ্যতার উঠে আসা, দেখতে দেখতে ওরা বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। বিশ্বাসই হচ্ছিল না; যে মাটির উপর ওরা দাঁড়িয়ে আছে তারই নীচে স্তরে স্তরে চাপা পড়ে আছে বাংলার ইতিহাসের কতই না পাতা। এটা ভাবতেই ওদের বিস্ময় জেগেছিল।

সেই হাবিবপুরে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন খোঁড়াখুঁড়ি দেখতে দেখতে আর্কিওলজির অনেকগুলি বিষয়ও শিখে ফেলেছিল। কাকে বলে 'কার্বন ডেটিং' আর তার ফলে কী করে বোঝা যায় উদ্ধার-করা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের বয়স। 'পাঞ্চমার্ক কয়েন' আরও কত কী।

এবারে বাঁকুড়ার লাল রুক্ষ মাটির তলা থেকে কোন সভ্যতা আবার আলোর মুখ দেখবে কে জানে? এখন বিল্টু আর ছোটকা কিন্তু অনেকটা বড় হয়ে গেছে। ছোটকা তো কলেজেই পড়ে; ওর বেশ পুরু গোঁফও গজিয়েছে, বিল্টু ইলেভেন থেকে টুয়েলভে উঠল।

অফিস থেকে বাবা এলে কোনোমতে তাঁকে আর মাকে রাজি করানোর পর আর ওদের দেখে কে? একদম সন্ধ্যা থেকেই ছোটখাটো বেডিং, প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি, দড়ি, মশারি, মশা তাড়ানো ক্রিম, দরকারি ওষুধপত্র, ছুরি, ছোট কাঁচি, বাটি, থালা একটা করে নিয়ে সকালের ট্রেন ধরবার জন্য একপায়ে খাড়া হয়েই রইল ওরা। মামাকে জানাবার দরকার নেই। মামা এখন ঠিক কোথায় রয়েছেন সে একবার মামির কাছে ফোনে জেনে নিলেই হল।

পরদিন সকালেই মামির দেওয়া ঠিকানা ধরে ধরে ঠিক সেই পোখন্না গ্রামে এসে হাজির। বাঁকুড়া অবধি ট্রেনে, তারপর বাসেও ঘণ্টাদুয়েক ঝকর ঝকর করে চলতে হল। বাস থামবার পর আবার শুরু হল তিন চাকার পায়ে টানা ভ্যানে গড়িয়ে গড়িয়ে চলা। ইটের রাস্তা। মাঝে-মধ্যেই ইঁট উঠে গর্ত বেরিয়ে পড়েছে। ফলে ভ্যান যাত্রাও ওদের আর একটু কাবু করেই ফেলল। সন্ধ্যা নাগাদ গিয়ে সেই গ্রামে পৌঁছাল।

তখন সন্ধ্যা নেমেছে। বাতাসে হাল্কা ঠান্ডার রেশ ক্রমশ জাঁকিয়ে বসতে চলেছে। অন্ধকার যত বাড়ছে ততই কালো ঝোপড়া গাছের মাথায় জোনাকিরা মিটিং করতে শুরু করল। ঝিঁঝিঁও যেন মজা করে গান ধরেছে। ওদের দুই মূর্তিকে দেখে ছোটমামা তো অবাকই হয়ে গেলেন।

জানিস বিল্টু, ছোটকা, কাল একটা সোনার গণেশ মূর্তি উঠেছে।

তাই! একদম লাফ মেরে উঠল ওরা।

বর্মন যুগের মূর্তি।

কী করে বুঝলে?

সে অনেক ব্যাপার। মূর্তির গঠন, হাত-পায়ের মুদ্রা, পাশাপাশি থাকা অন্যান্য মূর্তি বিচার করে এই সব মূর্তির সময়কাল একটা আন্দাজ করা যায়, তবে ঠিকঠাক বয়সকাল নির্ণয় করতে এটাকে দিল্লিতে পাঠাতে হবে ওর 'কার্বন ডেটিং' করবার জন্য।

মামা, একবার দেখা যাবে না ওই সোনার গণেশ?

কেন যাবে না রে, কী জানিস চন্দ্রবর্মন যুগের যে সব মূর্তি আমরা আজ অবধি পেয়েছি তার সবই—টেরাকোটার মানে পোড়ামাটির আর কি। আসলে বাংলার মাটি যত সরস আর যত উৎকৃষ্ট মানের তা তো আর অন্যত্র পাওয়া যায় না, তাই এখানে মাটির তৈরি জিনিসপত্র পুড়িয়ে ব্যবহার করাই রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শুধু কি তাই, শখ তো আর লোকের কোনো যুগেই কম ছিল না, তাই তারা কখনো মাটির পাত্র বেশি পুড়িয়ে তৈরি করল কালো, একটু কম পুড়িয়ে লাল বা আরও কম পুড়িয়ে ছাই রঙা।

একটানা অনেকটা কথা বলে মামা একটু দম নিলেন। তারপর বললেন, আমরা এই সব জায়গায় এক্সকাভেট করে তাই প্রায় সব সময়ই মাটির পাত্র বা মূর্তির টুকরো-টাকরা পাই। এবার সোনার গণেশ মূর্তি পেয়ে বুঝলি একদম অবাক হয়েই গেছিলাম। ইতিমধ্যেই আমাদের চিফ্ আর্কিওলজিস্ট ড. বিশালচাঁদ পাণ্ডে এসে গেছেন। বুঝতেই পারছিস ব্যাপারটার গুরুত্ব।

রাতে খেতে যাবার আগে ড. পাণ্ডের কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি নিয়ে ছোটমামা বিল্টু আর ছোটকাকে গণেশ মূর্তিটা দেখালেন। প্রায় আড়াই ইঞ্চি লম্বা আর ইঞ্চি দেড়েক চওড়া ছোট্ট গণেশ মূর্তিতে বিশেষত্ব বলতে তাঁর বাহন, ইঁদুরের পরিবর্তে এখানে রয়েছে দুটো কাঠবিড়ালি। লম্বা লোমশ লেজটা তাদের চলে গেছে গণেশজির মাথার উপর। অনেকটা চামরের মতোই তাঁর মাথার দু'পাশে উঠে গিয়ে আবার উল্টো দিকে একটুখানি ছড়িয়ে গেছে। এই মূর্তির গণেশের হাত চারটিই, তবে শুঁড়ের কাছে দাঁত কিন্তু দুটোই ভাঙা। শুঁড়টা আবার কিছুটা উদ্ধত অবস্থায় রয়েছে। গণেশজি বসে আছেন কাঠবিড়ালি দুটোর পিঠের উপর।

এমন অদ্ভুত মূর্তি বুঝলি কোনো সময়ই আমরা পাইনি। মামা বললেন, শুধু পাইনি বললে ভুল হবে ঐ ধরনের মূর্তি সম্পর্কে কোনো পুঁথিতেই কখনো পাওয়া যায়নি। তবে শুঁড়, ভুঁড়ি, আর ভুঁড়িতে বেড় দেওয়া সাপের বেল্ট দেখে ওকে গণেশ বলে সনাক্ত করা সহজ, কিন্তু ইঁদুরের পরিবর্তে কাঠবিড়ালি এল কীভাবে তা কে জানে। ড. পাণ্ডের মতো অমন পণ্ডিত মানুষও যেন থমকে গেছেন।

সেদিন ক্যাম্পের লোহার খাটে শুয়ে শুয়ে গণেশ মূর্তির কথাই ভাবছিল বিল্টু। এমন সময় হঠাৎই একটু খট খট শব্দ কোথা থেকে ভেসে এল।

একে গভীর শীতের রাত, তায় সবাই সারাটা দিন কাজ করে ক্লান্ত, তাই একজন লোকও জেগে নেই। গণেশ মূর্তির কথা ভাবতে গিয়ে বিল্টুর ঘুমটা আসতে একটু দেরি হয়ে গেছিল। কাঠের মধ্যে পেরেক মারলে যেমন খটখট আওয়াজ হয় তেমনই আওয়াজ হল চার-পাঁচবার, তবে খুব আস্তে আস্তে। কাঠের মধ্যে থেকে পেরেক তোলার মতো একটা ক্যাঁচ করে শব্দ যেন একবার মাত্র হয়ে চুপাচাপ হয়ে গেল চারিদিক। বিল্টু এবার পা টিপে টিপে উঠে এল ওর ক্যাম্প খাট থেকে। টেন্টের একটা হ্যারিকেন খুব মৃদু আলো ছড়িয়ে ঝিমোচ্ছিল, আলো যত না, তার থেকে বেশি ওড়াচ্ছিল ধোঁয়া। কাচটা ঘোলাটে হয়ে এসেছিল ফলে পরিষ্কার কিছু বোঝা যাচ্ছিল না।

এমন সময়ে খস খস করে একটা চাপা শব্দ পাওয়া গেল টেন্টের বাঁপাশে, যেখানে ঝুপসি রঙ্গন গাছটা নিঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিল্টু ধীরে ধীরে ওদিকে বেরিয়ে এল। এমন সময় ওর মনে হল পিঠের কাছে যেন গরম নিশ্বাস পড়ল। ও চমকে পিছনে ফিরল। দেখল কখন ওর অজান্তে ছোটকাও ওর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। হাঁফ ছাড়ল।

যেরকম ঘাবড়ে গেছিল তাতে দম বন্ধই হবার জোগাড় আর কি। রঙ্গন গাছটার ঝোপের পাশ দিয়ে কালো কম্বলে ঢাকা একটা লোক, খুব চুপিসাড়ে ক্রমশ আরও বাঁদিকে চলে যাচ্ছিল। কোথাও কোনো শব্দ নেই। নিঃশব্দে অনুসরণ করল বিল্টু আর ছোটকা। আস্তে আস্তে ওরা এগিয়ে যাচ্ছিল। উত্তেজনার বশে ওদের খেয়াল হল না কখন ওদেরও পিছনে চলেছে আর একজন। সেও খুব লম্বা আর চাদরে পুরো ঢাকা দেওয়া।

কিছুদূর যাবার পর সামনের লোকটা একটু উঁচু পুরোনো পাঁচিলের মধ্যে ছোটমতো ফাটল দিয়ে গলে গেল। ছোটকা আর বিল্টুও তাই যেত কিন্তু হঠাৎই ওদের মাথার পিছনে শক্ত কিছুর মোক্ষম আঘাত ওদের ঘুম পাড়িয়ে দিল। অজ্ঞান হবার আগে যে মেরেছে সেই লোকটাকে বোধহয় দেখতে পেল কিন্তু অন্ধকারে ভালোভাবে কিছুই ঠাওর করতে পারল না।

ঠিকমতো এখনও সকালটা হয়নি। কুয়াশা ঘেরা মাঠের ধারে একটা পাঁচিলের সামনে ওরা পড়ে আছে। মাথায় জব্বর ব্যথা রয়েছে। পাশে ছোটকাও জেগে গেছে। মাথার পিছনে হাত দিয়ে বুঝল ওখানে একটা ছোটখাটো আলু গজিয়ে উঠেছে তবে মাথা ফাটেনি। ওরা এখন ক্যাম্প থেকে ঠিক কতদূরে তাও ঠিক বুঝতে পারছে না। আস্তে আস্তে উঠে এল ওরা। সারারাত মাঠে হিমের মধ্যে পড়ে থেকে মাথাটা কেমন ভারী ভারী লাগছে।

কোনোমতে হাঁটতে হাঁটতে, পথে কয়েকজন লোককে জিজ্ঞাসা-টিজ্ঞাসা করে ক্যাম্পে এসে হাজির হল।

ক্যাম্পে এদিকে হুলস্থূলু কাণ্ড। ড. পাণ্ডে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। স্থানীয় থানা থেকে পুলিশ ইনসপেক্টর সাহেব এসেছেন, জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। ওদের দুই মূর্তিকে দেখে এবার ইনসপেক্টর রামলক্ষ্মণ মিশ্র ওদেরই নিয়ে পড়লেন। বেশ ধমকের সুরে বিল্টুদের দিকে ফিরে বললেন—তোমরা সকাল থেকে কোথায় ছিলে? অনেকক্ষণ ধরে তোমার মামা তোমাদের খোঁজ করছেন। এই সময় কেউ বেরোয়?

বিল্টু ওঁর কাছ থেকে শুনল গণেশ মূর্তি চুরি যাবার কথা। তখন সব বুঝে ফেলল। রাতে তা হলে চোরই ঐ ঝুপসি গাছের পাশে ঘাপটি মেরে বসেছিল। ও বুঝতে পারল না চোর কী করে চুরি করল। সোনার গণেশ মূর্তি ছিল একটা প্যাকিং কাঠের ছোট বাক্সে ড. পাণ্ডের টেন্টে। ওখান থেকে চুরি করতে

গেলে তো ড. পাণ্ডের কানে শব্দ যাওয়ার কথা। ড. পাণ্ডে বলেছেন সারাদিন রোদে মাঠে কাজ করে তিনি এতই ক্লান্ত ছিলেন যে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছেন তারপর কী হয়েছে না হয়েছে কিছুই টের পাননি। টেন্টের দারোয়ান দুজন রতন সিং আর ভজনরাম পুরোনো লোক। ওরা অনেকবার এইরকম এক্সাভেশনে এসেছে কিন্তু কোনোবার কিছু চুরি না যাওয়ায় ওরা পাহারার ব্যাপারটায় তেমন গা করেনি। অবশ্য বেশিরভাগ সময়েই তো মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করে মেলে কিছু ভাঙা পোড়ামাটির পাত্রের টুকরো-টাকরা আর কি। পাহারা দিয়েই বা কী হবে?

বিল্টু আর ছোটকা ইনসপেক্টরকে গতরাতের সব ঘটনা বলল। লোকটা কেমন লম্বা তার একটা ধারণা দিল। তবে যে লোকটা মাথায় ডাণ্ডা মেরে ওদের অজ্ঞান করে দিয়েছিল তাকে ওরা দেখতে পায়নি। ওরা পুলিশকে নিয়ে সেই ভাঙা পাঁচিল যেখানে মোহনচূড়া পাখিটা হনুমানের স্বরে ডেকে ডেকে ওদের জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছিল সেখানে নিয়ে গেল। আশেপাশের সবকটা কুঁড়েঘরে তল্লাশি চালানো হল; কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। মাটি খুঁড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন খুঁজে বার করবার কাজ যেমন চলতে থাকে তেমনই এখন চলল গণেশ উদ্ধারের পালা। সব ক'টা প্রধান সড়কে পুলিশকে সজাগ করে দেওয়া হল। মিশ্রজি নিজে থেকে তদ্‌বির করে বেড়াতে লাগলেন আর আফসোসও করলেন, বললেন, এইরকম একটা ভ্যালুয়েবল জিনিস আপনারা পেলেন আর পুলিশকে একটু জানালেন না? ওটা আমাদের সেফ কাস্টডিতে রাখা উচিত ছিল।

ড. পাণ্ডের মুখে তো কথাই নেই। খুবই হতাশ হয়ে পড়লেন উনি—ঐ রকম একটা রেয়ার পিস যে কী করে চুরি হল! জানেন ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে ঐ অ্যান্টিকের দাম কত হতে পারে, তার উপর ঐ রকম নতুন ধরনের কাঠবিড়ালি-ওয়ালা দুই দাঁত ভাঙা গণেশ মূর্তি, ওফ! কী বিশাল ক্ষতি হয়ে গেল।

যখন একদিকে ড. পাণ্ডের বিলাপ, আর ইনসপেক্টর মিশ্রের তল্লাশি চলছে তখন কিন্তু বিল্টু আর ছোটকা একদম চুপচাপ বসে নেই। ওদের আক্ষেপ ওরা এল, মাত্র এক ঝলক সোনার গণেশ মূর্তিটা দেখল আর গণেশ উধাও হয়ে গেল!

আচ্ছা ছোটকা, আমরা যখন টেন্টের থেকে বেরিয়ে আসছিলাম ভজনরামকে দেখেছিলাম টেন্টের বাইরেই নাক ডেকে ঘুমোতে কিন্তু রতন সিংটা কোথায় ছিল বল তো, তুই দেখেছিস?

কই না তো।

ছোটকা বলে, আসলে তুই যখন বেরিয়ে গেলি তখন আমি তোর দিকেই নজর রাখছিলাম। পরে তোর সামনে ঐ কালো কম্বলে ঢাকা মূর্তিটাকে দেখি, তাই ওদিকে খেয়ালই হয়নি।

আমরা কাল সকাল থেকে ট্রেনে তারপর বাসে আর ভ্যানে যেভাবে ঝক্কর ঝক্কর করে এলাম, আমাদেরই তো মড়ার মতো ঘুমিয়ে পড়ার কথা ছিল, অথচ দ্যাখ আমরা ঠিক জেগেই রইলাম আর পাণ্ডেজি তো শুধু 'বাগান-ছাতার' তলায় বেতের চেয়ারেই বসে বসে ইনস্ট্রাকশান দিয়ে গেলেন, উনি কিছুই শুনতে পেলেন না? আমার জানিস ওনাকেই কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে।

যাঃ, তা হয় নাকি? যেরকম ভেঙে পড়েছেন তাতে তো কোনো কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

সারাটা দিন ধরে 'সাইটে' কাজ চলছে, মাপ মতো মাটি কেটে কেটে তোলা হচ্ছে। ফিতে দিয়ে মাপ করা হচ্ছে, কতরকম স্তর বিভাগ করে হিসেব-নিকেশ করা হচ্ছে, মাঝে-মধ্যে পোড়া-মাটির নানান টুকরো-টাকরা আবার কখনো কখনো গোটা মূর্তিটাই উঠে আসছে। আলতো করে পরম স্নেহে হাতের তালুতে বসিয়ে চ্যাপটা ব্রাশ দিয়ে মূর্তি থেকে অপ্রয়োজনীয় আলগা মাটি ঝেড়ে ফেলা হচ্ছে। সেই মূর্তি আর টুকরোগুলো তুলো দেওয়া প্যাকিং বক্সে সাজিয়ে রাখা হচ্ছে। ড. পাণ্ডে আজ প্রায় পঁচিশ বছর ধরে এই প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে কাজ করছেন, নানান এক্সকাভেশন করেছেন। দুর্দান্ত সেসব অভিজ্ঞতা। সেই গল্পই করছিলেন কনস্টেবল দুজনার সঙ্গে। এবার রতন সিংকে দেখা গেল ড. পাণ্ডেকে একটা চিরকুট ধরিয়ে দিয়ে যেতে। বিল্টু আর ছোটকা আজ দুজনেই চোখ খোলা রেখেছে। ছোটকা সাইটে

মামার কাছে কাছেই আছে আর বিল্টুর একটু জ্বর জ্বর হয়েছে এই অছিলায় ড. পাণ্ডের সঙ্গে বসে আছে। ড. পাণ্ডের অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা শুনতে শুনতে তাঁর প্রতি ভক্তিও জেগে উঠতে থাকে বিল্টুর মনে। এমন সময় রতন সিং-এর দেওয়া চিরকুট সেই স্বাভাবিক গল্পের স্রোতে বাধা সৃষ্টি করল। চিরকুটটা পড়ে বুকপকেটে রেখে দিলেন পাণ্ডেজি। আবারও গল্প শুরু হল, মাঝে মাঝে সাইট থেকে কয়েকজন এসে টেকনিক্যাল কিছু ব্যাপার নিয়ে আলোচনা সেরে নিল। গল্প তো চলছে কিন্তু কেমন যেন আনমনা হয়ে গেছেন ড. পাণ্ডে। গল্প তাই ঠিকমতো আর জমল না।

সন্ধ্যায় যে যার টেন্টে ফিরে এল। সারাদিন কী কী পাওয়া গেল তার একটা লিস্ট তৈরি হল। পরে প্যাকিং বাক্সে সব মিলিয়ে ঠিক করে রাখা হল। এরপর রাতের খাওয়া আর ঘুম।

ঝুপসি রঙ্গন গাছের তলায় ঝিঁঝিঁ পোকাগুলো একসুরে গান ধরেছে। ভাগ্যিস এখন বর্ষা নেই, নয়তো ব্যাঙবাবাজিও এর সঙ্গে গান ধরত। বিল্টু একমনে জোনাকির চকমকি আলোর খেলা দেখতে দেখতে আর ঝিঁঝিঁদের গান শুনতে শুনতে প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিল আর কি। চাপাস্বরে একটা কথা কানে যেতেই চোখ দুটো একেবারে খুলে গেল। এবার ছোটকা মাথায় দুটো টোকা দিতেই ও ধড়ফড় করে উঠে বসল। পা টিপে টিপে ক্যাম্প খাট থেকে নেমে এল। রঙ্গন গাছের ঝোপের পাশ থেকেই যেন কথাটা ভেসে আসছে। ওরা খুব সন্তর্পণে গাছটার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। অবাক হয়ে দেখল ড. পাণ্ডে আর ইনসপেক্টর মিশ্রজির মধ্যে কথা হচ্ছে।

বীর সিং আজ দেখা করবে বলল। এখনো এল না, ড. পাণ্ডে বললেন।

ও ঠিক এসে যাবে, আপনি চিন্তা করবেন না। মিশ্রজি এই কথা বলে তাঁর খৈনির ডিব্বা থেকে একটু খৈনি নিয়ে বাঁ হাতের পাতায় ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে দলতে লাগলেন।

এমন সময় লম্বা-চওড়া একটা লোক এসে দাঁড়াল ওঁদের পিছনে। একটা কিছু পকেট থেকে এগিয়ে দিল ড. পাণ্ডের দিকে। এরপর ঐ লম্বা লোকটা আর মিশ্রজি, পাণ্ডে পরস্পরের হাত ঝাঁকিয়ে যে যার মতো হাঁটা দিলেন। ড. পাণ্ডে গিয়ে ঢুকলেন তাঁর টেন্টে। টেন্টের পাশে যে জানালার মতো জায়গা থাকে সেখানে লুকিয়ে নজর রাখতে লাগল বিল্টুরা। ড. পাণ্ডে টেন্টে ঢুকে কাগজের মোড়কটা খুলে ফেললেন। মোড়ক থেকে বেরোল একতাড়া টাকা। ড. পাণ্ডে টাকাটা পরপর দু'বার গুনে ফেললেন। তারপর ঐ নোটের তাড়া থেকে গুনে গুনে দশটা নোট নিয়ে একটা খামে পুরলেন আর বাকিগুলো নিজের অ্যাটাচি কেসে রেখে দিলেন। এবার খামটা নিয়ে প্রায় নাচতে নাচতেই চললেন তাঁর টেন্টের বাইরে যেখানে দারোয়ানদের জন্য টেন্ট আছে সেখানে। বিল্টু আর ছোটকার চোখে সবই পড়েছে কারণ টেন্টগুলো বসানো হয়েছে অনেকটা বৃত্তের মতো। মাঝে মাঝে কিছুটা জায়গা ফাঁকা রাখা হয়েছে, সেখানে ফোল্ডিং টেবিল, চেয়ার আর হ্যাজাক নিয়ে সারাটা সন্ধে উদ্ধার হওয়া জিনিসপত্রগুলো আর খোয়া যাওয়া সোনার গণেশ মূর্তি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল।

এখন এই গভীর রাতে, মাঝের ঐ ফাঁকা জায়গাটা একদম খাঁ খাঁ করছে। সন্ধেবেলার কথার ফুলঝুরি এখন নেই বরং হাল্কা একটা কুয়াশা যেন একটু একটু করে জমিয়ে বসতে চলেছে ঐ ফাঁকা মাঠে।

হঠাৎই দেখা গেল ড. পাণ্ডে ফিরে আসছেন। প্যাকেটটা ইতিমধ্যেই রতন সিংয়ের হাতে দিয়ে এসেছেন। সমস্ত ব্যাপারটা আস্তে আস্তে যেন পরিষ্কার হয়ে এল ওদের কাছে। ড. পাণ্ডে আর ইনসপেক্টর মিশ্র মিলেই যে মূর্তিটা সরিয়েছেন তা যেমন বোঝা যাচ্ছে তেমনই রতন সিং যে ড. পাণ্ডের দলে ভিড়ে এই কাজ করেছে তা একদম সাদা কাগজের মতোই পরিষ্কার হয়ে গেল।

অথচ এই ড. পাণ্ডেই প্রত্নতত্ত্বের বিখ্যাত পণ্ডিত। পুরোনো ইতিহাস সম্পর্কে আর তাঁদের ডিপার্টমেন্টের খনন কার্য সম্পর্কে কত সেমিনারে বক্তব্য রেখে বেড়ান। সেই মানুষটাই এমন করে নিজের দেশের ঐতিহ্য রাতের অন্ধকারে বিক্রি করতে পারেন তা না দেখলে, শুধু খবরের কাগজ পড়ে ওরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারত না। এবার ছোটমামাকে না জানালেই নয়।

ছোটমামা একদম কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমোচ্ছেন। বিল্টু আর ছোটকা নিজেদের দিকেই একবার চেয়ে নিল। তারপর মামাকে আস্তে আস্তে ঠেলতে শুরু করল। হঠাৎ গভীর ঘুম ভেঙে যাওয়ায় মামা একদম হাঁ করে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। ওরাও ঝপ্ করে কিছু বলল না, একটু থিতু হতে সময় দিল। মামার কিছুক্ষণ পরে সম্বিত হলে, ওরা সব কিছু খুলে বলল। শুনে তো মামার মাথায় হাত। আবারও কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন, বোধহয় কিছু ভাবলেন। এরপর হঠাৎই সটান উঠে জামা-প্যান্ট পরে একদম রেডি হয়ে নিলেন। বিল্টু-ছোটকা তো তৈরি হয়েই ছিল। শুধু 'চ'—বলতেই ওরা একদম একপায়ে খাড়া।

এখন রাত প্রায় দুটো। কোথায় চলেছে তার কিছুই ওরা জানে না, তবে এটুকু ওরা জানে যে মামা এর আগেও দু'বার এই গ্রামে এক্সকাভেশান করে গেছেন। অনেক রাস্তা-ঘাট তাঁর চেনা। একটানা হেঁটে মামা উঠলেন একটা টালির আটচালা ঘরের বারান্দায়। আস্তে আস্তে কয়েকটা টোকা দিলেন দরজায়। ঘরের মধ্যে একটা খুট্ করে মৃদু আওয়াজ হল তারপর দরজাটা অল্প একটু ফাঁক হল। দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে সর্বাঙ্গে চাদর মুড়ি দেওয়া একটা লোক। উঁকি দিয়ে মামাকে দেখে যেন অবাক হয়ে গেল। আরে মুখার্জিদা! এত রাতে?

আর ভাই বোলো না। ভেতরে তো ঢুকতে দাও। তোমাদের বাঁকুড়ার শীতে যে একদম কুঁকড়ে গেলাম।

ভেতরে গিয়ে ওদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। এরা আমার দু'ভাগ্নে, বিল্টু আর ছোটকা ওরফে শ্রীমান প্রতীপ আর অরুণ। আর উনি এই গ্রামের পঞ্চায়েত-প্রধান শ্রীপঞ্চানন প্রধান। বিল্টু, ছোটকার মামা ভবেশবাবু এবার ওঁর ভাগ্নেদের মুখে শোনা সমস্ত ঘটনা আস্তে আস্তে খুলে বললেন। পঞ্চাননবাবুরও মুখটা হাঁ হয়ে গেল। ঠিক যেমন একটু আগে হাঁ হয়ে গেছিল মামার মুখটা।

মুখার্জিদা, ভালো করেছেন এখানে এসে নইলে এতে আমাদের গাঁয়েরই অসম্মান হতে যাচ্ছিল। চলুন, দেখি।

পঞ্চানন প্রধান চাদর মুড়ি দিয়েই বার হলেন সেই শীতের রাতে, হাতে একটা টর্চ নিতে ভুললেন না। পথে-ঘাটে এখন সাপের উপদ্রব নেই ঠিকই কিন্তু উঁচু-নিচু ঢিবি, আর খানাখন্দ তো আছে। সাবধানের মার নেই।

পঞ্চাননবাবু এরপর একে একে দশ-বারো ঘর ঘুরে খান পনেরো ছেলে জোগাড় করে ফেললেন। তাদের বুঝিয়ে দিলেন কী করতে হবে। এর মধ্যে পাঁচটি ছেলে ও বিল্টু আর ছোটকা গেল টেন্টের দিকে। ওরা ড. পাণ্ডে ও দারোয়ানের টেন্টের আশেপাশে লুকিয়ে রইল। টেন্টে তখন ড. পাণ্ডে ঘুমোচ্ছেন। তাঁর আপাদমস্তক মোটা কম্বলে চাপা। ওদিকে মামা আর জনা পাঁচেক লোক গিয়ে হাজির হলেন থানায়। বাকি পাঁচজনকে নিয়ে পঞ্চাননবাবু গেলেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ি। পঞ্চাননবাবুকে ডি. এম. মিস্টার সামন্ত খুব ভালো করে চিনতেন, সব কথা শুনে তিনি নিজেই বেরিয়ে এলেন। সোজা ফোন করে জানালেন পুলিশ হেড-কোয়ার্টারে। বেশিক্ষণ লাগল না হেড-কোয়ার্টার থেকে পুলিশ আসতে। ওদিকে থানায় তখন সেকেন্ড অফিসার গড়গড়ি সাহেব ছিলেন চার্জে। তিনি আয়েশ করেই ঘুমোচ্ছিলেন কিন্তু মামা আর কয়েকজন গিয়ে তাঁকে জাগিয়ে দিলেন। জানালেন কয়েকজন অপরিচিত লোককে টেন্টের চারপাশে দেখা যাচ্ছে। একটু যদি চলেন। তা এলেন বটে বটকৃষ্ণ গড়গড়ি দুটি কনস্টেবল নিয়ে মামার সঙ্গে টেন্টে।

এদিকে ডি. এম সাহেবের পুলিশদল, অন্যদিকে গড়গড়ির দুই কনস্টেবল আর পাড়ার লোকজন তো সব আছেই, সব মিলে টেন্টে তখন বেশ হুলস্থুলু ব্যাপার। সরাসরি তো আর কিছু বলা যায় না তাই সার্চ করা শুরু হল সব কয়টা টেন্টে। পাওয়া গেল দেড় লাখ টাকার বান্ডিল ড. পাণ্ডের অ্যাটাচি কেস থেকে, আর পাঁচ হাজার টাকার খাম দারোয়ান রতন সিং-এর কাছ থেকে। তখন সকাল হতে চলেছে। রতন সিং আর ড. পাণ্ডেকে আলাদা করে জেরা করা হল। ড. পাণ্ডে এত টাকার হিসেব ঠিকমতো দিতে পারলেন না। অন্যদিকে রতন সিং ডি. এম. সাহেবের বকা খেয়ে হড়হড় করে সব ঘটনা বলে দিল।

কীভাবে সে প্যাকিং বাক্স খুলে সোনার গণেশ মূর্তি বার করেছে তারপর সেটা বীর সিংকে দিয়েছে। বীর সিং মূর্তি নিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় হঠাৎ রতন সিং-এর চোখে পড়ে যায় যে বাচ্চা দুটো বীর সিং-এর পিছু পিছু যাচ্ছে। তাই সে হাতের মোটা রুল দিয়ে জোরের সঙ্গেই ওদের মাথায় মেরে দেয়, ওরা অজ্ঞান হয়ে পড়ে। বীর সিং হল ইনসপেক্টর মিশ্রের লোক। এই কাজের জন্যই ড. পাণ্ডে ওকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। এরপর সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

গণেশজিকে এখনো কিন্তু পাওয়া যায়নি। ডি. এম. সামন্ত সাহেবই এবার ফাইনাল অপারেশনে হাত দিলেন। প্রথমেই কোয়ার্টার থেকে আনা হল ইনসপেক্টর মিশ্রকে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল এখন বীর সিং দুর্গাপুরের দিকে চলে গেছে। ওখান থেকে কলকাতায় যাবে সেখানেই হবে গণেশ মূর্তি বিক্রি।

এখন সকাল আটটা। ডি. এম. সামন্ত সাহেব জিপে ছুটলেন দুর্গাপুরের দিকে। স্টেশন মাস্টারের কাছে খবর দিলেন। রেল পুলিশ বীর সিংকে ধরতে ছেয়ে ফেলল সারাটা স্টেশন চত্বর। ওদিকে সব ক'টা লোকাল আর এক্সপ্রেস ট্রেন যেগুলি স্টেশন ছেড়ে গেছে সেগুলিতে তল্লাশি চালাতে খবর গেল প্রত্যেকটা স্টেশনে আর কলকাতায় তো বটেই।

বীর সিং বসেছিল একটা লোকাল ট্রেনে। যখন দেখল প্রচুর পুলিশ ছোটাছুটি করছে তখনই ওর অভিজ্ঞ অপরাধী চোখ সব বুঝে ফেলল। ট্রেন ছাড়তে তখনো একটু বাকি। উত্তেজনার বশে হঠাৎই ও বগির উল্টো দিকের দরজা দিয়ে লাফ দিয়ে নেমে দৌড় লাগাল। কয়েকজন পুলিশও যে ওদিকে রয়েছে তা কিন্তু ওর নজরে পড়েনি। একদম যাকে বলে 'কট রেড হান্ডেড' সেভাবেই জালে পড়ল বীর সিং। সোনার গণেশও পাওয়া গেছে ওরই কাছে।

দুপুর এখন বারোটা। আজ সাইটের কাজ চলছে না। ওরা সবাই অর্থাৎ রাতের সেই পনেরো জন গ্রামবাসী, পঞ্চাননবাবু, আর বিল্টু, ছোটকারা বসে আছে টেন্টের সামনে। ডি. এম. সাহেব মিঃ সামন্তও রয়েছেন। খবর এল গণেশ মূর্তি উদ্ধার হয়েছে আর বীর সিংও ধরা পড়েছে।

সেই সঙ্গে আরও একটা খবর। একেবারে নাটকীয় এবং চমকে দেবার মতো। চিফ আর্কিওলজিস্ট ড. পাণ্ডেকে বাঁকুড়া আসবার পথেই অপহরণ করা হয়েছিল, যিনি এসেছেন তিনি দাগী অপরাধী—, নাম ভাঁড়িয়ে এসেছিলেন। কোনোরকমে উদ্ধার পেয়ে বাঁকুড়ায় রিপোর্ট করেছেন আসল ড. পাণ্ডে।

এক্কেবারে হুররে বলে লাফিয়ে উঠল বিল্টু আর ছোটকা।

বিকেলে ছোটখাটো একটা সভাই যেন বসে গেল টেন্টের মাঝে সেই ফাঁকা জায়গাটায়। মাঝে বসেছেন মিঃ সামন্ত আর বিল্টু-ছোটকা তাঁর একপাশে। অন্য দিকে বসে আছেন পঞ্চাননবাবু। সামনে কলকাতা থেকে আসা একগুচ্ছ কাগজের সাংবাদিক, সঙ্গে অবশ্য স্থানীয় কাগজের লোকও কয়েকজন আছেন। ডি. এম. সাহেব বিস্তারিত ঘটনাটা বলে গেলেন। আর সাংবাদিকদের ফ্লাশের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বিল্টু-ছোটকারা।

এখন নিজেকে কেমন যেন ভি. আই. পি বলে মনে হতে লাগল। পরদিন কাগজ দেখে ওদের তো আর আনন্দই ধরে না। ডি. এম. সাহেব ওদের দুজনের নাম রাষ্ট্রপতি পুরস্কারের জন্য সুপারিশ করেছেন।

এখন বিল্টুদের কিন্তু হা! হা! করে হাসতে ইচ্ছে করছে, নাচতেও যে ইচ্ছে করছে না তা নয়, তবে মুখে গম্ভীর গম্ভীর ভাবটা ঝুলিয়ে রাখতেই হচ্ছে নইলে যে নিজেদের গুরুত্বটা কমে যাবে।

[ভাদ্র ১৪১৭]

দীপুদার গোয়েন্দাগিরি

পার্থপ্রতিম মণ্ডল

কিছুদিন হলো দীপুদার হাতে কোনো কেস নেই। আমারও মাধ্যমিক পরীক্ষা হয়ে গেছে, রেজাল্ট বেরোতেও অনেক দেরি। তাই এখন একটা কেস পেলে বেশ ভালোই হয়।

একদিন সকাল সাতটা নাগাদ বাবান্দায় বসে আমি এসব কথাই ভাবছিলাম। দীপুদা আমার পাশে বসে খবরের কাগজ পড়ছিল। এমন সময় কলিং বেল বাজল। আমি দরজা খুলে দেখলাম, একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। লম্বায় প্রায় ছ'ফুট, চওড়া কাঁধ, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। সব মিলিয়ে চেহারায় বেশ একটা ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কাকে চাই?'

'এটা কি দীপাঞ্জন চৌধুরীর বাড়ি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' আমি বেশ গম্ভীরভাবে বললাম।

'আমি খুব বিপদে পড়ে তাঁর কাছে এসেছি। আমার কিছু কথা ছিল।'

'ঠিক আছে, আপনি ভেতরে আসুন।'

'ধন্যবাদ, দয়া করে দীপাঞ্জনবাবুকে ডেকে দিন।'

আমি দীপুদাকে ডেকে মাকে বললাম আমাদের নতুন মক্কেলের জন্য চা পাঠাতে। তারপর আমি আর দীপুদা বসবার ঘরে ঢুকতেই ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'নমস্কার, আমার নাম বিশ্বনাথ বোস। আমি খুবই বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি।'

'সেটা আপনার অবস্থা দেখেই বুঝেছি। আপনি আগে একটু স্থির হয়ে বসুন। এই নীলু, এক গেলাস জল নিয়ে আয় তো।'

আমি কুঁজো থেকে এক গেলাস জল নিয়ে আসতে ভদ্রলোক তাই খেয়ে একটু স্থির হয়ে বসলেন। তারপর বললেন, 'আমি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একজন অফিসার। প্রায় পঁচিশ বছর ধরে ওখানে কাজ করছি। থাকি ঢাকুরিয়ায়, ১৮এ, ব্যানার্জী পাড়া লেন। বাড়িটি আমার ঠাকুর্দা তৈরি করেন। আমি আমার স্ত্রী অমলা এবং দুই ছেলে সোমেন আর রমেনকে নিয়ে তিনতলায় থাকি। দোতলায় বসবার ঘর, রান্নাঘর, খাবার ঘর ইত্যাদি আছে এবং একতলায় দু'জন চাকর আর একজন রান্নার লোক থাকে।

'যাই হোক, এবার আসার কারণটা বলি। হপ্তাখানেক আগে আমি একটা হুমকি-চিঠি পাই। বলে তিনি পকেট থেকে একটা সাদা খাম বার করে দীপুদার হাতে দিলেন। দীপুদা খাম থেকে একটা সাদা কাগজ বার করল। তাতে গোটা গোটা অক্ষরে লাল কালি দিয়ে লেখা 'সাবধান! যমদূত তোমার বাড়ির ডোরবেল টিপছে!'

দীপুদা ভদ্রলোককে বলল, 'তারপর কি হলো?'

'আমি প্রথমে ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু গতকাল বাড়ির সামনে দিয়ে গাড়ি করে যেতে যেতে কারা যেন একটা ছোরা বারান্দায় ছোঁড়ে। আমি তখন বারান্দায় বসেছিলাম। অল্পের জন্য বেঁচে যাই। তাড়াতাড়ি গাড়ির নম্বরটা টুকে রাখি। পরে মোটর ভেহিকল্‌স অফিসে ফোন করে জানতে পারি যে, ওই নম্বরের কোনো গাড়ি কলকাতায় নেই। এরপর আমার কি কর্তব্য সেটাই আমি আপনার কাছে জানতে এসেছি।'

এই সময় আমাদের কাজের লোকটা চা ও স্ন্যাক্স নিয়ে ঢুকল। বিশ্বনাথবাবুর দিকে এক কাপ এগিয়ে

দিল দীপুদা। আমি প্রশ্ন করলাম, 'আপনি পুলিশে ডায়েরি করেননি?' বিশ্বনাথবাবু উত্তর দিলেন, 'করেছি, তবে পুলিশের ওপর আমার আস্থা নেই। তাই তোমার দাদার কাছে এসেছি।'

দীপুদার ভ্রূ কুঁচকে ওঠে। গম্ভীরভাবে বলে, 'দেখুন বিশ্বনাথবাবু, আপনি যদি মনে করেন যে আমি দিনরাত আপনার বাড়ির সামনে ছদ্মবেশে থাকব তাহলে কিন্তু ভুল করছেন।'

চায়ের কাপ নামিয়ে বিশ্বনাথবাবু অপ্রস্তুত মুখে বলেন, 'না না, আমি সেজন্য আসিনি। বলছিলাম কি, যদি আমি হঠাৎ খুন হই তবে আপনি দয়া করে অপরাধীকে ধরার চেষ্টা করবেন। আমি আপনার পারিশ্রমিক ব্যাঙ্কে রেখে দেব।'

'আপনার ছেলেদের বয়স কত?'

'বড় ছেলের বয়স পঁচিশ আর ছোট ছেলের তেইশ।'

'তারা কি কাজ করে?'

'বড় গড়িয়াহাটের বুক হাউসের ম্যানেজার এবং ছোট ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে গ্লাস অ্যান্ড সিরামিকে ঢুকেছে।'

'আচ্ছা, আপনার কোনো শত্রু আছে বলে মনে হয়?'

'দেখুন, এমনিতে আমার কোনো শত্রু নেই। তবে, কয়েক বছর আগে আমাদের ব্যাঙ্কের একজন কর্মচারী দু'লক্ষ টাকা চুরি করে পালানোর চেষ্টায় ছিল। আমি তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলি। বছর দুয়েক সে জেলে ছিল। মনে হয় এতদিনে জেল থেকে বেরিয়েছে। তবে এই সামান্য কারণে সে কি আমাকে খুন করতে পারে বলে আপনার মনে হয়?'

'প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মানুষ কি না করতে পারে! আচ্ছা, লোকটার নামটা কি আপনার মনে আছে?'

'যতদূর মনে পড়ে, তার নাম ছিল হনুমন্তরাজ সিং।'

'ঠিক আছে, আর আমার জিজ্ঞাসা করার কিছু নেই।'

'তাহলে আমি চলি। নতুন কিছু ঘটলে আপনাকে অবশ্যই জানাব।'

২

পরদিন খাওয়া-দাওয়ার পর দীপুদা আর আমি দাবা খেলতে বসলাম। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। দীপুদা ফোন ধরে কি সব শুনে শেষে 'এক্ষুণি আসছি' বলে ফোন ছেড়ে দিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি হয়েছে?'

'বিশ্বনাথবাবু খুন হয়েছেন!' বলল দীপুদা।

'সে কি?'

'তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে। এক্ষুণি বেরুতে হবে।'

বিশ্বনাথবাবুর বাড়িটা দেখতে সুন্দর হলেও খুব পুরনো। আমরা পৌঁছনোর আগেই পুলিশ এসে গিয়েছিল। তিনতলায় যেতেই, ইন্সপেক্টার সুশীল সেন এগিয়ে এসে বললেন, 'সোমেনবাবু আমাকে আপনার কথা বলেছেন। বিশ্বনাথবাবু নাকি আপনার বাড়িতে গেছিলেন?'

'হ্যাঁ, গতকাল সকালেই তিনি আমার বাড়ি গেছিলেন। আচ্ছা, মৃতদেহ কি এখনো আছে?'

'হ্যাঁ আছে। আপনি দেখতে চাইলে ওই ঘরে যান। সোমেনবাবু আর রমেনবাবুকেও ওখানেই পাবেন।'

সুশীলবাবুর কথামতো আমরা বাঁদিকের দ্বিতীয় ঘরে ঢুকলাম। প্রথমেই সোমেনবাবু আর রমেনবাবুর সঙ্গে আলাপ হলো। দুজনকেই অনেকটা বিশ্বনাথবাবুর মতো দেখতে।

সোমেনবাবুর কাছে আমরা জানতে পারলাম, বিশ্বনাথবাবু রোজ ভোর ছ'টার সময় উঠে পড়েন।

কোনো দিন এর ব্যতিক্রম হয় না। আজ সাড়ে ছ'টাতেও ওঠেননি দেখে সোমেনবাবু ঘরের একটি গুপ্ত দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকেন। এই দরজার কথা বিশ্বনাথবাবু, সোমেনবাবু আর রমেনবাবু ছাড়া আর কেউ জানে না। এই দরজা তৈরি করার কারণ, যদি দরজা ভেতর থেকে বন্ধ থাকে এবং যদি ভেতরের লোক অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন দরজা না ভেঙে ওই গুপ্ত দরজা দিয়ে ঢোকা যাবে। যাই হোক, সোমেনবাবু ঘরের ভেতর ঢুকে দেখেন এই কাণ্ড। তখনই তিনি বাড়ির লোকজনকে ডাকেন এবং পুলিশে খবর দেন।

সোমেনবাবুর কথা শুনতে শুনতেই দীপুদা মৃতদেহ এবং তার আশপাশ খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। মৃতদেহ খাটের উপর ছিল। বুকে ছুরি বসানো। চারদিকে রক্ত ছড়িয়ে পড়েছে।

হঠাৎ দীপুদা কি যেন দেখে চমকে উঠল। তারপর রমেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করল, 'গতকাল বিশ্বনাথবাবুর হাতে যে হীরের আংটিটা দেখেছিলাম সেটা তো এখন দেখছি না?'

রমেনবাবু বললেন, 'কেন, সেটা নেই নাকি? বাবা তো ওটা সবসময় পরে থাকতেন। চুরি হলো নাকি?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। সুশীলবাবুকে খবরটা দেওয়া দরকার। নীলু, যা তো, সুশীলবাবুকে ডেকে নিয়ে আয়।'

আমি তাড়াতাড়ি সুশীলবাবুকে ডেকে আনলাম। তিনি এসে সব দেখেশুনে বললেন, 'তাহলে খুনের একটা মোটিভ পাওয়া যাচ্ছে। এতক্ষণ তো কোনো সূত্রই পাওয়া যাচ্ছিল না।'

'একটা ব্যাপারে আমার খটকা লাগছে। খুনী ঘরে ঢুকল কি করে আর বেরোলই বা কি করে? ঘরের দরজা তো ভেতর থেকে বন্ধ ছিল।' বলল দীপুদা।

'হ্যাঁ, এই ব্যাপারটা আমিও বুঝতে পারছি না। যাই হোক, আজ আমি চলি। কাল এসে আপনাদের সবাইকে জেরা করব।'

সুশীলবাবু ডেডবডি পোস্টমর্টমের জন্য পাঠিয়ে দিয়ে তাঁর লোকজন নিয়ে চলে গেলেন। দীপুদা সোমেনবাবু আর রমেনবাবুকে বলল, 'দেখুন, পুলিশ যেমন জেরা করছে করুক। কিন্তু আমিও আপনাদের আলাদা করে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাই। সময় বেশি লাগবে না।'

'আমাদের জেরা করতে চান করুন, কিন্তু মাকে ছেড়ে দিতে হবে। তিনি ভালো করে কথাই বলতে পারছেন না।' বললেন সোমেনবাবু।

'আপনার মাকে আমি প্রশ্ন করতে চাই না।' বলল দীপুদা, 'শুধু আপনাদের দুজনকে আর চাকর তিনজনকে আমি জেরা করতে চাই।'

৩

একট ছোটো ঘরে আমি আর দীপুদা বসলাম। প্রথমে এলেন সোমেনবাবু। দীপুদা শুরু করল, 'আপনার পুরো নাম?'

'সোমেন চন্দ্র বোস।'

'আপনি কি করেন?'

'গড়িয়াহাটের বুক হাউসে ম্যানেজারি করি।'

'বেতন কত পান?'

'দু'হাজার টাকা।'

'তাতে আপনার ভালো চলে?'

'একজন লোকের পক্ষে সে টাকা যথেষ্ট। তাছাড়া বাবার কাছে যখন যা চেয়েছি, তখন তাই পেয়েছি।'

'আচ্ছা, বাবার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন ছিল?'

'পিতাপুত্রের মধ্যে যেমন সম্পর্ক থাকা উচিত, আমাদের মধ্যেও তেমনি ছিল। অবশ্য সকাল আর রাত ছাড়া তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ দেখা হতো না।'

'সম্প্রতি আপনার সঙ্গে বিশ্বনাথবাবুর কোনো ঝগড়া হয়েছিল কি?'

'আমার তো সেরকম কিছু মনে পড়ছে না।'

'ঠিক আছে, আপনি এখন আসতে পারেন।'

সোমেনবাবু চলে যাওয়ার পর দীপুদা আমাকে বলল, 'নীলু, রমেনবাবুকে ডেকে আন।'

আমি রমেনবাবুকে ডেকে আনলাম। তিনি এসে বসার পর দীপুদা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার পুরো নাম?'

'রমেন চন্দ্র বোস।'

'কি কাজ করেন?'

'আমি গ্লাস অ্যান্ড সিরামিকের ইঞ্জিনিয়ার।'

'কত মাইনে পান?'

'এমনিতে পাঁচ হাজার। তবে কেটেকুটে মোটামুটি তিন হাজার টাকা হাতে পাই।'

'তাতে আপনার ভালোমতন চলে?'

'আমি একা মানুষ। আমার আর কত টাকা দরকার বলুন?'

'আচ্ছা, বাবার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন ছিল?'

'তাঁর সঙ্গে কখনও কোনো খারাপ ব্যবহার করেছি বলে তো মনে পড়ে না।'

'ঠিক আছে, আপনি এখন যেতে পারেন। চাকর দুজনকে আর আপনাদের রান্নার লোকটিকে এক এক করে পাঠিয়ে দেবেন।'

রমেনবাবু 'নিশ্চয়ই' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরে একজন ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের লোক ঘরে ঢুকল। মোটাসোটা চেহারা, বেঁটে লোকটির চোখ-মুখ নির্লিপ্তের মতো। দীপুদা তাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাম কি?'

'আজ্ঞে জগন্নাথ দাস।'

'বয়স কত?'

'তা প্রায় চৌত্রিশ বছর।'

'কত বছর এখানে কাজ করছ?'

'আজ্ঞে, তা বছর খানেক তো বটেই।'

'তোমার মনিব কি ভালো লোক ছিলেন?'

'আমার তো ভালোই লাগতো। তাছাড়া তিনি আমাকে খুব স্নেহও করতেন।'

'কত টাকা মাইনে পেতে তুমি?'

'মাসে দু'শো টাকা আর থাকা-খাওয়া তো আছেই।'

'তুমি তাতে সন্তুষ্ট ছিলে?'

'আজ্ঞে, মাসে হাতখরচ হিসেবে দু'শো টাকা তো কম নয়।'

'বেশ এবার তুমি যেতে পারো।'

মিনিট পাঁচেক যেতে না যেতেই অন্য চাকরটি ঘরে এসে ঢুকল। এ বেশ লম্বা, কিন্তু রোগা। মোগলাই গোঁফ-দাড়ি আছে। চোখের চাহনিতে যথেষ্ট বুদ্ধির ছাপ। দীপুদা তার আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাম কি?'

'আজ্ঞে গোপাল চন্দ্র নস্কর।'

'বয়স কত?'

'আজ্ঞে বত্রিশ বছর।'

'কদ্দিন এখানে কাজ করছ?'

'আজ্ঞে, বেশিদিন নয়। সবে পাঁচ-ছ'মাস হয়েছে।'

'বিশ্বনাথবাবু তোমার প্রতি কিরকম ব্যবহার করতেন?'

'আজ্ঞে, তাঁর কথা কি বলব! আমি যে এমন মনিব পেয়েছিলাম, সেটা আমার সৌভাগ্য। তিনি আমাকে খুবই স্নেহ করতেন।'

'তুমি আগে কোথায় কাজ করতে?'

'আজ্ঞে, আগে আমি কোথাও কাজ করতাম না।'

'তা এখানে তুমি কত মাইনে পেতে?'

'আজ্ঞে, তিনি আমাদের সবাইকে সমান মাইনে দিতেন। শুধু রান্নার লোককে পঞ্চাশ টাকা বেশি দিতেন। তাই জগার মতো আমারও মাইনে দু'শো টাকা আর খাওয়া-থাকা।'

'তোমার ঘর-সংসার নেই?'

'আজ্ঞে না।'

'বেশ, এবার তুমি এসো।'

গোপাল চলে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই রান্নার লোকটি এসে গেল। এর মাঝারি গড়ন। চিবুকে একটি বেশ বড় তিল আছে। এরও চোখে-মুখে একটা বুদ্ধির ছাপ লক্ষ্য করা যায়।

'তোমার নাম কি?'

'শ্যামাচরণ দে।'

'বয়স কত?'

'আজ্ঞে চল্লিশ বছর তো হবেই।'

'তাহলে হয়তো এখানকার পুরনো লোক।'

'হ্যাঁ, সাত বছর ধরে এখানে কাজ করছি।'

'বিশ্বনাথবাবু কেমন লোক ছিলেন বলে তোমার মনে হয়?'

'আজ্ঞে, তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে, সরল মানুষ ছিলেন। আমরা সবাই তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতাম।'

'তা তোমার মাইনে তো আড়াইশো টাকা। তাতে তোমার চলতো তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, এই যে বিশ্বনাথবাবু খুন হলেন, এ ব্যাপারে তুমি কাউকে সন্দেহ কর?'

'বাড়ির লোকের মধ্যেই কেউ এ কাজ করেছে বলে মনে হয়। কিন্তু কে যে করেছে, তা কিছুতেই মাথায় আসছে না।'

'ঠিক আছে, তুমি যাও।'

এরপর আমি আর দীপুদা সোমেনবাবু আর রমেনবাবুর কাছে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। সারা রাস্তায় দীপুদা একটিও কথা বলেনি। আমিও কিছু জিজ্ঞাসা করিনি। বাড়ি ফিরে এসে ও নিজে থেকেই বলল, 'জানিস নীলু, খুনী যদি বাড়ির লোক হয়, তাহলে যে রুমাল অথবা গ্লাভস দিয়ে সে ছোরাটা ধরেছিল তা নিশ্চয়ই নিজের কাছে রাখতে সাহস পাবে না। পুলিশ বাড়ির তল্লাশি নিচ্ছে, যেখানেই সেটা লুকিয়ে রাখুক, তারা ঠিক খুঁজে বের করবে। খুনী সেটা জানে। তাই আমার মনে হয়, বাড়ির পেছনে যে জংলা জায়গা আছে সেখানেই সেটা ফেলে দিয়েছে। এখন আমাদের কর্তব্য জায়গাটা একবার অনুসন্ধান করে দেখা এবং আরও কিছু খোঁজখবর নেওয়া।'

'তুমি কি করে জানলে যে, বাড়ির পেছনে একটা জংলা জায়গা আছে? কই আমি তো কিছু লক্ষ্য করিনি?'

'মৃতদেহ দেখার ফাঁকে আমি ঘরের প্রতিটি জানলা দিয়ে উঁকি মেরেছি। তখনি জায়গাটা লক্ষ্য করি।'

ইতিমধ্যে বাবা ঘরে এসেছেন। তিনি সব কথা শুনে বললেন, 'তাহলে এখন কি করবি ঠিক করলি?'

দীপুদা বলল, 'অনুসন্ধানটা দিনের বেলা না হলে হবে না। তবে খোঁজখবরটা আজ সন্ধ্যের মধ্যেই করতে হবে।'

৪

সন্ধ্যে ছ'টা নাগাদ দীপুদা বেরিয়েছিল। ফিরল সাড়ে সাতটা নাগাদ। ফিরে এসে বলল, 'ঠিক যা ভেবেছিলাম তাই।'

'কি ভেবেছিলে তুমি?'

'এখন বলব না।'

'ঠিক আছে বলতে হবে না। শুধু বল, তুমি কতদূর এগোলে?'

'চুরির ব্যাপারটার ফয়সালা কালকেই হবে। তবে খুনের ব্যাপারে কোনো সূত্রই নেই যেটা ধরে এগোবো। তবে জংলা জায়গাটা অনুসন্ধান করলে আশা করি কোনো সূত্র পাব।'

'তুমি কি বলতে চাও, খুন আর চুরি আলাদা আলাদা লোক করেছে?'

'এখন পর্যন্ত তাই মনে হচ্ছে। কারণ যে চুরি করেছে বলে আমি সন্দেহ করছি, তার চুরির মোটিভ পাওয়া গেলেও খুনের কোনো মোটিভ পাচ্ছি না।'

পরদিন সকাল আটটা নাগাদ আমরা রওনা দিলাম। ব্যানার্জী পাড়ায় পৌঁছে আমরা বিশ্বনাথবাবুর বাড়ির পিছন দিকে জংলা জায়গাটায় এসে দাঁড়ালাম। প্রথমে চারদিকটা ভালো করে দেখে নিয়ে, আমরা অনুসন্ধান শুরু করলাম। মিনিট পনের ধরে খোঁজার পর যখন প্রায় হতাশ হয়ে পড়ছি তখনই হঠাৎ আমার চোখে পড়ল, এক জায়গায় একটা গাছের ডালে কি যেন আটকে রয়েছে। কাছে গিয়ে দেখি, সেটা একটা সবুজ রুমাল। দীপুদাকে দেখাতেই সে তাড়াতাড়ি সেটাকে হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখতে দেখতে হঠাৎ কি যেন দেখে আনন্দে লাফিয়ে উঠল।

'কি হয়েছে?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'যা চেয়েছিলাম ঠিক তাই। এইখানটা ভাল করে দ্যাখ।'

আমি দেখলাম, যে জায়গাটা দীপুদা দেখাচ্ছে সেখানটায় একটু রক্ত লেগে আছে। অতএব, আমরা যে রুমালটা খুঁজছিলাম এটাই যে সেটা, তাতে আর সন্দেহ রইল না।

আমি দীপুদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এবার এটা নিয়ে কি করবে?'

'দেখ না কি করি!' বলে দীপুদা বিশ্বনাথবাবুর বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল। গেটের মুখেই সোমেনবাবুর সঙ্গে দেখা। আমাদের দেখে বললেন, 'আরে কি ব্যাপার? এত সকালে যে?'

দীপুদা তার পকেট থেকে সদ্য উদ্ধার করা রুমালটা বের করে বলল, 'এই রুমালটা কি আপনার?'

'না, এরকম রুমাল তো আমার নেই।'

'ও, তাহলে আমারই ভুল হয়েছে। আপনি বুঝি কাজে বেরোচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, কেন কোনো দরকার আছে কি?'

'না, তেমন কোনো দরকার নেই। আপনি যেতে পারেন।'

সোমেনবাবু চলে গেলেন। আমরাও গেট পেরিয়ে আরো খানিকটা এগোতেই রমেনবাবুর দেখা পেলাম। দীপুদা তাঁকেও সেই রুমালটা দেখিয়ে বলল, 'রুমালটা কি আপনার?'

রমেনবাবু বললেন, 'না, এটাকে আমি কখনো চোখেই দেখিনি।'

এরপর চাকর দুজন আর রান্নার লোকটিকেও দীপুদা রুমালটা দেখিয়ে একই প্রশ্ন করল। তারা প্রত্যেকেই বলল যে, এ রুমাল তাদের কারোরই নয়। ইতিমধ্যে রমেনবাবু আমাদের বৈঠকখানায় এনে বসিয়েছেন। দীপুদা ঘরটা ঘুরে দেখতে দেখতে দেওয়ালে টাঙানো একটা ফটোর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। ছবিটা একটা গ্রুপ ফটো। বিশ্বনাথবাবুকেও তার মধ্যে দেখলাম। মনে হয় তিনি যে ব্যাঙ্কে কাজ করতেন, সেখানকার কর্মচারীদের নিয়েই ছবিটা তোলা। রমেনবাবু আমাদের পাশেই ছিলেন। দীপুদা তাঁকে জিজ্ঞেস করল ফটোটা কয়েকদিনের জন্য নিজের কাছে রাখতে পারে কিনা। ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে রাজী হলেন। দীপুদা খবরের কাগজে ফটোটা মুড়ে আমার হাতে দিল। এরপরেই আমরা সেখান থেকে চলে এলাম।

৫

বাইরে বেরিয়ে দীপুদা বলল, 'নীলু' তুই বাড়ি যা। আমার একটা কাজ আছে।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কাজটা কি?'

দীপুদা 'পরে বলব' বলে চলে গেল।

বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ ফিরল দীপুদা। তার মুখ দেখে মনে হলো, সে অত্যন্ত চিন্তিত। তবু তার মধ্যে একটু খুশির ছোঁয়া আছে।

কিছুক্ষণ বসে থাকার পর সে বলল, 'আচ্ছা নীলু, যে ফটোটা আনলাম সেটা কই রে?'

ফটোটা আমি টেবিলের ওপর রেখেছিলাম। দীপুদাকে এনে দিতে সে প্রথমে সেটা ভালো করে দেখল। তারপর ফ্রেম থেকে ফটোটা খুলে ফেলে পেছনের সাদা দিকটা দেখতে লাগল। আমি দেখলাম পিছনে ছোট ছোট অক্ষরে সকলের নাম লেখা আছে। হঠাৎ দীপুদা 'পেয়েছি' বলে লাফিয়ে উঠল। আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কি পেয়েছো?'

'এই দ্যাখ, বাঁ দিক থেকে তৃতীয় জন হনুমন্তরাজ সিং।'

মনে পড়ল, বিশ্বনাথবাবু বলেছিলেন, এই হনুমন্তরাজ সিং নাকি দু'লক্ষ টাকা চুরি করে পালাতে গেছিল, তিনি তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। ছবিতে দেখলাম, লোকটাকে দেখতেও চোরের মতো। আমার মনে হলো, কোথায় যেন লোকটাকে দেখেছি।

দীপুদাকে সে কথা বলতেই ও আমার পিঠ চাপড়ে বলল, 'বাঃ, তোর চোখ আগের থেকে অনেক ভালো হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। তুই ঠিকই ধরেছিস। আমারও মনে হচ্ছে, কোথায় যেন লোকটাকে দেখেছি।'

'আচ্ছা, তুমি কি বিকেলে আবার যাবে নাকি বিশ্বনাথবাবুর ওখানে?'

'নাঃ, আজ আর যাব না। আজ শুধু বাড়িতে বসে ভাবব।'

'তোমাকে খুব চিন্তিত বলে মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ রে, চুরিটার কিনারা করতে পারলেও খুনটার কোনো কিনারা করতে পারছি না।'

'দীপুদা, তোমাকে একটা কথা বলব বলব করে ভুলে যাচ্ছি। তুমি দেখেছ কিনা জানি না, আমি গোপালের হাতে একটা আংটি দেখেছি। তাতে লেখা ছিল H.S.। কিন্তু ওর নাম তো গোপাল চন্দ্র নস্কর।

'এটা আমিও লক্ষ্য করেছি। কিন্তু সন্দেহের কোনো কারণ দেখছি না। গোপাল মুখ্যু মানুষ। হয়তো এমনি ওরকম লিখেছে—'

বলতে বলতে হঠাৎ দীপুদার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। সে বলল, 'দাঁড়া তোকে একটা ম্যাজিক দেখাই।' বলে একটা পেন্সিল নিয়ে কোলের ওপর রাখা ফটোর মধ্যে হনুমন্তের মুখের ওপর স্কেচ করতে লাগল। তারপর ফটোটা আমায় দেখিয়ে বলল, 'এই দ্যাখ।'

আমি অবাক হয়ে দেখলাম.....দীপুদা ততক্ষণে বিশ্বনাথবাবুর বাড়িতে ফোন করছে। ফিরে এসে বলল, 'আজ সন্ধ্যা সাতটায় বিশ্বনাথবাবুর বৈঠকখানায় সবাই উপস্থিত থাকবে। আমি ইন্সপেক্টর সুশীলবাবুকে নিয়ে যাব। তুইও সঙ্গে থাকবি।'

৬

সন্ধ্যে ছ'টা নাগাদ আমি আর দীপুদা বের হলাম। দীপুদা সঙ্গে সেই গ্রুপ ফটোটাও নিল। প্রথমেই আমরা গেলাম থানায়। সেখানে সুশীলবাবুকে সব কথা বলতে তিনি আমাদের সঙ্গে যেতে রাজী হলেন। সঙ্গে দু'জন কনস্টেবলকেও নেওয়া হলো।

বিশ্বনাথবাবুর বাড়ি পৌঁছে দেখি দীপুদার কথামতো সবাই বৈঠকখানায় জড়ো হয়েছেন। আমরা ঘরে ঢুকে সোফার ওপর বসলাম।

দীপুদা প্রথমে এক গেলাস জল খেয়ে নিল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে তার বক্তব্য শুরু করল,

'আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় বিশ্বনাথবাবু আজ নেই। তাঁর মৃত্যুর আগে তিনি আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, তিনি যদি হঠাৎ মারা যান তাহলে আমি যেন তার তদন্ত করি। আমি তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী তদন্ত করেছি এবং খুনীকে ধরতে পেরেছি। এখানে বলে রাখি, বিশ্বনাথবাবুকে খুন করা ছাড়াও তাঁর হাতের আংটিও চুরি করা হয়েছে। প্রথমে অন্য সকলের মতো আমারও মনে হয়েছিল যে, খুন আর চুরি একই লোক করেছে। কিন্তু এখন আমি জানতে পেরেছি খুন আর চুরি আলাদা আলাদা লোকের কাজ। তবে প্রথমে আমি আসব খুনের কথায়। এখানে আপনাদের একটা ঘটনার কথা শোনাই। এটা অবশ্য বিশ্বনাথবাবুর মুখে শোনা।

কয়েক বছর আগে, তিনি যে ব্যাঙ্কে কাজ করতেন, সেই ব্যাঙ্কের হনুমন্তরাজ সিং বলে একজন লোকা দু'লক্ষ টাকা চুরি করে পালানোর চেষ্টায় ছিল। কিন্তু বিশ্বনাথবাবু তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। সুতরাং বোঝা যায়, সে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বিশ্বনাথবাবুকে খুন করতে পারে এবং এক্ষেত্রে সেটাই হয়েছে।'

'ও তাহলে আপনি বলতে চান বাড়ির বাইরের লোক খুন করেছে?' জিজ্ঞাসা করলেন সোমেনবাবু।

'উঁহু, আমি কিন্তু তা বলিনি। আমি শুধু বলেছি হনুমন্ত খুন করেছে।'

'এসব কি বলছেন আপনি?'

'আমি যা বলছি তার একটাই মানে হয়—সে এ বাড়িতে এবং এই ঘরেই আছে।'

'কিন্তু কি করে?'

দীপুদা কিছু বলার আগেই রমেনবাবু বললেন, 'ছদ্মবেশে কি?'

'ঠিক ধরেছেন রমেনবাবু। সে এ বাড়িতে ছদ্মবেশ নিয়েই আছে। তবে তাকে চেনাবার আগে আমি গোপালকে কিছু প্রশ্ন করব।

'গোপাল তোমার হাতে যে আংটি আছে তাতে H.S. লেখা কেন? তোমার নাম তো গোপাল চন্দ্র নস্কর। আর আংটিতে তো নিজের নামের আদ্যক্ষরই লেখা হয়।'

'ওটার কোনো মানে নেই বাবু। আমি ওটা এমনি পরেছি।'

'কিন্তু আমি যদি বলি, ওটাই তোমার নামের আদ্যক্ষর! তোমার নাম গোপাল চন্দ্র নস্কর নয়, হনুমন্তরাজ সিং আর তুমিই প্রতিশোধ নেবার জন্য বিশ্বনাথবাবুকে খুন করেছ।'

'না, আমি খুন করিনি।'

'ঠিক আছে, আংটির কথা বাদ দিলাম। কিন্তু তার থেকেও বড় প্রমাণ আমার কাছে আছে হনুমন্ত।' বলে দীপুদা ব্যাগ থেকে সেই গ্রুপ ফটোটা বার করল। দেখলাম, হনুমন্তের মুখের ওপর সেই স্কেচটা নেই। মনে হয় দীপুদা আগেই সেটা মুছে ফেলেছে।

'যে ব্যাঙ্কে বিশ্বনাথবাবুর কাজ করতেন সেই ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের নিয়ে তোলা এই ছবি। এইটা হলো হনুমন্তরাজ সিং। এবার আমি আপনাদের একটা জিনিস দেখাব।' বলে দীপুদা পকেট থেকে পেনসিল বের করে আবার হনুমন্তের মুখে স্কেচ করল। তারপর সেটা সকলের সামনে তুলে ধরার পর দেখা গেল, দীপুদা ছবিটায় দাড়ি-গোঁফ করে দিয়েছে আর ওই পরিবর্তনের ফলে হনুমন্তের মুখটা বদলে অবিকল গোপালের মুখের মতন হয়ে গেছে।

'এর চেয়ে তুমি আর কি বড় প্রমাণ চাও, হনুমন্ত?'

দেখলাম হনুমন্ত মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে। কনস্টেবলরা এসে তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে গেল।

'আপনি কখন গোপালকে প্রথম সন্দেহ করেন?' প্রশ্ন করলেন রমেনবাবু।

'যখন রুমালটা আপনাদের সকলকে দেখাই, তখন থেকেই আমি গোপালকে সন্দেহ করি। কারণ রুমালটা দেখা মাত্র ওর মুখে একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। অবশ্য তারপর সে নিজেকে সামলে নেয়। তখনই আমার সন্দেহ হয় যে, ওই খুন করেছে।'

'কিন্তু যদি গোপালই খুন করে থাকে, তাহলে সে বিশ্বনাথবাবুর ঘরে ঢুকল কি করে আর বেরোলই বা কি করে?' সুশীলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

দীপুদা বলল, 'গোপাল বিশ্বনাথবাবুর খুব বিশ্বস্ত ও অনুগত চাকর ছিল এবং সবসময় সে বিশ্বনাথবাবুর কাছে কাছে থাকত। আমার মনে হয়, সে বিশ্বনাথবাবুর কাছে গুপ্ত দরজাটার সম্বন্ধে জানতে পেরেছিল আর সেটা কোথায় আছে তাও হয়তো বিশ্বনাথবাবু গোপালকে বলেছিলেন। গোপাল সেই গুপ্ত দরজা দিয়েই ঘরে ঢোকে এবং বিশ্বনাথবাবুকে খুন করার পর সে ওই দরজা দিয়েই বাইরে বেরিয়ে আসে।'

দীপুদা এরপর বলল, 'এবার আসি চুরির কথায়। আমি প্রথমেই বলেছি, আমার মতে খুন এবং চুরি আলাদা আলাদা লোক করেছে। আর এক্ষেত্রে চুরি করেছেন সোমেনবাবু।'

'এ আপনি কি বলছেন দীপাঞ্জনবাবু? টাকার দরকার হলে তো আমি বাবার কাছে চাইতে পারতাম। তাঁর আংটি চুরি করতে যাব কেন?'

'রেসের মাঠের দেনা শোধ করার জন্য কারুর বাবা টাকা দেয় না, সেটা আপনি ভালভাবেই জানতেন। তাই বিশ্বনাথবাবুর কাছে টাকা না চেয়ে, তাঁর আংটি চুরি করেন। এই দু'দিনে বোধহয় সেটা বিক্রি করে দেনা শোধ করাও হয়ে গেছে। কি বলেন?'

'কি আবোল-তাবোল বকছেন দীপাঞ্জনবাবু? আমি একটা দোকানে ম্যানেজারি করি। কাজ ফেলে—'

দীপুদা তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'ম্যানেজারি আপনি করেন না, আগে করতেন। সেখান থেকে বিতাড়িত হয়েই আপনি রেস খেলতে শুরু করেন। রেসের মাঠেই আমি আপনাকে দেখেছি এবং আপনার যে সত্তর হাজার টাকা দেনা ছিল, তাও জেনেছি। ছি, ছি, বিশ্বনাথবাবুর মতো সৎ ব্যক্তির পুত্র হয়ে আপনার এই কাজ? ছিঃ!'

সোমেনবাবু এবার আর প্রতিবাদ করতে পারলেন না। তাঁকেও অ্যারেস্ট করা হলো।

সবাই চলে যাবার পর রমেনবাবু বললেন, 'দাদা যে এত নীচে নামতে পারে তা আমার জানা ছিল না! যাই হোক, আপনি একটু বসুন। আমি এক্ষুণি আসছি।'

আমি আর দীপুদা বসলাম। কিছুক্ষণ পরে রমেনবাবু ফিরে এলেন। দেখলাম, তাঁর হাতে একটা চেক বই। তিনি সোফায় বসে চেক বইয়ের একটা পাতায় কিছু লিখলেন আর সেটা দীপুদার হাতে দিয়ে বললেন, 'বাবা আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা দিতে বলেছিলেন। আমি সে টাকাই আপনাকে দিলাম।'

[ভাদ্র ১৪০৬]

হোয়াই

কল্যাণ মৈত্র

এনগেইজড লেখা লাল আলোটা সবে নিভেছে। মিটিং শেষ। সকলে একে একে বেরিয়ে যেতে ওরাও সামনের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল।

ভিজিটিং স্লিপ-টা দিতেই বেয়ারা সেটি নিয়ে তৎক্ষণাৎ ভেতরে চলে গেল। আবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাইরে এসে বলল—যান, স্যার ডাকছেন। একটুও অপেক্ষা করতে হল না ওদের।

আই জি হরিশেখর চট্টোপাধ্যায় আর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন কার্ডটিতে—

শঙ্খশুভ্র চক্রবর্তী/জার্নালিস্ট পারপাস অব ভিজিট—পারসোনাল।

সঙ্গে আর একজনও আছেন।

হরিশেখর চট করে সাংবাদিকদের সঙ্গে দেখা করেন না। প্রচারের আলো থেকে দূরে থাকাই তাঁর স্বভাব। মাত্র চার-পাঁচ মাস আর চাকরিতে আছেন। তাই নতুন কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে চান না। হোম মিনিস্টার বললে তখনই কেবল ব্রিফ করেন।

হরিশেখর ফাইল থেকে চোখ তুলে বসতে বললেন। গম্ভীর মুখ। হয়তো কিছু চিন্তা করছেন। ফাইলটি পাশের টেবিলে হাল্কা থ্রো করে বেয়ারাকে ডাকলেন—এঁদের চা দাও।

হরিশেখর শঙ্খর দিকে তাকালেন। সেই কবে দেখেছেন। বন্ধু প্রিয়ব্রতর ছেলে। সম্ভবত জামসেদপুরে। নাইনটিন সেভেনটি নাইন কি এইটটি। প্রিয়ব্রত জেলা জজ ছিলেন।

আপনিও কি জার্নালিস্ট?

না। ওর নাম মোহনা চ্যাটার্জি। ইনফরমেশন টেকনোলজিস্ট। আমার মাসতুতো বোন, শঙ্খ বলল। মোহনা হাতজোড় করে নমস্কার জানাল।

আমি ভাবলাম উনিও.....

শঙ্খ তাতে বলল, মোহনা কেবল টেকনোলজিস্টই নয়, শখের গোয়েন্দাগিরিও করছে আজকাল।

সহজাত ভারী গলায় অসম্ভব গাম্ভীর্য টেনে হরিশেখর বললেন—আপনাকে ঠিক হেলেনের মতো দেখতে। হেলেন টমাস।

জান কে ছিলেন তিনি? হরিশেখর শঙ্খকে জিগ্যেস করলেন।

মোহনা মৃদু হেসে বলল, আপনি কি জার্নালিস্ট হেলেন টমাসের কথা বলছেন? যিনি হোয়াইট হাউস করসপনডেন্ট ছিলেন?

দ্যাটস রাইট। অ্যাবসোলিউটলি। হেলেন ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকার ন্যাশন্যাল প্রেস কাউন্সিল-এর চেয়ারম্যানও হয়েছিলেন। পৃথিবী জুড়ে তাঁর নাম।

চা এসে গেল।

হাতের ইশারায় ওদের চা নিতে অনুরোধ জানিয়ে হরিশেখর বললেন—হেলেনের একটা কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে।

কোন কথাটা? মোহনা বলল। 'হোয়াই'?

তুমি কী করে জানলে?

শঙ্খও জানতে উৎসুক, ব্যাপারটা কী?

হরিশেখর এবার বললেন, ওঁকে একবার জিগ্যেস করা হয়েছিল ঃ মৃত্যুর পর আপনার স্মৃতিস্তম্ভে কী লেখা হবে? হেলেন উত্তর দিয়েছিলেন ওই একটি মাত্র শব্দ। 'কেন?' এই একটি শব্দই ছিল তাঁর সমস্ত সাফল্যের চাবিকাঠি।

এই একটি শব্দের ওপর তোমাদের প্রফেশন্যালিজম অনেকাংশে নির্ভর করে। হরিশেখর এবার হাসলেন, মোটা ফ্রেমের চশমা চোখে। অসম্ভব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ।

আমার বাবাও কাগজে চাকরি করতেন। ইংরেজি দৈনিকে। কাগজটি এখন আর বেরোয় না। দেশের এ-ওয়ান পত্রিকা ছিল। কলকাতায় ডেপুটি এডিটর ছিলেন। পুলিশে আসার আগে আমিও কিছু লেখালেখি করেছি বইকি! হরিশেখর টেলিফোন তুলে কাউকে কিছু একটা বললেন, তারপর আর একটা ফাইলে চোখ রাখলেন।

মোহনা বলল, সেই অভ্যাস থেকেই আপনি এখনও লেখেন, তাই না? ন্যাশন্যাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর জার্নালে আপনার লেখা নিয়মিত পড়ি। এই কারণেই আপনাকে চাক্ষুষ করার জন্য শঙ্খর সঙ্গে চলে এসেছি।

লজ্জিতবোধ করলেন হরিশেখর। তুমি তো দেখছি সাংঘাতিক। অনেক খবর রাখা। ভালো, খুব ভালো। পেশাদারি কাজে নেমে পড়ো এবার। শখের গোয়েন্দাগিরি কেন।

শঙ্খ বলল, একটা বিশেষ কারণে আপনার কাছে আসা। আপনাকে সাহায্য করতে হবে। ব্যাপারটা খুব সিক্রেট।

তার আগে আমাকে একটা কথা বলো, আজকে টাইমস্-এ প্রথম পাতার নীচে যে খবরটা বেরিয়েছে সেটা কি তোমার লেখা?

শঙ্খ বলল, হ্যাঁ। বিপত্তিটা তো ওই লেখাটা থেকেই।

আই শ্যুড অ্যাপ্রিশিয়েট ইয়োর ইনিশিয়েটিভ। খবরটার জন্য খুব খেটেছ। কিন্তু ওই ভাবে সেনসেশন তৈরি করার কোনো দরকার ছিল না। প্রচুর ফোন পাচ্ছি আমরা। সি. আই. ডি. কেসটা টেক আপ করতে পারে। তোমরাও ইনভেস্টিগেশন করছ নিশ্চয়ই। কিন্তু সাবধান, কাউকে অপ্রয়োজনে কোনো মন্তব্য করবে না।

মোহনা বলল, শুনছি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনেও ওরা যাবে।

শঙ্খ অস্থির হয়ে ওঠে। আসল কথাটাই সে বলতে পারছে না। লেটেস্ট ডেভালপমেন্ট। মোহনারও কোনো কেয়ার নেই। নানান প্রশ্নের অবতারণা করছে সে। তবে ঘরের পরিবেশটা অনেক সহজ হয়েছে। হরিশেখর যে তাকে এতটা পাত্তা দেবেন তা শঙ্খ ভাবতেও পারেনি। মানুষটা যে রাশভারি এবং মিশুকে নন তা সে আগেই শুনেছিল। ডাকসাইটে আমলা। দক্ষ প্রশাসক—একেবারে নন্-কমপ্রোমাইজিং।

শঙ্খ বলল, রুধনের লাশটা পুলিশ মাটি খুঁড়ে পায়নি।

হরিশেখরের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। স্ট্রেইঞ্জ! বাট হোয়াই?

পোস্টমর্টেমের পর পুলিশ আদিবাসীদের হাতে রুধনের মৃতদেহ ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। পুলিশ বলেছে রুধনকে কেউ হত্যা করেনি। আদিবাসীদের দাবি রুধন-খুনের তদন্ত। আমার রিপোর্টে সে কথার উল্লেখ আছে। গোবিন্দপুরের লোকেরা বলেছে যে পুলিশ হেফাজতেই রুধন মারা যায়।

ফাইলটা তোমরা আসার আগেই চেয়েছি। একটা কনফিডেনশিয়াল রিপোর্টও আজকালের মধ্যে এস. পি-র কাছ থেকে এসে যাবে। কিন্তু আমরা, মানে পুলিশ তোমাকে এ ব্যাপারে কোনো ইনফরমেশন দেব না। যতক্ষণ পুলিশ ইনভেস্টিগেশন করবে ততক্ষণ কোনো তথ্য দেওয়া যাবে না। অন্তত তথ্য ফাঁস হলে অন্য কথা। ওতে তদন্তের ক্ষতি হয়। আততায়ীরা সজাগ হয়ে যায়। পুলিশ তাদের ধরতে পারে না। সো আই অ্যাম হেল্পলেস। আই ক্যান্ট ডু এনিথিং ফর ইউ রাইট নাউ।

মোহনা বলল, তাহলে লাশটা গেল কোথায়?

ওটা পুলিশের ব্যাপার। পুলিশ খুঁজবে। আমাদের লোকজন কাজ করছে। ধৈর্য ধরতে হবে।

শঙ্খ জিজ্ঞাসা করল—লাশটা হাওয়া করার পিছনে রিয়েল মোটিভটা কী? কার স্বার্থে আঘাত লেগেছে?

হরিশেখর বিরক্তবোধ করলেন। পরে বললেন, আজকে আমাদের মধ্যে যে ডিসকাশন হল তার একবর্ণও তুমি কিন্তু আমাকে কোট করে কিছু লিখবে না।

ঘটনাটা কিন্তু মারাত্মক এবং কনফিউজিং। আদালত আবার রুধনের ডেডবডি পোস্টমর্টেম করতে বলেছিল। তারপরই কিন্তু লাশটা হাওয়া হয়ে যায়। মোহনা এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলল।

তার মানে কি এটাই দাঁড়ায় না যে তুমি একটা প্রোব্যাবিলিটির ওপর ঘটনাটাকে ছেড়ে দিয়ে পুলিশের দিকে অভিযোগের তীরটা ছুঁড়ে দিচ্ছ? তবে আমি 'এমন তো কতই হয়' বলে ঘটনাটাকে খাটো করতেও চাইছি না।

নট্ লাইকলি। আমার সন্দেহ তো হতেই পারে। মোহনা জোর দিয়ে কথাটা থ্রো করল।

শঙ্খ বলল, আদিবাসীরা বিশ্বাস করতে পারছে না পুলিশের কথা। রুধনের আত্মহত্যার ঘটনাটা সাজানো গল্পও হতে পারে।

আবার নাও হতে পারে। তাই না?

শঙ্খ একটু দুমড়ে গেল। হরিশেখর আবার বললেন, তুমি-আমি মুখে কিছু বললেই তো তা আর সত্যি হয়ে যাবে না। ইউ শুড আন্ডারস্টান্ড দ্যাট, উই গো বাই ফ্যাক্টস্। পোস্টমর্টেম রিপোর্টকে মেনে নিতেই হবে। আবার দরকার হলে ময়না তদন্ত করা হয়েছে এমন নজিরও আছে।

শঙ্খ বলল, আমি কাল আবার জেলায় ঘটনাস্থলে যাব। যেটা আপনাকে বলতে চাইছিলাম, আমায় বাড়ির টেলিফোনে বা মোবাইলে কিছু লোক থ্রেট করছে। হয়তো তারা চাইছে না যে আমি এ নিয়ে বেশি দূর অগ্রসর হই।

মোবাইলে নাম্বার দেখেছ? কোথা থেকে ফোন করা হচ্ছে?

জেলা থেকে নয়। কলকাতা থেকেই। খোঁজ নিয়ে দেখেছি সব কটি টেলিফোন কলই করা হয়েছে লোকাল বুথ থেকে।

মোহনা বলল, একটা সিক্রেট গ্যাং সম্ভবত কাজ করছে।

একটা টেলিফোন এল। সেটা রিসিভ করে হরিশেখর শঙ্খকে বললেন, ডি জি ডাকছেন। আমাকে উঠতে হচ্ছে। যাবার আগে সম্ভবত তিনি তাঁর নোটপ্যাডে কয়েকটি পয়েন্ট টুকে নিলেন। ওরা সেটা লক্ষ করল।

মোহনা বলল, যদি অনুগ্রহ করে জেলা পুলিশকে একটু আমাদের সহযোগিতা করতে বলেন। সম্ভবত এস. পি. এখন কলকাতাতেই রয়েছেন।

ও আই সি। তুমিও যাচ্ছ নাকি? বেশ যাও। টেক কেয়ার। আমি যতটুকু করার তা চেষ্টা করব। হ্যাঁ, বাই দি বাই, তোমার দাদার খবর কি? সে কী এখনও কানাডায়? ডাক্তারবাবু কি এদেশে ফিরবেন না? শঙ্খ হাসল শুধু।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মোহনাকে শঙ্খ বলল, এসে কোনো লাভ হল না, বুঝলি। কিছু তো লেখা যাবেই না, উল্টে উনি আমাদের থেকে কিছু ইনফরমেশন কালেক্ট করলেন।

নো। নট ইয়েট। ঠিক উল্টো। এটা ঠিক যে হি ইজ এ হার্ড নাট টু ক্র্যাক। আর হবে নাই বা কেন, এত বড় একটা পোস্ট হোল্ড করছেন। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা। বাজারে নাম আছে। হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম, ওঁকে আমরা উদ্বিগ্ন করে তুললাম। দেখলি না কেমন কথাগুলো গায়ে মাখছিলেন। কিছু একটা করবেন। আমি বলছি।

গোবিন্দপুরে গিয়েও খুব একটা সুবিধা হল না। আদিবাসীদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। তারা বলছে বিনা অজুহাতে অস্ত্র-পাচার সংক্রান্ত কেসে পুলিশ রুধনকে জড়িয়েছিল।

মোহনাকে শঙ্খ বলল, একটা সোর্স বলছে, অস্ত্র-পাচারকারীরা যারা এই জেলায় খুব সক্রিয় তারাই মেরেছে ওকে।

হোয়াই? রুধন তো পয়সার জন্য তাদের হয়েই খবর-পাচারের কাজ করতো।

হয়তো তা ঠিক নয়। পরে পুলিশের ভয়ে সে সব কাজ ছেড়ে দেয়। খেতে-খামারে কাজ করে তার দিন কাটতো।

যদি তাই হয়, তাহলে পুলিশ হেফাজতে মরবে কেন?

রুধনের শরীরে পুরোনো রোগ ছিল। পুলিশের অত্যাচারে বেচারার প্রাণ.....

গোবিন্দপুর সেদিনও থমথমে। পুলিশ চারদিক ঘিরে রেখেছে। কুম্বিং অপারেশন চলছে। লাশটা গায়েব হবার পর পুলিশ কিছুটা গা-ছাড়া ভাব দেখিয়েছিল। শঙ্খর ধারাবাহিক লেখা বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জেলা প্রশাসনের টনক নড়ে। ওপর থেকেও চাপ এসেছে।

জেলার এস. পি-র সঙ্গে মোহনা কথা বলছিল।

শঙ্খ বলল—মিস্টার জহুরি, কিছু ক্লু মিলল?

এস. পি. একটু তেরচা হাসি দিয়ে বললেন, যাবে কোথায়?

একটু পরে একজন ডি. এস. পি র‍্যাঙ্কের অফিসার স্যালুট করে এস. পি-র সামনে দাঁড়ালেন—জহুরি বললেন, ইয়েস চ্যাটার্জি, পেলে কিছু? চ্যাটার্জি যা বলল, তা এইরকম, গতকাল রাতে দূরে পাহাড়ের নীচে একটা শবদেহ পোড়ানো হয়েছে। পুলিশের অনুমান হয়তো রুধনের শবদেহ গোপনে কেউ কাল পুড়িয়ে দিয়েছে।

মোহনা বলল—বাট হোয়াই?

শঙ্খ ফস করে বলল, তথ্য লোপাট করার জন্য। এতে যারা লাভবান হবে তারাই একাজ করেছে।

শঙ্খ মোহনাকে বলল, তুই এখানেই থাক। আমি অফিসে একটু কথা বলেই ফিরে আসছি। এখনই না গেলে কাল খবরটা ক্যারি করতে পারবে না। ঘড়িতে দেখল সাড়ে চারটে বাজে।

এস. পি. বললেন, চলুন আমি সদরের দিকেই যাব, আপনাকে নামিয়ে দেব।

ওহ্, সো নাইস অফ ইউ!

ওরা চলে গেল।

মোহনা গভীর ভাবনায় ক্রমশ ডুবে যাচ্ছে। একটা ষড়যন্ত্রর আভাস পাচ্ছে সে। ঘটনাটা বা রুধনের মৃত্যুর কেসটা জটিল করার জন্য একটা নিটোল ছক কষা হয়েছে। কাল ডেডবডি পোড়ানো হয়েছে অনেকটা সে কারণেই। এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত।

মোহনা ভাবল, রুধনের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার দরকার। শঙ্খ চেষ্টা করেও পারেনি। গত চার-পাঁচ দিন সে ঘর থেকে বের হয়নি পর্যন্ত। রুধনের লাশ গায়েব হওয়ার পর থেকে তার স্ত্রী সূর্যের আলো দেখেনি। তার আগে যা প্রতিবাদ করার সেই করেছিল।

ঘরটা বসতি থেকে একটু দূরে। ঝোপঝাড় আর একটা মজে যাওয়া পুকুরের ধারে। ঘর বলা ভুল হবে। মাটি, ইট, কাঠ, পাথর আর ভাঙা টালি দিয়ে বানানো একটা ছোট খুপরি। ছোট্ট একটা জানলা। লাগোয়া আর একটি খুপরি রয়েছে।

মোহনাকে কেউ বাধা দিল না। চেহারার আভিজাত্য বরাবর তার কাজে দেয়। পুলিশের লোকজন হয়তো তাকে হেলথ্-এর লোক ভেবেছে।

আধো-আলো আধো-অন্ধকারে মোহনা ভিতরে গিয়ে যা দেখল তাতে তার বিস্ময়ের শেষ নেই। বছর পাঁচেকের শিশুটি দূরে ঘুমোচ্ছে। রুধনের স্ত্রী মাটিতে একটা মাদুরের ওপর সোজা হয়ে বসে আছে। আতঙ্ক ছড়িয়ে আছে সারা মুখে। কিন্তু চোখ দুটো জ্বলছে। হয়তো চাপা ক্ষোভ আর অভিমানে। বোঝা যাচ্ছে বেশ যে অনেক দিন রাত্রিজাগরণেই কাটিয়েছে।

কাল কারা রুধনের বডি পুড়িয়েছে জানেন?

উত্তর নেই।

কাউকে সন্দেহ করেন? রুধনকে কে বা কারা মারল?

কোনো উত্তর নেই।

হঠাৎই রুধনের স্ত্রী চেঁচিয়ে উঠল, সে নিজে মরে নাই। বলতেছি তো, বার বার বলতেছি। ওকে ওরা মেরেছে।

মোহনা আর কোনো প্রশ্ন করল না। রুধনের স্ত্রী মাদুরের ওপর হাত-পা ছুড়িয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। ঠিক যেন মাটিকেই আঁকড়ে ধরতে চায়।

রাতে সার্কিট হাউসে ফিরে মোহনা দেখল শঙ্খ তখনও ফেরেনি। বারবার তার রুধনের স্ত্রীর কথা মনে পড়তে লাগল। ওই ভাবে শুয়ে পড়া। ছটফট করা। যেন কিছু সে বলতে চাইছে। কিছু লুকোতেও। এক কাপ কফি নিয়ে বারান্দায় এসে চেয়ারে এলিয়ে বসে পড়ল মোহনা। তারপর জট খোলার চেষ্টা করতে চাইল। কিছুতেই একটা সমীকরণ মিলছে না। কালকের শবটা যদি রুধনের হয় তাহলে গত দু'দিন সেটা কোথায় ছিল? এবং হঠাৎ সেটা কাল পোড়ানো হলই বা কেন?

শঙ্খ এসে বলল, পুলিশ জানিয়ে দিয়েছে গতকাল রাতে রুধনের ডেডবডি পুড়িয়ে দিয়েছে তার আত্মীয়স্বজন। এ ব্যাপারে তারা নিশ্চিত। সুতরাং কালকেই সকালে পুরুলিয়া এক্সপ্রেস ধরে কলকাতায় ফিরতে হবে।

মোহনা বলল, কোনো প্রমাণ আছে তার? তুই জানতে চেয়েছিস? ভস্মের ডি এন এ টেস্ট করলেই বোঝা যাবে ওটা রুধনের শব ছিল কিনা। আই ডাউট হানড্রেড পারসেন্ট।

ইউ মাই ডিয়ার, ইউ আর গ্রেট। একটা হেডলাইন দিলি। কালকে ফিরে গিয়ে ছাড়ব। ফার্স্ট পেজ মাস্ট।

ওক্‌কে, ওক্‌কে। নাউ গেট লাস্ট। স্টুপিড ফুল।

শঙ্খ হাসতে হাসতে বলল, তাড়াতাড়ি খেয়ে নে। এ এক্স এন-এ একটা ভালো ছবি দেখব—দ্য প্রিন্স অ্যান্ড দ্য পপার।

মোহনার অস্থির লাগছে। খেতেও পারল না ভালো করে। ইমিডিয়েট তার একবার বেরুনো দরকার। শঙ্খকে কিছু বলার দরকার নেই। ঘড়িতে দেখল রাত নটা বাজে। একটা ব্যাপার সে লক্ষ করেছে পুলিশের টিকটিকিরা তার গতিবিধির ওপর নজর রাখছে।

পরদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে শঙ্খ দেখল মোহনা নেই। পাশের ঘরটার দরজা খোলা। টেবিলের ওপর একটা চিরকুট। 'রেডি হয়ে সোজা চলে আয় রুধনের বাড়ি। গাড়িতে ফিরব। চিন্তা করবি না, কাল পেজ ওয়ান লিডটা তোরই হবে। আমি নিশ্চিত।'

রুধনের বাড়ি পৌঁছতে মিনিট কুড়ি লাগল। জলার ধারে আসতেই দেখা গেল পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। জহুরি সাহেবও হাজির। মোহনা রুধনের আত্মীয়-পরিজনদের কিছু একটা বোঝাতে চেষ্টা করছে। কিছুতেই রুধনের স্ত্রীকে ঘর থেকে বার করা যাচ্ছে না। অনেক কষ্টে মোহনা তাকে বাইরে নিয়ে এল। সে অঝোরে কাঁদছে।

ভেতর থেকে একজন পুলিশ অফিসার বলে উঠলেন, স্যার, শি ইজ রাইট।

জহুরি মোহনার দিকে চেয়ে হাসলেন। শঙ্খ কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। হতচকিত সে। বুঝল তার অলক্ষ্যে অনেক কিছু ঘটেছে।

জহুরি বললেন, ম্যাডাম, কাল অত রাতে আপনার শ্মশানে যাওয়া ঠিক হয়নি। আমাদের বলে গেলে ভালো করতেন।

মোহনা মৃদু হেসে বলল, না বলে গেলেও ক্ষতি তো কিছু হয়নি। আপনার লোকজন তো ছিলই আমার পিছনে।

শঙ্খ এখনও কিছু বুঝতে পারছে না। তার মানে কাল সারা রাত মোহনা বাইরে ছিল। মোহনার হাতে ব্যান্ডেজ। তার মানে কোনো এনকাউন্টার হয়েছিল। জহুরি বললেন, খুন হয়ে যেতেন আর একটু হলেই।

মোহনা কাঁধ ঝাঁকাল। ভুল করে ওরা আমাকে পুলিশের লোক ভেবেছিল।

রুধনের ঘর থেকেই তার গলাপচা লাশ বের হল। পুলিশের লোক সঙ্গে সঙ্গে প্লাসটিকের প্যাকেটে সেটা মুড়ে ফেলল।

মোহনা ভীষণ চুপচাপ। কিছুই বলছে না। গাড়িতে যেতে যেতে শঙ্খ বলল, পুলিশের যেটা করা উচিত ছিল সেটা তুই একাই করেছিস। কিন্তু আমার খুব কৌতূহল হচ্ছে। তোর অপারেশনের ডিটেলটা বলবি? শ্মশানে গেলি কেন?

আমার সন্দেহ হয়েছিল শ্মশানে কোনো দাহ আদৌ হয়েছিল কিনা। পুলিশের লোকজন খেয়ালই করেনি। গিয়ে দেখি, শ্মশানের কিছুটা দূরে ঝোপের মধ্যে একটা আধপোড়া জন্তুর দেহ। নিশাচর পশুরা তখনও সেটা নিয়ে ব্যস্ত। এই কাজ সম্ভবত রুধনের বন্ধুবান্ধবরাই করেছিল। তারা জানতো আসল লাশটা কোথায়।

ও মাই গড! তারপর? তোকে অ্যাটাক করল কেন? আর তার আগে বল ওরা পোড়ানোর ঝুঁকিটা নিয়েছিল কেন?

পুলিশকে বোকা বানানোর জন্য। আমায় আক্রমণ করার কারণ হল ওরা আমায় পুলিশের চর ভেবেছিল। আই জি-র পাঠানো সিকিউরিটি না থাকলে.....

লাশটা যে ঘরেই ছিল, সেটা টের পেলি কি করে?

আসলে দাহকার্যের নেতৃত্ব দিয়েছিল রুধনের স্ত্রী স্বয়ং। দ্বিতীয়বার যখন ওর সঙ্গে দেখা করতে যাই তখন খেয়াল করি ওর শাড়ির পায়ের দিকের কিছু অংশ পোড়া। পোড়া জন্তুটাকে ওরা ধরাধরি করে অন্যত্র সরায়। সম্ভবত সেই সময় কাপড়টা পুড়ে গিয়ে থাকবে। তারপর আজ সকালে প্রথম যখন গেলাম, গিয়ে দেখি ঘরময় কাঁচা মাটি। শুকনো নয়। অর্থাৎ নতুন করে কেউ মাটি খুঁড়েছিল। কাঁচা কাজ করে ফেলেছিল শেষ পর্যন্ত রুধনের স্ত্রীই। শেষরক্ষা করতে পারেনি। লাশটা পচে ফুলে উঠেছিল। নতুন করে খুঁড়ে মাটির গর্ত বড় করে পুনরায় লাশটাকে পুঁতে দিয়েছিল। আমার চোখ আটকে গেল একটা জায়গায়—গতকালের মাটির লেভেল আর আজকের লেভেল এক ছিল না। তারপরই মিস্টার জহুরিকে খবর দিলাম। স্বামীর মরদেহ মাটিতে পুঁতে সে এতদিন আগলে বসেছিল। বড় অদ্ভুত প্রতিবাদ!

শঙ্খ মোহনার মাথায় একটা চাঁটি মেরে বলল, ক্রেডিটটা আমায় দে। আমি তোকে নিয়ে না এলে.....

মোহনা বলল, গাধা, আমি না এলে তোর ফার্স্ট পেজটা হত কি?

ওহ্ ইয়েস। আই মিন, অফ কোর্স। ম্যাডাম হেলেন, আমি আপনার কাছে বড়ই কৃতজ্ঞ রইলাম। দুজনেই হেসে উঠল।

[ভাদ্র ১৪১৩]

আইপড রহস্য

ত্র্যম্বক গাঙ্গুলী

বুম্বাদা কম্পিউটারে গান শুনছে। আমি এখন আর কী করব? তাই আমিও বসে গেলাম গান শুনতে। গান শুনতে শুনতে রাত ন'টা বেজে গেল। বুম্বাদা বলল, 'তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়, কাল সকাল সকাল উঠতে হবে।' আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে ছোটপিসিকে ডাকলাম। রাত সাড়ে ন'টার মধ্যে আমাদের খাওয়া শেষ হল। খাওয়ার পর আমরা শুতে গেলাম।

বুম্বাদা আমার পিসির ছেলে। ছোটো থেকেই ওর সঙ্গে আমার খুব ভাব। গরমের ছুটি ও শীতের ছুটিতে সময় পেলেই আমি ওর কাছে চলে আসতাম আর দু-তিন দিন থেকে যেতাম। এখন বুম্বাদা গোয়েন্দাগিরি করছে, আমি এখনও স্কুলে পড়ছি। ও গোয়েন্দাগিরির পথ ধরাতে আমার কিন্তু বেশ ভালোই হয়েছে। কোনো ছুটির সময় ওর কোনো কেস হাতে এলে আমিও লেগে যাই ওর সঙ্গে। এর ফলে ছুটিটা বেশ আনন্দেই কাটে আমার। এবারও ঠিক তাই হয়েছে। আমার এখন শীতের ছুটি আর ওর এখন একটা কেস হাতে এসেছে। তাই আমি ওর সঙ্গী হয়েছি। এবার অবশ্য কেসটা একটু অন্যরকম। ভবানন্দ গোস্বামী নামে হুগলি জেলার তারকেশ্বরের এক মন্দিরের পুরোহিতের ছেলের মুম্বাই থেকে আনা একটা আইপড চুরি গেছে। ভবানন্দের এক শিষ্য বুম্বাদার খুব প্রশংসা করায় বুম্বাদাকেই ভবানন্দ ডেকেছেন।

সকালে যখন ঘুম থেকে উঠলাম তখন দেখলাম ঘড়িতে সাড়ে চারটে। ঘুম ভাঙল অবশ্য বুম্বাদার ধাক্কাতেই। স্নান করে চা-বিস্কুট খেয়ে রওনা হলাম হাওড়া স্টেশনের উদ্দেশে। রিকশা করে হাওড়া স্টেশন যেতে লাগল কুড়ি মিনিট। টিকিট কেটে ট্রেনে উঠে দেখি ট্রেন প্রায় ফাঁকা। বুম্বাদা এক ফাঁকে স্টেটসম্যান কিনে নিল। ট্রেন ছাড়ার পর থেকে ও কাগজে সব খেলার স্কোরগুলোয় একবার চোখ বুলিয়ে নিতে লাগল। কিন্তু একটু পরেই দেখলাম ও কাগজ বন্ধ করে দিল এবং মুখটা প্রায় বেজার করে বলল, 'বুঝলি শুভ, রিয়াল মাদ্রিদ আবার কাল হেরে গেছে আর বার্সেলোনার সঙ্গে রিয়াল মাদ্রিদের পার্থক্য দশ পয়েন্ট। ইস্টবেঙ্গল কাল পিয়ারলেসের সঙ্গে ড্র করেছে আর মোহনবাগান জিতেছে পাঁচ গোলে। মোহনবাগান এখন লিগের প্রথমে আর ইস্টবেঙ্গল তিন নম্বরে। ইস্টবেঙ্গলের থেকে মোহনবাগান এগিয়ে সাত পয়েন্টে। আমার পছন্দের টিমগুলো দিন দিন খারাপ খেলেই চলেছে।'

অনেক কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে এবং কনকনে শীতের হাওয়া খেতে খেতে আমরা তারকেশ্বর স্টেশনে নামলাম। বুম্বাদা মোবাইল থেকে ভবানন্দকে ফোন করে জানাল যে, ভবানন্দের শিষ্য রমানন্দ চ্যাটার্জি 'আনন্দময়ী' নামক হোটেলে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন। কাউকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে হল না। কিছুক্ষণ হাঁটার পরেই দেখলাম একটু দূরে এক জায়গায় 'আনন্দময়ী' লেখা। সেখানে গিয়ে দেখলাম ভবানন্দের শিষ্য অপেক্ষা করছিলেন, তিনি একটা সাইকেল নিয়ে এসেছিলেন। আর আমাদের জন্য একটা রিকশা ঠিক করে দিলেন। ভবানন্দের বাড়ি পৌঁছতে লাগল দশ মিনিট। বাড়িটা খুব পুরোনো নয়। সামনে বাগান, পাথরের রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলে দুটো গ্যারেজ। বাড়িটা তিনতলা। আমরা বৈঠকখানায় গিয়ে বসলাম। বেশি আসবাবপত্র না থাকলেও বেশ গোছানো ঘরগুলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভবানন্দ গোস্বামী এলেন। তাঁর বয়স মনে হয় আশির ওপর। লাঠি নিয়ে চলেন। কোমরে বেল্ট বাঁধা আছে। উনি এগিয়ে আসতে আমরা উঠে দাঁড়ালাম। উনি নমস্কার করলেন এবং চেয়ারে বসতে বললেন।

আলাপ-পরিচয়ের পর ভবানন্দ সোজাসুজি আসল কথায় এলেন, বললেন তাঁর ছেলে দশ দিনের ছুটিতে মুম্বাই থেকে এখানে এসেছে। 'সে এসেই বলেছিল যে প্রায় এক লাখ টাকার একটা গান শোনার যন্ত্র কিনেছে। কী যেন বলল? হ্যাঁ আইপড, তাতে নাকি অনেক কিছুই করা যায়, তা আপনি আমার ছেলের কাছ থেকে জানতে পারবেন। এখন হচ্ছে কি ও দুই দিন একটু ব্যস্ত ছিল। কলকাতায় গেছিল ওর বন্ধুর বাড়িতে। সেখানে ও আইপডটা নিয়ে গেছিল, কিন্তু ফেরার পর দেখে আইপডটা নেই। ওর স্পষ্ট মনে আছে ও গান শুনে আইপডটা ওর শোবার ঘরের টেবিলে রেখেছিল সেই রাত্রে। সকালে উঠে দেখে সেটা নেই।'

'আইপডটা কত বড় হবে?' বুম্বাদা জিজ্ঞাসা করল।

'দুই থেকে আড়াই ইঞ্চি।'

'আপনার বাড়িতে এখন অন্য কেউ, যেমন ধরুন, আপনার ছেলের বন্ধু বা যাকে সন্দেহ করা যায়, আছে কি?'

'না, না, সেরকম কেউ আসেনি। এমনিতে তো আমাদের বাড়িতে অনেক শিষ্যের সমাগম হয়, কিন্তু তারা কেউ আমার ছেলের তেতলার ঘরে যায় না। অবশ্য হ্যাঁ, এই ক'দিন আমার ভাইপো মানে আমার স্বর্গগত দাদা সদানন্দ গোস্বামীর ছেলে এসে রয়েছে আমার ছেলে আছে বলে।'

'আপনার বাড়িতে এখন লোক কতজন?'

'লোক বলতে আমি আর আমার দুই ভাই, ছেলে তো বছরে দু'বার আসে আর আমার স্ত্রী অনেক দিনই হল গত হয়েছেন। এছাড়া আছে আমার দুই চাকর। তারা আমার ছেলের জন্মের আগে থেকে এই বাড়িতে আছে। তারা খুবই বিশ্বস্ত।'

'আপনার ছেলের সঙ্গে কি এখন কথা বলা যেতে পারে?'

'না, ও আর আমার ভাইপো একটু কলকাতায় গেছে। হয়তো দু-তিন ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসবে। আপনি ওর সঙ্গে এখন ফোনে কথা বলতে পারেন।'

'আচ্ছা আপনার ছেলের ঘরে কি একবার যাওয়া যায়?'

'গোবিন্দ, ওনাদের একবার ইন্দ্রজিতের ঘরটা দেখিয়ে দাও।'

ঘরটা এমন কিছু আহামরি নয়। দুটো গিটার, একটা খাট আর তার পাশেই একটা টেবিল। এই টেবিলেই মনে হয় সেই আইপড রাখা হয়েছিল। বুম্বাদা সব ভালো করে দেখে নিল। নীচে গিয়ে বুম্বাদা ভবানন্দকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার দুই ভাই কোথায়?' ভবানন্দ বললেন, 'আমার মেজো ভাই দেবানন্দ আছে মন্দিরে। ও সারাদিন পুজো নিয়েই থাকে। আর ছোটো ভাই শিবানন্দ আগে সরকারি চাকরি করত কিন্তু এখন মনে হয় শিবু কোনো বন্ধুর বাড়ি গেছে।'

'বিকালে সবাইকে পাওয়া যাবে?' বুম্বাদা জিজ্ঞাসা করল।

এই কথা বলতে না বলতেই বেল বাজল। গোবিন্দ দরজা খুললে দেখলাম শিবানন্দ অর্থাৎ ভবানন্দের ছোটো ভাই ডান পায়ে ব্যান্ডেজ করা অবস্থায় প্রবেশ করলেন। তিনি লাঠি হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে এলেন। শোনা গেল যে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে তাঁর পায়ে লেগেছিল পাঁচ-ছ'দিন আগে। আজকে পায়ে ব্যথা বেশি বোধ হওয়ায় তিনি তাঁর বন্ধু ডাঃ বিজয় দাসের কাছ থেকে এক্স-রে করিয়ে ডান পা ব্যান্ডেজ করে এনেছেন। তাই ঠিক হল বিকালেই সবার সঙ্গে কথা বলা যাবে, এখন নয়।

ভবানন্দের বাড়ি থেকে ফেরবার পথে আমরা বাবা তারকেশ্বরের মন্দির দর্শন করে হোটেলে ফিরলাম এবং খাওয়ার পর একটু ঘুমও দিয়ে দিলাম। ঠিক পৌনে পাঁচটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম ভবানন্দের বাড়ির উদ্দেশে।

সেখানে গিয়ে দেখি সবাই উপস্থিত। অবশ্য বুম্বাদা আগেই বলে এসেছিল বিকালে তাদের থাকতে। ইন্দ্রজিতের বয়স পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে হবে। শুনলাম সে নাকি যাদবপুর থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে মুম্বাইতে একটা কোম্পানিতে কাজ করছে।

'আচ্ছা আপনি আইপডটা কখন দেখলেন নেই?' বুম্বাদা ইন্দ্রজিৎকে প্রশ্ন করল।

'একেবারে সকালে ঘুম থেকে উঠেই টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখি যে আইপড নেই।'

'রাত্রে কেউ ঘরে ঢুকছে টের পেয়েছিলেন?'

'না, একেবারেই কিছু টের পাইনি।'

'রাত্রে ঘুম থেকে উঠেছিলেন একবারও?'

'না, উঠিনি।'

'আমি একটু বাথরুম থেকে আসছি'—হঠাৎ এই বলে ভবানন্দের ছোটো ভাই শিবানন্দ আস্তে আস্তে উপরে উঠে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ফিরে এলেন। আমি তাঁর মধ্যে পার্থক্য কিছুই দেখলাম না কিন্তু বুম্বাদা আড়চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে কী একটা দেখল।

ভবানন্দের ভাইপো অর্থাৎ বিশ্বজিৎ পিয়ারলেসে চাকরি করে। তার অফিস বারাসতে। ইন্দ্রজিতের সঙ্গে তার খুব ভালো সম্পর্ক। ইন্দ্রজিৎ আসায় এই কয়েকদিন সে ছুটি নিয়েছে।

'এই চুরি সম্পর্কে আপনি কী বলেন?' বুম্বাদা বিশ্বজিৎকে প্রশ্ন করল।

'আমি আর ইন্দ্রজিৎ তো এক ঘরেই শুয়েছিলাম, আমিও কিছু টের পাইনি।'

'দরজা খোলার আওয়াজ একবারও পাননি?'

'না।'

'বাথরুমে গেছিলেন রাত্রে?'

'হ্যাঁ, একবার।'

'তখন কাউকে দেখেছিলেন ঘরে ঢুকতে বা বেরোতে?'

'না, সেরকম কাউকে দেখিনি।'

দেবানন্দ, ভবানন্দের মেজো ভাই একজন পুরোহিত। তিনি বিয়ে করেননি। সারাদিন পুজো নিয়েই থাকেন। বুম্বাদা কিছু বলার আগেই দেবানন্দ বললেন, 'আর আপনাকে কী বলব বলুন? আমাদের বাড়িতে এই প্রথম চুরি। আমাদের মানসম্মান একেবারে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে।'

'আপনি রাত্রে ঘুম থেকে উঠেছিলেন?' বুম্বাদা দেবানন্দকে প্রশ্ন করল।

'না, আমি প্রায় রোজই ঘুমের ট্যাবলেট খাই। আর সেই রাত্রে আমি ঘুম থেকে উঠিনি। অবশ্য ঘুমের ট্যাবলেট খেলে ঘুম থেকে ওঠার প্রশ্নই ওঠে না।'

ভবানন্দের ছোটো ভাই শিবানন্দ আগে সরকারি অফিসে চাকরি করতেন। দু-বছর হল তিনি অবসর নিয়েছেন। তিনিও বিয়ে করেননি। সারাদিন তিনি বই নিয়েই মেতে থাকেন।

'আপনি সেদিন রাত্রে উঠেছিলেন?' বুম্বাদা প্রশ্ন করল শিবানন্দকে।

'এখন তো আমার পায়ে লাগা দেখতেই পারছেন। রাত্রে তাই আর উঠতে পারিনি। সেদিনও উঠিনি। সকালে পায়ে মলম লাগানোর পর বিছানা থেকে উঠি।'

'সেদিন রাত্রে কোনো আওয়াজ শুনেছিলেন?'

'না, সেরকম কিছু শুনিনি।'

বুম্বাদা বলল যে, সে সবার ঘরগুলো আরেকবার ভালো করে দেখবে। সকালে ইন্দ্রজিতের ঘরটা দেখলেও বুম্বাদা আরেকবার ঘরটা ভালো করে দেখে নিল। ইন্দ্রজিতের ঘরের পাশে একটা ছোটো ঘর। সেখানে কেউ থাকে না। তার পাশের ঘরটা শিবানন্দের। শিবানন্দের ঘরটা বেশ গোছানো। ঘরে একটা শোবার খাট, তার পাশে সোফা, একটা পড়ার টেবিল, চেয়ার ছাড়াও একটি টিভি আছে। যদিও টিভিটা খারাপ না ভালো বোঝা গেল না। টিভির পাশে একটা বড়ো আলমারি। শিবানন্দের ঘরের মধ্যে দিয়েই আরেকটা ছোটো ঘরে যাওয়া যায়। সেই ঘরে শুধু বই আর বই। খুব সুন্দরভাবে তাকে সাজানো। দেখেই বোঝা যায় ভদ্রলোকের বইয়ের ওপর খুব যত্ন।

শিবানন্দের ঘরের পাশের ঘরটাই দেবানন্দের। দেবানন্দের ঘরেও একটা ছোটো সোফা, খাট,

আলমারি। এবং মহাদেবের সিংহাসনও আছে। সারা ঘরেতে শুধু পৈতে আর গীতা। আর কিছু আমাদের দেখার ছিল না। আমার সেরকম কিছুই চোখে পড়েনি। আমার নজর না পড়লেও বুম্বাদার চোখে পড়তেই পারে। পড়তেই পারে নয় পড়েছেও হয়তো। বাইরে বেরিয়ে সব জিজ্ঞাসা করতে হবে ওকে। চা আর বিস্কুট খেয়েই আমরা রওনা দিলাম। রাস্তায় আর কিছু কথা হয়নি। আমাদের সন্ধে সাতটায় ট্রেন ছিল, তাই কোনো-রকমে প্ল্যাটফর্মে এসে দেখি ট্রেন ছাড়ার সিগন্যাল দিয়েছে এবং তাড়াতাড়ি একটা কামরায় উঠে পড়লাম। কামরাটা ফাঁকাই ছিল। চারিদিকে অন্ধকার। মাঝে মাঝে আলো দেখা যাচ্ছে। আলো আসছে বোধহয় বাড়িগুলো থেকে। সকালে যাবার সময় যে ধানক্ষেত দেখেছিলাম এখন আর তা দেখা যাচ্ছে না। শেওড়াফুলিতে অনেকে নেমে পড়ল। তখন কামরা একটু ফাঁকা হতেই আমি বুম্বাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'অত কী ভবানন্দের বাড়িতে মন দিয়ে দেখছিলে? আমার তো সেরকম কিছু চোখে পড়েনি। এ তো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে.....' আমাকে থামিয়ে দিয়ে বুম্বাদা বলল, 'এখন নয়। বাকি সব আলোচনা বাড়ি ফেরবার পর।'

বাড়ি ফিরতে রাত দশটা হল। এসে দেখি পিসি, পিসেমশাই খুবই চিন্তা করছে। কথাবার্তা সব হল খাওয়ার পর।

'তোর কাকে চোর বলে মনে হয়?' বুম্বাদা আমাকে জিজ্ঞাসা করল।

আমি বললাম, 'ভবানন্দের ভাইপোকে। ও তো সব সময় আস্তে আস্তে উত্তর দিচ্ছিল। তুমি যখন জিজ্ঞাসা করলে ও রাত্রে উঠেছে কিনা ও তখন এই প্রশ্ন শুনে প্রায়ই কেঁপেই উঠেছিল। তোমার কাকে সন্দেহ হয়?'

'আমার তিনটে জায়গায় খটকা লেগেছে।

এক, ভবানন্দের ভাইপো কেন এত ভেবে ভেবে উত্তর দিচ্ছিল?

দুই, শিবানন্দ মাঝখানে কেন উপরে গেছিলেন? তিনি কি সত্যিই বাথরুমে গেছিলেন না অন্য কিছু করতে গেছিলেন? যাবার সময় পায়ে পরেছিলেন চটি আর ফিরে এলেন একটা পুরনো পাম্পশু পরে। কেন?

তিন, দেবানন্দ ঘুমের ট্যাবলেট খান সেটার প্রমাণ আছে। তাঁর ঘরের টেবিলের ওপর অনেকগুলো ট্যাবলেট রাখা ছিল। কিন্তু দেবানন্দের ঘরে আলমারির পিছনে ক্লোরোপ্যাকের শিশি রাখা কেন? ক্লোরোপ্যাক নিলে ঘুম হয় সেটা আমি জানি। যদি তিনি সত্যি ক্লোরোপ্যাক নেন তাহলে তিনি শিশিটা টেবিলে রাখতে পারতেন। কিন্তু আলমারির পিছনে কেন? এটা কি লুকোবার চেষ্টা?

এই সব তথ্য দিয়ে কে চোর তা বলা সম্ভব নয়। আরও তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।' তারপর আর রাত্রে কিছু কথা হয়নি।

(২)

সকালে একেবারে ঘুম ভাঙল বুম্বাদার ডাকে। প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে পড়লাম। একঘণ্টা পরে বাড়ি ফিরলাম গরম সিঙাড়া নিয়ে। তারপর বুম্বাদা ট্রেনের চার্ট খুলে দেখল কখন তারকেশ্বর লোকাল ছাড়বে। ও বলল যে দুপুর দুটোয় একটা তারকেশ্বরের লোকাল আছে।

সেই মতো খেয়ে-দেয়ে হাওড়া স্টেশন পৌঁছলাম। মাত্র চারটে স্টেশনে ট্রেনটা থামল। তাই সাড়ে তিনটের মধ্যেই আমরা 'আনন্দময়ী' হোটেলে পৌঁছলাম।

'তুমি ভবানন্দকে ফোন করেছ?' আমি বুম্বাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম।

'না, আমি বলেছি যে তিনদিন পরে আসব। কিন্তু আমি যে আজকেই চলে আসব সে কথা তাঁকে জানাইনি।'

রিকশায় উঠেই বুম্বাদা ভবানন্দকে ফোন করল। জানিয়ে দিল যে, আমরা আধঘণ্টার মধ্যে আসছি।

'ফোনটা কে ধরেছিল?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'শিবানন্দ। প্রায় চমকেই গেছেন।'

আধঘণ্টা নয় আমরা ভবানন্দের বাড়ি পৌঁছলাম দশ মিনিটের মধ্যে। দালানের সিঁড়ি দিয়ে উঠছি আর এমন সময় দেখি শিবানন্দ সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। তাঁর নামাটা দেখে আমার একটু খটকা লাগল, কিন্তু কিসের জন্য তা ধরতে পারলাম না।

'আমি এক্ষুনি আসছি।' এই বলে শিবানন্দ গেটের দিকে এগিয়ে গেলেন।

'আপনি আজকেই এলেন!' ভবানন্দ আমাদের দেখে অবাক হয়ে গেলেন।

'আমি একটু উপরে যাচ্ছি, আপনার কোনো অসুবিধা নেই তো?' বুম্বাদা ভবানন্দকে জিজাসা করল।

'না, না।'

বুম্বাদা তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল। আমিও গেলাম তার পিছন পিছন। প্রথমে ও ঢুকল দেবানন্দের ঘরে এবং তন্ন তন্ন করে সারা ঘরটায় কী খুঁজতে লাগল। তারপর ও ঢুকল শিবানন্দের ঘরে। আবার খুঁজতে লাগল। খাটের তলায় টর্চ মেরে দেখতে লাগল। হঠাৎ আমার কানে ভেসে এল নোকিয়া কলার টিউন।

'বুম্বাদা, মেসেজ এসেছে মনে হয়।'

বুম্বাদার চোখে পড়ল টেবিলে রাখা শিবানন্দের মোবাইল, যেখান থেকেই এসেছিল আওয়াজটা। বুম্বাদা শিবানন্দের মোবাইলে ইনবক্স খুলল। ইনবক্স খুলতে মেসেজ-এর লিস্টটা আমার চোখে পড়ল। সব মেসেজই দেখলাম ডাঃ বিজয় দাসের নামে। বুম্বাদা পড়তে থাকল মেসেজগুলো। তিন-চারটে মেসেজ পড়ে বুম্বাদা যথাস্থানে মোবাইল রেখে দিল। আমরা সিঁড়ি নিয়ে নীচে নেমে গেলাম।

'দেখা হল?' ভবানন্দ আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন।

'কিছু হল, আজ তাহলে আসি।' এই বলে বুম্বাদা এগিয়ে চলল গেটের দিকে। গেট থেকে বেরোবার সময় চোখ পড়ল শিবানন্দ খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে আসছেন।

'চলে যাচ্ছেন?' শিবানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ।' বলে বুম্বাদা ঘুরল ডানদিকে। কিন্তু স্টেশন যেতে হলে তো বাঁদিকে যেতে হবে। একটু এগিয়ে গিয়ে 'বীণা' নামক হোটেলে বুম্বাদা ঢুকল।

'আপনাদের কি উত্তর দিকের ঘর ফাঁকা আছে?' বুম্বাদা হোটেলের ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ, দেখছি একটা ঘর ফাঁকা আছে বোধহয়।' একটা হোটেলের লোক আমাদের ঘরটায় নিয়ে গেল। জানলা খুলে দেখি যে ঘরটা একবারে শিবানন্দের ঘরের সোজাসুজি। এই দেখে তো আমি অবাক! তাই বুম্বাদা এই হোটেলে উঠেছে। ঘর বুক করা হল দু'দিনের জন্য। ঘরে টিভিও ছিল তাই আমি আর বুম্বাদা বসে গেলাম ইস্টবেঙ্গল-চিরাগ ম্যাচ দেখতে। আমি সন্ধ্যাবেলায় হোটেলেই ছিলাম। বুম্বাদা মাঝখানে একটু বেরিয়ে গিয়েছিল। তবে কী জন্য তা জানি না। সন্ধে আটটার মধ্যে ও ফিরে এল। এই সময়টুকু আমি গল্পের বই পড়ে কাটিয়ে দিলাম।

বুম্বাদা ফিরে আসতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কাকে তোমার দোষী বলে মনে হচ্ছে?'

'শিবানন্দ আর দেবানন্দকে চোখে চোখে রাখতে হবে তাই তো এখানে আসা।'

'আর তুমি বিশ্বজিতের কথা ছেড়েই দিলে?'

'না, না, কাউকেই এখন ছাড়া যায় না। তবে শিবানন্দকেই আমার বেশি সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছে।'

আমি কিছু বলার আগেই বুম্বাদা বলে উঠল, 'তোকে বলা হয়নি। এখন ডাঃ বিজয় দাসের চেম্বারেই গেছিলাম, ডাঃ দাসের ওপরেও নজর রাখতে হবে। গিয়ে দেখি শিবানন্দ চেম্বারে বসে আছেন।'

'তোমাকে দেখে শিবানন্দ কী বললেন?' আমি বুম্বাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম।

'শিবানন্দ আমায় চিনতে পারলে তো হয়েই যেত। আমি এখান থেকে বেরিয়ে স্টেশনের কাছে একটা দোকানে যাই। সানগ্লাস, টুপি, ফল্‌স চুল, দাড়ি, গোঁফ ইত্যাদি কিনে এনেছি। আর শুধু টুপি আর ফল্‌স গোঁফ লাগিয়ে যাই ডাঃ বিজয় দাসের চেম্বারে। গিয়ে দেখি শিবানন্দ তাঁর পাশেই বসে আছেন। মনে হয় কোনো কথা বলছিলেন কিন্তু আমি যেতে সবাই চুপ হয়ে গেলেন। সর্দি-কাশি হয়েছে বলাতে ডাঃ দাস একটি ওষুধও লিখে দেন।'

'আজ তোমার কী কী চোখে পড়ল?' আমি বুম্বাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম।

'আবার তিনটে জিনিস ঃ

এক, ক্লোরোপ্যাকের যে শিশিটা কাল দেবানন্দের আলমারির পিছনে দেখেছিলাম সেটা আজ সেখানে ছিল না, ছিল শিবানন্দের খাটের তলায়।

দুই, শিবানন্দের ডান পায়ে ব্যান্ডেজ ছিল কালকে। তাই তাঁর ডান পা খোঁড়ানো উচিত। কিন্তু হয়তো তিনি আজ ভুলবশত তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় বাঁ পা খোঁড়াচ্ছিলেন। তাতে একটা জিনিস প্রমাণ হল যে, শিবানন্দের পায়ে আসলে লাগেনি। সেটা ধাপ্পা। আমার মনে হয় তিনি সন্দেহ খাটাবার জন্য ডাঃ দাসের থেকে পা ব্যান্ডেজ করে নিয়ে এসেছেন।

তিন, শিবানন্দের মোবাইলে মেসেজ ইনবক্সের প্রথম মেসেজটাই ছিল বিজয় দাসের। সেটায় লেখা ছিল Hoping joy. Tomorrow 9.00 A.M. meeting at station। Hoping joy কিসের নাম বলতে পারবি?' বুম্বাদা আমায় জিজ্ঞাসা করল।

'না, পারব না।'

'কালকের স্টেটসম্যান-এ দেখেছিলাম। Hoping joy একটা ঘোড়ার নাম। শনিবারের রেসে ঘোড়াটা সবার শেষে ফিনিশ করেছে। এই দেখে বোঝা যায় শিবানন্দ আর বিজয় দাস ঘোড়ার রেসের সঙ্গে যুক্ত। আর মেসেজ-এর পরের অংশ পরিষ্কার। কাল স্টেশনে সকাল ৯টায় দেখা হবে। অর্থাৎ কাল সকালে তাড়াতাড়ি উঠে ছদ্মবেশে আমাদের ন'টার আগে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে স্টেশনে।'

রাত্রে পিসি-পিসেমশাইকে বুম্বাদা ফোন করে জানিয়ে দিল যে, আমরা আজ রাত্রে ফিরব না, হয়তো কাল ফিরব।

(৩)

সকাল ছ'টায় ঘুম থেকে উঠে পড়লাম। স্নান করে, জলখাবার খেয়ে, শুরু হল আমাদের সাজ। টুপি পালটে গেল। কাল নীল যে টুপিটা পরে বুম্বাদা বিজয় দাসের চেম্বারে গিয়েছিল সেই টুপিটা পরলাম আমি। বুম্বাদা আরেকটা হলদে রঙের টুপি পরল। ও ফল্‌স দাড়ি ও চুল লাগাল। আমি পরলাম একটা সানগ্লাস। সাজতে আমাদের লাগল প্রায় আধঘণ্টা। তারপর আমরা ঠাকুর দর্শন করে স্টেশনে পৌঁছলাম। বুম্বাদা আমাকে স্টেশনের বাইরে দাঁড়াতে বলে টিকিট কাটতে গেল। কিন্তু ন'টা বেজে যাবার পরও দেখছি শিবানন্দ আসছেন না। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই দেখি বিজয় দাস রিকশা থেকে নামলেন। তিনি স্টেশনের গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই শিবানন্দও চলে এলেন। আমরা ওঁদের সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগলাম। ওঁরা ট্রেনের যে কামরাটায় উঠলেন আমরা সেই কামরাতেই উঠলাম। শিবানন্দ ও বিজয় দাসের থেকে একটু দূরে বসলাম। তবে আমাদের জায়গা থেকে তাঁদের প্রায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। আমার এবার চোখ আর ধানক্ষেতের দিকে ছিল না, ছিল শিবানন্দের দিকে। দেড়ঘণ্টার মধ্যে আমরা হাওড়া স্টেশন পৌঁছলাম। হাওড়া স্টেশনে নেমে দেখলাম শিবানন্দ বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই তিনি বেরিয়ে এলেন।

'কিছু বুঝতে পারলে?' আমি বুম্বাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম।

'মনে হয় ব্যান্ডেজটা খুলতে গিয়েছিলেন। দ্যাখ চটির ফাঁক দিয়ে ব্যান্ডেজটা আর দেখা যাচ্ছে না।'

'আচ্ছা বুম্বাদা, আরেকটা জিনিস লক্ষ করেছ যে, শিবানন্দ আর খোঁড়াচ্ছেন না, দিব্যি হেঁটে চলেছেন।'

'এই থেকে প্রমাণ হয় যে, শিবানন্দের পায়ে চোট লাগেনি।'

ওরা হাওড়া স্টেশন থেকে একটা ট্যাক্সি ধরল। আমরাও অরেকটা ট্যাক্সি ভাড়া করলাম।

'সামনের ২৯১৯ ট্যাক্সির পিছু ধরো,' বুম্বাদা ট্যাক্সির ড্রাইভারকে বলে দিল।

'ঠিক আছে সাব।'

মাঝখানে একটা সিগন্যালের জন্য আমাদের ট্যাক্সি একটু পিছনে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু বেশিক্ষণ না যেতেই আবার ওদের ট্যাক্সির কাছে চলে এলাম। সামনের ট্যাক্সি থামল রেসকোর্সে। আমাদের ট্যাক্সি একটু পিছনে দাঁড়াল। আমাদের ট্যাক্সির ড্রাইভার মনে হয় রহস্যের গন্ধ পেয়ে গিয়েছিল। তাই সে বলল যে, সে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে, অন্য কোনো ভাড়া নেবে না। বুম্বাদা রামজির অর্থাৎ ট্যাক্সির ড্রাইভারের মোবাইল নাম্বার নিয়ে নিল আর আমরা আবার শিবানন্দের পিছু ধরলাম। শিবানন্দকে সারা রেস জুড়ে আমরা চোখে চোখে রাখলাম। শিবানন্দ ১ নং গেট দিয়ে বেরোলেন। বুম্বাদা তার আগেই রামজিকে ফোন করে দিয়েছিল। আবার আমরা ২৯১৯ ট্যাক্সির পিছু নিলাম। সামনের ট্যাক্সি থামল ধর্মতলার শ্রীলেদার্স-এর সামনে। রামজিও ট্যাক্সি দাঁড় করাল একটু পিছনে।

'তুই এখানে দাঁড়িয়ে থাক, আমি দোকানের ভেতরে যাচ্ছি।' এই বলে বুম্বাদা শিবানন্দর পিছু ধরে শ্রীলেদার্স-এর দোকানে ঢুকে গেল। হঠাৎ আমার চোখ পড়ল একটা টুপি-পরা লোকের ওপর। উল্টো ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছে। রেসের মাঠেও একে দেখেছিলাম। এ আবার আমাদের পিছু নিল না কি? বুম্বাদা এলে ওকে বলতে হবে। এই নিয়ে ভাবছি এমন সময় দেখি শিবানন্দ আর ডাঃ দাস দোকান থেকে বেরিয়ে আসছেন। শিবানন্দের হাতে শ্রীলেদার্স-এর প্যাকেট। তাঁর পিছনে বুম্বাদাও। বুম্বাদার হাতেও শ্রীলেদার্স-এর প্যাকেট। বুম্বাদা আমার দিকে এগিয়ে এল।

'আচ্ছা, উল্টো ফুটপাথে যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে তাকে তো রেসের মাঠেও দেখেছি।' আমি বুম্বাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম।

'তোর আগেই আমার চোখে পড়েছে। একটু চোখে চোখে রাখতে হবে আর কি।'

আমি কিছু বলার আগেই বুম্বাদা বলল, 'শিবানন্দ একটা নতুন হাইহিল শু কিনেছেন, আমারও সেই একই জিনিস।' বুম্বাদা রামজিকে ভাড়া মিটিয়ে দিল আর আমরা আবার শিবানন্দের পিছু ধরলাম। কিছুক্ষণ হাঁটার পরে দেখলাম ওঁরা দাঁড়িয়েছেন নিউ মার্কেটে এক মুচির কাছে। তারপর শিবানন্দ তাঁর নতুন জুতো বের করে মুচিকে কী একটা যেন বললেন।

'তুই প্যাকেটটা ধর, আমি একটু আসছি।' এই বলে বুম্বাদা আমাকে শ্রীলেদার্স-এর প্যাকেট দিয়ে মুচির দিকে এগিয়ে গেল।

মুচিকে বুম্বাদা নিজের জুতোটা দেখিয়ে মনে হয় পালিশ করার কথাই বলল। কিছুক্ষণ পরেই বুম্বাদা ফিরে এল।

'মারাত্মক ব্যাপার, পরে সব বলব।'

শিবানন্দ ও বিজয় দাস আরেকটা ট্যাক্সিতে উঠলেন। আমরাও ট্যাক্সি স্ট্যান্ড থেকে একটা ট্যাক্সি ধরলাম। 'সামনের ৩০৫১ ট্যাক্সিতে ফলো করো।' বুম্বাদা ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলল।

ওঁদের ট্যাক্সি আর কোথাও দাঁড়ায়নি, একেবারে হাওড়া স্টেশন। বুঝলাম ওঁরা বাড়ি ফিরছেন। হাওড়া স্টেশনে শিবানন্দ আবার বাথরুমে ঢুকলেন ব্যান্ডেজ পরতে। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছিলাম। কিছুক্ষণ পরেই ট্রেন ছেড়ে দিল। আমরা ভিড়ের মধ্যে কামরায় ঢুকে গেলাম। আমাদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল শিবানন্দের ওপরে। তারকেশ্বর পৌঁছে ওঁরা একটা রিকশায় উঠলেন, আমরাও একটা রিকশা নিয়ে তাঁদের পিছু ধরলাম। ডাঃ দাস বাজারে একটা গলির সামনে নেমে গেলেন। শিবানন্দ রিকশা থেকে নামলেন তাঁর বাড়ির সামনে। আমরা শিবানন্দকে পাশ কাটিয়ে নামলাম সেই হোটেলে। হোটেলের ঘরে ঢুকে আমি বুম্বাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মুচির কাছে কী দেখলে?'

'জুতোর হিল পাশ থেকে ফুটো করা হচ্ছে। ওই গর্তের মধ্যেই থাকবে আইপড, আর আমি এখন একটু বেরুচ্ছি।'

'তুমি এখন আবার কোথায় যাচ্ছ?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'বাজারে এক মুচির কাছে। আমারও এই ডানপায়ের জুতোর হিলটা ফুটো করতে হবে।'

'তুমি আবার জুতো বদলের চিন্তা করছ না কি?'

'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছিস।'

হঠাৎ দরজার পাশ থেকে কার একটা ফোন বেজে উঠল। 'কে?' চিৎকার করে বুম্বাদা ছুটে গিয়ে দরজা খুলল। সিঁড়ির দিকে টর্চ ফেলল। দেখতে পেলাম একটা লোক দৌড়ে নীচে নেমে গেল।

'ঠিক আছে, আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছি। তুই কিন্তু ঘরেই থাকিস।'

বুম্বাদা চলে যাবার পরে আমি দূরবীন দিয়ে শিবানন্দের ঘরের দিকে লক্ষ রাখছিলাম। বুম্বাদা আধঘণ্টার মধ্যে ফিরে এল। এর মধ্যে শিবানন্দকে কিছু সন্দেহজনক কাজ করতে দেখিনি।

'তুই দূরবীন দিয়ে শিবানন্দের ঘরের দিকে চোখ রাখ। আমি রেস্টুরেন্ট থেকে খাবার নিয়ে আসছি।' এই বলে বুম্বাদা আবার বেরিয়ে গেল।

রাত ন'টার সময় দেখলাম শিবানন্দ জুতোর প্যাকেট থেকে জুতোটা বের করলেন তারপর আইপডটা হিলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। আইপডটা দেখে যতদূর মনে হল নীল রঙের। ফিরে এসেই বুম্বাদা বলল, 'শিবানন্দ আইপড নিয়ে কী করলেন দেখলি?'

'হ্যাঁ, আইপডটা ডান পায়ের জুতোর হিলের মধ্যে ঢুকিয়েছেন।'

'যাক তা হলে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল যে আইপডটা জুতোর মধ্যেই আছে।

বুম্বাদা লুচি আর আলুর দম কিনে নিয়ে এনেছিল। তাই খেয়ে নিয়ে আমরা বসে পড়লাম টিভি দেখতে। রাত্রেই খেলা ছিল রিয়াল মাদ্রিদ-চেলসি। হাফ টাইমে রিয়াল এক গোলে জিতছিল। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

(৪)

সকালে ঘুম থেকে উঠেই খুব ব্যস্ততা। তাই সকালে আর জিজ্ঞাসা করা হয়নি ম্যাচটা কে জিতল। স্নান সেরে জলখাবার খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম ভবানন্দের বাড়ির উদ্দেশে।

'কী? আর ক'দিন লাগবে?' ভবানন্দ আমাদের দেখে জিজ্ঞাসা করলেন।

বুম্বাদা উত্তর দিল, 'প্রায় শেষের দিকে বলতে পারেন। আসলে আমি শিবানন্দবাবুর থেকে একটা বই নিতে এসেছি। উনি আছেন তো?'

'হ্যাঁ, ওপরে গেলে পেয়ে যাবেন। সকাল থেকে শিবু বাড়িতেই আছে।'

শিবানন্দের ঘরে গিয়ে দেখলাম, শিবানন্দ খাটে বসে বই পড়ছেন।

'কী ব্যাপার?' আমাদের দেখে তিনি হাসিমুখে বললেন।

'আচ্ছা আপনার কাছে উইদারিং হাইটস বইটা আছে তো? রোববার আপনার শোকেসে দেখছিলাম, বইটা আমাকে কিছুক্ষণের জন্য দিতে পারবেন?'—বুম্বাদা শিবানন্দকে জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ নিশ্চয়। একটু দাঁড়ান, আমি পাশের ঘর থেকে বইটা এনে দিচ্ছি।'

শিবানন্দ যেই তাঁর খাট থেকে নেমে পাশের ঘরে ঢুকলেন, বুম্বাদা তার হাতের কাজ দেখাল। বুম্বাদার কাছে যে জুতোটা ছিল সেটা পাল্টাপাল্টি হল শিবানন্দের জুতোর সঙ্গে। অর্থাৎ আইপড এখন বুম্বাদার হাতে। কিছুক্ষণের মধ্যে শিবানন্দ ফিরে এলেন এবং বইটা বুম্বাদার হাতে তুলে দিলেন।

'আসছি।' এই বলে আমরা শিবানন্দের ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে পৌঁছলাম। তারপর সোজা হোটেলে। হিলের মধ্যে থেকে বার হল আইপড। আইপডটা কালো রঙের। তাহলে কাল রাত্রে কি ভুল দেখেছিলাম?

'এবারে স্টোনের কাছে যেতে হবে একবার।' বুম্বাদা বলল। আমিও গেলাম ওর সঙ্গে। বুম্বাদা একটা মোবাইলের দোকানে ঢুকল।

'আচ্ছা এই আইপডটার দাম কত হবে?' এই বলে বুম্বাদা দোকানের লোকটার দিকে আইপডটা বাড়িয়ে দিল। 'পাঁচ হাজার হবে। কাল রাত্রে এরকম একটা আইপড এই দোকান থেকে বিক্রি হয়েছে।' দোকানদার আমাদের বলল।

দাম শুনে তো আমি অবাক, তাহলে আসল আইপডটা গেল কোথায়? রিকশা নিয়ে আমরা হোটেলে ফিরলাম, বুম্বাদা ঘরে এদিক থেকে ওদিক পায়চারি করতে লাগল। দশ মিনিট ওর সঙ্গে আমার কোনো কথা নেই। তারপর বুম্বাদা ফোন করল ভবানন্দকে—'আমি আজ বিকেলে যাব। সবাই যেন থাকে।' বুম্বাদা ফোনে কেবল এতটুকুই কথা বলল।

'তাহলে আসল আইপড এখন কার কাছে?' আমি বুম্বাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম। কোনো উত্তর পেলাম না। আমরা নীচে গিয়ে দাঁড়ালাম। নীচে যাওয়ার পর আমি বুম্বাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বুম্বাদা, কালকে রাত্রে আমাদের দরজায় কে কান পেতে কথা শুনছিল?'

'একেবারে কোনার টেবিলে যে লোকটা বসে আছে সেই লোকটা।'

আমি লোকটার দিকে তাকালাম। তাকে দেখে চেনা চেনা মনে হল।

'এই লোকটাকে আমি আর কোথাও যেন দেখেছি?'

'অনেকবার দেখেছিস।'

'অনেকবার! যেমন—'

'যেমন কালকে রেসের মাঠে দেখেছিস আর শ্রীলেদার্সের সামনে দেখেছিস। তবে এই ভাবে নয়। লোকটার মাথায় শুধু একটা টুপি দিতে হবে আর চুলটা বড়ো করতে হবে।'

'এছাড়া অন্য কোথাও দেখেছি?'

'লোকটার মুখ থেকে দাড়ি আর গোঁফ বাদ দিলে হয় বিশ্বজিতের মুখ।'

'তার মানে বিশ্বজিৎ আমাদের হোটেলের নীচেই আছে?'

'তার জন্যেই আজ সকালে তাকে ভবানন্দের বাড়িতে দেখতে পাইনি।'

কেসটা খুবই জটিল। বিশ্বজিতের ব্যাপারটা বোঝা গেল কিন্তু আইপড কী করে বদল হল তা বুঝতে পারলাম না। তাই দুপুরের খাওয়ার পর বুম্বাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বুম্বাদা, আইপড কী করে তাহলে বদল হল?'

'তুই এখনও বুঝতে পারিসনি? শিবানন্দের জুতোটা দে, বুঝিয়ে দিচ্ছি।' আমি শিবানন্দের জুতোটা বুম্বাদার দিকে বাড়িয়ে দিলাম।

'শিবানন্দ কোথা থেকে জুতো কিনেছিলেন?' আমাকে বুম্বাদা জিজ্ঞাসা করল।

'শ্রীলেদার্স থেকে।' আমি বললাম।

'শ্রীলেদার্স-এর স্টিকার কি রঙের হয়?'

'নীল।'

'আর এইখানে কী রঙ দেখছিস?'

'এই স্টিকার হলদে রঙের আর লেখা এলিট।'

বুম্বাদা বলতে থাকল, 'এলিটের এক শোরুম আছে স্টেশনের কাছে। এইখান থেকেই বিশ্বজিৎ জুতো কেনে এবং সেটা কাল রাত্রে সম্ভবত পাল্টাপাল্টি করে, কারণ কালকে খেলা শেষ হবার পর আমি একবার নীচে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি ঘরটা বাইরে থেকে তালা দেওয়া। অর্থাৎ বিশ্বজিৎ আবার কালকে সন্ধ্যাবেলায় জুতো ছাড়া আইপডটাও কিনে আনে। আর সেই নকল আইপডসমেত জুতো আমরা আজ সকালে শিবানন্দের ঘর থেকে নিয়ে আসি। তাহলে এখন আসল আইপড বিশ্বজিতের কাছে।'

আমরা সাড়ে চারটে নাগাদ ভবানন্দের বাড়ি পৌঁছলাম। বৈঠকখানায় সবাই অপেক্ষা করছিলেন বুম্বাদার জন্য। বুম্বাদা এবার শুরু করল, 'আমি একবারে প্রথম থেকে শুরু করছি। ইন্দ্রজিৎবাবু

আসেন মুম্বাই থেকে। এসেই তিনি জানিয়ে দেন তিনি এক লাখ টাকার আইপড কিনেছেন। শিবানন্দবাবুর এই শুনে লোভ হয়। তিনি দেখেন যে তিনি যদি আইপডটা চুরি করেন তাহলে সেটা বিক্রি করে অনেক টাকা পাওয়া যাবে। তাঁর ওপর যাতে সন্দেহ না হয় তাই তিনি পা মচকে যাবার ভান করেন। যেদিন রাত্রে চুরি হয় সেদিন তিনি সম্ভবত খাওয়ার আগে ইন্দ্রজিৎবাবুর ঘরের টেবিলে রাখা জলের গেলাসে ক্লোরোপ্যাকের ঘুমের বড়ি গুঁড়ো করে ঢেলে দেন। সেই কারণেই ইন্দ্রজিৎবাবু অঘোরে ঘুমিয়েছিলেন। সেই রাত্রেই চুরি করবার সময় তাঁকে দেখে ফেলেন বিশ্বজিৎবাবু কিন্তু বিশ্বজিৎবাবু সে কথা আমায় প্রথম দিন বলেননি।'

বিশ্বজিৎবাবু দেখলাম মাথা নিচু করলেন। বুম্বাদা আবার বলতে শুরু করল, 'আমি রবিবার আসছি এ কথা জেনে শিবানন্দবাবু সকালে তাঁর বন্ধু ডাঃ দাসের থেকে পা ব্যান্ডেজ করে আনেন যাতে আমার সন্দেহ তাঁর উপর না পড়ে। তারপর সেদিন বিকালে যখন আমি জেরা শুরু করি তখন হঠাৎ উপরে গিয়েছিলেন সম্ভবত দুটি কারণে।

এক, আইপডটা তাঁর পুরোনো পাম্পশুর মধ্যে ঢুকিয়ে আনেন যাতে সেটা আমার পক্ষে পাওয়া দুষ্কর হয়।

দুই, ক্লোরোপ্যাকের শিশিটা যার সাহায্যে তিনি চুরি করেছিলেন সেই শিশিটা তিনি রাখেন দেবানন্দবাবুর ঘরে যাতে আমার সন্দেহ পড়ে দেবানন্দবাবুর উপরে। কিন্তু তিনি এখানে একটু ভুল করে ফেলেছিলেন। তিনি বোধহয় ভুলে গেছিলেন যে দেবানন্দবাবু ঘুমের ট্যাবলেট খান। ক্লোরোপ্যাকের বড়ি খেলে ঘুম হয়। তাই আমার সন্দেহ হয় যে ক্লোরোপ্যাকের শিশিটা আলমারির পিছনে রাখা কেন? দেবানন্দবাবু সেটা টেবিলের ওপরেও রাখতে পারতেন।

এরপর আমি কিছু না জানিয়ে সোমবার আবার এখানে আসি। সেদিন হঠাৎ আমি আসছি জেনে শিবানন্দবাবু তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে ভুল করে ডান পায়ের বদলে বাঁ পা খুঁড়িয়েছেন। এই থেকে আমি নিশ্চিন্ত হই যে শিবানন্দবাবুর পায়ে চোট লাগেনি। তিনি রবিবার ক্লোরোপ্যাকের শিশিটা নিজের ঘরে রেখেছিলেন, পরে সেটা সরিয়ে দেবেন ভেবে। কারণ আমি বলেছি, তিনদিন পরে আসব, কিন্তু আমি হঠাৎ চলে আসায় তিনি সেদিন ক্লোরোপ্যাকের শিশিটাও তাঁর ঘর থেকে সরাতে পারেননি। তাঁর খাটের তলায় সেই ক্লোরোপ্যাকের শিশি পাওয়া যায়। তিনি সেদিন মোবাইলও ফেলে গেছিলেন তাঁর টেবিলে। ডাঃ দাসের মেসেজ পড়ে আমি বুঝতে পারি যে তিনি ঘোড়ার রেসের সঙ্গে যুক্ত। পরের দিন শিবানন্দবাবুর পিছু নিই আমরা। তিনি শ্রীলেদার্স থেকে যে মডেলের জুতো কেনেন আমি সেই একই মডেলের জুতো কিনি। নিউ মার্কেটে মুচির কাছে গিয়ে তিনি জুতোর হিল ফুটো করেন। বুঝে যাই যে সেখানেই আইপড থাকবে। ঠিক সেই মতো আমিও এইখানেই এক মুচির কাছে গিয়ে সেইমতো জুতোর হিল ফুটো করি। সেই জুতো আমি বদল করি। আইপড আমার হাতে আসে কিন্তু দোকানে খবর নিয়ে জানতে পারি যে সেই আইপডটা নকল। তার দাম মাত্র পাঁচ হাজার টাকা।'

এই শুনে ইন্দ্রজিৎবাবু একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'তাহলে আমার আসল আইপড কোথায়?'

'অত ব্যস্ত হবেন না।' এই বলে বুম্বাদা আবার বলতে শুরু করল।

'শিবানন্দবাবুর ওপর সন্দেহ হবার পর আমি পাশের 'বীণা' হোটেলে উঠি তাঁকে চোখে চোখে রাখবার জন্য। কিন্তু শুধু আমি নয় সেই হোটেলে ওঠেন বিশ্বজিৎবাবুও। কাল আমাদের পিছু ধরেন ছদ্মবেশে। কাল রাত্রে তিনি আমাদের দরজায় কান পেতে কথা শুনছিলেন। কথা শুনে বুঝতে পারেন যে আইপড শিবানন্দবাবুর জুতোর ভেতর থাকবে কারণ তখন আমাদের সেই নিয়েই আলোচনা চলছিল। তিনি আমার পিছু ধরে মুচির কাছে গিয়ে দেখেন জুতোর হিল কী ভাবে ফুটো করা হচ্ছে। ঠিক সেই মতো তিনি স্টেশনের কাছে এলিট-এর দোকান থেকে একটা নতুন জুতো আর সামনেরই মোবাইলের দোকান থেকে তিনি কমদামি একটা আইপড কেনেন। তারপর জুতোর হিল

মুচিকে দিয়ে ফুটো করেন, তার মধ্যে আইপড ঢুকিয়ে কাল রাত্রে তিনি সেই জুতো শিবানন্দবাবুর জুতোর সঙ্গে পাল্টা-পাল্টি করেন কারণ কাল রাত্রে তিনি হোটেলে ছিলেন না, তাঁর হোটেলের ঘর তালা দেওয়া ছিল। বিশ্বজিৎবাবুর কেনা সেই জুতো আমি আজ সকালে নিয়ে আসি।' বুম্বাদা বিশ্বজিৎবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওই দেখুন ওনার গালে ফলস দাড়ি লাগানোর জন্য এখনও আঠা লেগে আছে।'

'আইপডটা বের করুন।' বুম্বাদা বিশ্বজিৎবাবুকে একটা ধমক দিল।

বিশ্বজিৎ তাঁর জুতোর হিলের মধ্যে থেকে আইপড বের করলেন। বুম্বাদা আইপডটা ভালো করে দেখে বলল, 'আচ্ছা ইন্দ্রজিৎবাবু, এই আইপডটার দাম বড়োজোর কুড়ি হাজার হবে।'

ইন্দ্রজিৎ হাসতে হাসতে বললেন, 'ঠিকই ধরেছেন।'

'শিবানন্দ গোস্বামী, আপনি এত করলেন কিন্তু কিছুই লাভ হল না। এই নিন আপনার বইটা।' এই বলে বুম্বাদা উইদারিং হাইটস বইটা শিবানন্দবাবুর দিকে বাড়িয়ে দিল।

এবার ভবানন্দকে বুম্বাদা বললে, 'আইপড তাহলে বেরিয়ে গেল। আমার মনে হয় এই ব্যাপার নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নেওয়া উচিত।'

'ঠিকই বলেছেন, কী আর বলব বলুন। আমি তো ভাবতেই পারছি না।' এই বলে ভবানন্দ বুম্বাদার দিকে চার হাজার টাকার চেক বাড়িয়ে দিলেন।

এরপর কফি আর বিস্কুট খেয়ে আমরা ভবানন্দের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। এখন আমরা ট্রেনে। উত্তরপাড়া পেরোল। তার মানে আর তিনটে স্টেশন পরেই হাওড়া।

হঠাৎ বুম্বাদার ফোন বেজে উঠল।

'আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি একঘণ্টার মধ্যে যাচ্ছি।'

'কী হল?' আমি বুম্বাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম।

'হাওড়া ময়দানের কাছে একটা বাড়িতে লকেট চুরি গেছে, তাই যেতে হবে।'

হাওড়া স্টেশন থেকে আমি ধরলাম শিবপুর ট্রামডিপোর বাস আর বুম্বাদা একটা রিকশা ধরে এগোল। এখন বাজে আটটা। আমার বুম্বাদার সঙ্গে নতুন কেসে সাহায্য করা যাবে না। কারণ ছোটোপিসি কিছুক্ষণ আগেই ফোন করে বলেছে যে, আমার বাবা চলে এসেছে। তাই আজ রাত্রেই আমায় ফিরে যেতে হবে বাড়িতে।

[মাঘ ১৪১৭]

চন্দ্রদার দ্বিতীয় অভিযান

রূপক চট্টরাজ

গোয়েন্দা চন্দ্রক সেন ওরফে চন্দ্রদা সকালে টেবিলে বসে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে খবরের কাগজে চোখ বোলাচ্ছেন। এমন সময় ক্রি-ক্রি করে টেলিফোনটা বেজে উঠল। চন্দ্রদা ফোনটা ধরে হ্যালো বলতেই শুনতে পেলেন, নমস্কার, চন্দ্রক সেন আছেন?

হ্যাঁ, আমি চন্দ্রক সেন বলছি।

শুনুন, গতকাল দুপুরে আমার একটা বিপদ হয়েছে। আসলে ব্যাঙ্কের লকার থেকে গয়নাগাটি ও টাকাপয়সা তুলে বাড়ি ফেরার সময় আমার ভ্যানিটি ব্যাগটা চুরি হয়ে গেছে। ব্যাগে তখন গয়না, টাকা ও অনেক দরকারি কাগজপত্র ছিল।

আপনি কে বলছেন?

আমি মিসেস বোস।

কোথায় থাকেন আপনি?

নর্থ ক্যালকাটায়, হাতিবাগানে। আপনি যদি দয়া করে এখনই একবার আসেন—মানে টেলিফোনে সব কথা গুছিয়ে বলা যাবে না তাই!

আচ্ছা যাচ্ছি, আপনি ঠিকানাটা বলুন। লিখে নিচ্ছি।

লিখুন.....। আমি আমার গাড়িটা পাঠাব আপনাকে আনার জন্য?

না, না, আমি এই আধঘণ্টার মধ্যেই ওখানে পৌঁছে যাচ্ছি। আপনি অপেক্ষা করুন।

ধন্যবাদ। আসুন, আপনার জন্য অপেক্ষা করছি।

টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখতেই চন্দ্রদার শাগরেদ নীল বলে উঠল, কী হল, চন্দ্রদা? সকাল সকাল তুমি আবার কার সঙ্গে অত কথা বললে? নতুন কিছু ঘটল বুঝি? কেসটা একবার শুনি!

পরে বলছি। এখন তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে। এক্ষুনি বেরুতে হবে আমাদের।

নীলকে সঙ্গে নিয়ে চন্দ্রদা একটা ট্যাক্সি নিয়ে ঠিকানা খুঁজে মিসেস বোসের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন। মিসেস বোস অপেক্ষা করছিলেন তাই ওঁদের দেখামাত্রই বললেন, আমি মিসেস বোস। আপনি মিস্টার সেন? আসুন আপনারা ভেতরে আসুন।

মিসেস বোস ওঁদের বাড়ির ভেতর এনে সদর দরজা বন্ধ করে বসার ঘরে এসে বসলেন।

চন্দ্রদা বললেন, আমি চন্দ্রক সেন। আর এ আমার শাগরেদ নীলাদ্রিশেখর সেন ওরফে নীল। প্রথমে বলুন আপনি আমার নাম ও ফোন নাম্বার কোথা থেকে পেলেন।

মিসেস বোস বললেন, আমি আমার এক বন্ধুর কাছে আপনার নাম ও ফোন নাম্বার পাই।

তা, ঘটনাটা বন্ধু জানল কেমন করে?

বলছি, আমার ভ্যানিটি ব্যাগটা চুরি হয়ে যাওয়ার পর আমি থানায় গিয়ে ডায়েরি করি। এই দেখুন ডায়েরির কেস নাম্বার।

হুঁ, বলুন, থানা কী বলল?

যা বলে, মামুলি ব্যাপার।

তারপর?

আমি ডায়েরির কেস নাম্বারটা নিয়ে বাড়ি ফিরে আসি। পরে এক বন্ধুকে এই চুরির ঘটনাটা বলি। ও শুনে বলল, ব্যাপারটা একটা পার্সোনাল ইনভেস্টিগেশন করাতে পারিস। তাই ওর কথামতো ওর কাছ থেকে আপনার নাম ও ফোন নাম্বার নিই। অত টাকা-গয়না একসঙ্গে চলে গেলে কার আর মন ঠিক থাকে বলুন!

বুঝলাম, এবার বলুন ঠিক কী ঘটেছিল।

গতকাল ব্যাঙ্কে গিয়েছিলাম টাকা ও লকার থেকে গয়নাগাটি তুলতে। ওসব তুলে আমাকে একটা জরুরি কাজে পার্কসার্কাসে যেতে হয়েছিল। ওখান থেকে কাজ সেরে আমি বাড়ি ফিরছিলাম আমার গাড়িতে। টাকাপয়সা-গয়নাগাটি সবই ছিল আমার ভ্যানিটি ব্যাগে। ভ্যানিটি ব্যাগটা আমি আমার পাশেই সিটে রেখেছিলাম। গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে দেখি ভ্যানিটি ব্যাগটা পাশে নেই। সিটের নীচে, পিছনের খাঁজে, এপাশ-ওপাশ সব তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখলাম। ড্রাইভারও আমার সঙ্গে খুঁজল। কিন্তু কোথাও আর ব্যাগটার হদিস পাওয়া গেল না। ভ্যানিটি ব্যাগে টাকাপয়সা-গয়নাগাটি ছাড়াও আমার অনেক জরুরি কাগজপত্র ছিল। ওগুলোও না পেলে আমার অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। এখন যে কী করি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না, মিস্টার সেন।

ব্যাগটা কী রঙের ছিল, মিসেস বোস?

ডিপ ব্রাউন কলার চামড়ার ব্যাগ। কাঁধেও ঝোলানো যায়, হাতেও নেওয়া যায়। ব্যাগটা আমার খুব শখের ছিল। এক নামী কোম্পানির শো-রুম থেকে কিনেছিলাম।

আচ্ছা, আপনি পার্কসার্কাসের যেখানে গিয়েছিলেন সেখানে খোঁজ নিয়ে দেখেছেন যে ব্যাগটা ওখানে ফেলে এসেছেন কিনা?

না, না, আমি ওখানে গিয়ে কলেজের ভেতরে ঢুকিনি। এমনিতেই ব্যাঙ্কে খুব দেরি হয়ে গিয়েছিল তাই কলেজের দারোয়ানকে দিয়ে আমার এক বান্ধবীকে ডেকে এনে ব্যাগ থেকে একটা কাগজ বের করে দিয়ে চলে আসি। তখন তো ব্যাগটা আমার হাতেই ছিল।

আপনার বান্ধবীর নামটা বলবেন?

ওর নাম সুতপা ঘোষ। ও আমার কলেজের বন্ধু। এখন ও ওই কলেজে অধ্যাপনা করে।

আপনি ওখান থেকে বাড়ি ফেরার সময় রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে কোনো দোকানে বা অন্য কোথাও কিছু কিনতে যাননি তো?

না মিস্টার সেন। কোথাও যাইনি। শুধু একবারই গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল ট্রাফিক সিগন্যালে। তখন তো আমি গাড়ির ভেতরে। বাইরে থেকে হাওয়া আসার জন্য আমি শুধু গাড়ির জানালার কাচগুলো নামিয়ে দিই।

আচ্ছা, তখন ব্যাগটা আপনার কাঁধে ছিল, না পাশে রেখেছিলেন মনে পড়ছে?

ব্যাগটা আমার পাশেই সিটের ওপর ছিল। সাধারণত ওটা আমার কোলে থাকে। কিন্তু যা গরম তাছাড়া টাকাপয়সা-গয়নাগাটি থাকায় ব্যাগটা বেশ ভারী লাগছিল তাই হালকা হওয়ার জন্য পাশেই রেখেছিলাম।

ওটা আপনার বাঁ দিকে ছিল না ডান দিকে ছিল, ম্যাডাম?

এমনি সময়ে সিটে রাখলে ডান দিকে রাখি। ডান দিক দিয়ে হাওয়া আসছিল বলে তাই ব্যাগটাকে বাঁ দিকে রেখে আমি ডান দিকের জানালা ঘেঁষে বসেছিলাম।

যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন ট্রাফিক সিগন্যালে সেই জায়গাটা কোথায় ঠিক বলতে পারবেন?

তা আমি ঠিক বলতে পারব না। তবে আমার ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলে জানা যেতে পারে।

আচ্ছা আপনার ড্রাইভার কতদিন আপনার গাড়ি চালাচ্ছেন?

ও আমার খুব পুরোনো লোক। কম করে পনেরো বছর হবে।

এর আগে কখনো আপনার গাড়ির ভেতর থেকে কোনো কিছু হারিয়েছে বলে মনে পড়ে?

না, গাড়ির ভেতর থেকে চুরি যাওয়ার ঘটনা ঘটল এই প্রথম।

আপনার ড্রাইভারকে আমি দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। তবে তার আগে আপনি বলুন আপনার ড্রাইভার রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে একবারও গাড়ি থেকে নামেননি তো?

না মিস্টার সেন। ও সব সময় গাড়ির ভেতরেই ছিল। তবে যখন ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়ে ছিলাম তখন একটা অল্পবয়সি মেয়ে একটা পাত্র হাতে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির জানালার কাছে গিয়ে ভিক্ষা চাইছিল। আমাদের গাড়ির কাছে এসে ও পাত্রটা তুলে ভিক্ষা চাইতে গিয়ে ওর হাত থেকে ভিক্ষাপাত্রটা উল্টে পড়ে যায়। সামান্য কিছু পয়সা হলেও ওগুলো রাস্তায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে যায়। আমার গাড়ির তলায়ও কয়েকটা পয়সা গড়িয়ে ঢুকে যায়। তখন অবশ্য আমার ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমেছিল ওই মেয়েটিকে পয়সা কুড়িয়ে দিয়ে সাহায্য করতে। তারপর আবার গাড়িতে উঠে পড়ে। ততক্ষণে সিগন্যাল খুলে যাওয়ায় ও গাড়ি স্টার্ট করে দেয়। পরে আর আমরা কোথাও থামিনি। একেবারে সোজা বাড়িতে। এখানে এসে গাড়ি থেকে নামতে গিয়েই নজরে পড়ল যে ব্যাগটা নেই।

এবার আপনার ড্রাইভারকে একবার ডাকুন, দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। ওকে ওর ড্রাইভিং লাইসেন্সটা সঙ্গে আনতে বলবেন।

মিসেস বোস তাঁর ড্রাইভারকে ডেকে এনে বললেন, মিস্টার সেন, এই যে আমার ড্রাইভার। আপনারা কথা বলুন আমি পাশের ঘরে যাচ্ছি।

আপনিও থাকুন, মিসেস বোস। থাকলে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। উনি কী বলছেন তা আপনিও শুনবেন। তবে কোনো মন্তব্য না করলেই হল।

ঠিক আছে, আমি বসছি এখানে। আপনি এখন শুরু করতে পারেন কথাবার্তা।

চন্দ্রদা মিসেস বোসের ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার নামটা?

শিবু মণ্ডল।

আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্সটা দেখি?

এই নিন, স্যার।

বাবার নাম?

স্বর্গীয় হরেন মণ্ডল।

আচ্ছা, আপনি কতদিন মিসেস বোসের গাড়ি চালাচ্ছেন?

তা স্যার বছর চোদ্দো-পনেরো হবে।

আপনি এ কাজে থাকার সময় কখনো কিছু এই গাড়ি থেকে খোয়া গেছে বলে আপনার মনে পড়ছে?

না, স্যার। এরকম ঘটনা এই প্রথম ঘটল।

ব্যাগটা চুরি যাওয়ার ব্যাপারে আপনার কী মনে হয়?

আমি তো কিছুই বুঝতে পারিনি, স্যার। দিদিমণি গাড়ি থেকে নামার পর সব জানতে পারলাম। শুনে তো রীতিমতো অবাক হয়ে গেছি আমি।

তা ব্যাগটা তো আপনি দেখেছেন?

হ্যাঁ স্যার। তা দেখেছি। ব্যাগটা তো দেখি সবসময় দিদিমণির হাতে হাতেই ঘোরে।

আপনি গতকালও ব্যাগটাকে ওনার হাতেই দেখেছিলেন?

হ্যাঁ স্যার। উনি তো ব্যাগটা হাতে নিয়ে ব্যাঙ্কে গেলেন, আবার পার্কসার্কাসে গেলেন, ফিরে এলেন গাড়িতে। তখন তো দিদিমণির হাতে ব্যাগটা ছিল বলে মনে পড়ছে।

আচ্ছা, ব্যাগটা কী রঙের ছিল বলুন তো?

মনে হচ্ছে স্যার বাদামি রঙের।

ব্যাগটা দেখলে আপনি নিশ্চয় চিনতে পারবেন?

তা পারতে পারি, স্যার। দিদিমণির হাতের ব্যাগ তো, তাই ঠিক সেভাবে কখনো নজর করিনি। তবে দেখলে আমি নিশ্চয় চিনতে পারব।

আচ্ছা, আপনি বাড়ি ফেরার সময় গাড়ি থেকে কখনো রাস্তায় নেমেছিলেন বলে মনে পড়ে?

হ্যাঁ স্যার। একবারা নেমেছিলাম।

যেখানে গাড়ি থেকে নামলেন সে জায়গাটা কোথায়? আর কেনই বা নামলেন আপনি?

ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সি. আই. টি রোড দিয়ে আসার সময় এন্টালির মোড়ে। গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি একটি বাচ্চা মেয়ে আমাদের গাড়ির কাছে এসে ভিক্ষা চাইছিল। সে সময় ওর ভিক্ষাপাত্রটা হাত থেকে পড়ে যায়। পয়সাগুলো সব রাস্তায় এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যায়। ট্রাফিকে আটকে ছিলাম তাই গাড়ি থেকে নেমে মেয়েটার সঙ্গে হাত লাগিয়ে পয়সাগুলো ওকে কুড়িয়ে দিই। তারপর সিগন্যাল খুলে যাওয়ায় আমিও গাড়ি চালিয়ে সোজা বাড়িতে চলে আসি। দিদিমণি গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে দ্যাখেন ওঁর ব্যাগটা নেই। তখনই আমি জানলাম ওটা চুরি হয়ে গেছে।

ঠিক আছে। আপনি আসুন। এই নিন আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্স।

এরপর চন্দ্রদা মিসেস বোসকে বললেন, আপনি তো সবই শুনলেন। দেখা যাক আমরা কতদূর কী করতে পারি। তবে দু-এক দিন সময় লাগবে। ভরসা রাখতে পারেন।

সে আর বলতে, মিস্টার সেন। আমার গয়নাগাটি, টাকাপয়সা ও দরকারি কাগজপত্র সবই তো খোয়ালাম ওই ব্যাগের সঙ্গে। এখন আপনাদের ওপর ভরসা করা ছাড়া আর উপায় কী বলুন?

ও. কে. মিসেস বোস। আজকে আমরা উঠি। তবে আপনার ব্যাগে কত টাকা ছিল আর গয়নাগাটির যদি একটা লিস্ট করে রাখেন তো ভালো হয়। পরে কাজে লাগতে পারে।

নিশ্চয় সেটা করে রাখব, মিস্টার সেন। আর যদি কিছু মনে না করেন তবে আমার গাড়িটা আপনাদের ছেড়ে দিয়ে আসতে পারে বাড়িতে।

নো ম্যাডাম। আমরা একটা অন্য কাজ সেরে বাড়ি ফিরব। চলি, পরে দেখা হবে। থ্যাঙ্ক ইউ।

দিন চারেক বাদে চন্দ্রদা মিসেস বোসকে ফোন করে বললেন, আপনি এক্ষুনি আপনার লোকাল থানায় চলে আসুন। সঙ্গে আপনি কেস ডায়েরির নম্বরটা আনবেন। একটা ভ্যানিটি ব্যাগ উদ্ধার করা গেছে। এসে দেখুন চিনতে পারেন কিনা! তাড়াতাড়ি আসুন। আমরা আপনার জন্য থানায় অপেক্ষা করছি।

মিসেস বোস চন্দ্রদার ফোন পাওয়ার পর ওঁর এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে থানায় গেলেন। চন্দ্রদা ও নীল থানার সামনেই অপেক্ষা করছিলেন। মিসেস বোস গাড়ি থেকে নেমে বললেন, গুড মর্নিং মিস্টার সেন। আপনার ফোন পাওয়ার পর আমি একটু নার্ভাস হয়ে পড়ি। তাই আমার এই বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এলাম। এই আমাকে আপনার খবর দেয়।

নমস্কার। চলুন মিসেস বোস, আমরা এখন ভেতরে যাই। আমাদের জন্য অফিসার ইনচার্জ অপেক্ষা করছেন।

ও. সি.-র চেম্বারের দরজা নক করে চন্দ্রদা বললেন, আসতে পারি?

আসুন, আসুন মিস্টার সেন। বসুন।

স্যার, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনিই হচ্ছেন মিসেস বোস, যাঁর জন্য আমাদের এখানে আসা। মানে এই ভ্যানিটি ব্যাগ রহস্য।

বসুন মিসেস বোস। আপনারাও বসুন। বলে ও. সি. তাঁর আলমারি খুলে একটা ভ্যানিটি ব্যাগ এনে মিসেস বোসকে বললেন, দেখুন, এই ব্যাগটা কি আপনার ম্যাডাম?

মিসেস বোস ব্যাগটা হাতে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ স্যার, এটাই আমার ব্যাগ। কিন্তু.....

এই নিন আপনার কাগজপত্র। এসব ওই ব্যাগে পাওয়া গেছে আর আপনি কেস ডায়েরিতে

লিখেছেন যে আপনার ব্যাগে গয়নাগাটি ও টাকাপয়সা ছিল। সেসবই পাওয়া গেছে। এগুলো আমার কাছে আছে। তবে কী কী গয়না আর কত টাকা ছিল তার যদি একটা লিস্ট আমাকে দেন তো আমি ওগুলো মিলিয়ে মিলিয়ে আপনার হাতে সব তুলে দিতে পারি। মনে হয় সবই ঠিকঠাক আছে। দুঁদে গোয়েন্দা চন্দ্রক সেন কেসটা হাতে নিয়ে এত তাড়াতাড়ি সমাধান করে ফেলেছেন যে দুষ্কৃতীরা ব্যাগটা হাতিয়ে ওগুলো গায়েব করার সময়ও পায়নি।

এই নিন স্যার আমার গয়নাগাটি ও টাকাপয়সার লিস্ট।

বাঃ, আপনি তো দেখছি সব রেডি করে নিয়ে এসেছেন। দেখুন তো এই পুঁটলিতে যা যা আছে সব ঠিকঠাক আছে কিনা?

মিসেস বোস সব ভালো করে দেখেশুনে ও. সিকে বললেন, হ্যাঁ স্যার, সব গয়নাই আছে তবে টাকাটা পাঁচশো কম দেখছি।

তা হবে। এটা দুষ্কৃতীরা স্বীকার করেছে যে টাকাপয়সা কিছু কম আছে। আসলে কাঁচা পয়সা হাতে পেয়েছে তো তাই আর লোভ সামলাতে পারেনি ওরা। তবে ওরা বলেছে জেল থেকে ছাড়া পেলে ওটাও শোধ করে দেবে।

ধন্যবাদ স্যার, কী বলে যে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাব তা ভেবে পাচ্ছি না।

নো ম্যাডাম। ওটা আমার প্রাপ্য নয়। এ কেসটার ব্যাপারে যা কিছু সবই মিস্টার সেনের কৃতিত্ব।

ওঁকে তো জানাবই, স্যার। উনি কেসটা হাতে না নিলে এত তাড়াতাড়ি কোনো কিছু সম্ভব হত না। কী বলেন, মিস্টার সেন?

এ ব্যাপারে আমি আর কী বলব। এটা তো আমার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। তবে আপনারা সবকিছু ঠিকঠাক বলে যে ভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন তার তারিফ করতেই হয়। আমি ও নীল আপনাদের কথামতো এগিয়েই এর কিনারা পাই। সেদিন আপনাদের গাড়িটা ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়েছিল তখন যে মেয়েটি ভিক্ষা করছিল তার সঙ্গে আরও একজন ছিল গাড়ির এপাশে। ওই দুজনে সবসময় দু'পাশে থাকে। মেয়েটি আপনার কাছে ভিক্ষা চাইতে এসে ইচ্ছাকৃতভাবে হাতের পাত্রটি উল্টে রাস্তায় ফেলে দেয়। আপনি তখন কৌতূহলবশে গাড়ির জানালার পাশে সরে এসে বাইরে মুখ বাড়িয়ে ওই দিকে নজর দেন। আর আপনার ড্রাইভারও গাড়ি থেকে নেমে মেয়েটির পয়সা কুড়োনোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সেই ফাঁকে অপর ছেলেটি গাড়ির অন্য জানালা দিয়ে চুপিসাড়ে হাত গলিয়ে আপনার ব্যাগটা তুলে নেয়। ওরা এমনভাবে কাজটা করে যে ঠিক সেই মুহূর্তেই ট্রাফিক সিগন্যালটা খুলে দেয়। তখনই সমস্ত আটকে থাকা গাড়ি এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সেই হৈ-হট্টগোলের মধ্যে তখন আর কারো কোনো দিকে নজর থাকে না। এভাবেই ওরা দিনের পর দিন লোকের জিনিস চুরি-ছিনতাই করে। আমি ও নীল গত তিনদিন ওখানেই ওত পেতে বসেছিলাম। গতকালই ওদের ধরে ফেলি। ওরা এখন লকআপে। জেরার মুখে সব কথা কবুল করেছে। তাই আপনাকেও সাবধান করে দিচ্ছি মিসেস বোস, এবার থেকে একটু সতর্ক হয়ে পথেঘাটে চলবেন।

তা আর বলতে, মিস্টার সেন। আপনি ও নীল আমাদের সঙ্গে গাড়িতে উঠুন। আপনার পারিশ্রমিকের চেকটা তাড়াহুড়োয় বাড়িতেই ফেলে এসেছি। চলুন, বাড়ি গিয়ে আমাকে ঋণমুক্ত করুন আর সকলে মিলে একটু মিষ্টিমুখ করা যাবে, কী বলুন?

[ভাদ্র ১৪১৭]

বছরে শারদীয়া সংখ্যাসহ মোট বারোটি সংখ্যার 'শুকতারা' পত্রিকায় প্রচুর গোয়েন্দা ও রহস্য গল্প প্রকাশিত হয়। একসময় সেগুলি লিখেছেন ছোটদের গল্পের বিখ্যাত সব লেখক, এই সময়ও ছোটদের প্রিয় লেখক আছেন অনেক। তাঁদের লেখাও কম আকর্ষণীয় নয়। দীর্ঘ চৌষট্টি বছর ধরে যে জনপ্রিয় পত্রিকা এই জাতীয় গল্প প্রকাশ করে আসর মাতিয়ে রেখেছে, সেই পত্রিকা থেকে মাত্র একশো একটি গল্প নির্বাচন করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। প্রথম সমস্যা, এতদিন ধরে যেসব লেখক লিখছেন তাঁদের মধ্য থেকে ১০১ জনকে নির্বাচন করা। তার চেয়েও বড়ো সমস্যা, প্রত্যেকেই এত বছরে বেশ কিছু গোয়েন্দা বা রহস্য গল্প লিখেছেন—তার মধ্যে থেকে তাঁর সেরা লেখাটি নির্বাচন করে নেওয়া। এর পরেও একটা সমস্যা থেকে যায়, প্রত্যেকটি গল্প যেন ভিন্ন স্বাদের হয়, সেটা দেখা। কারণ লেখা অত্যন্ত ভালো হলেও গল্প যদি এক ধরনের হয়, পড়তে তা অত ভালো লাগার কথা নয়।

অত্যন্ত যত্ন করে এবং সতর্কভাবে, প্রত্যেকটি গল্প খুঁটিয়ে পড়ে এর আকর্ষণ বিচার করে গল্পগুলি নির্বাচন করা হয়েছে। গোয়েন্দা গল্পগুলি রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় ভরা, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সাসপেন্স বজায় থাকে। রহস্য গল্পগুলিও অত্যন্ত রোমাঞ্চকর, এদের টান টান উত্তেজনা সবাইকে স্তব্ধ করে রাখবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। গোয়েন্দা ও রহস্য গল্পের সংকলন অনেক আছে, 'শুকতারা'র ১০১ গোয়েন্দা রহস্য গল্প কিন্তু আছে একটাই।